সোনার হরিণ নেই

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড
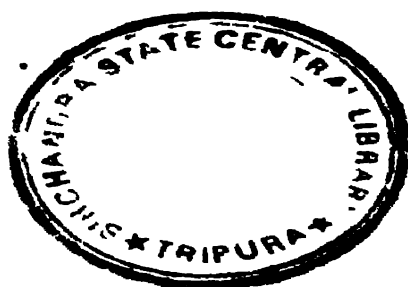
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৬৬

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন— গৌতম রায়
মুদ্রণ— চয়নিকা প্রেস

SONAR HARIN NEI VOL II
A novel by Ashutosh Mukherjee published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt Ltd 10, Shyama Charan Dey Street, Calcutta 700 073

ISBN : 81-7293-242-1

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও এসসি অফসেট ৩০/২ বি, হরমোহন ঘোষ লেন
কলিকাতা ৭০০ ০৮৫ হইতে সন্দীপ চ্যাটার্জী কর্তৃক মুদ্রিত।

—তোমাকে

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই—

তিন ভাগ জল
নগরপারে রূপনগর
একাল ওকাল
শতরূপে দেখা
পঞ্চতপা
বাজীকর
চলাচল
কাল, তুমি আলেয়া
ত্রিশূল
তিন পুরুষ
বকুলবাসর
জবার বদলে কাল যমুনার বিয়ে
মানুষের দরবারে

সোনার হরিণ নেই

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ এক ॥

বনমায়ার সেই দাঁতাল সঙ্গীকে মারার জন্য সরকারী ঢ্যাঁড়া পড়েছে।

প্রথম দিকে কিছুদিন ওই বুনো হাতিটা চা-বাগানের কাছাকাছি জঙ্গল থেকে তারস্বরে ডাকাডাকি করেছে। সন্ধ্যায় বা রাতে ওদিকে ঘেঁষার মতো বুকের পাটা কারো নেই। তারপর লছমন এক চাঁদনি রাতে স্বচক্ষে পাহাড়ের মতো ওই দাঁতাল হাতিটাকে সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। একবারও ডাকেনি বা এতটুকু শব্দ করেনি। বাপীকে বলেছে, ভয়ে ওর হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে গেছল। ওটা নেমে এলে ছনের ঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে ওকে পিষে মারতে কতক্ষণ।

কিছুই করেনি। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি চলে গেছে। তার সঙ্গিনী আর এ-জগতে নেই তা ও ভালো করেই বুঝে গেছে। কিন্তু কিছুদিন না যেতে ওটার উপদ্রব শুরু হল। এক-এক রাতে গাছপালা মুড়িয়ে তছনছ করে দিয়ে যাচ্ছে, জঙ্গলের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। ঢাক-ঢোল টিন কানেস্তারা নিয়ে দল বেঁধে রাতে পাহারা দিতে হয়। পাঁচ-ছ'মাসের মধ্যে নানা জায়গায় সাত-সাতটা জঙ্গলের কুলি মজুরকে মেরে দলা পাকিয়ে রেখে গেছে। ওটা গুণ্ডা হয়ে গেছে। মারার পরোয়ানা বার করা ছাড়া আর উপায় নেই। বনবিভাগের তরফ থেকে পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে। বিষমাখানো ফলার কারবারী নেপালী তীরন্দাজরা ওটার খোঁজে দল বেঁধে জঙ্গল ঢুঁড়েছে। কিন্তু এই গুণ্ডা হাতিও এখন তেমনি চতুর। উল্টে ওই তীরন্দাজদের দুজন আচমকা ওর হাতে পড়ে তালগোল পাকিয়ে গেছে।

শেষে বাইরের দুজন রাইফেলধারী পাকা শিকারী আসরে নামতে ওটা কিছুটা নাকাল হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছে মনে হয়। মনে হয় কারণ, রাইফেলের গুলি ওটার কান বা ঘাড়ের কোথাও লেগে থাকবে বলে শিকারীদের বিশ্বাস। নইলে মুখ থুবড়ে পড়ে ওখানেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু জঙ্গল কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে ওটা পালিয়েছে। পরের ছ'মাসের মধ্যে জঙ্গলের এই এলাকায় আর তাকে দেখা যায়নি। অমন পাহাড়ের মতো দেহ নিয়ে কোথাও মরে পড়ে থাকলেও টের পাওয়া যেত। জঙ্গলের লোকেরাই নিঃশব্দে খোঁজাখুঁজি করেছে। ওটার দাঁতের প্রতি অনেকেরই লোভ। কোথাও মরে পড়ে থাকলে আর সকলের অগোচরে দাঁত দুটোর মালিক হয়ে বসতে পারলে এক ধাক্কায় স্বর্গলোক। বাপী শুনেছে, ওই বুনো গুণ্ডার বিশাল দাঁত দুটো ধনুকের মতো বেঁকে শূন্যে ঠেলে ওপরের দিকে উঠেছে।

পাগল হয়ে গেছে যখন একদিন ওটা কারো হাতে মরবে জানা কথা। গুলির ক্ষত বিষিয়ে আপনিও মরতে পারে। বন্দুক ছুঁড়তে জানলে আর ওটা সামনে পড়লে বাপী নিজেও মারার চেষ্টাই করত। কিন্তু ভিতর থেকে হিংস্র হয়ে উঠতে পারত কি? উল্টে ছেলেমানুষের মতোই কাল্পনিক শত্রু-ফাঁশের আক্রোশ তার। বনমায়ার হাল যদি কোনো এক মেয়ের হত, ও নিজে কি করত? এমন কি কিছু না হলেও শুধু যদি সভ্য দুনিয়ার বিধি-নিষেধের অস্তিত্ব না থাকত? তাহলেও কি কলকাতার এক সোনালি-চশমা-রাঙা-মুখ এত দিনে যমের দরজা দেখত না?

আরো একটা বছর ঘুরে গেল। বাপী তরফদার সুখে নেই এ তার কোনো শত্রুও বলবে না। মর্যাদা বেড়েছে, প্রতিপত্তি বেড়েছে। মাইনে বা বাড়ি ভাড়ার টাকা এক পয়সাও খরচ হয় না। সব সোজা ব্যাঙ্কে চলে যায়। অলিখিত কমিশন হিসেবে গড়ে তার দ্বিগুণের বেশি কাঁচা টাকা হাতে আসে। তাই সামাল দিতে ভাবতে হয়। খাওয়া খরচ

নেই, জলখাবারের খরচ পর্যন্ত না। শুধু লাঞ্চ ডিনার নয়, সকালে-বিকেলের জল-খাবারের সময়ও এখন পাশের বাংলোয় ডাক পড়ে। আপিস তো ওখানেই, তাই সাতসকালে নাকে-মুখে গুঁজে ছোটার দরকার হয় না। দু-বেলাই গায়ত্রী রাই আর তার ˙ায়ের সঙ্গে ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসতে হয়। তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও মহিলার নজর আছে বোঝা যায়। মাঝে মাঝে অনুযোগ করে, যে-মুখ করে খাও, কি পছন্দ আর কি অপছন্দ কিছুই বোঝা যায় না।

বাইরে কোনো উচ্ছ্বাস নেই। বিরক্ত হলে আগের মতোই কথা শোনায় বা ধমকে ওঠে মহিলা। তবু বাপী স্নেহের স্বাদ পায়। ওর প্রতি মনোযোগ বাড়ছে, নির্ভরতা বাড়ছে। পরোক্ষ প্রশ্রয়ও। বাপীর সঙ্গে ঊর্মিলার কথায় কথায় ঝগড়া। ঝগড়া অবশ্য এক-তরফা ঊর্মিলাই করে থাকে। দোষ বলতে গেলে বাপীরই। ফাঁক পেলেই সাদা মুখ করে এমন কিছু মন্তব্য করবে বা ফোড়ন কাটবে যে ও-মেয়ে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেই। যা মুখে আসে তাই বলে তখন। গায়ত্রী রাই দেখে। শোনে। বিরক্ত হয়ে কখনো বা মেয়েকেই শাসন করে।—সর্বদা তুই ওর সঙ্গে এমন লাগবি কেন—আর যা-তা বলবি কেন?

বেশি রাগিয়ে দিতে পারলে মেয়ে মায়ের ওপর চড়াও হয়।—আমি ওর সঙ্গে লাগি —আমি যা-তা বলি? ও কত বড় বজ্জাত জানো?

বাপীর এমন মুখ যে মালিক না বাঁচালে এই মেয়ের অত্যাচারে তার বাঁচা দায়।

গায়ত্রী রাই কখনো ইচ্ছে করেই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। কখনো বা ঠোঁটের ফাঁকে চুলচেরা হাসির রেখা মিলিয়ে যায়। ঊর্মিলা জানে না, কিন্তু বাপী তাইতেই আরো বিপন্ন বোধ করে। মহিলা বলতে গেলে গোড়া থেকেই সদয় তার ওপর। অনেক ভাবে ওকে যাচাই করেছে, কিন্তু উত্তীর্ণ হোক সেটা নিজেও মনেপ্রাণে চেয়েছে। এই চাওয়াটা ভিন্ন স্বার্থের কারণে। তখন শুধু চালিহা লক্ষ্য। তেমন নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত কাউকে পেলে তাকে দূরে সরানোর সংকল্প। সেই লক্ষ্য আর সংকল্পের দিকে বাপীই তাকে এগিয়ে দিয়েছে। তার পুরস্কারও পাচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো কিছু পাচ্ছে যার ফলে আনন্দের থেকে ভয় বেশি। ভিতরে সেই অনাগত আশঙ্কার ছায়াটা ইদানীং আরো বেশি দুলছে। মহিলার স্নেহ শুধু কাম্য নয়, দুর্লভ ভাবে বাপী। এর সঙ্গে শুর ভিতরের একটা উপোসী আবেগের যোগ। কিন্তু এত স্নেহ আর প্রশ্রয়ের আড়ালে মহিলার প্রত্যাশাটুকু বাপীর কাছে দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভয় আর দুশ্চিন্তা সেই কারণে।

...মেয়ে ওর সঙ্গে যেখানে বা যত দূরে খুশি বেড়াতে গেলে গায়ত্রী রাইয়ের আপত্তি নেই। দুপুরে ব্যবসার কাজকর্মে একটু-আধটু বোঝার জন্য মেয়েকে বাংলোর আপিস ঘরে গিয়ে বসতে বলে। কিন্তু বাপীর বিশ্বাস মেয়ে এলে স্রেফ আড্ডা দেয় আর কাজ-কর্ম পণ্ড হয় জেনেও এই তাগিদ দেয়। বিশেষ কাজে কিছুদিন আগে একবেলার জন্য পাহাড়ে আসার দরকার হয়েছিল। গায়ত্রী রাই মেয়েকে হুকুম করেছে, তুইও যা. ঘরে বসে থেকে কি হবে, যেটুকু পারিস শিখেটিকে নে।

ঊর্মিলা তক্ষুনি রাজি। শিখতে দায় পড়েছে তার। বাপীর সঙ্গে বেড়ানোটুকুই লাভ। বাপীই বরং প্রস্তাবু নাকচ করেছে। বলেছে, শেখার সময় ঢের পাওয়া যাবে, আপনাকে একলা রেখে দুজনের বেরুনো চলবে না।

মা সরে যেতে ঊর্মিলা ঝাঁঝিয়ে উঠেছে. না গেলাম তো বয়েই গেল, কিন্তু শেখার সময় ঢের পাওয়া যাবে বলার মানে কি? কাজ শেখার জন্য এখানে তোমার কাছে বসে থাকব?

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর গায়ত্রী রাই তার সময়মতো শুতে চলে যায়। মেয়ের আবার সেটাই ভালো আড্ডার সময়। প্রায়ই বাপীকে ধরে রাখে। যে-দিন বিলেতের চিঠি আসে সেদিন তো ওকে সমস্ত সমাচার জানানোর জন্য এই নিরিবিলির প্রতীক্ষায় ছটফট করে। কিন্তু এরকম আড্ডা দেওয়াটাও গায়ত্রী রাইয়ের চোখে দৃষ্টিকটু ঠেকে না।

সম্প্রতি বাপীর একটা মোটর গাড়ি হয়েছে। গাড়ির তখন কি-বা দাম। চা-বাগানের সায়েবসুবোরা চলে যাবার সময় ভালো গাড়িও জলের দামে বেচে দিয়ে যায়। বাপী ডাটাবাবুকে বলে রাখতে সে-ই একটা ভালো গাড়ির সন্ধান দিয়েছিল। কিন্তু গায়ত্রী রাই বাপীকে এখানকার ব্যাংকে গচ্ছিত সাদা টাকা দিয়ে কিনতে দেয়নি। আর হিসেবের বাইরের উত্তর বাংলার দূর-দূরের ব্যাংকে যে টাকা জমা আছে—তার থেকে তুলে গাড়ি কিনলে ইনকাম ট্যাকস্ ছাড়াও আরো সতের রকমের জবাবদিহির ফ্যাসাদে পড়তে হবে। গায়ত্রী রাইয়ের হুকুমে সেই গাড়ি ফার্মের নামে কেনা হয়েছে। ফলে খরচ সব কোম্পানীর ট্যাক্সের খাতায় উঠছে। গাড়ি বাপীর খাস দখলে।

মায়ের বদান্যতায় ঊর্মিলা অখুশি নয়। তবু বাপীকে ঠেস দিতে ছাড়েনি।—বা রে দেখি তোমার বেলায় মিসেস দাতাকর্ণ হয়ে বসল একেবারে, যা চাও তাই মঞ্জুর। চাইলে শেষে আমাকে সুদ্ধু না দিয়ে দেয়—

বলতে বলতে খিলখিল হাসি।

বাপী সন্তর্পণে প্রসঙ্গ এড়িয়েছে। বিজয় মেহেরা বিলেত থেকে ফেরার আগে মহিলা না চাইতেই দেবার জন্য ঝুঁকবে কিনা সেই আশঙ্কা বুকে চেপে বসেছে বাপীর। ঊর্মিলা মেয়েটা বোকা নয়। নিজেকে নিয়ে বিভোর, তাই কোনরকম সন্দেহের আঁচড় পড়ছে না। উল্টে বাপী দলে আছে বলেই নিজের ব্যাপারে বাড়তি জোর পাচ্ছে। ও ধরে নিয়েছে, সততার সবগুলো সিঁড়ি টপকানো শুধু নয়, মায়ের সব থেকে ব্যথার জায়গাটি ছুঁয়ে যেতে পেরেছে বলেই এই ছেলের এখন এত খাতির কদর, তার প্রতি এত স্নেহ। তাছাড়া মায়ের অসুখটার জন্য বাপী যা করল তাও এই মেয়ে আর কোনদিন কাউকে করতে দেখেনি। একথা ঊর্মিলা নিজেই বাপীকে বলেছিল। ওর নিজের তো আগে ধারণা হয়েছিল মায়ের অসুখ-টসুখ সব বাজে। পরে এই জন্যেও মনে মনে লজ্জা পেয়েছে।

বাপীর এত সুখের তলায় কোন্ দুশ্চিন্তা থিতিয়ে আছে ঊর্মিলাকে তার আভাস দেওয়াও সম্ভব নয়। জানালে এই মেয়ে অবুঝের মতো ক্ষেপে যাবে। মা মেয়ের মধ্যে আবার একটা বড় রকমের অশান্তি ঘনাবে। শুধু মানসিক নয়, মহিলার তাতে স্বাস্থ্যেরও ক্ষতির সম্ভাবনা। তাছাড়া ঊর্মিলাকে বলবেই বা কি, ওর মা তো এখন পর্যন্ত সরাসরি প্রস্তাব কিছু দেয়নি। যেটুকু বোঝার বাপী আভাসে বুঝেছে, আচরণে বুঝেছে।

বাঁচোয়া শুধু এই, মেয়ে শেষ পর্যন্ত যদি তার সংকল্প আঁকড়ে ধরে থাকে। যেরকম অবস্থা আর মতিগতি দেখছে, মনে হয় থাকবে। এক বছরেরও ওপরে দেরি, এখন থেকেই বিজয় মেহেরার ফেরার দিন গুনছে। প্রাণের দায়ে ইদানীং বাপী ঊর্মিলার কাছে ওই ছেলের গুণকীর্তন শুরু করেছে। ছেলেটার ব্যক্তিত্ব আছে, পুরুষের গোঁ আছে, বড় হবার মতো ইচ্ছের জোর তো আছেই, গুণও আছে।

ঊর্মিলার কানে মধু। এক-এক সময় তাগিদ দেয়, মায়ের কাছে ওর সম্পর্কে তুমি একটু একটু বলতে শুরু করো না।

বাপীর তখন পিছু হটার পালা।—এখন বললে মাঝখান থেকে উত্তেজনা বাড়বে, শরীর খারাপ হবে। সময়ে তোমার জোরটাই আসল, এখন বলে কিছু লাভ হবে না।

সেদিন ঊর্মিলা এসে একটা জবর খবর দিল। বিকেলে চা-বাগান কোয়ার্টার্স-এর দিকে বেড়াতে গেছল। আংকল চালিহার সঙ্গে দেখা। ডাটাবাবুর ক্লাবে নিয়ে গিয়ে জোরজার

করে অনেক কিছু খাওয়ালো। সেই ফাঁকে বিজয় মেহেরার দারুণ প্রশংসা। আংকল নিজের একটা মস্ত ভুল শুধরোবার সুযোগের অপেক্ষায় আছে বলল। মিরিকের চা-বাগানের ওপরওলার সঙ্গে দেখা করে বিজয় মেহেরার সম্পর্কে খোঁজখবরও নিয়েছে। কারণ ভাগ্নি নিজের মেয়ে বললেই হয়, তার তো একটা দায়িত্ব আছে। তা সেই ওপরওয়ালা মেহেরার খুব প্রশংসা করেছে। বলেছে, যেমন সৎ তেমনি পরিশ্রমী। আর ভালো স্কলার তো বটেই। ছেলেটা যে খুব উন্নতি করবে তাতে তার কোনো সন্দেহ নেই। বিজয় লণ্ডনে এখন কোথায় আছে, কি রকম আছে, কবে পর্যন্ত ফেরার সম্ভাবনা, চিঠিপত্র লেখে কিনা, সহৃদয় আপনার জনের মতো আংকল এসব খোঁজও নিয়েছে। চিঠির প্রসঙ্গে ঊর্মিলা চুপ করে ছিল। অন্য সব কথার জবাব ঠিক ঠিক দিয়েছে। তারও ধারণা, বিজয়কে মায়ের কাছে অমন ছোট করে ফেলে আংকল এখন পস্তাচ্ছে।

কিন্তু পস্তাবার কারণটা বাপীর থেকে ভালো বোধ হয় আর কেউ আঁচ করতে পারবে না। বাপীর সঙ্গেও রণজিৎ চালিহার ব্যবহার এখন আরোও আপনার জনের মতো। মাঝে মাঝে ওকে ডিনারেও ডাকে। গেলাসে চুমুক দিয়ে অন্তরঙ্গ খোশমেজাজে জিজ্ঞাসা করে, কতকাল আর ব্যাচিলার থাকবে হে, দেখেশুনে ঝুলে পড়ো কোথাও। নয় তো বলো আমিই ঘটকালিতে লেগে যাই। তারপর গলা খাটো করে জিগ্যেস করেছিল, কাউকে মনে-টনে ধরেনি তো?

নিরীহ মুখে শুধু হেসেই বাপী এসব কথার জবাব এড়াতে পারে। ঊর্মিলার সঙ্গে সহজ মেলামেশাটাই খুব সম্ভব ভদ্রলোকের বেশি দুশ্চিন্তার কারণ। আর গায়ত্রী রাই যেভাবে এখন ওকে আগলে রাখে, সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখে, টাকা-পয়সা দেয়—তাই দেখেও এই অতি-চতুর লোকের সন্দেহের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। মেয়ের বিয়ের পাত্রর জন্য দু-দুটো বড় কাগজে অত ঘটা করে বিজ্ঞাপন দিয়েও মহিলা একটা বছরের মধ্যে সে-সম্পর্কে একেবারে চুপ মেরে গেল দেখেও এই লোকের সন্দিগ্ধ হবার কথা।

অনুমান মিথ্যে নয় দিন কতকের মধ্যেই বোঝা গেল। রণজিৎ চালিহা মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলতে দেখুক। কিন্তু মুশকিল হল, সেই একই খাঁড়া যে বাপীর দিকে উঁচিয়ে আছে! মেয়েকে নিয়ে আজকাল বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে ভ্যানে চেপে হাওয়া খেতে বেরোয় গায়ত্রী রাই। ব্যবস্থা বাপীরই। তাকে না পেয়ে রণজিৎ চালিহা সেদিন বাপীর বাংলোর হাজির।

ব্যবসার আলোচনার ফাঁকেই তার মনের সংকট আঁচ করা গেল। মধ্যপ্রদেশের অনেক জায়গায় ঘুরে এসেছে এর মধ্যে। ভালো ব্যবসাই হবে আশা করা যায়। কিন্তু চালিহা খোঁজখবর নিয়ে দেখেছে পশ্চিম বাংলার কলকাতার মতো এমন বাজার আর হয় না। শুধু শুকনো হার্বের চাহিদাই সেখানে বছরে পঁচিশ-তিরিশ লক্ষ টাকার মতো। আর নেশার জিনিসও ওখানেই সব থেকে বেশি চলতে পারে। চালিহার মতে এত বড় মার্কেট আর হাতছাড়া করে রাখার কোনো মানে হয় না। ওয়েস্ট বেঙ্গল রিজিয়নের জন্যেই বাপীকে প্রথমে নেওয়া হয়েছিল, এখন তার সেখানেই চলে যাওয়া উচিত। সেখানে একটা গোডাউন ঠিক করে এখান থেকে মাল চালানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তারপর দেখে-শুনে ঘাঁটি ঠিক করে অন্য পাঁচ রকমের মাল পাঠানো যেতে পারে।

প্রস্তাবের শুরুতেই বাপী তার মনের কথা বুঝে নিয়েছে। সাদাসিধে জবাব দিল। মিসেস রাইয়ের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করুন, আমার আর অসুবিধে কি।

—বলেছিলাম। চালিহার মুখে চাপা বিরক্তি।—এই অসুখটার জন্যেই ভদ্রমহিলা মনের দিক থেকে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছেন মনে হয়। অত বড় একটা মার্কেট হাতছাড়া হওয়া উচিত নয় বলে যদি মনে করো তাহলে তুমিই জোর দিয়ে তাঁকে বলো। এদিকের

জন্যে তো কিছু আটকে থাকবে না, মধ্যপ্রদেশের ফিল্ড হাতে নিয়েও এদিকটা আমি দেখাশুনা করতে পারব।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বাপী জিজ্ঞাসা করল, মিসেস রাই কি বলেন?

—কি বলেন তাই তো আমার মাথায় ভালো করে ঢুকছে না। তোমাকে নাকি এখন তাঁর খুব কাছে রাখা দরকার। ব্যবসায় ইণ্টারেস্ট ছেড়েও তোমাকে খুব কাছে রাখা দরকার তাঁর...ব্যাপার কি বলো তো?

ব্যাপার কি তা যে এই লোক গায়ত্রী রাইয়ের ও-কথার পরে খুব ভালো করে টের পেয়ে গেছে বাপীর তাতে একটুও সন্দেহ নেই। মনে হল, অন্তরঙ্গ খোলসের আড়ালে একটা হিংস্র জানোয়ার ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ওৎ পেতে আছে। চোখের গভীরেও একটা ধারালো ছুরি লুকনো আছে।

বাপী ভাবনায় তলিয়ে যাবার মতো করে জবাব দিল, অসুখটার জন্যেই হয়তো মন দুর্বল হয়ে আছে।

একটু আগে নিজেই এই কথা বলেছিল চালিহা। মুখে হঠাৎ আবার হাসির খোলস ঢ়ালো। বলল, তোমারও তো মন খুব সবল দেখছি না। যাক, আমার যা বলার ব্যবসার স্বার্থেই বললাম, যদি ভালো বোঝো তো মিসেস রাইয়ের সঙ্গে আলোচনা কোরো—তার কাছে থাকাটাই যদি বেশি দরকার ভাবো তা হলে আর কথা কি!

সে চলে যাবার পরেও বাপী স্থাণুর মতো বসে অনেকক্ষণ। সকলকে ছেড়ে গায়ত্রী রাই আগে এই লোকের কাছেই মনের ইচ্ছেটা প্রকারান্তরে ব্যক্ত করে ফেলল কেন মাথায় আসছে না। অসুখের জন্য বাপীর যেটুকু উদ্বেগ, মহিলার নিজের তার ছিটেফোঁটাও নেই। তার চরিত্রের এই ধাত বাপীর থেকে রণজিৎ চালিহা কম জানে না। অতএব ওকে কাছে রাখার একটাই অর্থ চালিহা বুঝেছে। আর, গায়ত্রী রাইও তাকে তা-ই বোঝাতে চেয়েছে। কিন্তু কেন? দূরে যাকে সরাতে চায় চালিহা, ভবিষ্যতে সে কত কাছের কোন জায়গা জুড়ে বসতে পারে সেটা বলে তাকে একটু সতর্ক করে দেবার জন্যে? বুঝিয়ে দেবার জন্যে যে আর তোমার ওই ছেলের পিছনে লেগে লাভ নেই—বরং নিজে তুমি সামলে চলো?

কিন্তু বাপী কি করবে এরপর? মহিলার সংকল্প যে ভাবে দানা বেঁধে উঠছে, ও কোন্ পথ ধরে আত্মরক্ষা করবে?

জঙ্গলের কাজ যেমন বাড়ছে, আবুর দায়িত্ব বাড়ছে তেমনি। কোথায় কোন্ চাষের বেড হচ্ছে বা হবে বাপীর কাছে তার প্ল্যান ছকা। দায়-দায়িত্ব আবুর। তার হুকুমমতো তিরিশজন লোক সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছে। এই গতর-খাটা লোকদের হিসেব মেটাবার জন্য আর পরামর্শ নেবার জন্য একদিন অন্তর আবুকে বাপীর কাছে আসতে হয়। হিসেব বুঝে পরচা লিখে সই করে দিলে অ্যাকাউনটেণ্ট টাকা দিয়ে দেয়। মেমসায়েবের বাংলোর আপিসের দিকে ঘেঁষে না আবু। সন্ধ্যার দিকে বাপীর বাংলোয় আসে।

পর পর চার দিনের মধ্যে আবুর দেখা নেই। লোক মারফৎ অ্যাকাউণ্টেণ্টের কাছে হিসেব পাঠিয়েছে—সে এসে বাপীর কাছ থেকে সই করিয়ে নিয়ে গেছে। অ্যাকাউণ্টেণ্ট জানিয়েছে, রব্বানীর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।

বিকেলের দিকে বাপী সেদিন ওকে দেখার জন্যেই বেরিয়ে পড়ল। এদিক ওদিক পত্র-টত্র লেগেছে খবর পেয়েছে। শুধু-মুদু ঘরে বসে থাকার লোক নয় আবু রব্বানী।

দাওয়ার দিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। মুখখানা বাংলার পাঁচের মতো হাঁড়ি করে দুলারি বেরিয়ে আসছে। বাপীকে দেখল। অভ্যাসবশত একটা হাত কপালে উঠল

বটে, কিন্তু মুখ তেমনি অপ্রসন্ন। গম্ভীর তো বরাবরই। একটি কথাও না বলে পাশ কাটিয়ে গেল।

ওর অসন্তোষের কারণ আঁচ করতে পারে বাপী। সাপ ধরার মৌসুম এটা। এর মধ্যে তিন দিন আগে রেশমাকে আবার পাহাড়ের বাংলোয় পাঠানো হয়েছে। এধারে গায়ত্রী রাইকে বলেই তাকে পাঠিয়েছে রণজিৎ চালিহা। বানারজুলি বা আশপাশের এলাকার মদ চালানোর ব্যাপারটা এখন বাপীর হাতে বটে। কিন্তু অন্যত্র চালিহার পার্টিও কম নয়। একটা বড় চালানের ব্যবস্থা করে মাল সংগ্রহের জন্য রেশমাকে আগে থাকতে সেখানে পাঠানো হয়েছে। বাপীর ধারণা দু-চার দিনের মধ্যে রণজিৎ চালিহাও পাহাড়ে যাবে। অবশ্য যাওয়াই স্বাভাবিক। হাজার টাকার মাল আসবে হয়তো, সে টাকা তো আর রেশমার হাতে দিয়ে দেওয়া যায় না। আগে গিয়ে সে শুধু সংগ্রহের ব্যবস্থা পাকা করে রাখবে।

চেষ্টা করেও ব্যাপারটা খুব সাদা চোখে দেখেনি বাপী। কিন্তু কর্ত্রীর সায় থাকলে সে আর বাধা দেয় কি করে। রেশমাকে আসামে চালান করতে চাওয়ার পিছনে চালিহার নিজস্ব মতলব কিছু আছে একথা তো গায়ত্রী রাইকে খোলাখুলিই বলে দিয়েছিল বাপী। হয়তো বা ভেবেছে, ঝগড়ু আছে সেখানে, মেয়েটা ঠিক থাকলে তার ওপর হামলার কোনো ভয় নেই। আবার এমনও হতে পারে ওই তুখোড় বুদ্ধিমতী মহিলার কাছে এও একটা টোপের মতো। আর সেই কারণেই প্রস্তাব আসামাত্র সায় দিয়েছে। হামলা যদি কিছু হয়ই, আর মেয়েটা যদি রুখে দাঁড়ায় বা ফুঁসে ওঠে, রণজিৎ চালিহার তাহলে মুখ পুড়বে। জঙ্গলের এইসব মেয়ে, বিশেষ করে রেশমা যে সহজ মেয়ে নয় গায়ত্রী রাই সেটা ভালই জানে। বড়দরের গণ্ডগোল কিছু পাকিয়ে উঠলে চালিহার সঙ্গে মহিলার কিছু ফয়সলার সুযোগ হয়তো আপনি এগিয়ে আসবে।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে বাপীর চাপা অস্বস্তি রেশমাকে নিয়েই। তার হাবভাব চাল-চলনের বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করছে। জঙ্গলের কাজ তদারকে বেরুলে ওর সঙ্গে দেখা হয়। আবার বাংলোর দিকের রাস্তায় যখন ঊর্মিলার সঙ্গে বেড়ায়, তখনো দেখা হয়। রেশমা চোখের কোণে তাকায়, ঠোঁটে হাসি টিপ টিপ করে। সামনা-সামনি দেখা হয়ে গেলে দু-হাত কোমরে তুলে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বাপী এগোলে বা থামলে দুটো কথা কইবার সাধ। কিন্তু বাপী এগোয়ও না দাঁড়ায়ও না। সোজা পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তাতেও মেয়েটার চোখেমুখে কৌতুক ঝরে লক্ষ্য করেছে।

বাপী তরফদার এখন ওর শুধু খোদ ওপরওলা নয়, এক কথায় দণ্ডমুণ্ডের মালিক। রেশমাও সেটা খুব ভালো জানে। দেখা হলে এই মেয়ে যদি সসম্ভ্রমে তাঁকে সেলাম ঠুকত বা পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াত—তাও অস্বাভাবিক হত না। কিন্তু এর থেকে ওর সর্ব অঙ্গে ওপরওলার দাক্ষিণ্য যেটুকু আছে তার ওপরেই যেন নির্ভর বেশি। নিজের এই জোরের দিকটা সম্পর্কে সজাগ বলেই বেশি বেপরোয়া। এই মেয়ে যদি সসম্ভ্রমে সেলাম ঠোকে বা পথ ছেড়ে দাঁড়ায় সে-ও যেন কৌতুকের মতোই হবে। যাই হোক, বাপীর ধারণা মেয়েটার চাপা কৌতুক দিনকে দিন বাড়ছে।

...ক'দিন আগের এক বিকেলে ঊর্মিলা বাপীর বাংলোয় এসে হেসে অস্থির।—জঙ্গলে রেশমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

বাপী জবাব দেয়নি। নির্লিপ্ত গম্ভীর মুখে তাকিয়েই শুধু।

—তোমাকে ক'বার করে ডেকেছিল আর তুমি সাড়া না দিয়ে আর একদিকে চলে গেছ?

...জঙ্গলের সেই সাপ-ধরার পোশাকে রেশমাকে দেখেছিল ঠিকই। আঁট জামা পরা এই মেয়েকে দেখলে দুটো চোখ আপনা থেকে অবাধ্য হয় বলেই ডাক শুনেও বাপী

সোজা প্রস্থান করেছিল। জিগ্যেস করতে আরো বেশি বিরক্ত হয়ে জবাব দিয়েছিল, রেশমাকে বলে দিও আমি ওর ইয়ার্কির পাত্র নই।

ছদ্ম বিস্ময়ে ঊর্মিলার দু'চোখ বড় বড়।—রেশমা তো তাহলে ঠিক বলেছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসি।

—কি বলেছে?

—ও একটা মস্ত শঙ্খচূড় ধরেছে আজ, সেই আনন্দে ওটা তোমাকে দেখাবার জন্যে ডেকেছিল। ও দুঃখ করছিল, এত বড় ওপরওলা হয়েও জ্যান্ত সাপের মতোই তুমি ওকে ভয় করো—এদিকে তোমার জন্যেই এখন ওর এত আয়-পয় যে ম্যানেজার চালিহা পর্যন্ত এখন ওকে খাতির করে, হেসে কথা কয়। তারপরেই চোখ পাকিয়েছে ঊর্মিলা, নিজের মনে পাপ না থাকলে ওর মতো এতদিনের একটা চেনা-জানা মেয়েকে তোমার এত ভয় কেন মশাই? ও-মেয়ে তো পারলে তোমাকে পুজো করে!

বিরক্ত হয়ে বাপী চায়ের তেষ্টার কথা বলে ওদের বাংলোয় চলে এসেছিল। মেয়েলী রাস্তা ধরে রেশমা যে শয়তানি করেই চালিহার খাতির করা বা হেসে কথা কওয়া ব্যাপারটা বাপীর কানে তুলতে চেয়েছে তাতেও কোনো সন্দেহ ছিল না।

আবু রব্বানী দাওয়ায় একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে। অদূরে দুলারি দাঁড়িয়ে। দুজনেই গম্ভীর। মুখ দেখে মনে হয় দুজনের কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। এইমাত্র হারমাকে চলে যেতে দেখেছে বাপী। কাছে আসতেই দুলারি জিগ্যেস করল, হারমাকে দেখলে?

—হ্যাঁ, কেন?

—কেন আবার কি, তোমার একটু মায়াদয়া নেই? রেশমা পাহাড়ে গেলে ওকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না? সেখানকার জঙ্গলে সাপখোপ নেই?

এমন মুখ আর এই অভিযোগ যে আবুকে আরো উত্তপ্ত করার জন্য বাপীর বুঝতে সময় লাগল না। ওর দিকে ফিরে হেসেই জিগ্যেস করল, জ্বরটর বাধিয়ে বসে আছ নাকি?

এবারে গম্ভীর চালে ঠেস দিয়ে দুলারিই আগেভাগে জবাব দিল, বসন্তের বাতাসে রাতদুপুরে ইঁদারায় ঠাণ্ডা জলে চান না করলে গা জুড়ায়? এখন গা গরম, তার থেকে মেজাজ আরো বেশি গরম। হারমার জন্য এত দরদ যে আমাকেই পাঁচ কথা শোনাচ্ছে।

বাপী দাওয়ায় বসল।—কি ব্যাপার?

গোমড়া মুখ করে আবুই ব্যাপার বোঝালো তাকে। জান কয়লা করে ফেললেও রেশমার মতো মেয়ে হারমাকে পাত্তা দেবে না, দোষের মধ্যে ঠেস দিয়ে দুলারিকে এই কথা আবু বলেছিল। তাইতেই দুলারির রাগ, রেশমার নামে কেউ কিছু বললে ও আর বরদাস্ত করতে পারে না। কিন্তু হারমা যে নালিশ করে গেল, উল্টে ওই মেয়ের ওপর দুলারির রাগ হবার কথা।...ম্যানেজার চালিহার সঙ্গে রেশমার এখনকার একটু ভাবসাব আবুও লক্ষ্য করেছে। কিন্তু দুলারি তা বিশ্বাসই করে না। রেশমার কানে লাগাতে ওই পাজী মেয়ে ফিরে তড়পেছে, নতুন বড় কর্তা তো সাত খুনের আসামীর মতো দেখে তাকে, পুরনো বড় কর্তা যদি হেসে-ডেকে দুটো কথা কয় তো দোষের কি, আনন্দই বা হবে না কেন? পাহাড়ে যাবার মওকা পেয়ে খুশিতে নাচতে নাচতে চলে গেল, এদিকে হারমা বলল, এর মধ্যে এক সন্ধ্যায় ওই চালিহা লোক পাঠিয়ে রেশমাকে তার বাংলোয় ডেকে নিয়ে গেছল। পাহাড়ে যেতে হবে বলার জন্যে সন্ধ্যার পর বাংলোয় ডেকে পাঠাবার দরকার কি, আপিসে ডেকে এনে বললেই হয়। অবশ্য হারমা তখন ওর সঙ্গে ছিল, আর আধ ঘণ্টা-টাক বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিল। তারপর রেশমার পাহাড়ে যাবার আগের দিন বিকেলে ম্যানেজার চালিহা নিজে ওর জঙ্গলের ডেরায় এসেছে, রেশমা নাকি তাকে

আদর করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছে। কম করে ঘণ্টাখানেক পরে কাজের কথা বলে তারপর চলে গেছে। হারমা ততক্ষণ সামনের উঠোনে বসে। নালিশ শুনে দুলারি নাকি উল্টে হারমাকে ধমকেছে, দু'দিনই তুই কাছে ছিলি আর ঘরের দরজাও বন্ধ ছিল না—তোর এভাবে এসে লাগান-ভাঙান দেবার কি হল, কাজের কথা থাকতে পারে না?

কাজ যা-ই থাক, ওই ধূর্ত লোকের সংগে মাখামাখি আবুর একটুও ভালো লাগেনি। হারমার পক্ষ নিয়ে সে-কথা বলতে দুলারি শুনিয়েছে, নিজের চরিত্রখানা কি ছিল তাই আগে ভালো করে দেখো, রেশমার মতো মেয়েকে বুঝতে তোমার ঢের দেরি। ফাঁদ যদি পাতেও, বুকে ছুরি বসানোর জন্যে পাতবে জেনে রেখো।

সবটা শোনার পর নিরীহ মুখে বাপী জানান দিল, চালিহা সাহেবও দু'চার দিনের মধ্যে পাহাড়ে যাচ্ছেন. ।

—যাচ্ছেন! রাগ আর উত্তেজনায় আবু সামনে ঝুঁকল।

—যেতে তো হবেই। রেশমা যে কাজের ভার নিয়ে গেছে তার টাকা পৌঁছে দিতে হবে না?

—শুনলে? শুনলে দোস্ত্‌এর কথা?

মুখ মচকে দুলারি জবাব দিল, দোস্ত্‌কেও তোমার মতো রোগে ধরাতে চাও তো এ-সব কথা বেশি করে শোনাও।

রেশমার বিরুদ্ধে কোনো কথাই দুলারির বরদাস্ত হবার নয়।

কিন্তু দুদিন না যেতে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে ব্যাপারখানা অন্যরকম দাঁড়িয়ে গেল। হাজার আড়াই টাকা নিয়ে কর্ত্রীর হুকুমে চালিহার বদলে বাপীকে ছুটতে হল পাহাড়ের বাংলোয়। জরুরী তার পেয়ে রণজিৎ চালিহা বিহারে চলে গেছে। ছ'সাত দিনের আগে তার ফেরার সম্ভাবনা নেই।

এ-রকম হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবু হাসিই পেয়েছে বাপীর। বেচারার বরাত বড় মন্দ চলেছে দেখা যাচ্ছে।

রেশমা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। বাংলোর ফটক দিয়ে বাপীর গাড়ি ঢুকতে দেখল। চালকের আসনে শুধু ওকেই দেখল। নিজের অগোচরে হাত দুটো কোমরে উঠল তার। একজনের বদলে অন্যজনকে দেখে অবাক কতটা ঠাওর করা গেল না। মুখে চাপা খুশির ছটা।

বাগানে মৌসুমী ফুল ছেয়ে আছে। আবার সেই বসন্তকাল। একটা মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে রঙ-চঙা ঘাঘরা আর জামা-পরা ওই মেয়ে দাঁড়িয়ে। কোমরে দু-হাত তোলার ভঙ্গিটাও চোখ টানবেই। ভিতরে ভিতরে বাপীর আবার সেই পুরনো অস্বস্তি। ফলে ওপরওলার মুখ ভার। ঠাণ্ডা, গম্ভীর।

গাড়ি থেকে নামার ফাঁকে ঝগড়ু এসে দাঁড়ালো। ওকে দেখে একগাল হাসি। তড়বড় করে বলল, তুমি আসবে বাপীভাই, ভাবিনি—খুব ভালো হল।

বারান্দায় উঠে বাপী একটা চেয়ার টেনে বসল। রেশমা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে। ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে শুধু। ঝগড়ুর দিকে চেয়ে গম্ভীর মুখেই বাপী জানান দিল, মিস্টার চালিহা জরুরী তার পেয়ে বিহার চলে গেলেন, তাই আমি এলাম।

কালো মুখে আর এক প্রস্থ হাসি ছড়িয়ে ঘাড় মাথা নাড়তে নাড়তে ঝগড়ু চায়ের ব্যবস্থায় চলে গেল। ওই একজনের বদলে বাপীভাইকে দেখে সে-যে কত খুশি, মুখে আর সে-কথা বলল না।

সামান্য মাথা নেড়ে বাপী রেশমাকে কাছে ডাকল। কোমর থেকে হাত নামলো রেশমার।

ঢিমেতালে এসে দাঁড়াল। বাপী তাকে বসতে বলল না। জিগ্যেস করল, কাজ-কর্মের কদ্দুর?

—হচ্ছে। কয়েকজন মাল মজুত করেছে, টাকা পেলেই দিয়ে দেবে। আর বাকিরা এখনো যোগাড় করছে, আরো পাঁচ-ছ'দিন লাগবে।

—এত সময় লাগবে কেন, তুমি তাড়া দাওনি?

—বেশি তাড়া দেবার কথা আমাকে বলা হয়নি। তোমার ফেরার তাড়া থাকলে তাড়া দিয়ে দেখতে পারি।

রেশমা সোজা চেয়ে আছে বলেই বাপীর দু-চোখ সামনের বাগানের দিকে। এবারে ওর দিকে না তাকিয়ে পারা গেল না। খুব সহজ কথাটার মধ্যেও যেন অহেতুক মজার ছোঁয়া লেগে আছে। চোখাচোখি হতেই বাপী ধাক্কা খেল একপ্রস্থ। এই হাসিমাখা চাউনি বাপীর অচেনা নয় খুব। কোথায় দেখেছিল...কোথায়? যে-চাউনি দেখলেই মনে হয় তার আড়ালে সর্বনাশ লুকিয়ে আছে কিছু। কমলা বনিক নয়, মণিদার বউ গৌরী বউদির চোখে এই রকম দেখেছিল কিছু। গৌরী বউদি সাত বছরের বড় ওর থেকে। রেশমা বছর দুইয়ের। কিন্তু দেখলে রেশমাকে বড় কেউ বলবে না। আরো তফাৎ কিছু আছে। গৌরী বউদি খুব অপ্রত্যাশিত পুরুষ দেখেছিল। রেশমার চাউনি আদৌ অপ্রত্যাশিত কাউকে দেখার মতো নয়। ও-যেন কাউকে নাগালের মধ্যে পেয়েই বসে আছে।

বাইরে বাপী আরো ঠাণ্ডা। আরো গম্ভীর। উঠল। ঘরে চলে গেল। নিজেই জানে কপাল ঘেমে উঠেছে। ওপরওলার ষড়যন্ত্রটা যে রণজিৎ চালিহাকে নিয়ে নয়—ওকে নিয়ে।

এবারে আর রেশমার সঙ্গে কোথাও বেরুলো না। ওর কাছ থেকে পার্টিদের ঠিকানা নিয়ে নিজেই বেরুলো। ওকে শুধু হুকুম করল. যোগাড়যন্ত্র তাড়াতাড়ি হয় কিনা দেখো—

একে একে চারদিন কেটে গেল। আজ পাঁচদিন। বাপী আশা করছে আজকের মধ্যে কাজ চুকিয়ে কাল সকালে বেরিয়ে পড়তে পারবে। একলাই যাবে। পরে ভ্যান এসে মালসহ রেশমাকে নিয়ে যাবে। ওর আচরণের ফলেই রেশমাও এবারে অনেকটা সমঝে চলতে বাধ্য হয়েছে বলে বিশ্বাস। সমস্ত দিন বা রাতের মধ্যে একবারও দেখা হয়নি এমন দিনও গেছে। সকাল দুপুর বিকেল রাত্রি একলা বসে খেয়েছে। ঝগড়ুকে বলেছে খাবার ঘরে দিয়ে যেতে। বাপীভাইয়ের মেজাজ দেখে এবার ঝগড়ুও হয়তো অবাক একটু। দুদিন মাত্র রেশমাকে ডেকে কাজের কথা বলেছে বা নির্দেশ দিয়েছে। রেশমাও অনুগত বাধ্য মেয়ের মতো কথার জবাব দিয়েছে বা শুনেছে। কোনো অছিলায় কাছে ঘেঁষতে চেষ্টা করেনি। তবু বাপীর ভেতরটা অস্বস্তিতে বোঝাই একেবারে।

সেদিন আর দুপুরের পর বাপীর হাতে কাজ নেই কিছু। রেশমা সকাল সকাল খেয়েদেয়ে তার কাজে বেরিয়েছে। বেলা থাকতে বাপী পায়ে হেঁটেই বাংলো ছেড়ে বেরুলো। আগের তুলনায় অনেক আত্মস্থ। পাহাড় থেকেই নেমে জঙ্গলে ঢুকল। তারপর পাহাড়ের ধার ধরে আপন মনে এগিয়ে চলল। পাহাড়-ঘেঁষা জঙ্গলের একান্ত নির্জন পথ ধরে মাইল দুই হাঁটার পর ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরে বসল।

বিকেল চারটে তখন। এত নিরিবিলি বলেই ভালো লাগছে। উঠতে ইচ্ছে করছে না। এই নির্জনতার এক ধরনের ভাষা আছে যা কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করে। আগের বছর যেমন দেখে গেছল তেমনি। বনের সর্বত্র সেই রূপের ঢেউ। সেই রসের ঢেউ। অশোক পলাশের সেই রঙের বাহার। শিমুল কৃষ্ণচূড়ার মাথা তেমনি লালে লাল। বাপী তন্ময় হয়ে দেখছে।

হঠাৎ বিষম চমক। কেউ ডাকোনি, কিন্তু নিজে থেকে কি করে টের পেল জানে না। ওর বাঁ পাথরটার ঠিক পিছনে কেউ দাঁড়িয়ে।

রেশমা। পরনে ঘাগরা। গায়ে রঙচঙা জামা। দু-হাত কোমরে। বাপীকে যেন দেখেইনি। তার মাথার ওপর দিয়ে সামনের প্রকৃতি দেখছে সেও।

—তুমি এখানে কেন? হঠাৎ কঠিন কর্কশ গলার স্বর বাপীর।

রেশমার দু'চোখ যেন দূরের থেকে কাছে এলো। তার মুখের ওপর স্থির হল। রাগত মুখ রাগত চাউনি তারও।—আমার সঙ্গে আজকাল তুমি এরকম ব্যাভার করছ কেন?

—তুমি যাবে এখান থেকে?

—কেন যাব? জঙ্গল তোমার?

হঠাৎ বাপী অত্যন্ত শান্ত। সংযত। গলার স্বর তেমনি কঠিন।—দেখো রেশমা, তুমি যার কাজ করছ আমিও তার কাজ করছি। এর মধ্যে তুমি যদি আমাকে ওই চালিহার মতো একজন কেউ ভেবে থাকো তো খুব ভুল হবে।

কৌতুক চাপার তাড়নায় রেশমা আরো গম্ভীর। সাদাসাপটা জবাব দিল, চালিহার মতো ভাবলে তোমার ধারে-কাছে কে ঘেঁষত?

এবারে বেশ জোরেই ধমকে উঠল বাপী।—তুমি যাবে এখান থেকে?

কোমর থেকে দু-হাত খসল। বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে সামনের দিকে তাকালো একবার। সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ। কিছু বোঝার আগেই দু-হাত বাড়িয়ে আচমকা প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টানে বাপীকে একেবারে নিজের গায়ের ওপর টেনে আনল। তারপরেই বলে উঠল, বনমায়ার সেই গুণ্ডা হাতি!

পলকে সামনের দিকে চোখ পড়তে বাপী বিমূঢ় হঠাৎ। রেশমা এক হাতে তাকে আঁকড়ে ধরে আছে, হুঁশ নেই। দেড়শ গজ দূরে একটা বিরাট হাতি। দুটো বিশাল দাঁত ধনুকের মতো বেঁকে শূন্যে উঠে গেছে। ডান দিকের গলার কাছে প্রকাণ্ড লালচে ক্ষতর মতো। হাতিটাও বোধ হয় সেই মুহূর্তেই দেখেছে ওদের। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের মতো শরীরটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে দ্রুত ধাওয়া করল এদিকে।

॥ দুই ॥

শক্ত মুঠোর বাপীর জামাটা ধরে আবার একটা হ্যাঁচকা টান দিল রেশমা—ছোটো শিগগীর।

কিন্তু বুনো হাতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটা যে সম্ভব নয় সেই মুহূর্তে অন্তত বাপীর মাথায় এলো না। দিশেহারার মতো সামনের দিকে ছুটতেই জামায় আবার জোরে টান পড়ল। জামাটা ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রেশমা জামা ছেড়ে তার হাত ধরল। ধমকের সুরে চেঁচিয়ে বলে উঠল, আঃ, পাহাড়ের দিকে ছোটো!

পঁচিশ-তিরিশ গজের মধ্যে পাহাড়। রেশমা বাপীর হাত ছাড়েনি। ওরা পাহাড়ের নাগাল পাবার ফাঁকে ওই যম পঞ্চাশ-ষাট গজের মধ্যে এসে গেছে।

—ওঠো! শিগগীর ওঠো! ও-দিক দিয়ে নয়, এই ছোট পাহাড়গুলো টপকে ওঠো। রেশমা ওকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজেও দু'হাতে আর দু'পায়ে তর তর করে উঠে যেতে লাগল। কিন্তু বাপী তাও পিছিয়ে পড়ছে দেখেই আবার দাঁড়িয়ে গিয়ে ওকে হাত ধরে টেনে পাথর টপকাতে সাহায্য করল। বুনো মরদ হাতি পাহাড়ের গায়ে এসে গেছে ততক্ষণে। ওদের পাহাড়ে উঠতে দেখেছে। বিশাল মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে ওটা পাহাড়ে ওঠার জায়গা খুঁজছে। একটা পাথরের আড়ালে বাপীকে এক হাতে জাপটে ধরে বসে ওটার মতি-গতি লক্ষ্য করল রেশমা। দেখছে বাপীও। কি বলতে যেতে রেশমা

মুখে হাত চাপা দিল। তারপর এক-হাতে তেমনি ধরে রেখে হামাগুড়ি দিয়ে আবার অন্য উঁচু পাথরের দিকে এগিয়ে গেল। এইভাবে আরো খানিক এগিয়ে যেতে পারলে পর পর কতগুলো পাহাড়ী ঝোপের আড়াল পাবে।

আবার একটা পাথরের পিছনে এসে থামল ওরা। কানে প্রায় মুখ ঠেকিয়ে রেশমা বলল, খানিকটা ওঠার মতো প্লেন পাথর পেলে ও ঠিক শুঁড় দিয়ে ছোট পাথর ঠেলে ঠেলে এ দিকে উঠে আসবে। বোসো, দেখে নিই কি করছে—

সভয়ে দেখছে বাপীও। শুঁড় তুলে শিকার ঠিক কোন্ দিকে হদিস পেতে চেষ্টা করছে। দুটো অতিকায় দাঁত ধনুকের মতো বেঁকে আছে। হাঁ করে শুঁড় উঁচনোর দরুন লালা-ঝরা লাল মুখ-গহ্বর দেখেও গা শিরশির করছে। ঘাড় আর কাঁধ ঘেঁষা পেল্লায় দগদগে ক্ষতটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন।...বনমায়ার সেই বুনো মরদ হাতিটাই যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দু'পেয়ে মানুষ বনমায়ার জীবন কেড়েছে। তাই আজ মানুষই চরম শত্রু ওর।

ক্ষিপ্ত আক্রোশে হাতিটা শরীর ঝাঁকিয়ে সামনের দিকে এগোতে রেশমা আবার একটা হ্যাঁচকা টান দিল।—ওই ওপরের ঝোপের দিকে, শিগ্‌গীর।

ছোট বড় খণ্ড খণ্ড পাথর টপকে আরো ওপরের ঝোপের আড়ালে চলে এলো তারা। একটু বাদে বাপী সত্রাসে দেখলে, দূরে বারো চৌদ্দ গজের মতো পাহাড় বেয়ে উঠে শুঁড় দিয়ে পাথর ঠেলে ঠেলে হাতিটা এ-দিকে এগিয়ে আসছে। ওরা যেখানে আছে শুঁড় দিয়েও নাগাল পাবে না হয়তো, কিন্তু অতটা যখন উঠেছে আরো উঠতে পারবে কিনা কে জানে: ওটাকে আসতে দেখেই বাপীর গায়ের রক্ত হিম।

বড় পাথরের দিকে ঘেঁষল না রেশমা, আবার ওকে টেনে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে খণ্ড খণ্ড পাথরের আড়ালে আড়ালে আরো উঁচু উঁচু ঝোপের পিছনে চলে আসতে লাগল। এক হাতে পিঠ বেড়িয়ে বাপীকে জাপটে ধরে আছে। মহামূল্যবান একটি প্রাণ যেন ওরই হাতের মুঠোয়। ঝোপের আড়ালে বসে আবার কানের কাছে মুখ এনে ফিস-ফিস করে বলল, উল্টো দিকের হাওয়ায় ও আমাদের গায়ের গন্ধ পাচ্ছে...ওর পিছনে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ওটা নড়বে না, হয়তো বিকেল ছেড়ে সমস্ত রাত আমাদের আগলে রাখবে।

হাতিটা এখন বেশ নিচে অবশ্য। ওটার দিকে চোখ রেখে ঝোপ আর পাথরের আড়ালে আড়ালে ফাঁক বুঝে বুঝে তারা ওটার পিছনের দিকে এগোতে লাগল। এই করে অনেকটা পিছনে এসে কিছুটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু ওটা সরে না গেলে তো এর পাহাড় থেকে নামা যাবে না।

হাতিটা যে রাস্তা ধরে ওপরে উঠেছিল সেদিকে ফিরে চলল এক সময়। ফলে ওদেরও সন্তর্পণে এগোতে হচ্ছে। নইলে গায়ের গন্ধ পাবে।

নামার আগে ওই বুনো হাতি হঠাৎ থেমে গিয়ে শরীরের সমস্ত রাগ গলা দিয়ে বার করতে লাগল। তার ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে পাহাড়টা সুদ্ধু কাঁপছে। উঁচু ঝোপের আড়ালে রেশমা বাপীকে এক হাতে বুকের আর নিজের পাঁজরের সঙ্গে জাপটে ধরে বসে আছে। কিন্তু তখন পর্যন্ত বাপীর আর কোনো দিকে হুঁশ নেই। সব ক'টা স্নায়ু টান টান. লক্ষ্য নিচের ওই দানবটার দিকে।

হুঙ্কার থামিয়ে বুনো হাতিটা সমতল পাহাড় ধরে নামতে লাগল। নামার পর আরো খানিক দাপাদাপি করে জঙ্গলের যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলল।

একটা দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটতে লাগল বাপীর। মুখ ফেরাতেই রেশমার গালের সঙ্গে গাল ঠেকল। রেশমা তেমনি এক হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছে তাকে। নিঃশব্দে

হাসছে। ঠোঁটের ফাঁকে ঝকঝকে দাঁতের সারি চিক চিক করছে। চোখের পলকে সর্বাঙ্গে যেন আগুনের ছেঁকা লাগল বাপীর। আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। কোন রকম বাধা না দিয়ে রেশমাও এবারে ছেড়ে দিল। কিন্তু চাপা হাসির তরঙ্গ নিঃশব্দে ওর দেহ-তট ভেঙে উপচে উঠছে। বাপী আর তাকাতেও পারছে না। শুধু নিজের জামা নয়, রেশমারও জামার জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার।

মাথাটা প্রচণ্ড ঝিম ঝিম করছে বাপীর। তবু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে চাপা ধমকের সুরে রেশমা বলল, এখুনি নামতে যাচ্ছ নাকি? পাগলা হাতির থেকে এখন আমাকে বেশি ভয় তোমার?

বাপী দাঁড়িয়ে রইল স্থাণুর মতো। শরীরের রক্তকণাগুলো জ্বলছে। চারদিক তাকিয়ে দেখল। বিচার-বিবেচনা যতো বাড়ছে এখন, ভিতরে ততো অস্বস্তি। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার বেশ খানিকটা নিচে পর্যন্ত খণ্ড খণ্ড ছোট পাথর। তুখোড় বুদ্ধিমতীর মতোই এই ছোট পাথরগুলোর এ-ধারে ওকে নিয়ে এসেছে রেশমা। কোনো হাতির পক্ষে এই ছোট পাথরের জঙ্গল ঠেলে উঠে আসা সম্ভবই নয়, বাপীর এতক্ষণ সেটা মনে হয়নি। কিন্তু তার পরেও রেশমা ওকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত এমনি জাপটে ধরে বসেছিল। সবটাই মনে পড়ছে বাপীর। নিজের প্রাণ তুচ্ছ, গোড়া থেকে ওকে বাঁচানোর আকুতিটুকুই সব রেশমার।

বাঁচাতে পেরেছে। পাথুরে মাটি ছেড়ে রেশমাও উঠে দাঁড়াল। চোখেমুখে হাসি চিক-চিক করছে তখনো। কিন্তু বাপী কি এত দুর্বল, এত অসহায়। ওর দিকে চোখ পড়তে এ কি সর্বনাশের ছায়া দেখছে। স্নায়ুগুলো এত কাঁপছে কেন ঠক ঠক করে?

রেশমা বলল, কিছুটা নেমে পাহাড় ধরেই যতটা সম্ভব এগনো যাক, একেবারে নিচে নামা ঠিক হবে না।

অর্ধেকটা নেমে পাহাড়ের পাথর ভেঙে ভেঙে পাশাপাশি চলল তারা। কিন্তু এভাবে চলা কষ্টকর। রেশমা থমকে দাঁড়াল এক জায়গায়।—হাত ধরব?

—দরকার নেই। রেশমার এই দুটো কথাও কানে গরম তাপ ছড়াচ্ছে।

—প্রাণে বাঁচালাম, এখন তো আমাকে দূরে ঠেলবেই। না তাকিয়েও বাপী বুঝতে পারছে ওর চোখেমুখে সেই সর্বনাশা হাসি ঠিকরে পড়ছে।

...অথচ রেশমা না থাকলে প্রাণে বাঁচা যে সম্ভব ছিল না এ এক নির্মম সত্য। বুনো পাগলা হাতিটা এত নিঃশব্দে আসছিল যে বাপীর চোখেই পড়ে নি। আর এক মিনিট দেরি হলেও রক্ষা পেত না। তাছাড়া ওটাকে দেখার পরেও দিশেহারার মতো জঙ্গল ধরেই ছুটতে যাচ্ছিল। রেশমা ওকে পাহাড়ে টেনে না তুললে এই জীবনের খেলা শেষ হয়ে যেত। জঙ্গলের মধ্যে ছুটে হাতির সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা যে হাস্যকর এ বাপীও জানে। অথচ সংকটের সময় এটুকুও মাথায় আসেনি।

দিনের আলোর টান ধরেছে। দেখতে দেখতে এখন অন্ধকার ধেয়ে আসবে। নিচে নেমেও তারা পাহাড় ঘেঁষেই দ্রুত চলতে লাগল। আরো মিনিট বিশ-পঁচিশ বাদে সব অন্ধকার। দু'জনে পাশাপাশি চলেছে। এখন রেশমার মুখ ভালো দেখা যাচ্ছে না। তাইতেই স্বস্তি একটু।

এতটা পথ দু'জনেরই মুখ সেলাই। পাহাড়ের বাংলোয় উঠে আসতে রাত। বাইরের বারান্দায় বড় হ্যাসাক জ্বলছে। বাপীর মনে হল ওটা না থাকলে ভালো হত। দূর থেকে দেখল কমলু বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। রাত হতে দেখে ওদের অপেক্ষাতেই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে হয়তো।

বারান্দায় উঠে আসতে দুজনের মূর্তি দেখে ঝগড়ুর চোখ কপালে। এত আলোয় রেশমার সমস্ত মুখ লালচে দেখাচ্ছে। চাপা হাসি ঠিকরোচ্ছে। কিন্তু ঝগড়ুর কিছু তলিয়ে ভাবার ফুরসৎ নেই!—কি হয়েছে বাপীভাই? কোনো বিপদ-টিপদ নাকি?

—ওর কাছে শোনো। আমি খুব ক্লান্ত। এক পেয়ালা স্ট্রং কফি নিয়ে এসো চট করে।

দ্রুত নিজের ঘরে চলে এলো। বুকের তলায় একটা ঠক ঠক শব্দ হয়েই চলেছে। মুখ হাত ধোবার ধৈর্যও নেই। গায়ের ছেঁড়া জামাটা খুলে গেঞ্জি গায়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। একটা চেনা যন্ত্রণার আগুন ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে।

একটু বাদে ঝগড়ু কফি রেখে গেল। ভয়ার্ত বিহ্বল মুখ তারও। বিপদের কথা শুনতে শুনতেই কফি নিয়ে চলে এসেছে বোধ হয়। পেয়ালা রেখেই আবার ছুটল।

রাত নটা নাগাদ চুপচাপ একলাই খেয়ে নিল বাপী। ভিতরে ঝগড়ুর ঘরে রেশমার খুশি-ঝরা গলা শোনা যাচ্ছে। তার ঘরের সামনেটা অন্ধকার। বাপী একটু এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে না দেখে পারল না। ঝগড়ু একটা নতুন দামী বোতল নিয়ে বসেছে। বাপী দেয়নি যখন ওটা নিশ্চয় রেশমাই দিয়েছে তাকে। পরনে তার একটা চকচকে ঘাগরা। গায়ে অন্য জামা। চান সেরে পিঠে ভিজে চুল ছড়িয়ে ঝগড়ুর মুখোমুখি মেঝেতে বসে আছে। হাঁটুর একটু ওপর থেকে ধপধপে পা দুটো দেখা যাচ্ছে। ঝগড়ুকে বিপদের গল্প বিস্তার করে শোনাচ্ছে।

বাপী সরে এলো বটে. কিন্তু স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা অবাধ্য অবুঝ দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে। সেই এক রাতের কথা মনে পড়তে বুকের ওপর আসা মুগুরের ঘা পড়েছে। ...যে রাতে কমলা বনিক নিজের শোবার ঘরে বসে আধা-বুড়ো রতন বনিককে তার খুশিমত মদ খেতে দিয়েছিল। কেন দিয়েছিল বাপী সেই সন্ধ্যায় সেটা তক্ষুনি আঁচ করছিল।

আজ সামনে বসে ঝগড়ুকে দামী মদ খাওয়াচ্ছে রেশমা।

নিজের ঘরে এসে বাপী দরজা দুটো বন্ধ করে দিল। তারপর ছিটকিনিও লাগিয়ে দিল। শরীরটা কাঁপছে। আলো নিভিয়ে সটান বিছানায়। কিন্তু তার পরেও একটা অমোঘ সর্বনাশ হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল .কলকাতায় যেমন হয়েছিল। সমস্ত দিন নিদারুণ আক্রোশে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করার পরেও রাতে একটা তিমির তৃষ্ণা ভিতর থেকে ঠেলে উঠেছে আর তারপর একটু একটু করে ওর ওপর দখল নিয়েছে—এই রাতের অনুভূতিটাও সেই রকম। অবাধ্য তাড়নায় এখনই কেউ যেন বাপীকে ওই বন্ধ দরজার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দরজা খুলে লোলুপ প্রতীক্ষায় বসে থাকতে বলছে। ও নড়ছে না বলেই ওই চেনা যন্ত্রণাটা ওর হাড়-পাঁজর দুমড়ে মুচড়ে ভাঙছে।

রাত বাড়ছে। যন্ত্রণাটাও।

বাপী বিছানা ছেড়ে নামল। ওই দরজা খুললে কেউ আসুক না-আসুক ওকেই যে সামনের অন্ধকার হলঘরের ভিতর দিয়ে একজনের দরজার দিকে এগোতে হবে এটা তার থেকে ভালো কেউ জানে না। কলকাতার টালি এলাকার সেই এক খুপরি ঘরে বাপী তরফদার দেউলে হয়েছিল, সর্বস্বান্ত হয়েছিল। কিন্তু তখন বাপীর কোনো হাত ছিল না।

কিন্তু আজ? এখন?

বাপী মেঝেতে বসে পড়ল। কাঠের মেঝেতে খসখসে গালচে পাতা। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আর সে দেউলে হবে না। জীবনে শুধু একটি মেয়েই তার লক্ষ্য। আর কেউ না—কেউ না! আবার দেউলে হলে আর কোনদিন তার মুখোমুখি হওয়া যাবে

না। তাই এই যন্ত্রণার শেষ না করলেই না। এই লোভের টুঁটি টিপে না ধরলেই না।

খসখসে গালচের নাক মুখ কপাল ঘষে ঘষে ছাল তুলে ফেলার উপক্রম করল। চামড়া যত জ্বলছে, যন্ত্রণা তত কমছে। মুঠো করা দুটো হাতই একে একে দাঁতে তুলে চামড়া কেটে ফেলল।

...হ্যাঁ, এইবার যন্ত্রণা আরো কমছে।

গালচের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রইল খানিক। তার পরেই স্নায়ুগুলো সব ধনুকের ছিলে ছেঁড়ার মতো একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল। বন্ধ দরজার ও-ধারে মৃদু ঘা পড়ল। কেউ দরজা ঠেলছে। খুলতে না পেরে ওই শব্দ করছে।

অন্ধকারে বাপী নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোচ্ছে। নিঃশ্বাসেও। উঠল। দরজার দিকে এগলো। ছিটকিনি নামালো। দরজা খুলল।

বারান্দার হ্যাসাক অনেক আগেই নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাইরে চাঁদের আলোর ছড়াছড়ি। আড় হয়ে একপশলা জ্যোৎস্না রেশমার মুখের ওপর পড়েছে। কোমরে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

দরজা খুলতেই ঘরে এলো। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাত দুটো পিছনে নিয়ে নিজেই দরজা দুটো বন্ধ করল। ঘর অন্ধকার আবার।

বাপী নিঃশব্দে সুইচের দিকে এগিয়েছে। তারপরেই জোরালো আলোর ধাক্কা।

রেশমার ঠোঁটে হাসি। মুখে হাসি। চোখে হাসি। কিন্তু তার পরেই সত্যিকারের বিস্ময়। অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, এ কি। নাক মুখ কপালের এ-রকম হাল হল কখন? পাহাড়ে? আগে তো লক্ষ্য করিনি...ওষুধ-টষুধ লাগিয়েছ কিছু?

বাপী চেয়ে আছে। এই রাতটা যেন এই মেয়ের দখলে। মৃত্যুর থাবা থেকে যে পুরুষকে ছিনিয়ে এনেছে, এই রাতে তার ওপর দখল বরবাদ করার হিম্মতও যেন কারো নেই।...নাক মুখ কপালের এই হাল কেন রেশমা কি তা বুঝতে পেরেছে? ঠোঁটে মুখে চোখে আবার সেই হাসি। দেখছে সে-ও।

—ও কি! অত চোখ লাল করছ কেন?

—এত রাতে তুমি এই ঘরে কেন?

জবাবে রেশমা কাছে এগিয়ে এলো। ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখল একবার। তারপর চোখের আর ঠোঁটের নিঃশব্দ হাসির জালে ওর মুখটা ভালো করে আটকে নিল।—অত ধকলের পর এত রাত পর্যন্ত তুমিই বা জেগে বসে আছ কেন?

সঙ্গে সঙ্গে আরো এগিয়ে এলো। একেবারে আধ-হাতের মধ্যে। বাপীর চোখে-মুখে একঝলক তপ্ত নিঃশ্বাস এসে লাগল। হাত দুটো আবার কোমরে উঠে এলো রেশমার। গলার স্বরেও হাসি ঠিকরলো এবার।—এলাম তো এলাম, তোমার অত ঘাবড়ানোর কি আছে? তুমি কি ভেবেছ মওকা বুঝে এরপর আমি তোমার ঘর করতে চাইব?

—তুমি যাবে এখন এখান থেকে?

—যাব বলে এসেছি?

রেশমা বুক ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে এবার। কোমরের দু'হাত ওর কাঁধের ওপর দিয়ে গলার দিকে এগোচ্ছে। বাপী জানে আর এক মুহূর্ত দেরি হলে ওই দুটো হাত এবার অব্যর্থ রসাতলের গহ্বরে টেনে নিয়ে যাবে তাকে।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে চার হাত দূরে কাঠের গালচের ওপর ছিটকে পড়ল রেশমা। পুরু গালচের ওপর দিয়েই মাথার পিছনটা জোরে ঠোক্কর খেল। প্রচণ্ড ধাক্কায় চিৎপাত হয়ে যে-ভাবে পড়ল তার আঘাতও কম নয়। কিন্তু বাপীর মাথায় খুন চেপেছে।

ওর পাশ কাটিয়ে চোখের পলকে ভেজানো দরজা দুটো খুলে ফেলল। তারপর সেই অবস্থাতেই দু'হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে নারীদেহ দরজার বাইরে এনে ফেলল। আবার ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা দুটো বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল।

হাঁপাচ্ছে। বুকের তলায় ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে। কাঁচের জাগ থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে খেল। আলো নিভিয়ে বিছানায় এসে বসল।

পরদিন সকাল সাড়ে আটটার পর ঝগড়ু কড়া নাড়তে বাপী দরজা খুলল।

ঝগড়ু বলল, তুমি খুব ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছ দেখে এতক্ষণ ডাকিনি। কিন্তু কি ব্যাপার বলো তো বাপীভাই, রেশমাকে কি তুমি খুব সকালে উঠে হেঁটেই বানারজুলিতে চলে যেতে বলেছ নাকি?

বাপী থমকালো।—কেন?

—আমি তো বেশ ভোরে উঠেছি, কিন্তু ওকে কোথাও দেখছি না। তারপর ওর ঘরে গিয়ে দেখি জামা-টামা বা তোরঙ্গটাও নেই! সকালে যাবে কাল রাতেও তো আমাকে বলেনি!

বিড়বিড় করে বাপী বলল, না, আমার সঙ্গে কোনো কথা হয়নি।

স্নেহ-মেশানো বিরক্তি ঝগড়ুর।—দেখো তো, বলা নেই কওয়া নেই এ-ভাবে কেউ চলে যায়! যেমন বুদ্ধি তেমন সাহস মেয়েটার, কাল তুমি ওর জন্যেই বড় বাঁচা বেঁচে গেছ বাপীভাই—ভাঙা পাথর বেয়ে পাহাড়ে উঠে না গেলে আর রক্ষা ছিল না—কিন্তু এ-দিকে মর্জি দেখো মেয়ের, সকালে উঠেই হাওয়া!

...না, বাপী কিছু ভাববে না। কিছু চিন্তা করবে না। যা হবার তাই হয়েছে। এর ওপর বাপীর কোনো হাত ছিল না।

সকালে উঠে নিজেই বানারজুলি চলে যাবে ঠিক করেছিল। কিন্তু রেশমা চলে গেছে শুনে তার আর যাবার তাড়া নেই। ভালোই হয়েছে। একটু সময় দরকার। সহজ হবার মতো একটু অবকাশ দরকার। সকাল দুপুর বিকেল এক-রকম শুয়ে বসেই কাটিয়ে দিল। আয়নায় মুখ দেখে মাঝে মাঝে। নাক মুখ কপালে এখনো ছাল ওঠা লালচে দাগ। ঊর্মিলার প্রসাধনসামগ্রী এখানেও তার ঘরে মজুত। ঝগড়ুর অলক্ষ্যে ক্রিমের কৌটোটা এনে সকাল থেকে অনেকবার ঘষেছে।

...অমোঘ রসাতলের গহ্বর থেকে বাপী নিজেকে টেনে তুলেছে। সর্বক্ষণ তবু নিরানন্দে ভেতর ছেয়ে আছে। লোভের জাল ছিঁড়ে-খুঁড়ে নিজেকে উদ্ধার করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পৌরুষের অস্তিত্ব নেই কোথাও।...এর পরেও ওই মেয়ের কোন রকম ক্ষতি করবে না বাপী। ক্ষতি করার শক্তিও নেই। কিন্তু রেশমা এরপর কি করবে? না, বাপী ভাববে না। তার ভাবনা ধরে দুনিয়ায় কিছুই ঘটছে না।

গাড়িতে সব মাল তুলে পরদিন সকালে আটটার মধ্যে বানারজুলি ফিরল। এই চালানের সবটাই রণজিৎ চালিহার অর্ডারের মাল। এগুলো কোথায় যাবে বাপী জানে না। চালিহা বাইরে থেকে ফিরেছে কিনা তাও জানা নেই। গাড়ি হাঁকিয়ে সোজা তার বাংলোতেই এলো।

গাড়ি থেকে নামার আগেই বাপীর চিন্তার জগৎ ওলট-পালট আবার।

চালিহার বাংলোর বারান্দার একটা চেয়ারে বসে আছে রেশমা। একা। উস্কোখুস্কো লালচে চুল। ঢিলেঢালা বেশবাস।

বাপীকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। হাত দুটো আপনা থেকেই কোমরে উঠে এলো। বাপী থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। রেশমা চেয়ে

আছে। সাপ ধরা মেয়ের দুটো চোখ সাপের মতোই জ্বলছে ধক-ধক করে।

একটু বাদে ঘুরে শ্লথ পায়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে রণজিৎ চালিহা বেরিয়ে এলো। চকচকে লুঙ্গির ওপর গায়ে সিল্কের হাওয়াই শার্ট। ফোলা ফোলা লালচে মুখে জলের দাগ। এইমাত্র চোখেমুখে জল দিয়ে মুছে এসেছে বোঝা যায়। রাতে মদের মাত্রা ঠিক ছিল না বলে হয়তো বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছিল।

কিন্তু ঠেলে তুলল কে? অনায়াসে অন্দরে ঢুকে রেশমা চাকরটাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে? বাপী জানে না। কিন্তু বুকের ভিতরে অস্বস্তি জমা হচ্ছে আবার।

—হ্যালো—হ্যালো! গুড মর্নিং। ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, উঠে এসো।

বাপী পায়ে পায়ে বাংলোয় উঠল। অন্তরঙ্গ সম্ভাষণের কোনো জবাব না দিয়ে জিগ্যেস করল, গাড়ির মাল আপনার এখানেই তোলা হবে তো?

—হ্যাঁ, বোসো। অর্জুন!

ভিতর থেকে তার অসমীয়া কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড বেরিয়ে আসতে তাকে গাড়ির মালের বাক্স কটা ভিতরে তুলতে হুকুম করল। তারপর হৃষ্টবদনে বাপীর দিকে ফিরল।.. চা খাবে?

—না, থ্যাংকস; আমি এক্ষুনি ফিরব।

বাপীর অবাক লাগছে, রেশমা ওর সামনে বাইরে আসতে পারছে না বলে এই লোকের অন্দরমহলে সেঁধিয়ে আছে?

চালিহার মুখে হাসি চুঁয়ে পড়ছে, চাউনিও ছুরির ফলার মতো হাসিমাখা। বলল, তোমার জিম্মায় মাল ফেলে চলে এলো দেখে রেশমাকে বকছিলাম—তা ব্যাপারখানা কি হে, সব ফেলে-টেলে এত পথ হেঁটেই চলে এলো—আর ওর হাবভাবও অন্যরকম দেখছি—কি হল হঠাৎ?

বাপী ঠাণ্ডা জবাব দিল, কি হয়েছে জানি না, তবে ওকে বলে দেবেন দায়িত্ব ফেলে এভাবে চলে এলে ভবিষ্যতে জবাবদিহি করতে হবে।

রণজিৎ চালিহা হাসছে। মাথা নেড়ে সায় দিল।—ও ভিতরেই আছে, ডাকব?

পাল্টা প্রশ্ন ঠোঁটের ডগায় প্রায় এসে গেছল বাপীর। বলতে যাচ্ছিল, রেশমা এই বাংলোর ভিতরে কেন? বলল না। জবাব দিল, দরকার নেই।

মালের বাক্স কটা নামানো হয়েছে। বাপী উঠে দাঁড়াল, চলি—

গাড়িতে স্টার্ট দেবার ফাঁকে চালিহার চোখে চোখ পড়ল একবার। অন্তরঙ্গ হাসি-মুখে চালিহা হাত নেড়ে বিদায় নিল। কিন্তু এই চাউনি আর ওই হাসি দেখে বাপীর কেবল মনে হল, লোকটার যেন কোনো ক্রূর অভিলাষ সফল হয়েছে বা হতে চলেছে।

গাড়ি নিয়ে বেরুনোর পনের সেকেণ্ডের মধ্যে বাপীর দু চোখ আবার হোঁচট খেল। রাস্তার ধারে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে রেশমার সাপ ধরার সঙ্গী হারমা। ওই বাংলোর দিকে চোখ। বাপীকেও দেখল। কলের মতো একটা হাত কপালে উঠল, বাপীর গাড়ি বেরিয়ে গেল। মুখ দেখে মনে হল, রেশমা ওই বাংলোয় সেটা ও জানে।

যার কথা ভাবছিল বাড়ির কাছাকাছি আসতে তার সঙ্গেই দেখা। আবু রব্বানী। ভেতর-জোড়া অস্বস্তি বাপীর। তাই থেকে থেকে আবুর কথা মনে হয়েছে, রেশমা ফিরে এসে ওদের কিছু বলেছে কিনা বা কতটা বলেছে জানার তাগিদ। রেশমাকে চালিহার বাংলোয় দেখার পর তাগিদটা আরো বেশি বলেই জোর করে ঘরমুখো হয়েছিল। রেশমা যদি ওদের কিছু না বলে থাকে তো বাপী কি বলবে?

উল্টো দিক থেকে আবু হনহন করে হেঁটে আসছিল। আর এত বিমনা ছিল যে

বাপী মুখোমুখি ব্রেক কষতে তবে হুঁশ হল। হাসতে চেষ্টা করে বাপী বলল, ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়বে যে।...কোথায়?

—তোমার ওখানেই গেছলাম, না পেয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম।...তুমি এই ফিরলে?

শুকনো গম্ভীর মুখ দেখে বাপীর খটকা লাগল একটু। সাত দিন বাদে দেখা, কিন্তু এই মুখে হাসি নেই, উচ্ছ্বাস নেই। বাপী জবাব দিল, একটু আগে ফিরেছি, কিছু মাল ছিল, চালিহার বাংলোয় নামিয়ে দিয়ে এলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আবু উদ্‌গ্রীব।—সেখানে রেশমাকে দেখলে?

গাড়িটা রাস্তার ধারে নিয়ে গিয়ে বাপী স্টার্ট বন্ধ করে নেমে এলো। কিছু ঘটেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কি ঘটেছে না জানা পর্যন্ত স্বস্তিও নেই। আবু কাছে এসে দাঁড়াতে বলল, দেখলাম।...রেশমা ওখানে কেন?

আরো মুখ কালো করে আবু জবাব দিল, ও কাল সন্ধ্যা থেকেই ওখানে—রাতেও ওখানেই ছিল।

শোনামাত্র বাপীর স্নায়ুগুলো সজাগ, তীক্ষ্ণ। মুখে কথা নেই।

—হঠাৎ কি হল বলো দেখি বাপীভাই, কিছু ভেবে না পেয়ে আমি তোমার কাছে ছুটেছিলাম।

—তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি?

—না। এতদিন বাদে পাহাড় থেকে ফিরে দুলারির কাছে এলো না। এমন তো কখনো হয় না। আজ সকালে হারমা এসে খবর দিল, রেশমা কাল সকালে হেঁটে পাহাড় থেকে ফিরেছে। সে নাকি ভয়ঙ্কর মূর্তি। খানিক বাদে ম্যানেজারের বাংলোয় চলে গেছে। অনেক দূর থেকে হারমা নিজের চোখে ওকে ওখানে যেতে দেখেছে। আবার সন্ধ্যার পর সেজেগুজে হারমা ওকে সেই বাংলোতেই যেতে দেখেছে। রাতে আর ঘরে ফেরেইনি।

নির্লিপ্ত মুখে বাপী জানান দিল, হারমা এখনো বাংলোর কাছাকাছি একটা গাছ-তলায় দাঁড়িয়ে আছে।

শুনে আরো দুর্ভাবনা আবুর। বাপী শুনল, ধামন ওঝার ছেলে ও, জাতব্যবসা ছেড়ে জোয়ান ছেলে এই একটা মেয়েতে মজে আছে বলে বাপ ওকে ভিটে থেকে তাড়িয়েছে। ভাবগতিক যেমন দেখছে, এরপর ওই হারমাই না মেরে দেয় মেয়েটাকে। রাগের থেকে আবুর দুর্ভাবনা বেশি।—রেশমা হঠাৎ এরকম করছে কেন বাপীভাই?

—জানি না। দেখা হলে জিগ্যেস কোরো।...আর বোলো, আমার কোনো রাগ নেই ওর ওপর। এই জীবনটার জন্য বরাবর আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

আবু আরো হতভম্ব।—কেন বাপীভাই? কি হয়েছে?

বাপী ঠাণ্ডামুখে জানালো কি হয়েছে। বনমায়ার সেই বুনো হাতির খপ্পর থেকে রেশমা ওকে বাঁচিয়েছে।

শুনতে শুনতে আবু বার বার শিউরে উঠেছে। তারপর সোৎসাহে বলে উঠেছে, রেশমা এইরকমই বাপীভাই—ঠিক এইরকম। ঠিক অমনি করে ও দুলারির জন্যেও প্রাণ দিতে পারে। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ ও এ-রকম হয়ে গেল কেন? সব জানলে মেমসায়েব তো উল্টে ওকে আরো অনেক ইনাম দেবে।

জবাব না দিয়ে বাপী গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল। বলল, পারো তো কাল সকালের দিকে একবার এসো।

আবু বিমূঢ় মুখে চেয়ে রইল তার দিকে। দেখতে দেখতে বাপীর গাড়ি অনেক দূরে।

বাংলোয় আসতে ঊর্মিলা জানালো, মায়ের শরীর আবার একটু খারাপ হয়েছে। ডাক্তার আবার দিন-কতক তাকে বিশ্রামে থাকতে বলেছে।' গায়ত্রী রাই বলেছে, ও কিছুই

না, ডাক্তাররা অমন বাড়িয়ে বলে। মাল চালিহার বাংলোয় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে আর রেশমাও ফিরে এসেছে শুনে মহিলা নিশ্চিন্ত। মাল বা রেশমাকে আনার জন্য আর ভ্যান পাঠানোর দরকার নেই। গায়ত্রী রাইয়ের অসুস্থতার ফলে বাপী যেন একটু আড়াল পেল। দুজনেই জানে তার শরীর খারাপ শুনলে বাপী একটু বেশি উতলা আর গম্ভীর হয়ে যায়।

পরদিন সকাল সাতটার আগেই আবু এলো। ওর চকিত চাউনি দেখেই বাপীর মনে হল রেশমার এমন অদ্ভুত আচরণের কিছু হেতু ও আঁচ করতে পেরেছে। খবর জিগ্যেস করতে আবু বলল, গতকালও সমস্ত রাত রেশমা চালিহার বাংলোয় ছিল। সমস্ত দিনও ওই বাংলোতেই ছিল। চালিহা আপিসে চলে যেতে হারমা ওকে ডেকে দেখা করেছিল। বলেছিল, দুলারি ডেকেছে। ঝাঁঝ দেখিয়ে রেশমা তাকে বলে দিয়েছে, তার এখন কারো সঙ্গে দেখা করার সময় নেই।

বাপী চুপ। তার ওপর আক্রোশেই এই কাণ্ড করছে জানা কথা। আবুর পাথরের মতো মুখ। একটু থেমে মনের কথা ব্যক্ত করল।—দুলারি বলছিল রেশমা মনে মনে তোমাকে পুজো করে...বুনো হাতির কবল থেকে তোমাকে বাঁচাতে পেরে ওর বোধ হয় মাথা খারাপ হয়েছিল।...সত্যি?

বাপী ঈষৎ তপ্ত জবাব দিল, ওর মাথার খবর ও-ই জানে। দুলারিকে বলে দিও আমার মাথা ঠিক ছিল। আমি ওর কোনো ক্ষতি করিনি বা কোনদিন করব না।

আবু চলে যাবার পরেও সারাক্ষণ ভেতরটা কেমন অস্থির হয়ে থাকল বাপীর। লাঞ্চের পর আপিস ঘরে আবার কাজে বসল এসে। কিন্তু মন নেই। কিছু ভালো লাগে না। বেলা তিনটে নাগাদ সেজেগুজে ঊর্মিলা ঘরে ঢুকে ঝাঁঝালো অনুযোগ করল, কাল ফিরে এসে-তক হাঁড়ি মুখ করে কেবল কাজই দেখাচ্ছো—চলো না ঘুরে আসি একটু।

—কোথায়?

—প্রথমে রেশমার ওখানে। হতচ্ছাড়ি এসে অবধি আমার সঙ্গে একবার দেখা পর্যন্ত করল না। ফিক করে একটু হাসল ঊর্মিলা, তারপর ক্লাবে ডাটাবাবু কেমন আছে একটু খবর নেব।

বাপী বলতে যাচ্ছিল, রেশমাকে পেতে হলে তোমার আংকল চালিহার বাংলোয় যাও —দু দিন দু রাত সে তার ওখানেই আছে। কিন্তু বলল না, সামলে নিল। শুনলে মেয়েটা অবাক হবে, তারপর কৌতূহলে ওরই ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। গম্ভীর মুখে বাপী ফাইলে চোখ নামাল। যাবে কি যাবে না, ওটাই জবাব। ঊর্মিলা রাগ করে বেরিয়ে গেল।

বিকেল সাড়ে চারটে তখন। বিরক্ত হয়ে ফাইলগুলো ঠেলে সরাল। দশ মিনিটের জন্যেও কাজে মন বসেনি। উঠে পড়বে ভাবছে।

—বাপীভাই! বাপীভাই! উদ্‌ভ্রান্ত দিশেহারা মুখে ঘরে ঢুকল আবু রব্বানী।—বাপীভাই! শিগগির ওঠো—কি সর্বনাশ করল রেশমা দেখে যাও। কি প্রায়শ্চিত্ত করল নিজের চোখে এসে দেখো বাপীভাই!

বাপী চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছে। কিন্তু আবু ততক্ষণে বাইরে আবার। চেঁচামেচি শুনে গায়ত্রী রাই বারান্দায় এসেছে। সে-ও গেটের ওধারে আবুর উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি দেখেছে। বাপীকে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?

—রেশমার কিছু হয়েছে [illegible] দেখছি।

দাঁড়াবার সময় নেই, সে-ও [illegible] এলো। বুকের তলায় কাঁপুনি শুরু হয়েছে। কি হতে পারে? রেশমা কি করে [illegible]?

বাংলোর পিছনের পথ ধরে আবু আগে আগে হনহন করে চলছে। ওর নাগাল পেতে

হলে বাপীকে ছুটতে হবে। পিছন থেকে বার দুই ডেকেও ওকে থামানো গেল না।

জঙ্গলের পথ ধরল। পিছনে বাপী। ...কিন্তু আবু এ-রকম করছে কেন? দাঁড়াচ্ছে না কেন? ও কি কাঁদছে? নইলে থেকে থেকে চোখে হাত উঠছে কেন?

দুলারির সেই আগের ঘরের কাছাকাছি আসতেই বাপীর বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। পর পর দুটো ঘরেই এখন সাপ মজুত করা হয়।...কিন্তু এখানে এত লোক জড় হয়েছে কেন? কি করছে ওরা? সামনের ঘরের ওই বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে কি দেখছে? বাঁশের বেড়ার ওধারে দুলারি দাঁড়িয়ে। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে। কিন্তু দু চোখে আগুনের হল্কা ঠিকরোচ্ছে। তার পিছনে হারমা। ওই মুখেই কোন ভাব-বিকার নেই। আর সব কারা বাপী জানে না। জঙ্গলের সাপ ধরার লোক বা মজুর-টজুর হবে, সকলেই বিমূঢ়, হতভম্ব।

বেড়া ঠেলে ভিতরে ঢুকতে আবু ওর একটা হাত ধরল। তার আগে মাটি থেকে একটা পাকা বাঁশের লাঠি কুড়িয়ে নিয়েছে। ওর দু চোখ টকটকে লাল। জলে ঝাপসা। আবু কাঁদছে।

মুখে একটিও কথা না বলে বাপীকে বন্ধ দরজার সামনে টেনে নিয়ে গেল। যারা সেখানে ছিল তারা সরে সরে গেল। কেউ বা পিছু হটল। কাছাকাছি এসে বাঁশের লাঠি দিয়ে আবু বন্ধ দরজার এক পাট ঠেলে খুলল।

সঙ্গে সঙ্গে কোমর সমান ফণা উঁচিয়ে ফোঁস করে উঠল একটা বিশাল শঙ্খচূড় সাপ। বাপী সভয়ে দু পা পিছিয়ে গেল। আর তার পরেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তার গায়ের রক্ত জল: রেশমা মেঝের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে। সর্বাঙ্গ নীল। ওই বিশাল সাপ তার সর্ব অঙ্গ পাকে পাকে জড়িয়ে বুকের কাছে কুলোর মত ফণা উঁচিয়ে আছে।

দরজা দুটো বন্ধ করে আবু একজনকে ঘরের পিছনে গিয়ে ঘুলঘুলিটা টেনে খুলে দিতে বলল। বন্ধ দরজার এদিকে লাঠি-সোঁটার ঘা পড়লে সাপটা ঘুলঘুলি দিয়ে পালাবার পথ পাবে। হারমা হঠাৎ আবুর হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিতে গেল। সাপটাকে পালাতে দেব না। ঘুলঘুলির দিকে গিয়ে ওটাকে মারবে। আবু বাধা দিয়েছে।—মারবি কেন, ওটার কি দোষ, রেশমা যা চেয়েছে তাই হয়েছে। তাছাড়া কি হয়েছে মেয়েটার দেখতে হবে তো, তোর বাপ যদি কিছু করতে পারে।

যে-সাপ কাটে তাকে চট করে মারতে নেই এ-রকম একটা সংস্কার আছে। সে-রকম ওঝা নাকি ঝাড়ফুঁক করে বিষ তোলার জন্য সেই সাপকে আবার টেনে আনতে পারে। কিন্তু এ আশ্বাস যে শুধু হারমাকে আটকানোর জন্য তাও বোধ হয় সকলেই জানে।

ঘোলাটে চোখে বাপীর দিকে ফিরল আবু। বলল, ওপর-অলার খেলা দেখ বাপী ভাই, পাহাড়ে যাবার দিন-কয়েক আগে এই বিরাট শঙ্খচূড়টাকে রেশমাই ধরেছিল, তারপর খুশিমুখে আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল, এটার ডবল টাকা দিতে হবে তোমার বাপী-ভাইকে বলে দিও।

বাপী ভোলেনি। সেদিন সে-ও জঙ্গলে ছিল। ওই সাপ দেখার জন্য রেশমা তাকে ডাকাডাকি করেছিল। বাপী শুনেও শোনেনি। চলে গেছল। রেশমা তারপর ঊর্মিলাকে ঠাট্টা করে বলেছিল, এত বড় ওপরঅলা হয়েও বাপীভাই ওকে জ্যান্ত সাপের মতই ভয় করে।

দুটো নরম হাত একটা বাহু আঁকড়ে ধরতে বাপী ঘুরে তাকালো। ঊর্মিলা। ভয়ার্ত ফ্যাকাসে মুখ। খবর শুনে ছুটেই এসেছে। হাঁপাচ্ছে। সাহস করে কিছু জিগ্যেস করতে পারছে না, শুধু জানতে চায় সত্যি সব শেষ কি না। কি হল! কেন হল!

ওর হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে বাপী টের পাচ্ছে। কিন্তু বাপী কি বলবে?

কি সান্ত্বনা দেবে? পাহাড়ের সেই পাগলা বুনো হাতি নাগালের মধ্যে পেলে এই দেহ ওটার পায়ের তলায় পড়ে ভেঙে-দুমড়ে তালগোল পাকিয়ে যেত। কিন্তু সে যন্ত্রণা কি এর থেকে বেশি?

বন্ধ দরজায় এদিকে বিশ-পঁচিশ মিনিট লাঠি ঠোকাঠুকির পর আবার দরজা ফাঁক করে দেখা হল। সাপটা পালিয়ে গেছে।

রেশমা মাটিতে শুয়ে।

চারদিক দেখে প্রথমে ঘরে ঢুকল আবু রব্বানী। তার পিছনে ঊর্মিলার সঙ্গে বাপী। ঊর্মিলা তার বাহু দু হাতে আরও শক্ত করে চেপে ধরে আছে। ওদের পিছনে আরও অনেকেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

রেশমার বিবর্ণ দেহ নিষ্প্রাণ। নিস্পন্দ।

তার বুকে মুখে কপালে মাথায় কতকগুলো ছোবল মেরেছে কে গুনবে? এর যে-কোন একটাতে মৃত্যু অবধারিত। তবু ওই কাল-সাপ বোধ হয় এই নারীদেহে তার সমস্ত বিষ ঢেলে আক্রোশ মিটিয়েছে।

ঊর্মিলা দু'হাতে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বাপীর পায়ের নিচে মাটি ভয়ানক দুলছে। সে-ও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ঊর্মিলাকে ধরে নিয়ে বাইরে এলো। বাইরে এখনও বেশ আলো। মাথার ওপর বসন্তের নীল আকাশ। কিন্তু বাপী চোখে সব-কিছু ঝাপসা দেখছে। মানুষগুলোর মুখও।

কেন এমন হল? কেন কেন কেন? বাপীর জন্য? বাপীর দোষে? তাই যদি হয় তো ওই নীল আকাশ বজ্র হয়ে ওর মাথায় নেমে আসতে পারে না?

বাঁশের বেড়ার সামনে দুলারি তেমনি তামাটে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে। হারমা নেই। সে বোধ হয় তার বাপ ধামন ওঝাকে ধরে আনার জন্য ছুটেছে। সব যে শেষ এ বোধ হয় এখনও শুধু ও-ই বিশ্বাস করছে না। আবু রব্বানী তাকে আশার কথা শুনিয়েছে।

ঊর্মিলাকে ধরে বাপী বেরিয়ে আসছিল। এই মুহূর্তে কোনো নিঃসীম অন্ধকার গহ্বরে সে হারিয়ে যেতে চায়। মুছে যেতে চায়। কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। দুলারির ধকধকে দুই-চোখ ওর মুখের ওপর।

বলল, যেও না। কথা আছে।

॥ তিন ॥

রাত দশটা। বানারজুলির অনেক রাত। অন্ধকার ঘরে শুয়ে বাপী এ-পাশ ও-পাশ করছে। রাজ্যের ক্লান্তি আর অবসাদ নিয়ে ঘরে ফিরেছিল। ঊর্মিলাকে বলে দিয়েছিল তাকে যেন রাতে খাওয়ার জন্য ডাকা না হয়। ঘরে গিয়েই ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। তাই ইচ্ছে ছিল। ঘুমের ট্যাবলেট একটা খেয়েছে। একঘুমে সকাল হলে হয়তো দেখবে এই দুঃস্বপ্নের রাতটাই মিথ্যে। ঊর্মিলা বাধা দেয়নি বা জোর করেনি। সে-শক্তিও ছিল না। তার চোখেও আতঙ্ক। ঘরে গিয়ে হয়তো মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদবে। ওরা কেঁদে হাল্কা হতে পারে। বাপী পারে না।

কিন্তু ঘুম চোখের ত্রিসীমানায় নেই। চোখ বুজলেই সামনে বিভীষিকা। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো এক মেয়ের বুকের ওপরে শঙ্খচূড়ের ফণা। ওটা সরে যাবার পরে যা দেখেছে সে আরো ভয়ঙ্কর। বিষে বিষে ফর্সা অঙ্গ গাঢ় নীল-কালিতে ছোপানো। চোখ বুজলেই সামনে সেই গ্রাস। অন্ধকার অসহ্য। উঠে আলো জেলে দিয়েছে।

আলো দেখেই একটু আগে গায়ত্রী রাই এসেছিল। ঘরের দরজা দুটো খোলাই ছিল। মাথার ওপর বনবন পাখা ঘুরছে। কিন্তু জানলা দরজা বন্ধ করলে বাপী বুঝি দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে। কেউ আসছে টের পেয়েই চোখ বুজে ফেলেছে। তা সত্ত্বেও আঁচ করেছে কে এলো। বাপী চোখ মেলে তাকায়নি। কেন তাকাবে? চোখে জল নেই। বুকে মুখ গোঁজার মতোও কেউ নেই।

গায়ত্রী রাই আধ মিনিটের মতো দাঁড়িয়ে ওকে দেখেছিল হয়তো। তারপর ঘরের আলো নিভিয়ে নিঃশব্দে দরজা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

মেয়ের মুখে যা শোনার শুনেছে। যা বোঝার বুঝেছে। ঊর্মিলার কাছেই বরং অনেক কিছু দুর্বোধ্য এখনো। কিন্তু তার মা সব শোনা মাত্র বুঝবে। বাপীকে রেশমা ভরা-ডুবি থেকে একেবারে নিরাপদ ডাঙায় তুলে দিয়ে শুধু নিজের ওপর চরম শোধ নিয়ে গেল।

...দুলারিকে নাকি রেশমা এই দুপুরেই হেসে হেসে বলেছিল, ও অনেক দোষ করেছে, ওর গুনাহর শেষ নেই। তাহলেও বাপীভাই কখনো ওর দোষ ধরবে না, ওকে মাপ করে দেবেই। কারণ সব দোষ আর সব পাপের যুগ্যি প্রায়শ্চিত্ত ও করবে। তখন আর বাপী-ভাইয়ের কক্ষনো ওর ওপর রাগ থাকতে পারে না। বাপীভাইয়ের মতো এমন মুরুব্বী আর হয় নাকি। এই মুরুব্বী মাফ করে দিলে যত দোষ আর যত পাপই করুক নরকের বদলে সরাসরি হয়তো বেহেস্তে গিয়েই হাজির হবে।

এই পাজী মেয়েকে হাড়ে হাড়ে চেনে দুলারি। ওর থেকে ভালো আর কেউ চেনে না। সব শোনার পরে শেষ মুহূর্তে সুমতি হয়েছে বুঝেও হাড়পাঁজি জ্বলছে দুলারির! কিন্তু ওকে চিনতে যে এত বাকি সে কি তখনো বুঝেছিল!

...হারমা পাগলের মতো ছুটে গিয়ে তার বাপ ধামন ওঝাকে ধরে নিয়ে আসতে দুলারির সেই কঠিন দু' চোখ আবার বাপীর মুখের ওপর উঠে এসেছিল।—কি হবে?

বাপী মাথা নেড়েছে। কিছু হবে না। যা হবার হয়ে গেছে।

দুলারি ডেকেছিল, এসো। তুমিও এসো মেমদিদি।

জঙ্গলের পথ ধরে দুলারি আগে আগে নিজের ঘরের দিকে এগিয়েছে। পিছনে বাপী আর ঊর্মিলা। বাপীর মনে হচ্ছিল কেউ তার গলায় একটা অদৃশ্য দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলেছে। না গিয়ে উপায় নেই. তাই চলেছে। ঊর্মিলা তার একটা হাত চেপে ধরে ছিল। ও তখনো বিমূঢ়, ভয়ার্ত।

...দুলারি ঊর্মিলাকে সুদ্ধ ডাকল কেন? ওর সামনেই চরম কিছুর ফয়সালা করে নিতে চায়? কোনো অভিযোগের বোঝা চাপিয়ে ওকে কিছু বুঝিয়ে দিতে চায়? যে আগুন দুলারির চোখে দেখেছে, সেই আগুনে এবার বাপীর মুখ ঝলসে দিতে চায়?

ঘরে ঢুকে দুলারি ছেলে দুটোকে বাইরে বার করে দিয়েছে। তারপর ঊর্মিলাকে বলেছে, বোসো।

ওরা দাঁড়িয়েই ছিল।

আঁচলে বাঁধা একটা পুঁটলির মতো কোমর থেকে টেনে বার করল দুলারি। গিঁট খুলে মোটা সুতোয় জড়ানো কাগজের পুঁটলিটা বাড়িয়ে দিল বাপীর দিকে।—এটা তোমার কাছে রাখো এখন।

বাপীর মুখে কথা সরলো এতক্ষণে।—কি এতে?

—আমার জানার কথা নয়। ওর ডেরা থেকে ঘরে ফিরে খুলে দেখছিলাম। দু' হাজার টাকা।

বাপী আরো হতভম্ব।—এ কিসের টাকা?

—তোমাকে যমের মুখে ঠেলে দেবার জন্য এই টাকা চালিহা ওকে ঘুষ দিয়েছিল।

বিস্ময়ে হতবাক দুজনেই। ঊর্মিলার পক্ষে আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হয়নি। সে চৌকিতে বসে পড়েছিল।

দুলারি আবার বলেছে, এটা রেশমা তোমার হাতে দিতে বলেছিল। মেমসায়েবকে সব বলে তার আপত্তি না হলে এ-টাকা তুমি হারমাকে দিয়ে দেবে। রেশমা তাই বলে গেছে।

বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করে উঠল বাপীর। নিজের ঘরের অন্ধকার শয্যায় উঠে বসল। ...একটি একটি করে দুলারি এরপর যা বলে গেছে ঊর্মিলাও শুনেছে। আংকল চালিহা একটা নোংরা ষড়যন্ত্রের জালে আটকে বাপীর বিরুদ্ধে তার মা-কে বিষিয়ে দিতে চেয়েছিল—ঊর্মিলা শুধু এটুকুই বুঝেছে। এর বাইরে আর বেশি কিছু ওর কাছে স্পষ্ট নয় এখনো। কিন্তু ওর মা সব শোনামাত্র রণজিৎ চালিহার উদ্দেশ্য আরো ঢের বেশি বুঝবে বাপীর তাতে একটুও সন্দেহ নেই। গায়ত্রী রাই হয়তো এর পর ওকে আরো বেশি কাছে টেনে নেবে, আর চালিহার সঙ্গেও চূড়ান্ত বোঝাপড়া কিছু করবে। কিন্তু সব শোনার পর থেকে হাড়-পাঁজরগুলো আরো বেশি দুমড়ে মুচড়ে ভাঙছে বাপীর। ভেঙেই চলেছে।

..শেষ মুহূর্তে রণজিৎ চালিহার বদলে পাহাড়ে এবার বাপী তরফদার যাবে সেটা গায়ত্রী রাই বা ঊর্মিলা জানত না, আবু বা দুলারি জানত না, বাপী নিজেও জানত না। জানত শুধু চালিহা আর রেশমা। ম্যানেজারের হঠাৎ এমন দরাজ ভালো মানুষ হবার কারণটা রেশমা আগে বোঝেনি। তার নিজের লোভটাই আসল ভেবেছিল। কিন্তু পরে বুঝেছে। নিজের লোভ ছেড়ে এখন বাপীভাইকে লোভের ফাঁদে ফেলতে চায়। ফাঁকমতো অর্জুনকে দিয়ে কদিন সকালে ওকে ডেকে পাঠিয়েছে। ক্লাবের ডাটাবাবুর কাছে বোতলের বাক্সটা চালান দেওয়ার জন্য বা কাছাকাছির মধ্যে কোনো খদ্দেরের জিম্মায় নেশার প্যাকেট পৌঁছে দিয়ে আসার জন্য রেশমাকে পঁচিশ-তিরিশ টাকা করেও বখশিশ দিয়েছে। এ-ভাবে কাঁচা টাকা হাতে পেলে রেশমা ছাড়ার মেয়ে নয়, দিব্বি নিয়েছেও। কিন্তু গোড়া থেকেই তার মতলব সম্পর্কে রেশমা হুঁশিয়ার ছিল। বাপী-ভাইয়ের বুকে সে কোন্ কলঙ্কের ছুরি বসাতে চায় সেটা বোঝার পর তাজ্জব বনেছে। আবার মজাও পেয়েছে।

রেশমার সঙ্গে খাতির বাড়ার পর টোপ ফেলেছে রণজিৎ চালিহা। প্রথমে কেবল বাপী তরফদারের প্রশংসা। সে আছে বলেই রাতারাতি রেশমার এত আয়পয়। নইলে ও যে এত গুণের মেয়ে সেটা আগে কে বুঝেছিল? মালকানও বোঝে নি, ম্যানেজার নিজেও না। তারপর বলেছে, শুধু এই একজনের যদি মন বুঝে চলিস আর তাকে খুশি রাখতে পারিস, তাহলে আর দেখতে হবে না। কালেদিনে এর দশগুণ বরাত ফিরে যাবে।

মতলব বোঝা গেছে। কাঁচা টাকা হাতে আসছে, রেশমা পরামর্শটা একেবারে বরবাদ করে দিতে পারে না। চালিহার সামনে খুশি যেমন দুর্ভাবনাও তেমনি। .খোদ ম্যানেজার সাহেব যখন বলছে তখন আর ভাবনা কি। তার সাধ্যমতো চেষ্টা করবে। কিন্তু ওই তরফদার সাহেবের মেজাজের হদিসও যে পায় না কখনো, মন বুঝবে কি করে? কাছে গেলে দশ হাত দূরে দিয়ে চলে যায়। আর এমন করে তাকায় যে ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করে। আগে কত সহজে মেলা-মেশা করত ওদের সঙ্গে, এত বড় মুরুব্বী হয়ে বসার পর অন্য রকম হয়ে গেছে।

চালিহা সাহস যুগিয়েছে। হেসে হেসে বলেছে, তুই একটা আস্ত বোকা। ওটা বাইরের চাল। কোথা থেকে কোথায় টেনে তুলল দেখেও মন বুঝতে অসুবিধে! যা

বললাম শোন্, চেষ্টা-চরিত্র করে লেগে থাক ওর সঙ্গে, হিল্লে হয়ে যাবে।

এই লেগে থাকার তাগিদটাই দিনে দিনে বেড়েছে। বখশিশের অঙ্কও। রেশমার টাকার লোভ দেখেই মুখোস খুলে শেষে মতলব ফাঁস করেছে। ওই বাপী তরফদারের মুখ লালসার আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে। একটা রাতের জন্যও যদি রেশমা তা পারে, চালিহা ওকে নগদ দু'হাজার টাকা দেবে। আর তার পরেও বরাত ফেরানোর জন্য ওই বাপী তরফদারের মুখ চেয়ে থাকতে হবে না কোনোদিন। ওর রানীর হালে থাকার ব্যবস্থা চালিহাই করে দেবে।

ওই শয়তানের মতলব এবার আবু সাহেব আর দুলারির কাছে ফাঁস করে দেবার কথা ভেবেছিল রেশমা। বাপীভাইয়ের মুখ কার কাছে পোড়াতে চায় রেশমা তাও জানে। মালকানের কাছে। কিন্তু যেমন বেপরোয়া তেমনি নিজের ওপর বিশ্বাস ওর। ও জানে বাপীভাইয়ের কক্ষনো কোনো ক্ষতি হবে না বা হতে পারে না। মজা কতটা গড়ায় দেখা যাক না। ফাঁকতালে নগদ আরো কিছু হাতে এলেই বা মন্দ কি, সানন্দে রাজি হয়ে দু' হাজার টাকার বদলে দু'শ টাকা আগাম চেয়েছে। খুব দরকার। চালিহা তক্ষুনি দিয়ে দিয়েছে। আর বলেছে, এটা আগাম ফাউ। বাপী তরফদার ঘায়েল হলে ফের দু'হাজারই দেবে।

খোশ মেজাজে কড়কড়ে দু'শ টাকা নিয়ে ঘরে ফিরেছে। ম্যানেজার শেষ পর্যন্ত ওর কি করবে? কোন্ মতলবে দু'শ টাকা ওকে দিয়েছে সে তো আর কারো কাছে ফাঁস করতে পারবে না। বোকা বনে নিজেই জ্বলবে। তার আগে আরো কিছু টাকা ট্যাঁকে গোঁজার মওকা পাবে রেশমা। চালিহা যা চায় সেটা কল্পনা করতে গিয়ে অনেক সময় যে কান-মাথা গরম হয়েছে, শেষদিন হেসে হেসে দুলারির কাছে রেশমা তাও স্বীকার করেছে। ও-চিন্তা মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে তাড়িয়েছে।

বাপীভাইকে রসাতলে পাঠানোর প্ল্যান রেডি চালিহার। কাজ নিয়ে রেশমা পাহাড়ের বাংলোয় যাবে। দিনকতক বাদে তার বদলে বাপী তরফদার সেখানে টাকা নিয়ে যাবে। ওদের মেমসায়েবই তাকে যাতে পাঠায় সে-ব্যবস্থা চালিহাই করবে। ওকে জালে ফেলার মতো অমন মোক্ষম জায়গা আর নেই। সেখানে ঝগড়ু আছে, তাকে মদে ঠেসে রাখতে হবে। কিন্তু পরে যদি সে-ও আঁচ করতে পারে ব্যাপারটা, খুব ভালো হয়। রেশমা যেমন চালাক মেয়ে, একটু মাথা খাটালে সে-ব্যবস্থাও ও নিশ্চয় করে আসতে পারবে।

ওই আপনা-খাকী মেয়ের মাথায় তখনো কেবল মজাই নাচছে। এক কথায় রাজি। খরচার নাম করে আরো দু'শ টাকা আগাম ফাউ নিয়েছে। পাহাড়ে যখন নিজের নাগালের মধ্যেই পাবে বাপীভাইকে, তখন আর আবু সাহেব বা দুলারিকে বলা কেন—তার কাছেই ম্যানেজারের সব মতলব ফাঁস করে দেবে। বাপীভাইকে ও কি চোখে দেখে নিজে তো জানে—তার এক ফোঁটা ক্ষতিও কক্ষনো হতেই পারে না। সব বলে চালিহার দেওয়া চারশ টাকা বাপীভাইকে দেখাবে আর মালকানের সামনে এসেও সব কবুল করতে রাজি হবে।

পাহাড়ের বাংলোয় গিয়ে বাপীভাইয়ের অপেক্ষায় দিন গুনছে। রেশমা হেসে হেসে দুলারির কাছে স্বীকার করেছে, পাহাড়ে যাবার পর চালিহার মত লোকের চিন্তাটা আবারও মাথায় ঘুরপাক খেয়েছে, আর ভাবতে মজা লাগলেও জোর করেই সেটা ঝেঁটিয়ে দূর করেছে। কিন্তু বাপীভাই আসতেই ও যেন আর এক মজার খোরাক পেয়েছে। দোষ বাপীভাইয়েরই। আগেও টের পেয়েছে, ওকে বিশ্বাস করে না। জঙ্গলে ওকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। ডাকলেও সাড়া দেয় না। এবারে ও আরো ভালো করে বুঝেছে, বাপীভাই আসলে ওকে ভয় পায়। এবারে পাহাড়ে আসতে রেশমার মনে হয়েছে, সেই ভয় যেন বাপীভাইয়ের কাঁধে ভূতের মতো চেপে বসেছে। কেবল কাজের কথা ছাড়া ওর

সংগে কথা বলে না, ওর দিকে তাকায় না, নিজের ঘরে বসে খায়। ফাঁক পেলে জংগলে পালিয়ে যায়।

ক'দিন ধরে রেশমার মাথায় কেবল মজা গিসগিস করছে। বাপীভাইকে যা বলার পরে বলবে। যাবার আগে বলবে। তার আগে পর্যন্ত এইভাবেই চলুক। রেশমা নিজের মনে ছিল, আর চালিহার মতলবের কথা ফাঁস করলে বাপীভাইয়ের মুখখানা দেখতে কেমন হবে ভেবে ডবল মজা পাচ্ছিল।

ওখানকার কাজ শেষ বুঝে রেশমা সেদিন আড়াল থেকে নজর রাখছিল। পাহাড়ের ধারে জংগলে এসে তাকে ধরেছে। কিন্তু পথের ওপর এমন বিমনা হয়ে বসেছিল বাপী-ভাই যে একটু পিছনে দাঁড়িয়ে পাশ থেকে তাকে দেখে কিছুক্ষণ চোখ ফেরাতে পারেনি। শয়তান যে রেশমার দিকেই গুটি গুটি এগোচ্ছে রেশমা ভাবেইনি। ভাববে কি করে। ও তো এসেছে চালিহার মতলবের কথা ফাঁস করে দেবার জন্য!

কিন্তু ওর অজান্তে শয়তান ভর করেছে বলেই হয়তো খোদাতালাও নারাজ। নইলে বনমায়ার সেই পাগলা বুনো হাতি জংগল ফুঁড়ে যমের মতো এসে হাজির হবে কেন! ওটাকে তেড়ে আসতে দেখেই রক্ত জল। ভয় পেয়ে বাপীভাই জংগলের দিকে ছুটতে যাচ্ছিল। ও ধরে ফেলে পাহাড়ের দিকে টেনে নিয়ে না গেলে হয়েই গেছল। তাও প্রাণে বাঁচবে না কে জানে। তক্ষুনি মনে হয়েছে বাপীভাইয়ের মতো এত আপনার জন আব নেই, তাকে যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে—হবেই। না পারলে নিজের জীবনও রাখবে না। আর বাপীভাইয়ের সেই মুখ দেখে মনে হয়েছিল, নিজের বুকটা দু'খানা করে খুলে তাকে তার মধ্যে পুরে নিয়ে পালানো সম্ভব হলে তাই করত। তাকে আগলে নিয়ে ফাঁড়া কাটিয়েছে শেষ পর্যন্ত। ফাঁড়া সত্যি কেটেছে কিনা বাপীভাই তখনো জানে না। আর ঠিক তক্ষুনি বোধ হয় শয়তানের দখলে চলে গেছে রেশমা। ফাঁড়া কেটেছে, খানিকক্ষণ পর্যন্ত বাপীভাইকে সেটা বুঝতে দেয়নি। তাকে আঁকড়ে রেখে আব এক পাথর থেকে অন্য পাথরে সরেছে।

...শয়তান রেশমাকেই ফাঁদে ফেলেছে। আসমানের চাঁদের লোভ দেখিয়েছে। সেই চাঁদ যেন হঠাৎ ওর হাতের মুঠোয়। না, চালিহার মতলব হাঁসিলের কথা আব তার মাথায়ও ছিল না। চালিহা জানবে না। দুনিয়ার কেউ কোনদিন জানবে না।

বাংলোয় ফেরার মধ্যে রেশমার সবটাই শয়তানের দখলে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। বাপীভাই ভয়ে ঘরে সেঁধিয়ে আছে। সেই ভয়ের খোল ছিঁড়ে-খুঁড়েই দেবে রেশমা আজ। ঝগড়ুকে মদে ডুবিয়ে দিয়ে এসে দেখে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। ক্ষিপ্ত হয়েই সেই বন্ধ দরজায় ঘা দিয়েছিল।

দরজা খুলতে নির্লজ্জ বেহায়ার মতো আসমানের চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছিল রেশমা।

বাপীভাই সেই হাত দুমড়ে ভেঙে দিয়েছে।

রেশমার মাথায় দাউ দাউ আগুন জ্বলেছে তার পর থেকে। শয়তান সেই আগুন নিভতে দেয়নি। ওকে উল্টে পাগল করে তুলেছে। চরম প্রতিশোধ না নিতে পারা পর্যন্ত মাথার আগুন নিভবে না।

ভালো করে ফর্সা হবার আগে বেরিয়ে পড়েছে। ডেরায় তোরংগটা রেখে সোজা চালিহার কাছে চলে গেছে। বলেছে, দু'হাজার টাকা দাও এবার।

চালিহা আনন্দে লাফিয়ে উঠেছে। কিন্তু রেশমার মুখ দেখে আবার খটকাও লেগেছে। —তোর এরকম মূর্তি কেন? বাপী তরফদার ফাঁদে পা দিয়েছে তো?

রেশমা বলেছে, না! কিন্তু না দিলেও তুমি এত বোকা কেন? এক ঝটকার গায়ের

জামা সরিয়ে পাহাড়ের সেই কাটা-ছেঁড়ার দাগ দেখিয়েছে।—এগুলো দেখেও তোমার শত্রু কিভাবে আমাকে শেষ করেছে বললে মালকান্ অবিশ্বাস করবে? তাছাড়া জিগ্যেস করলে ঝগড়ুও বলবে, ভোর হবার আগে আমি হেঁটে পালিয়ে এসেছি।

চালিহার ফর্সা মুখেও শয়তান হাসছে।—মালকানকে তুই নিজে গিয়ে বলবি?

—বলব। তার আগে তোমার কাছে নালিশ করেছি তাও বলব।

—কবে বলবি?

—ও পাহাড় থেকে ফিরুক, তারপর বলব।

রেশমার মুখে সেই আগুন দেখে চালিহা বিশ্বাস করেছে। আর সেই প্রথম নিজের দু'চোখেও গলগল করে লোভ ঠিকরেছে। ওর মাথাটা আদর করে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলেছে, তোর থেকে বেশি আপনার আর আমার কেউ না। নগদ টাকা হাতে নেই এখন, রাতে আসিস দিয়ে দেব।

রাতে এসেছে। আসবে না কেন, শয়তানের হাতে চলে গেলে আর কার পরোয়া? রাতে ডাকার অর্থ জেনেও এসেছে। এরপর আর কিছুই যায় আসে না। চালিহা ওকে দারুণ খাতির করেছে। কড়কড়ে টাকা ওর হাতে গুঁজে দিয়েছে। রেশমা মদ ঘৃণা করে, কিন্তু চালিহা আদর করে সেই মদও ওকে খাওয়াতে পেরেছে। তারপর নরকে ডুবেছে। নিজেকে ধ্বংস করতেই চায়। নিজেকে, সেই সঙ্গে আর একজনকে।

কিন্তু পরদিন সকালে সেই বাংলোয় বাপীভাইকে দেখে রেশমার বুকের তলায় হঠাৎ প্রচণ্ড মোচড় পড়েছে। প্রাণপণে তখন সেই শয়তানকেই আঁকড়ে ধরেছে সে। নিজেকে দ্বিগুণ হিংস্র করে তুলতে চেয়েছে।

বাপীভাই চলে যাবার পর চালিহা ওকে মালকানের কাছে ঠেলে পাঠাতে চেয়েছে। কিন্তু রেশমা আবার যেন পঙ্গু হয়ে পড়েছে। শয়তান তাকে ছেড়ে যাচ্ছে। চেষ্টা করেও বাঘিনীটাকে আর বুকের মধ্যে ধরে রাখতে পারছে না। তবু অক্লান্ত চেষ্টা করছে। চালিহাকে বলেছে, আজ না, মালকানের কাছে কাল যাবে।

চালিহার সবুর সয় না।—কাল কেন? আজ নয় কেন?

রেশমা বলেছে, আজ রাতেও তোমার কাছে থাকব। তাড়া দিও না। আমার মন মেজাজ এখনো ভালো না।

চালিহা লোভের টোপ গিলেছে, আর তাগিদ দিতেও সাহস করেনি।

পরদিন সকাল থেকে রেশমা আরো গুম। শয়তানও ওর সঙ্গে শয়তানি করেছে। ওকে ছেড়ে চলেই গেছে। ভিতরের সেই বাঘিনীও উধাও। ওদিকে চালিহারও তাগিদ বেড়েছে। ওকে মালকানের কাছে পাঠানোর জন্য ব্যস্ত।

ভেবেচিন্তে রেশমা একটা মতলব এঁটেছে। তাকেই ঢিট করার মতলব। চালিহাকে বলেছে, সকালে নয়, দুপুরে যাবে মালকানের কাছে। তখন তাকে নিরিবিলিতে পাবে। আর পরামর্শ দিয়েছে, তুমি সায়েব, পাহাড়ের বাংলোয় চলে যাও। আমি যা-ই বলি, ঝগড়ুকে মেমসায়েব জিজ্ঞাসাবাদ করবেই। আমার ব্যাপারে খোঁজ-খবর করার নাম করে তুমি আগেভাগে গিয়ে তার মগজে যা ঢোকাবার ঢুকিয়ে দিয়ে এসো। তারপর রাতে এসে মালকানকে যা বলার বোলো।

রেশমা জানে এই লোকের কোনো নোংরা কথা ঝগড়ু বিশ্বাস করবে না। তার নজরে বাপীভাইয়ের পাহাড়ের মতো উঁচু মাথা। রেশমার মতলব হাঁসিল হলে চালিহা উল্টে আরো বেশি নিজের কলে পড়বে।

দুপুরে রেশমা নিজের ডেরায় ফিরেছে। হারমা ঘরের সামনে বসে আছে দেখে বিরক্ত হতে গিয়েও ফিকফিক করে হেসেছে। কাছে এসে ওর ঝাঁকড়া চুল মুঠো করে

ধরে মাথাটা ঝাঁকিয়েছে আর আদুরে গলায় বলেছে, আমার ওপর তোরা সব্বাই খুব রেগে গেছিস জানি। কিন্তু আজ থেকেই বুঝবি আমি কতো ভালো মেয়ে।

এ-কথা হারমাই পরে বলেছে দুলারিকে। দু'দিন ধরে রক্ত সাত্যি টগবগ করে ফুটছিল হারমার। রেশমাকে নাগালের মধ্যে পেলে খুনই করে ফেলবে ঠিক করেছিল। কিন্তু তার কথা শুনে আর অত হাসি দেখে হারমা হকচকিয়ে গেছল। রাগও জল।

রেশমা তক্ষুনি হারমাকে ঠেলে পাঠিয়েছে দুলারিকে ডেকে আনার জন্য। এক্ষুনি আসতে হবে, খুব দরকার।

দুরাত ওই শয়তানের বাংলোয় কাটিয়েছে জানার পর দুলারি আর তার মুখ দেখবে ভাবেনি। কিন্তু ডাকছে শুনে না এসে পারেনি। ওই মুখপুড়ি যে কতখানি ওর, জানে বলেই ডেকেছে। তাছাড়া অনেক জানার আছে, অনেক বোঝার আছে। না এলে জানবে কি করে, বুঝবে কি করে?

এসেছে। দুলারিকে জড়িয়ে ধরে সে কি আদরের ঘটা ওর। আর সে কি হাসি! যেন দুনিয়া জয় করে ঘরে ফিরল। খুশি ধরে না। তেমনি হাসিমুখে ওর আদ্যোপান্ত সব বলল। শুনতে শুনতে দুলারি স্তব্ধ। কিন্তু ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। শয়তান ওকে ছেড়ে গেছে। ভিতরের বাঘিনী পালিয়েছে। আর ওর কাকে ভয়? এবারে ওই ম্যানেজারকে জব্দ করার পালা। মোক্ষম জব্দই করবে। এমন জব্দ করবে যে দুলারি আবু সায়েব এমন কি বাপীভাইয়েরও ওর ওপর আর একটুও রাগ থাকবে না।

ও কি করবে বা কি মতলব এঁটেছে বার বার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও বলল না। হেসেছে আর মাথা নেড়েছে। সেটি হচ্ছে না। আগে থেকে জানা-জানি হলে সর্বনাশ। সব ভেস্তে যাবে। এত কাণ্ডর পর মেয়েটার মাথাই খারাপ হয়ে গেল কিনা দুলারি ভেবে পায়নি। ...ওই চালিহাকে খুন-টুন করে বসে শেষে সব কবুল করার ফন্দি আঁটছে না তো? ও না পারে কি?

মোট কথা মেয়েটার অত হাসি দুলারির ভালো লাগেনি। তার ওপর দু'হাজার টাকার পুঁটলিটা তার হাতে দিয়ে কি করতে হবে বলতে আরো খটকা লেগেছে। কিন্তু ভাবার সময় পায়নি খুব। রেশমা আবার ঠেলে তুলে দিয়েছে ওকে। বলেছে, হারমার সঙ্গে ওর দরকারি কথা আছে, পরে দেখা হবে।

দুলারির দুশ্চিন্তা বেড়েছে আরো। ওই হারমার সঙ্গে জোট বেঁধে কিছু একটা করে বসার মতলবে আছে নাকি?

দুলারি চলে যেতে রেশমা বেরিয়ে এলো। হারমাকে বলল, তুই আর বসে আছিস কেন, ঘরে যা। আমার দরকারি কাজ আছে, এক্ষুনি বেরুবো।

হারমা গোঁজ হয়ে বসে থেকে জবাব দিয়েছে, আমার আর ঘর কোথায়।

এ-কথা শুনে রেশমা নাকি হাসতে লাগল আর ওকে দেখতে লাগল। তার পর কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, আচ্ছা আজ থেকে আমার এই ঘরই তোর ঘর। আবার ঘরে ঢুকে দুটো টাকা এনে ওর হাতে দিল—সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। যা খেয়ে আয়—

হারমা তাও নড়ে না।

—অবাধ্য হলে রাগ করব বলে দিচ্ছি, যা চটপট খেয়ে আয়।

হারমা চলে গেল। কিন্তু আসলে কোথাও না গিয়ে একটু ঘুরে রেশমার ডেরার পিছনে এলো আবার। নিজের এত ভাগ্য বিশ্বাস করতে পারছিল না। রেশমা কোথায় বেরুবে, কি তার দরকারি কাজ না দেখে থাকে কি করে। তাছাড়া ওর সেই হাসিমুখ দেখেই ক্ষুধাতৃষ্ণা গেছে।

একটু বাদে রেশমা বেরুলো। কিন্তু হারমা ভেবে পেল না কোথায় চলল ও। রাস্তার দিকে নয়, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যে-দিকে চলেছে সে-দিকে তো সাপ-ঘর! ভয়ে ভয়ে হারমা অনেকটা ফারাক রেখে গাছের আড়ালে আড়ালে চলছে। দেখে ফেললে কি মূর্তি ধরবে সেই ভয় আছে।

বেশ দূরে একটা গাছের ওধারেই দাঁড়িয়ে গেল হারমা। সামনে আর গাছ নেই, আর এগোলে দেখে ফেলবে। বাঁশের বেড়া সরিয়ে রেশমা দাওয়ার দিকে এগলো। তারপর সামনের বড় সাপ-ঘরটার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল।

এই ঘরে হঠাৎ কি দরকার পড়তে পারে রেশমার, হারমা ভেবেই পাচ্ছে না। পাহাড়ের বাংলো থেকে সাপের বিষ বার করা শিখে এসেছে, এ অনেকদিন আগে রেশমাই ওকে বলেছিল। সেই বিষ বার করতে গেল? বিষের নাকি অনেক দাম। কিন্তু বিষ দিয়ে রেশমা কি করবে? চুরি করে বিক্রি করবে? না কি কাউকে সাবড়ে দেবার মতলব!

ঝাঁপির মুখ একটু একটু ফাঁক করে খুব বিষাক্ত সাপ টেনে বার করা জল-ভাত ব্যাপার। ভয়ের কিছু নেই। হারমা নিজেও পারে। অথচ কি একটা ভয় হারমার বুকের ওপর চেপে বসেছিল। রেশমা এত দেরি করছে কেন? তিন-পো ঘণ্টা পার হতে চলল—বেরিয়ে আসছে না কেন?

আর পারা গেল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল।। পা টিপে দাওয়ায় উঠল। আস্তে আস্তে দরজাও ঠেলল। তারপর মেঝেতে ওই দৃশ্য দেখে একটা আর্তনাদ করে বাইরে ছুটল।

টর্চ জেবলে ঘড়ি দেখল বাপী। রাত এগারোটা বেজে দশ। ঘুম এই রাতে আর আসবে মনে হয় না।...দু'হাজার টাকার সেই পুঁটলিটা ফেরার সময় বাপী ঊর্মিলার হাতে দিয়েছে। তার মাকে দিতে বলেছে। আর যা শুনেছে সব তাকে বলতে বলেছে। রণজিৎ চালিহাকে রেশমা মোক্ষম জব্দ করে গেল বটে। পাহাড় থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অঘটনের খবর তার কানে গেছেই। তারপর সাহস করে সে আর পাশের বাংলোয় এসে গায়ত্রী রাইয়ের সঙ্গে দেখা করেনি নিশ্চয়। কথার খেলাপ করে যে মেয়ে এ-ভাবে নিজের জীবন দিয়েছে, তার আগে হাটে হাঁড়ি কতটা ভেঙে দিয়ে গেছে কে জানে? দু'রাত পর পর ওই মেয়ে তার বাংলোয় কাটিয়েছে এও আর গোপন থাকবে না। আত্মঘাতিনী হবার ফলে ম্যানেজারের বাংলোয় রাত কাটানো নিয়েই সকলের কিন্তু জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। বাংলো থেকে নড়ার সাহস এই রাতে অন্তত চালিহার হবে না।

কিন্তু বাপী কি করবে এখন? টর্চটা হাতে করে রেশমার ডেরায় চলে যাবে? ওকে সেখানেই শুইয়ে রাখা হয়েছে এখন। আবু বসে পাহারা দিচ্ছে। সংস্কারবশে হারমার বাপ ধামন ওঝা সাপে-কাটা মরাকে চব্বিশ ঘণ্টার আগে মাটি চাপা দিতে নিষেধ করে গেছে। যে মুখ চোখের সামনে থেকে সরানোই যাচ্ছে না, চুপচাপ বেরিয়ে গিয়ে বাপী আবুর সঙ্গে তার কাছে গিয়েই বসে থাকবে?

—বাপী সাব! বাপী সাব! বাপী সাব!

আচমকা চিৎকারে অন্ধকার রাতের স্তব্ধতা খান-খান হয়ে গেল। সুইচটা টিপে একলাফে বিছানা থেকে নেমে বারান্দার দরজা খুলে বাপী বেরিয়ে এলো। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কে। বারান্দার আলো জবালল।

রণজিৎ চালিহার কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড অর্জুন। ভয়ার্ত মুখ। দু'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। বেদম হাঁপাচ্ছে।

তার কথা শুনে বাপী কাঠ কয়েক মুহূর্ত। অর্জুন ঘুমোচ্ছিল। একটু আগে তার

সায়েবকে সাপে কেটেছে। চিৎকার চেঁচামেচি করে কয়েকজন লোক জুটিয়ে সে সাইকেল নিয়ে এখানে খবর দিতে ছুটে এসেছে। মেমসায়েব তাকে জলদি গাড়ি বার করে বাংলোর সামনে দাঁড়াতে বলেছেন। তিনিও যাবেন।

দু'মিনিটের মধ্যে গাড়ি নিয়ে বাপী পাশের বাংলোয় এলো। বারান্দায় গায়ত্রী রাই আর বিবর্ণ মুখে ঊর্মিলা দাঁড়িয়ে। গায়ত্রী রাই একাই নেমে এলো। ঊর্মিলার নড়া-চড়ারও শক্তি নেই যেন। অর্জুন সাইকেল নিয়ে আগেই ছুটে বেরিয়ে গেছে।

রণজিৎ চালিহার শোবার ঘরে আট-দশজন লোক। প্রতিবেশী হবে। কিন্তু বাপী সব থেকে অবাক সেখানে হারমাকে দেখে। তার মুখে রক্ত। হাতে একটা ছোরা। সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। দু'মিনিটের মধ্যেই মুখ ধুয়ে ফিরে এলো।

চালিহা বিছানায় পড়ে আছে। অত ফর্সা মুখ কালচে, বিবর্ণ। সেটা ভয়ে কি বিষে বাপী ঠাওর করতে পারল না। জ্ঞান আছে কি নেই তাও বোঝা যাচ্ছে না। সম্বিৎ ফিরতে হাত তুলে বাপী নাড়ি দেখল। পালস্ অস্বাভাবিক দ্রুত। হাঁটুর নিচে পায়ের পিছনে মাংসালো জায়গায় সাপে কেটেছে। হারমা কাছাকাছিই ছিল নাকি। অর্জুনের চেঁচামেচি শুনে ভিতরে ঢুকেছে। তারপর প্রাথমিক যা করার সে-ই করেছে। হাঁটুর ঠিক নিচে শক্ত বাঁধন দিয়েছে। আর হাঁটুর ছ'আঙুল ওপরে আর একটা। তার সঙ্গে ওই ছোরাটা ছিল। সেটা দিয়ে সাপে-কাটা জায়গা আরো বেশি করে কেটে দিয়ে রক্ত বার করে দিয়েছে। একবারে বিষকালা রক্ত বেরিয়েছে গলগল করে। তারপর মুখ লাগিয়ে ও অনেকটা রক্ত টেনে এনেছে—বিষ কতটা বার করতে পেরেছে জানে না।

হারমা বিড়বিড় করে বলল, সায়েব ভয়ে ভিরমি খেয়েছে—আর ভয় নেই, বেঁচে যাবে।

চা-বাগানের হাসপাতালে খবর দেওয়া হয়েছিল। তাদের গাড়ি এলো রণজিৎ চালিহাকে তুলে নিয়ে গেল।

তখন পর্যন্ত বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি বাপীর।...সাপের জায়গা, বাংলোয় সাপ ঢোকাটা আশ্চর্য কিছু না। কিন্তু ঢুকতে পারে না বড়। কারণ সব জানলাতেই পাতলা তারের জাল লাগানো থাকে। বাপী তিনটে জানলা চেয়ে চেয়ে দেখল। পায়ের দিকের জানলার জাল বেশ খানিকটা ছেঁড়া আর দুমড়নো। মাথায় রক্ত ওঠার দাখিল বাপীর। ঘরে তখন কেবল গায়ত্রী রাই আর সে। অর্জুন তার সায়েবের সঙ্গে হাসপাতালে। কাছে ডেকে বাপী গায়ত্রী রাইকে ছেঁড়া জালটা দেখালো। চাপা গলায় বলল জাল কেটে কেউ ঢুকিয়ে না দিলে এ-ঘরে সাপ ঢুকতে পারে না।

গায়ত্রী রাই একটি কথাও বলল না। সমস্ত মুখ অদ্ভুত সাদা। তার হার্টের কথা চিন্তা করেই বাপী হাত ধরে বাংলো থেকে নামিয়ে গাড়িতে তুলল। সব কটা আলো জ্বালাই থাকল। বাপী বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

গায়ত্রী রাই গাড়িতেও নির্বাক।

হেড লাইটের আলোয় বাপী দেখল, পঁচিশ-তিরিশ গজ দূরে একটা লোক শ্লথ পায়ে হেঁটে চলেছে। হারমা। লাইট দেখে সেও ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

তার সামনে এসে বাপী গাড়ি থামালো। হেড লাইট নেভালো। গায়ত্রী রাইকে বলল একটু বসুন, আসছি।

নেমে এসে হারমাকে গাড়ি থেকে আট-দশ হাত দূরে গিয়ে ধরল। তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল খানিক। হারমার ভাবলেশশূন্য মুখে শুধু রাজ্যের ক্লান্তি। চেয়ে আছে সে-ও।

—তুমি এত রাতে এদিকে এসেছিলে কেন?

হারমা নিরুত্তর।

—কি করছিলে?

নিরুত্তর।

বাপীর গলার স্বর কঠিন এবার।—আমাকে বিশ্বাস করে যা জিগ্যেস করছি জবাব দাও!

বিড়বিড় করে বলল, এদিকে এসেছিলাম।

—এত রাত্তিরে কেন এসেছিলে? তোমার সঙ্গে ওই ছোরা ছিল কেন?

ঘোলাটে চোখে হারমা চেয়ে রইল খানিক।—দুশমনকে খতম করব বলে এসেছিলাম। ওই ছোরা দিয়ে খোদা তাকে বাঁচিয়ে দিল।

আর দু'চার কথায় ব্যাপারটা বুঝে নিল বাপী। রাতে সুযোগ না পেলে ভোরে বাংলোয় ঢুকে সায়েবকে শেষ করার সংকল্প নিয়ে এসেছিল। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে বাংলোয় ঢুকে দেখে আল্লা তাকে আগেই শাস্তি দিয়েছে। তক্ষুনি আল্লার ওপর ভয়ংকর রাগ হয়ে গেল ওর—আল্লা রেশমাকে নিয়েছে। তাই খোদা এবারে যাকে মারতে গেল হারমা তাকে বাঁচিয়ে দিল। হঠাৎ বিষম রাগে ওই কালো দেহের ছাতি ফুলে উঠল, বলল, আমি ভুল করলাম, আবার বদলা নেব।

বাপী দেখছে ওকে। এবারে ঠাণ্ডা গলায় বলল, খোদা ওই সায়েবকে শাস্তি দেয়নি, জানলার জাল কেটে কেউ তার ঘরে সাপ ছেড়ে দিয়ে গেছে। তুমি?

বিমূঢ় মুখে মাথা নাড়ল লোকটা। সে নয়। পরের মুহূর্তে কিছু মনে হতে চমকে উঠল যেন। সামলে নিয়ে আবার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

—তুমি দেখেছ কাউকে?

মাথা নাড়ল, দেখেনি।

—ভালো করে ভেবে দেখো। দেখেছ? কে এমন কাজ করতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

হঠাৎ গলার স্বর গমগম করে উঠল ওর।—কিছু মনে হয় না। আমি জানি না। আমি কাউকে দেখিনি। হনহন করে হেঁটে চলল।

গাড়িতে ফিরে আসতে গায়ত্রী রাই জিজ্ঞাসা করল, লোকটা কে?

—হারমা। এক ওঝার ছেলে। রেশমাকে খুব ভালোবাসত।

—তাহলে ওরই কাজ?

বাপী জবাব দিল, না—মিস্টার চালিহাকে ওই বাঁচিয়ে দিল ভেবে এখন পস্তাচ্ছে।

বাকি রাতটুকু দু' চোখের পাতা আর এক করা গেল না। খুব ভোরে বাপী গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। গা-জুড়নো ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস। পাশে বসন্তের রং-ছোপানো বানারজুলির জঙ্গল। বনমায়া নেই। রেশমা নেই। এই বাতাস আর এই বসন্ত বিদ্রূপে ঠাসা এখন।

সাপে-কাটা রোগী হামেসাই আসে এখানকার হাসপাতালে। তাই চিকিৎসার ব্যবস্থাও ভালো। রণজিৎ চালিহাকে কেবিনে রাখা হয়েছে। এত সকালে বাপী তাকে দেখতে আসেনি। খবর নিতে এসেছে। মেট্রনের কাছ থেকে খবর পেল ভালো আছে। তবে জ্বর খুব। এমনি ছোরা দিয়ে ক্ষত জায়গা কেটে দেওয়ার দরুন অ্যান্টিটিটেনাস দিতে হয়েছে। প্রাণের ভয় নেই আর, কিন্তু প্রচণ্ড রকমের নার্ভাস শকের দরুন পেশেন্ট খুবই কাহিল। যে লোকটা ক্ষত জায়গা কেটে বিষরক্ত বার করে দিয়েছে আর জায়গামতো দু-দুটো বাঁধন দিয়েছে তার খুব প্রশংসা করেছে ডাক্তাররা।

গাড়িতে ফিরে এলো। এক জায়গায় এসে জঙ্গলের ধারের রাস্তায় গাড়ি থামালো

আবার। এখান থেকে জংগলের পথে আবুর ঘর দূরে নয় খুব।

দুলারি দাওয়ায় দাঁড়িয়ে। দূর থেকে বাপীকে দেখল। চোখে একবারও পলক পড়ল না। নিশ্চল পাথর-মূর্তি।

বাপী ওর কাছে দাওয়ার সামনে দাঁড়ালো। এ-ও সমস্ত রাত ঘুমোয়নি বোঝা যায়। এই চোখে গতকালের মতো আগুন ঠিকরোচ্ছে না এখন। পাথর-মূর্তির মতো শুধু অপলক। অনেকটা হারমার মতো ভাবলেশশূন্য।

সাদামাটা সুরে বাপী জিগ্যেস করল, আবু রাতে ঘরে ফেরেনি তো?

মাথা নাড়ল। ফেরেনি।

জানা কথাই। গতকাল বিকেল থেকে রেশমার ডেরায় আছে। মাটি না দেওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকবে। বাপী দুলারির কাছেই এসেছে। কিছু বলতে নয়, শুধু দেখতে। দেখছেও। অনেক কাল আগের সেই দুলারিকে মনে পড়ছে। যখন রেশমাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সাপ খেলা দেখাতো, গাল ফুলিয়ে সাপের বাঁশি বাজাতো, হাঁটু মুড়ে বসে সামনের ফণা-তোলা সাপের মতোই সামনে পিছনে কোমর বুক মাথা দোলাতো আর বার বার মাটিতে হাত পেতে দিয়ে ছোবল পড়ার আগেই পলকে সে হাত টেনে নিয়ে সাপকে উত্তেজিত করত। বাপী তখন রেশমার থেকে সেই দুলারিকেই ঢের সাংঘাতিক মেয়ে ভাবত।

এতকাল বাদে আজ আবার সেই দুলারিকেই দেখছে বাপী। কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে শুধু দেখাটা বিসদৃশ। বলল, এ-দিকের ব্যাপার তো শুনেছ?

দুলারি চেয়েই আছে। এখনো জিজ্ঞেস করল না কি ব্যাপার বা কি শুনবে।

—কাল রাত এগারোটা নাগাদ রণজিৎ চালিহাকে খুব বিষাক্ত সাপে কেটেছে।... ওর চাকর এসে খবর দিতে আমি আর তোমাদের মেমসায়েব তক্ষুনি গেছলাম। চোখে চোখ রেখে কথাগুলো বলছে বাপী। জানলার জাল কেটে কেউ ঘরে সাপ ছেড়ে দিয়ে গেছে। খুব বরাত ভালো লোকটার...ওই হারমার জন্যেই বড় বাঁচা বেঁচে গেল।

যা দেখার এবারে নির্ভুল দেখল বাপী। ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে সোজা হয়ে দাঁড়াল দুলারি। মুহূর্তের মধ্যে চোখে সেই আগুন নেমে এলো। এই শেষের খবরটাই যেন সর্বাঙ্গ ঝলসে দিয়ে গেল ওর—হারমার জন্য বেঁচে গেল। হারমার জন্য! ও কি করেছে?

বাপ বলল কি করেছে।

—হারমা! হারমা এই কাজ করল! হারমা ওই শয়তানকে বাঁচিয়ে দিল।

বাপীর নির্লিপ্ত মুখ। গলার স্বরও ঠাণ্ডা।—তুমি তাহলে জানতে চালিহা সাহেবকে সাপে কাটবে?

সেই ছেলেবেলা হলে এই চাউনি দেখেই বাপী হয়তো ভয়ে তিন পা সরে যেত।

—হ্যাঁ, জানতাম। তুমিও বুঝেছ বলেই এত সকালে এখানে ছুটে এসেছ, তাও তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছে। তোমার বন্ধুও শোনামাত্র বুঝবে। কিন্তু আমায় কে কি করবে? কে ছেড়েছে বলার জন্য ওই সাপ ফিরে আসবে, না তার গায়ে আমার হাতের দাগ থাকবে? ওই হারমাকে আমি দেখে নেব, বুঝলে? আর রেশমাকে যে শেষ করেছে, এবার প্রাণে বাঁচলেও সেই শয়তানকে আমি আর বেশিদিন এই বানারজুলির বাতাস টানতে দেব ভেবেছ?

এবারে চাপা ধমকের সুরে বাপী বলল, এখন মাথা খারাপ করবার সময় নয়—যা বলি শুনে রাখো। কটা দিন এখন মুখ শেলাই করে থাকবে। হারমাকে একটি কথাও বলবে না, আবু যা বোঝার বুঝুক, নিজে থেকে তুমি কিছু বলবে না। নিশ্চিন্ত থাকো, যাকে

সরাতে চাও এবারে সে নিজেই সরবে—বানারজুলির বাতাস বেশিদিন তাকে নিতে হবে না।

পরের পাঁচ-ছ'দিনের মধ্যে বাপী আর একবারও হাসপাতালে যায়নি। গায়ত্রী রাই রোজ একবার করে গেছে। কিন্তু তিন মিনিটও থাকেনি। দেখেই চলে এসেছে। সেদিন উর্মিলা সঙ্গে ছিল। সে এসে বাপীকে খবর দিল, আংকল তার কথা শোনার জন্য মাকে বার বার বলছিল। পরে মায়ের মুখে শুনেছে, রোজই বলে তার নাকি অনেক কথা বলার আছে। সেদিন মা তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে, তারও অনেক কথা শোনা হয়ে গেছে—কিন্তু আপাতত তার কারো কোনো কথা শোনার ইচ্ছে নেই। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই আংকল যেন এখন আসাম চলে যায়। পরের কথা পরে।

শুনে আংকলের মুখ আমসি একেবারে।

বাপী হাসপাতালে তার কেবিনে এলো আরো দু-দিন বাদে। বিকেলে। পরের দিন সকালে সে নিজের বাংলোয় আসছে শুনেছে।

বেড-এর মাথার দিকে পিঠে ঠেস দিয়ে বসেছিল, ওকে দেখেই রণজিৎ চালিহা অন্য-দিকে মুখ ফেরালো। অনেক দিন বাদে সেই ওপরওয়ালার গাম্ভীর্য আর বিরক্তি টেনে আনার চেষ্টা। কিন্তু মুখ দেখে বাপীর মনে হল এই কদিনে লোকটার দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বাপী পাশে বসল।—কাল বাংলোয় ফিরছেন শুনলাম?

চালিহা এবার দিকে ফিরল। ক্রুর সন্দিগ্ধ চাউনি।—তোমার কি ধারণা হাসপাতালেই থেকে যাব?

—না। তারপর আপনি আসাম যাচ্ছেন কবে?

পিঁজরায় পোরা হায়নার মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল রণজিৎ চালিহা।—সে খোঁজে তোমার কি দরকার? আমার ঘরের জানলার জাল কেটে সাপ ঢোকানো হয়েছে...এ খবরটা জানা আছে?

—আছে।

—কে করেছে এ কাজ? এত সাহস কার?

—জানি না।

—কিন্তু আমি জানব! আমি তার টুঁটি টিপে ধরব—বুঝলে?

—চেষ্টা করে দেখুন। আমার আপত্তি নেই।

সন্দিগ্ধ দুই চোখ মুখের ওপর থমকে রইল একটু।—তুমি আপত্তি করার কে?

—আপনার সঙ্গে ফয়সালা এরপর আমার হবে ভেবেছিলাম। আপনি এ চেষ্টায় এগিয়ে এলে তার আর দরকার হবে না। রেশমা কেন নেই কারো জানতে বাকি নেই। আপনি যাদের খুঁজছেন তারা এখনো আপনার ঘরে ফেরার অপেক্ষায় আছে। আমি বাধা না দিলে তাদের সুবিধে।

রাগে কাঁপছে লোকটা। কিন্তু বাপী জানে আসলে ত্রাসে কাঁপছে। জালে পড়া জানোয়ারের ত্রাসে রাগের ঝাপটাই বড় হয়ে ওঠে।—তুমি তাহলে আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ, কেমন?

—শুনুন! এবারে ঠাণ্ডা কঠিন গলায় বাপী বলে গেল, মিসেস রাইয়ের অনেক ধৈর্য...মাত্রা ছাড়িয়ে ড্রিঙ্ক করে বৃষ্টির পাহাড়ী রাস্তায় তাঁর স্বামীর জিপ-অ্যাকসিডেন্ট করাটা আর তার আগে আপনার সেই জিপ থেকে নেমে যাওয়াটা তিনি খুব সাদা চোখে দেখেননি। তবু এত ধৈর্য যে আপনাকে তিনি এ পর্যন্ত বরদাস্ত করে এসেছেন। তাঁর কাছে এতদিন থেকে আমিও কিছু ধৈর্য শিখেছি। নইলে এবারে যে ষড়যন্ত্রে আপনি

নেমেছিলেন, তার জবাব আমারই দেবার কথা। কিন্তু কাল আপনার ঘরে ফেরার পর থেকে আমারও ধৈর্যের মেয়াদ আর তিন দিন। হাতে গুনে তিনটি দিন। সেই তিনদিনের জন্য আপনার জীবনের দায়িত্ব আমি নিলাম। কিন্তু তারপর আপনাকে আর এই বানারজুলিতে দেখা গেলে আমার আর কোনো দায়িত্ব থাকবে না।

চালিহার সমস্ত মুখ এখন পাংশু বিবর্ণ।

বাপী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

বাংলোর বারান্দায় মা-মেয়ে বসে। গেটের সামনে গাড়ি থামিয়ে বাপী নামল। বারান্দায় উঠে সামনের চেয়ার টেনে বসল। গায়ত্রী রাই জিগ্যেস করল, পাঁচটার আগেই আপিস ছেড়ে হুট করে কোথায় চলে গেছলে?

—হাসপাতালে। চালিহার কাছে।

আজ আর মিস্টার বা সাহেব জুড়ল না, ওই কানে তাও ধরা পড়ল মনে হল। তার দিকে চেয়ে একটু অপেক্ষা করল।—কেন? কি কথা হল?

বাপী শান্তমুখে জানালো কেন, বা কি কথা হল। কিছুই গোপন করল না।

ঊর্মিলার চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনা। কিন্তু গায়ত্রী রাই বিরক্ত হঠাৎ।—কেন তুমি আগবাড়িয়ে এ-সব বলতে গেলে? সে আসাম চলে গেলে পরে ব্যবস্থা আমিই করতাম। এখন গোঁ ধরে যদি না যায়?

বাপী তেমনি নির্লিপ্ত, নিরুদ্বিগ্ন। ঠাণ্ডা স্পষ্ট জবাব দিল, না যদি যায়, আপনি আমার নামে কুকুর পুষবেন।

গায়ত্রী রাই চেয়ে রইল। তার মেয়েও নতুন মুখ দেখছে।

॥ চার ॥

বাপীর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি প্রমাণ করে তিনরাতের মধ্যে রণজিৎ চালিহা বেত-খাওয়া কুকুরের মতো বানারজুলি থেকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। বাপী যা বলে এসেছিল তারপর আর তার গায়ত্রী রাইয়ের সঙ্গে দেখা করারও মুখ ছিল না বা সাহস ছিল না। পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যাবার খবরটা কানে আসতে গায়ত্রী রাই মুখে একটি কথাও বলেনি বা কোনো মন্তব্য করেনি। রাতে খাবার টেবিলে বসে কেবল টিপে-টিপে হেসেছে আর বাপীকে লক্ষ্য করেছে। দুষ্টু দামাল ছেলের কাণ্ড দেখা প্রসন্ন কমনীয় মিষ্টি-মিষ্টি হাসি।

তাই দেখে ঊর্মিলার হঠাৎ হি-হি হাসি। হাসির চোটে বিষম খেয়ে নাকের জলে চোখের জলে একাকার। গায়ত্রী রাই ওকে ধমকে থামাতে চেষ্টা করে শেষে নিজেই আবার হেসে ফেলল।—এত হাসির কি হল তোর?

জবাবে চোখেমুখে জল দেবার জন্য ঊর্মিলা বাথরুমের দিকে ছুটেছে। পরে একলা পেয়ে বাপীকে বলেছে, মা তোমাকে যেভাবে দেখছিল আর হাসছিল, তাইতে আমার সেই কথা মনে আসছিল।

—কি কথা?

চপল খুশিতে ঊর্মিলার রক্তবর্ণ মুখ তখনো।—তোমার বয়েস আর দশটা বছর বেশি হলে আর মায়ের দশ বছর কম হলে কি হত!

বাপী ওকে সতর্ক করার একটা বড় সুযোগ ফসকালো। বলতে পারত, বয়েসের ফারাক যে-দুজনের একটুও আপত্তিকর নয়, মা যদি তাদের মধ্যে কিছু ঘটাতে চায়, তাহলে কি হবে?

বলা গেল না। ওর মায়ের কোন উদ্দেশ্য পণ্ড করার জন্য এমন একটা ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে বসেছিল রণজিৎ চালিহা, এই মেয়ের মাথায় সেটা ঢোকেইনি। জানলে এই হাসিমুখ আমসি হয়ে যেত।

চালিহা উধাও হবার তিন-চার দিনের মধ্যে তার আসামের ঠিকানায় গায়ত্রী রাইয়ের সই-করা রেজিস্ট্রি চিঠি গেছে। টাইপ করা সেই চিঠির কপি বাপী দেখেছে। অল্প কথায় ঠাণ্ডা বিদায়। রাই অ্যাণ্ড রাই-এর সমস্ত দায়িত্বভার থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হল। এই সংস্থার সঙ্গে আর তার কোনরকম সংস্রব থাকল না।

মহিলার পাকা কাজ। কাগজে কলমে চিফ এক্সিকিউটিভ এখন বাপী তরফদার—ভুটান সিকিম নেপাল বিহার মধ্যপ্রদেশ আর উত্তর বাংলার ছোট বড় সমস্ত ক্লায়েন্টের কাছে মহিলার স্বাক্ষরে রেজিস্ট্রি ডাকে সেই ঘোষণাও তড়িঘড়ি পৌঁছে গেছে। আসামের মার্কেট হাতছাড়া হল বলে একটুও খেদ নেই তার। বিহার আর মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে এবার ওয়েস্ট বেঙ্গলের মার্কেটও যাচাই করে আসার পরামর্শ দিয়েছে বাপীকে। সব কটা প্রভিন্স-এর জন্য তার অধীনে দেখে-শুনে একজন করে রিজিয়ন্যাল ম্যানেজার নেবার কথা বলেছে। ওকে সকলের ওপরে রেখে ব্যবসাটা এবার ঢেলে সাজাবার ইচ্ছে তার।

কিন্তু গায়ত্রী রাইয়ের মাথায় আরো কি আছে বাপীর কল্পনার মধ্যেও ছিল না। জানা গেল আরো আট-ন মাস বাদে। যে লোভে শুরু থেকে রণজিৎ চালিহার এত দিনের এত ছলা কলা কৌশল, না চাইতে বাপীর বরাতে ভাগ্যের সেই শিকেও ছিঁড়ল।

রাই অ্যাণ্ড রাইয়ের সমস্ত ব্যবসার চার আনার অংশীদার বাপী তরফদার।

ওকে নিয়েই মহিলা শিলিগুড়ির অ্যাটর্নি অফিসে হাজির একদিন। তখন পর্যন্ত বাপীর ধারণা নেই কি হতে যাচ্ছে। তাই বাধা দিয়ে বলেছিল, এই শরীরে এতটা পথ গাড়িতে যাওয়ার দরকার কি আপনার—কি করতে হবে আমাকে বলুন না?

অবাধ্য হলে এখনো আগের মতই মেজাজ দেখাতে চেষ্টা করে গায়ত্রী রাই। জবাব না দিয়ে গটগট করে গাড়িতে গিয়ে উঠেছে। অ্যাটর্নির সঙ্গে কথাবার্তার সময় ওকে ডাকা হল না দেখে ধরে নিয়েছে ব্যক্তিগত ব্যাপার কিছু। তার দিন-কতক বাদে গায়ত্রী রাই বাংলোর আপিস ঘরে এসে চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসল। সহজ সাদামাটা মুখ। হাতে অ্যাটর্নির তৈরি একটা খসড়া। বাপীর দিকে সেটা এগিয়ে দিয়ে বলল, পড়ে দেখো তো—

সাধারণ কিছু ধরে নিয়েই বাপী চোখ বোলাতে শুরু করেছিল। তারপর চক্ষু স্থির। হকচকিয়ে গিয়ে খসড়াটা ফেলে তার দিকে তাকালো। মহিলার সাদা মুখ কমনীয় কৌতুকে ভরাট।

—এ কি কাণ্ড! এ আপনি কি করছেন!

—কেন, তোমার আপত্তি আছে? হাসি-ছোঁয়া স্নেহ ঝরছে দু'চোখে। কিন্তু খুশির বদলে শুকনো মুখ দেখে অবাক একটু।

বাপী বলল, তা না, মানে কত ভাবে কত তো দিচ্ছেন—এক্ষুনি এর দরকার কি!

মুখের দিকে চুপচাপ খানিক চেয়ে থেকে মহিলা ওর অস্বস্তিটুকু লক্ষ্য করল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, তোমার প্রাপ্য থেকে একটুও বেশি দেওয়া হয়নি বা হচ্ছে না। শরীরের যা হাল, আমার দিক থেকে কোনো কাজ ফেলে রাখার ইচ্ছে নেই।

বাপীর গলা শুকিয়ে কাঠ। চুপচাপ খসড়াটা তার দিকে ঠেলে দিল শুধু।

—ওটা অ্যাপ্রুভ করে পাঠালে দলিল হবে, আমি দেখেছি—ঠিকই আছে, তবু তুমি একবার দেখে নিতে পারো।

—আমি আর কি দেখব। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করল, ডলি দেখেছে?

—ওর অত সময় আছে না ধৈর্য আছে? আমার মুখে শুনেছে। সব দিক সামলে যে

ভাবে এখন তুমি ব্যবসার হাল ধরে আছ, ওর মতে চার-আনার থেকে বেশিই দেওয়া উচিত। ঠোঁটের ফাঁকে আবার একটু হাসির রেখা স্পষ্ট হতে দেখা গেল।—আমি আরও ঢের বেশি দেবার জন্য তৈরি হয়েই আছি, কিন্তু নেবার জন্য তৈরি হতে পারছ না কেন? চোখ-কান বুজে এভাবেই বা দিন কাটাচ্ছ কেন?

বাপীর কপাল ঘেমে উঠেছে। খসড়াটা হাতে করে মহিলা উঠে দাঁড়াতে প্রায় অনুনয়ের সুরে বলে উঠল, দলিল করার জন্য এক্ষুনি ওটা না পাঠালে ভালো হয়।

এরকম বাধা আদৌ প্রত্যাশিত নয়। গায়ত্রী রাইয়ের দু-চোখ ওর মুখের ওপর স্থির খানিক।—কেন?

বাপী চুপ। কি বলবে? কি বলতে পারে?

কমনীয় মুখে কিছু সংশয়ের আঁচড় পড়তে থাকল। গলার স্বরও নীরস একটু।—মনে যা আছে খোলাখুলি বলো। দলিল করার জন্য এক্ষুনি এটা না পাঠালে ভালো হয় কেন?

দায়ে পড়ে বাপী সত্যি জবাবই দিতে চেষ্টা করল। বলল, আপনি যা ভেবে রেখেছেন শেষ পর্যন্ত তা যদি না হয়, আপনারই খারাপ লাগবে। আপনি আমাকে অনেক দিয়েছেন, দিচ্ছেনও—পার্টনার ইচ্ছে করলে পরেও করে নিতে পারবেন।

গায়ত্রী রাই ভিতর দেখছে ওর।—আমি যা ভেবে রেখেছি তার সঙ্গে তোমাকে চার-আনার পার্টনার করার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এ-কথা কেন, আমার মেয়েকে তোমার পছন্দ নয়?

বাপী আরো ফাঁপরে পড়ল। তাড়াতাড়ি জবাব দিল, ডলির মতো মেয়ে আমি কমই দেখেছি। কিন্তু বলার পরই মনে হল, এবারেও ভুল বুঝল মহিলা।

অনুচ্চ গলার স্বর প্রায় কঠিন।—আমার মেয়ের যদি শেষ পর্যন্ত তোমাকে বাতিল করার মতো দুর্বুদ্ধি হয়, তাহলে তোমাকে আমার চার-আনা ছেড়ে আট-আনার পার্টনার ক... নেবার কথা ভাবতে হবে। ডলি আপত্তি করেছে বা তোমার সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে?

সত্যি অসহায় মূর্তি বাপীর। মাথা নাড়ল। ডলি আপত্তি করেনি বা কোনো কথা হয়নি।

এত চৌকস ছেলে এ ব্যাপারে সত্যি এত ভীরু কিনা দেখছে মহিলা। এবারে গলার স্বর সদয় একটু।—আমি যতদূর বুঝেছি ডলি তোমাকে পছন্দ করে। কিন্তু তুমি প্রায় দুটো বছর এভাবে কাটিয়ে দিলে কেন, আমি কি চাই বুঝতে তোমার বাকি ছিল?

দলিলের খসড়া হাতে চলে গেল। তার পরেও বাপী অনেকক্ষণ স্থাণুর মতো বসে।

ঊর্মিলার ইদানীংকালের বেপরোয়া মেলামেশা তার মা লক্ষ্য করেনি এমন হতে পারে না। ঝর্ণা পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে, কিন্তু নদীর দিকে গতি তার। সেই আছাড়ি-বিছাড়ির মতো বাপীর ওপর মেয়ের অমন সহজ আর নিঃসংকোচ হামলা দেখেই তার পছন্দ সম্পর্কে মায়ের এমন ধারণা। রাগ হলে বা ঝগড়া বাধলে মেয়ে তার সামনেই বাপীর কাঁধ ধরে বা দু-হাতে মাথার চুলের মুঠো ধরে ঝাঁকায়। গায়ত্রী রাই মেয়েকে বকা-ঝকা করে আর মেয়ে পাল্টা মুখঝামটা দেয়, বেশ করব, আমার সঙ্গে লাগতে আসে কেন!

ঊর্মিলা এখন গাড়ি চালানোটা মোটামুটি রপ্ত করে ফেলেছে। অনায়াসে মায়ের অনুমতি আদায় করার ফলে বাপীই শিক্ষাগুরু। তার ওপর দিয়ে তখন আরো বেশি ধকল গেছে। শেখানোর সময় ঊর্মিলার হাতে স্টিয়ারিং, ব্রেক আর ক্লাচ স্বভাবতই বাপীর দখলে। ফলে স্টিয়ারিং-এর ওপর দখল আনতে হলে মেয়ের বাপীর গায়ের সঙ্গে

লেপটে বসা ছাড়া উপায় কি? একটা পা, হাঁটু থেকে কোমরের একদিক, বুকের পাশের খানিকটা আর কাঁধের একাদকে বাপীর সংগে এ'টে থাকবেই—কিন্তু মেয়ের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। শেখার উত্তেজনায় সমস্ত মন স্টিয়ারিংয়ের দিকে। প্রথম দিনের মহড়ার পরেই উল্টে বাপীর মাথা ঝিমঝিম করছিল। ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলেছে, আমার দ্বারা হবে না—বিয়ের পরে নিজের লোককে ধরে শিখো।

অসুবিধেটা না বোঝার কথা নয় ঊর্মিলার। ওর শেখার তাড়া, কারণ বিজয় মেহেরা শিখেছে গাড়ি চালানো শিখে সে একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড গাড়িও কিনে ফেলেছে। অতএব ঊর্মিলাও তাকে অবাক করে দেবেই—ছেলে ফিরে এসে দেখবে ড্রাইভিংএ ওরও পাকা হাত। বাপীর আপত্তির হেতু বুঝে হাসি চেপে চোখ পাকিয়েছে।—ধরেছি যখন না শিখে ছাড়ব না—তোমার বদলে তাহলে ওই আধবুড়ো বাদশাই মজা লুটবে।

পরদিন সকালে মায়ের সামনেই আবার হিড়হিড় করে গাড়িতে টেনে তুলেছে ওকে। তারপর তার চোখের আড়ালে গিয়ে ধমকেছে, মায়ের যখন আপত্তি হয়নি, তোমার অত সতীপনা কিসের মশাই? যার কাছে ড্রাইভিং শিখব, তার সংগে জড়াজড়ি একটু হবেই যা জানে না? সংগে সংগে হাসি।—তুমি আমার ফ্রেন্ড আর আমি তোমার ফ্রেন্ড—ওই ঝকঝকে নীল আকাশখানার মতো পরিষ্কার সম্পর্ক—শেখা হয়ে গেলে গুরুদক্ষিণা হিসেবে অনায়াসে একখানা চুমুও খেয়ে ফেলতে পারি।

এরপর বাপীর আর অব্যাহতি কোথায়। কিছুদিন বাদে মেয়ের হাত কিছুটা রপ্ত হতে বাপীর একটু সরে বসতে পেয়ে বেঁচেছে। কিন্তু এক সহজ বিশ্বাসে মেয়েটার এই বেপরোয়া মেলামেশা সত্যি যে আশ্চর্যরকম পরিষ্কার, তা অনুভব না করে পারেনি।

এভাবে আর খুব বেশি দিন কাটবে না জানত। জেনেও অসহায়। অনেক দিন থেকে মা আর মেয়ের বিপরীত প্রত্যাশা আর তাগিদ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ভাবসাব মেলামেশা দেখে গায়ত্রী রাই আশা করছে মেয়ের মনের জগৎ থেকে সেই অবাঞ্ছিত পাঞ্জাবী ছেলেটা মুছে গেছে। সে জায়গায় এই ছেলে জুড়ে বসেছে। কিন্তু আশাই করছিল শুধু, নিশ্চিত হতে পারছিল না। শরীর মোটে ভালো যাচ্ছে না। মুখ ফুটে স্বীকার না করলেও দিনকে দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাড়াতাড়ি বিয়েটা হয়ে গেলে সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত। কিন্তু দিন একে একে কেটেই যাচ্ছে, ওদের দুজনারই হাতে যেন অঢেল সময়। কারো তাড়া নেই দেখেই মহিলা মাঝে মাঝে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল, বাপী তাও টের পেত। অন্য-দিকে মাকে সামলাবার বা বোঝাবার সব দায় ফ্রেন্ড-এর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে ঊর্মিলাও দিন গুনছে। কিন্তু মনের মানুষের ফেরার সময় এগিয়ে আসছে অথচ ফ্রেন্ড-এর তেমন মাথাব্যথা নেই। বিয়ের ব্যাপারে মায়ের দিক থেকেও স্পষ্ট কিছু তাগিদ নেই দেখেও ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি। যে ছেলে কাছে নেই, সে একেবারেই দূরে সরে গেছে ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত কিনা কে জানে! তাহলে তা চিন্তির। ঘুরেফিরে তাই বাপীর ওপরেই ক্ষোভ ঊর্মিলার। এতগুলো দিন কেটে গেল, এখনো কেন মাকে বোঝাতে পারল না—মায়ের মন ফেরাতে পারল না। এত পারে আর এটুকু পারে না? এদিকে তো মায়ের চোখের মণিটি হয়ে বসে আছে একেবারে!

বাইরের দিক থেকে দেখলে প্রতিটি দিন বাপীর অনুকূলে গড়িয়ে চলেছে সেটা মিথ্যে নয়। না চাইতে গায়ত্রী রাই তার দু-হাত ভরে দিচ্ছে। সম্মান আর প্রতিপত্তি বেড়েই চলেছে। চিফ এক্জিকিউটিভ হিসাবে মাসের মাইনে দ্বিগুণ। তবু ও-টাকা টাকাই নয়। যাতে হাত দেয় তাই সোনা, তাই টাকা। টাকাই এখন বাপীর পিছনে ধাওয়া করে চলেছে। মাইনের টাকা, কমিশনের টাকা, পার্টনারশিপের ভাগের টাকা। গায়ত্রী রাইয়ের চোখের

মণি হয়ে ভাগ্যের বিপুল জোয়ারেই ভাসছে বটে বাপী তরফদার।

এরই মধ্যে যে আশঙ্কা দুঃস্বপ্নের মতো বাপীর বুকে চেপে বসে আছে ঊর্মিলা তার খবর রাখে না। পরের কটা মাসের মধ্যে গায়ত্রী রাই আর একটা কথাও বলেনি। কিন্তু মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় তার প্রতিটি দিন কিছু প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে কাটছে। ওর ওপর নির্ভর করে কখনো ঠকতে হয়নি বলেই এখনো স্থির বিশ্বাসে মহিলা সেই নির্ভরতার মর্যাদা দিয়ে চলেছে।

কিন্তু প্রতীক্ষারও শেষ আছেই।

এক সন্ধ্যায় ঊর্মিলা তার ঘরে হাজির। গনগনে মুখে সিঁদুরে মেঘ। এক ঝাপটায় বাপীর হাতের বই পাঁচহাত দূরে মাটিতে ছিটকে পড়ল।

—সব তোমার জন্য বুঝলে? তুমি যতো নষ্টের গোড়া!

এরকম হামলা বা এই গোছের সম্ভাষণ নতুন কিছু নয়। শোয়া থেকে উঠে বসল। -কি ব্যাপার?

রাগের ফাটলে নাচার হাসির জেল্লা।—অমন চালাক মা বোকার মতো কি আশায় এতদিন ধরে এমন ভালোমানুষটি হয়ে ঠাণ্ডা মেরে আছে তুমি জানো?

বাপীর ভিতর নাড়াচাড়া পড়ল একপ্রস্থ।—তুমি কি জেনেছ তাই বলো।

জবাব না দিয়ে ঊর্মিলা আবার জিগ্যেস করল, চিকিৎসার জন্য মাকে তুমি বিদেশে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছ?

—হ্যাঁ, একজন স্পেশালিস্টের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলাম, তাঁর মতে নিয়ে যেতে পারলে ভালই হয়।...কেন?

—একটু আগে মা সেই কথা বলতে আমি তক্ষুনি সায় দিলাম। তার উত্তরে মা কি বলল জানো? বলল, আমার বিয়ের পরে যাবে। তারপরেই জিগ্যেস করল, তোদের বিয়েটা হচ্ছে কবে আগে আমাকে সোজাসুজি বল্।

বাপীর বুক দুরুদুরু।—তারপর?

—আমি হাঁ। কার সঙ্গে বিয়ে? শুনে মা রেগেই গেল। পরে বুঝলাম তার ধারণা আমার প্রেমে তুমি হাবুডুবু খাচ্ছ একেবারে। ধমকে বলল, এমন ভালো একটা ছেলে, সেই কবে থেকে তোর মুখ চেয়ে বসে আছে আর তুই কেবল ধিঙ্গিপনা করে বেড়াচ্ছিস। ছেলেটাকে তোরও এত পছন্দ যখন মিছিমিছি দেরি করিস কেন—আমার শরীরের হাল দেখছিস না? বোকো কাণ্ড, মা কিনা শেষে এই ভেবে বসে আছে! তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারি মায়ের এ ধারণা হল কি করে?

বাপীরও ওর মতো সহজ হবার চেষ্টা। উনি যাকে এত কাছে টেনে নিয়েছেন, তাকে তুমি এমন অমানুষ ভাবো তিনি জানবেন কি করে?

—ধ্যেৎ! তুমি একটা যাচ্ছেতাই। তুমি আমার ফ্রেন্ড। সেই হিসেবে তোমাকে আমি দারুণ ভালবাসি। মা সেটাই দেখেছে কিন্তু বোঝেনি।

—তুমি আজ বুঝিয়ে দিলে না কেন?

—হুঃ, ধড়ফড়ানির চোটে পালিয়ে বাঁচলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ চড়ল।—আমি বোঝাতে যাব কেন—দু' বছর ধরে তুমি কি করলে? নাকি মায়ের মন বুঝে তলায় তলায় তাতেই সায় দেবার ইচ্ছে?

এবারে বাপী নির্লিপ্ত। গম্ভীরও।—নিজেকে নিয়ে বিভোর হয়ে না থাকলে মায়ের মন আমার থেকে তুমি ঢের আগেই বুঝতে পারতে।

ঊর্মিলার চোখে-মুখে সংশয়ের ছায়া।—তার মানে মা কি ভাবছে তুমি আগেই জানতে?

—তোমার মা ভাবাভাবির মধ্যে নেই। দু বছর ধরে তিনি নিজে যা চেয়েছেন তাই তোমাকে বলেছেন।

সোজা চেয়ে থেকে ঊর্মিলা সেই একই প্রশ্ন করল, তুমি তাহলে জানতে মা এই চায়?

—শুধু আমি কেন, অনেকে জানত। অত বড় একটা বিভ্রাটের পরেও তুমিই শুধু কিছু তলিয়ে দেখলে না বা ভাবলে না।

ঊর্মিলা এবারে বিমূঢ় খানিক। উতলাও।—কোন্ বিভ্রাটের পরেও আমি কিছু তলিয়ে দেখলাম না, ভাবলাম না? মা কি চায় সেটা তুমি ছাড়া আর কে জানত?

—রণজিৎ চালিহা জানত। রেশমা জানত। আবু রব্বানী জানত। তার বউ দুলারি জানত। তোমার মা এই চান জেনেই রণজিৎ চালিহার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল। তোমার মায়ের কাছে তাই আমার এ-মুখ বরাবরকার মতো পুড়িয়ে দেবার জন্য টাকা ঢেলে রেশমাকে সে অমন কুৎসিত ষড়যন্ত্রের মধ্যে টেনে নামাতে চেয়েছিল। এখন বুঝতে পারছ?

ঊর্মিলা হতভম্ব। চোখে পলক পড়ছে না।—কিন্তু সকলে তো জানে আংকল ইজ্জত খেয়েছে বলে রেশমা অমন ভয়ংকর প্রায়শ্চিত্ত করে তাকে আক্কেল দিয়ে গেল!

ঠাণ্ডা মুখে বাপী জবাব দিল, অত সহজে ইজ্জত খোয়াবার মতো ঠুন্‌কো মেয়ে নয় রেশমা। আমার ওপর আক্রোশে তার মাথার ঠিক ছিল না। সেই আক্রোশে চালিহার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তোমার মায়ের কাছে সেও আমার মুখ পুড়িয়েই দিতে চেয়েছিল। পরে অনুশোচনায় জ্বলেপুড়ে ঠাণ্ডা মাথায় ওই কাজ করেছে।

এক বছর পরে হলেও চোখের সামনে থেকে একটা হেঁয়ালির পর্দা সরেছে ঊর্মিলার। অস্ফুট বিস্ময়।—ওঃ! সেই জন্যেই সেই দিন নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে দুলারি তোমাকে ওই সব কথা বলেছিল!

বাপী নিরুত্তরে অন্যদিকে চেয়ে রইল।

পরের মুহূর্তে ঊর্মিলা আবার অসহিষ্ণু।—কিন্তু আমাকে তুমি কিছু বুঝতে দাওনি কেন? মায়ের মতলব জেনেও এতদিন তুমি চুপ করে ছিলে কেন?

—তাতে অশান্তি বাড়ত, মায়ের শরীর খারাপ হতো।

পায়ের নিচে থেকে নতুন করে আবার যেন মাটি সরছে ঊর্মিলার। অবুঝ ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, অশান্তি কমবে? মায়ের শরীর ভালো হবে? সব জেনে-বুঝেও কেন তুমি এতদিন ধরে তাকে এমন একটা অসম্ভব ইচ্ছে আঁকড়ে ধরে থাকতে দিলে?

নিরুপায় বলেই সঙ্গে সঙ্গে বাপীও তেতেই উঠল।—তোমার কি ধারণা? কেন দিলাম?

মেয়েটা থতমত খেল একপ্রস্ত। অবিশ্বাসের এক আচমকা যন্ত্রণা ভিতর থেকে ঠেলে উঠেছিল ঠিকই। ধমক খেয়ে ঠাণ্ডা। কিছু হাল্কাও। কিন্তু গোঁ ছাড়ার মেয়ে নয়। সমান মেজাজে জবাব দিল, আমার ধারণা তুমি একটা ভীতুর ডিম—তুমি একটা ওয়ার্থলেস। বিপদ জেনেও উটের মতো বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছ, এদিকে তোমার ওপর নির্ভর করে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি।

নিস্পৃহ মুখে বাপী বলল, তোমার মা-ও এখন ঠিক এই কারণে আমার ওপর বিরক্ত, দু'বছর ধরে তিনিও আমার ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন। এজন্য অনুযোগও করেছেন—

ফ্রেন্ডকে অবিশ্বাস করে না, করতে চায় না। কিন্তু ফের একথা শোনার পর চোখে সংশয়ের ছায়া দুলছেই একটু। মায়ের জন্যেই এ-ছেলের বেশি দরদ, বেশি দুর্ভাবনা।

—মা কি বলেছে?

—বলেছেন ব্যবসার চার-আনার অংশ ছেড়ে তিনি আরো ঢের বেশি দেবার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছেন—আমি নেবার জন্য তৈরি হতে পারছি না কেন, সব জেনেও কেন চোখ-কান বুঝে এভাবে দিন কাটাচ্ছি।

ঊর্মিলা চেয়ে আছে। এই লোকেরও ভিতর বোঝার দায় এখন। তাই নিজেকে সংযমে বাঁধার চেষ্টা।—এতটা শোনার পরেও মাকে তুমি কিছু বললে না? কিছু আভাস দিলে না?

—দিয়েছিলাম। সেই জন্যেই পার্টনার হ'তে আপত্তি করেছিলাম। তাইতে তিনি রেগে গিয়ে বলেছিলেন, তাঁর মেয়ের যদি শেষ পর্যন্ত আমাকে বাতিল করার মতো দুর্বুদ্ধি হয়, তাহলে চার-আনা ছেড়ে আট-আনার পার্টনার করে নেবার কথা ভাবতে হবে।

চেষ্টা করেও গলার স্বর খুব সংযত রাখা গেল না এবার।—আট-আনা ছেলে ষোলো-আনাই দিক না, কে তাকে ধরে রেখেছে?

বাপীর জবাবও এবারে প্রায় নির্মমগোছের ঠাণ্ডা।—তাও দিতে পারেন। শরীরের হাল তো ভালো নয়, তবে তাঁর ষোলো-আনাটা তোমাকে বাদ দিয়ে নয়।

ঊর্মিলার ঝকঝকে দু-চোখ বাপীর মুখের ওপর নড়ে-চড়ে স্থির আবার। গলার স্বরে তপ্ত ব্যঙ্গ।—তাহলে?

—তাহলে ঘরে গিয়ে এবারে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবোগে যাও। তোমার মা আমার কাছে কতখানি সেটা তোমার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে বলেই আমার সমস্যাটা দেখছ না—লোভের কলে পা দিলাম কিনা ভাবছ। তোমার মা হয়তো বেইমান নেমকহারাম ভাববেন আমাকে, তবু বরাবরকার মতো আমি এখান থেকে চলে গেলে তোমার সুবিধে হবে? নিশ্চিন্ত হতে পারবে?

ঊর্মিলা হকচকিয়ে গেল। গালে যেন ঠাস্ করে চড় পড়ল একটা। আর একই সংগে ওকে যেন একটা দম-বন্ধ-করা শূন্যতার গহ্বরে ঠেলে দেওয়া হল। ও নেই, বাপী নেই —মা একা। এ-চিত্র আর ভাবাই যায় না। ফলে চিরাচরিত রাগত মুখ।—আমি তোমাকে তাই বলেছি?

—বলেছ। সব কথা মুখে বলার দরকার হয় না।—সমস্যা দুজনেরই এক—এটুকু জেনে মাথা এখনই সব থেকে ঠাণ্ডা রাখা দরকার। বুঝলে?

পরের দিন-কতকের মধ্যে ঊর্মিলা মুখে আর কিছু বলল না বটে, কিন্তু মাথা যে খুব ঠাণ্ডা নেই, তাও স্পষ্ট। এতটা জানা আর বোঝার পরে ঘাবড়েছে বেশ। নিজের মা-টি কত শক্ত মেয়ে বিলক্ষণ জানে। কিন্তু বাপীকে তার থেকেও জোরালো ছেলে ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। এখন ভয়, মা-ই না উল্টে এই ছেলেকে ঘায়েল করে। তার মতি-গতি বদলে দেয়। দিলেও ওর নাগাল কেউ পাবে না বটে, কিন্তু এমন সংকটের মধ্যে কে পড়তে চায়। এই ছেলের প্রতি মায়ের এতটুকু টান দেখলে ভিতরে ভিতরে তেতে ওঠে এখন।

ওর মনের অবস্থাটা বাপী আঁচ করতে পারে।

কিন্তু বন্ধুকে আগের মতো মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেই চায় ঊর্মিলা। ভিতরে ভিতরে বিশ্বাস যে ভেঙেছে তাও নয়। তবু এরই মধ্যে সব সংশয় আর অস্থিরতা কাটিয়ে ওঠার মতোই কিছু চোখে পড়ল ঊর্মিলার।

নাকের ডগায় চশমা এঁটে মা কি-সব দরকারী কাগজপত্র দেখছিল। ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে বাপী তখনো খবরের কাগজ পড়ছিল। হঠাৎ এক জায়গায় বাপীর দু'চোখ আটকে গেল। ঊর্মিলা তারপর সেই আর একবারের মতোই স্থান-কাল ভুলে কাগজের খবরের ওপর ঝুঁকে পড়তে দেখল তাকে। চোখ দিয়ে পড়ছে না, মন দিয়ে স্নায়ু দিয়ে সত্তা দিয়ে

পড়ার মতো কিছু খবর যেন কাগজে আছে।

ঊর্মিলা লক্ষ্য করছে। সেই একবার কলকাতার প্লেগের খবর পড়ে যে-রকম বিবর্ণ মুখ দেখেছিল সে-রকম নয়। কিন্তু আত্মহারা মনোযোগটুকু সেই গোছের। খবরের কাগজ খুলেই এই ছেলে প্রথমে কলকাতার খবর খোঁজে, ঊর্মিলা তাও খেয়াল করেছে। ওর এখনো বদ্ধ ধারণা, ছেলেবেলার সঙ্গিনী এক মেয়ে তার মন জুড়ে আছে যার নাম মিষ্টি। সেবারে তো বলেই বসেছিল, কলকাতার প্লেগের খবর পড়ে মূর্ছা যেতে বসেছিলে কার ভাবনায় মশাই? আজও এই মুখ আর এই একাগ্র উন্মুখ মনোযোগ দেখেই ধরে নিল, সেই এক মেয়েকে মনে পড়ার মতো কাগজে খবর আছে কিছু।

নিঃশব্দে উঠে পিছনে এসে দাঁড়াল। ঠিক কোন্ খবরটার ওপর চোখ আটকে আছে ঠাওর করা গেল না। কিন্তু কোন্ জায়গাটা পড়ছে মোটামুটি আন্দাজ করা গেল।

একটু বাদে কাগজ রেখে বাপী আপিস ঘরে চলে এলো। নিজের তখনকার চেহারা আয়নায় দেখেনি। কিন্তু ঊর্মিলা দেখেছে।

দশ মিনিটের মধ্যে নবাব-নন্দিনীর মতো দু'হাত পিছনে করে ঊর্মিলা হাজির। গম্ভীর বটে, কিন্তু মুখ থেকে মেয়ের পরদা সরে গেছে।

—কলকাতার মিষ্টি নামে কোনো মেয়ে দু'বছর আগে বি-এ পাশ করেছিল?

হকচকিয়ে গিয়ে বাপী ওর দিকে চেয়ে রইল।

ঊর্মিলা জবাব যেন পেয়েই গেছে। আবার প্রশ্ন।—এবার তাহলে তার এম-এ পাশ করার কথা?

বাপী বোকার মতোই জিজ্ঞাসা করল, তুমি জানলে কি করে?

—তোমার মুখ দেখে। পিছনের হাত সামনে এলো। হাতে ভাঁজ করা খবরের কাগজ। ওটা সামনে ধরল। কলকাতা য়ুনিভার্সিটির এম-এ পরীক্ষার ফল বেরুনোর খবরটার চার পাশে লাল দাগ। বলল, মুখে রক্ত তুলে এমন দিশেহারা হয়ে পড়ার মতো আর কোনো খবর এ-জায়গায় দেখলাম না। তাই মনে হল, এটাই তোমার কাছে দুনিয়ার সেরা খবর।

ঊর্মিলা হাসছে। আগের মতো তাজা হাসি।

বাপী দেখছে। এই মেয়ে এখন নিজের আর ওর সমস্যাটা এক জেনে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে।

॥ পাঁচ ॥

গেজেটের পাতায় ছাপা নামগুলোর ওপর বাপী অনেক বার চোখ বুলিয়ে গেল। ব্যাপারখানা অপ্রত্যাশিত ধাক্কার মতোই। ইতিহাসে এম. এ-র সফল ছাত্রছাত্রীদের নামের মিছিল খুব লম্বা নয়। কিন্তু ফার্স্ট বা সেকেণ্ড কোনো ক্লাসে কোনো গ্রুপে যে-নাম খুঁজছে সেটা একেবারে নেই-ই! মালা আছে, মালঞ্চ আছে, মালবী আছে—নন্দী ছেড়ে কোনো মালবিকারও অস্তিত্ব নেই।

গেজেট ফেলে বাপী হাঁ খানিকক্ষণ। এমন একটা ধাক্কা খাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে বানারজুলি থেকে শিলিগুড়ি ছুটে আসেনি। আসতে আসতে বরং অন্য রকমের সম্ভাবনা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল।...মেয়ে বি. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পায়নি। প্রথম তিনজনের মধ্যেও জায়গা হয়নি। এম. এ-তে না বুঝে ছাড়বে না বাপী ধরেই নিয়েছিল। গাড়ি ছুটিয়ে আসার সময় বাপীর চিন্তায় এম. এ-র ফয়সালাটা ফার্স্ট ক্লাসের দিকে ঝুঁকছিল। আর সেই কারণে কেন যেন একটু অস্বস্তিও বোধ করছিল। সেটা ঠিক ঈর্ষা

বলে মানতে রাজি নয়। এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে বসলে নাগালের ফারাকটা আরো বেশি লম্বা মনে হবে বাপী তা-ও স্বীকার করে না। অস্বস্তির একটা যুৎসই কারণ নিজেই হাতড়ে বার করেছে। ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে বসলে মিষ্টির অনেকখানি হয়তো মালবিকা হয়ে যাবে।

...ফার্স্ট ক্লাস যদি পায়ই, বাপীর এবারের টেলিগ্রামের বয়ান কি হবে তা নিয়েও মাথা ঘামিয়েছিল। তারপর ঠিক করেছে, যে-ক্লাসই হোক, ওর কাছ থেকে এক শব্দের অভিনন্দন যাবে। ফিরেও আসবে তেমনি এক শব্দের ধন্যবাদ, জানা কথাই। কিন্তু ধন্যবাদের পর এবার সেই মেয়ে মালবিকা লিখবে না মিষ্টি লিখবে?

এত সব চিন্তা-ভাবনার পরে এই! নামই নেই! কি হল? কি হতে পারে?

হতে অনেক কিছুই পারে। পরীক্ষা দিয়েও কত ফেল করে। কিন্তু মনে মনে মাথা ঝাঁকিয়েই বাপী সেই সম্ভাবনা বাতিল করে দিল। ফেল করার মেয়ে নয়। পরীক্ষার পড়া পছন্দমতো না হলেও অনেক ভালো ছেলে-মেয়ের ড্রপ করার ভূত চাপে মাথায়। সেটা বরং হতে পারে। এছাড়া আর এক সম্ভাবনার কথা মনে আসতেই ভিতরে গনগনে আগুনের ছেঁকা।

'...বি. এ, এম. এ. পাশ করা দূরে থাক, ওই মেয়েকে ম্যাট্রিকও পাশ করতে হবে না বলে দিলাম।'

এক যুগেরও আগের সবজান্তা আবু ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিল। ফকির-জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বচনের জবাবে মিষ্টির সম্পর্কে আবু এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল।

তার যুক্তিও কম যুৎসই নয়।—এই বয়সেই চেহারাখানা দেখছিস না মেয়েটার, ষোল-সতের বছরের ডবকা বয়সে এই মেয়ের চেহারাখানা কেমন হতে পারে চোখ বুজে ভেবে দেখ দিকি? তারপর আবু ব্যাখ্যা শুনিয়েছিল।—'সেই বয়সে কোনো না কোনো বড় লোকের ছেলের চোখ পড়বেই ওর ওপর। বিয়ে করে ঘরে এনে পুরবে তারপর লুটে-পুটে শেষ করবে—বি. এ, এম. এ. পাশের ফুরসৎ মিলবে কোত্থেকে?

...তবু বি, এ, পাশ করা পর্যন্ত অন্তত ফুরসৎ মিলেছিল। কিন্তু তার পরেও বাপী নিশ্চিন্ত ছিল কোন্ ভরসায়? একটানা আরো দুটো বছর ওই সম্ভাবনাটা ছেঁটে দিয়ে বসে ছিল কি করে? দু বছর আগে অভিনন্দনের জবাবী টেলিগ্রামে 'মালবিকা'র বদলে মিষ্টি লিখেছিল বলে?

...পীর ফকির ওর মা-কে অন্ন দেখে ঘি আর পাত্র দেখে ঝি দেবার শ্লোক বলেছিল। ওই মেয়ে কোন পাত্রের খপ্পরে পড়ে আছে সেটা নিজের চোখে দেখে আসেনি? দু'বছর আগে বি. এ-র রেজাল্ট দেখে ঘটা করে টেলিগ্রাম না পাঠিয়ে নিজেই কলকাতায় ছুটে গেল না কেন? যা-হোক কিছু হেস্তনেস্ত করে এলো না কেন? গায়ত্রী রাইয়ের দৌলতে দু'বছর আগেই তো ভাগ্যের চাকা বেশ জোর তালে ঘুরতে শুরু করেছিল। তারপরেও দিবাস্বপ্নে দিন কাটিয়ে দিল কেন? বাপী কি ভেবেছিল ভাগ্যের একেবারে চূড়ায় উঠে বসতে না পারা পর্যন্ত ছুম্পরফোঁড়া কোনো মন্ত্রের জোরে সেই মেয়ে তার জন্য হাঁ করে বসে থাকবে?

নিজের বয়েস এখন ছাব্বিশের প্রায় ওধারে। মিষ্টির তাহলে বাইশ তো বটেই। টানা বারো বছরের মধ্যে চার বছর আগে মাত্র দুটো দিন বাপীকে দেখেছে, চিনেছে। তা সত্ত্বেও ওই মেয়ের জগতে নিজেকে এক অমোঘ দুর্বার পুরুষ ঠাওরে বাপী একে একে দুটো বছর পার করে দিল!

এই আবেগের গালে ঠাস ঠাস করে গোটাকয়েক চড় বসালো বাপী। তাইতেই একটা সংকল্পের শর জ্যা-মুক্ত হয়ে ঠিকরে বেরুলো।

কলকাতায় যাবে।

কিন্তু যাবে ঠিক করলেই পাঁচ-সাত-দশ দিনের জন্য কোথাও বেরিয়ে পড়া আগের মতো অতটা সহজ হয় না এখন। এক বছর আগেও ব্যবসা বাড়ানোটাই বোধ হয় গায়ত্রী রাইয়ের জীবনের সব থেকে বড় লক্ষ্য ছিল। সেই উৎসাহে একটু একটু করে ভাঁটা পড়ছে বাপী সেটা অনুভব করতে পারে। দেহ নিয়ে মহিলার শান্তি নেই খুব, সেটাই হয়তো বড় কারণ। কিন্তু অশান্তির কথা মুখ ফুটে বড় একটা বলে না। বরং বেশির ভাগ সময় চাপা দিতে চেষ্টা করে। জিগ্যেস করলে বলে, ভালো আছি। আবার বেশি জিগ্যেস করলে বিরক্ত। ভালো আছি, এই জোরের ওপর থাকার চেষ্টা। কেমন ভালো আছে বা কতটা ভালো আছে বাপী তা বুঝতে পারে। ওর এই বুঝতে পারার আবেগের দিকটা খুব চাপা।

গায়ত্রী রাইয়ের প্ল্যান মতোই ব্যবসার সাজ বদল হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার এমন কি উত্তর বাংলারও বিশেষ বিশেষ জায়গায় মোটা মাইনের অভিজ্ঞ ম্যানেজার বহাল করা হয়েছে। সকলের মাথার ওপর জেনারেল ম্যানেজার ও পার্টনার বাপী তরফদার। ফলে বাপীর লম্বা লম্বা টুর প্রোগ্রামের ছাঁটকাট বাড়ছে। পাঁচ-সাত দিনের জন্য কোথাও বেরুতে চাইলেও গায়ত্রী রাই ভুরু কোঁচকায়!—এত লোকজন থাকতে তোমাকে এতদিনের জন্য গিয়ে বসে থাকতে হবে কেন? ফোনে খবর নেবে, ইনস্ট্রাকশন দেবে, তারপরও ইন্সপেক্‌শনের জন্যে যেতে হয় তো একদিন-দুদিনের জন্য এয়ারে যাবে আসবে।

বাপীকে তাই করতে হয়। কর্ত্রীর হুকুম এখনও হুকুমই। কোম্পানির খরচে তেল পুড়িয়ে বাদশা ড্রাইভার তাকে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে ছেড়ে দিয়ে আসে বা সেখান থেকে নিয়ে আসে। ট্রেনের চার-পাঁচ গুণ খরচা করে এরোপ্লেনের টিকিট কেটে রাতারাতি বা একদিন-দুদিনের মধ্যে বাপীকে কাজ সেরে ফিরে আসতে হয়। কোনো কারণে ফিরতে দেরি হলে মহিলা খুব একটা জেরা করে না কিন্তু মায়ের চোখের আড়ালে মেয়ে এসে ধমকাতে ছাড়ে না। দেরি হতে পারে বুঝলে বলে যেতে পারো না বা ফোনে জানাতে পারো না? মুখ বুজে মায়ের ছটফটানি দেখলে আমার ভয় ধরে যায় বলেছি না তোমাকে?

এই ধমক কানের ভেতর দিয়ে যেখানে গিয়ে পৌঁছায় তার স্বাদ আলাদা। মহিলার এই নিরুত্তাপ নির্ভরতা বাপীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। এই বাঁধনটুকু বড় লোভনীয়। কোনো স্বার্থের দাঁড়িপাল্লায় এর ওজন হয় না।

দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে রাতে খাবার টেবিলে বাপী সেদিন গম্ভীর মুখেই প্রস্তাব পেশ করল।- একবার কলকাতা যাওয়া দরকার।

খাওয়া ছেড়ে ঊর্মিলা বাপীর মুখখানা দ্রষ্টব্য ভাবছে। পশ্চিমবাংলা অর্থাৎ কলকাতা যে এ-ব্যাসাব স্বর্গভূমি, গায়ত্রী রাই সেটা কারো থেকে কম জানে না। এক বছর আগের প্ল্যানেও কলকাতার বাজার বড় লক্ষ্য ছিল তার। তখন যাচাইয়ের তাগিদও বাপীকে দিয়েছে। কিন্তু সেই আগ্রহের ছিটেফোঁটাও নেই এখন। নিস্পৃহ মুখে জিগ্যেস করল, কেন?

দেখেশুনে আসি . ।

এই কথায় প্রস্তাব নাকচ করে দিল।—যেতে হবে না। নিজে কিছু দেখতে-শুনতে পারছি না, আর বাড়িয়ে কাজ নেই। একা কত দিক সামলাবে—

ব্যবসার স্বার্থ দেখিয়েই বাপী জোর করতে পারত। বাগডোগরা থেকে আকাশে উড়লে কলকাতা পঞ্চাশ মিনিটের তো পথ মাত্র। কিছুই বলা গেল না ঊর্মিলার জন্য। ওর ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ঝুলছে। চোখে দুষ্টুমি চিকচিক করছে।

পরে হালকা ভ্রূকুটি করে বলেছে, হঠাৎ কলকাতা যাবার তাগিদ কেন আমাকে খোলা-

খুলি বললে মায়ের কাছে একটু তদবির-টদবির করি—

বাপী গম্ভীর।—নিজের স্বার্থেই বলতে পারো।

অর্থাৎ, বাপীর কলকাতা যাওয়ার সঙ্গে ওরও নিষ্কৃতি লাভের যোগ। কিন্তু ওর কথা সাদা অর্থেও এমন লেগে যাবে যে সেটা কারো কল্পনার মধ্যে ছিল না। পরের তিন সপ্তাহের মাথায় ঊর্মিলার হৃদয়জগতে এমনি তোলপাড় কাণ্ড ঘটে গেল যে বাপীকে কলকাতা পাঠানোর জন্য ও নিজেই উন্মুখ।

এক সকালের দিকে নিজের ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে বাপী দূরের ধূসর পাহাড়টার দিকে চেয়ে ছিল। পাহাড়টা খুব দূরে নয়, কিন্তু সকালের হালকা কুয়াশার দরুন দেখাচ্ছে অনেক দূরে। ওই রকমই কিছু একটা স্থির লক্ষ্য বাপীর, কিন্তু ভিতরের অস্থিরতার দরুন যেন ওটাও ঝাপসা আর নাগালের বাইরে।...জঙ্গলের নাংগা ফকির বলেছিল, আগে বাড়লে পেয়ে যাবে। বাপী থেমে থাকেনি, সামনে এগিয়েছে। অনেক পেয়েছে। অনেক পাচ্ছেও। কিন্তু এই পাওয়াই শেষ লক্ষ্য হলে ভেতরটা সুস্থির থাকত, সামনেটা এত ঝাপসা দেখত না। বিত্ত বৈভব নিশ্চয় চেয়েছিল। কিন্তু সব চাওয়ার মূলে এক মেয়ে। সব থেকে বেশি চেয়েছিল সেই মেয়েকে। এই চাওয়ার সঙ্গে এখনো কোনো আপোস নেই। কিন্তু এই ব্যাপারে বাপী কতটা সামনে এগিয়েছে? কতটা আগে বেড়েছে?

ভিতরের একটা অসহিষ্ণু তাপ ঠেলে মাথার দিকে উঠতে লাগল। গায়ত্রী রাইকে যা-হোক কিছু বলে বা বুঝিয়ে দুই একদিনের মধ্যেই কলকাতা যাবে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর না।

নিজের ভাবনায় ছেদ পড়ল। সদর রাস্তা ছেড়ে ঊর্মিলা হনহন করে এই পিছনের মাঠ ভেঙে এদিকে আসছে। হাঁপাচ্ছে বেশ! বাপীর তক্ষুনি মনে হল, নিশ্চয় ডাটা-বাবুর ক্লাবে গেছল। সেখান থেকে কিছু সংগ্রহ করে বাতাস সাঁতারে ওর কাছে আসছে। পিছন দিক দিয়ে ঘুরে আসার একটাই অর্থ। মায়ের চোখে পড়তে চায় না। বাপীকে জানলায় দেখে থমকে দাঁড়াল একটু। ফিক করে হেসে ফেলল। লালচে মুখ। তারপর ছোট মেয়ের মতোই ছুট্।

জানালা ছেড়ে বাপী সামনের বারান্দার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। শব্দ না করে গেট ঠেলে ঊর্মিলা লঘুছন্দের দ্রুততালে বারান্দায় উঠে এলো। মেয়ের মুখের এমন গোলাপী কারুকার্য দেখলে তার মায়েরও বড় রকমের সন্দেহ কিছু হতই। চোখে মুখে গালে ঠোঁটে খুশির বন্যা। উত্তেজনাও।

বাপী গম্ভীর।—বিজয় মেহেরা কবে ফিরছে?

হিসেবমতো আর মাস-খানেকের মধ্যে ফেরার কথা বিজয় মেহেরার। সেই সম্পর্কে পাকা খবর কিছু এসেছে বাপী নিঃসংশয়।

ঊর্মিলা থমকে দাঁড়াল। তারপর যা করল, এই উত্তেজনার মুহূর্তে ওর কাছে সেটা সংকোচের ব্যাপার কিছুই নয়। খুব কাছে এসে দু'হাতে বুকে একটা ধাক্কা মেরে আগে বাপীকে দরজার কাছ থেকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। বাপী পড়তে পড়তে সামলে নিল। ততক্ষণে ঊর্মিলাও ঘরের মধ্যে। আনন্দ আর বিস্ময়ের ধকলে দু'চোখ কপালের দিকে।—আর কবে-টবে নয়, বাবুর ফেরা সারা।

শুনে বাপীরও হঠাৎ ফাঁপরে পড়ার দাখিল।—সে কি। কবে? কোথায় আছে?

বলতে গিয়েও ঊর্মিলা থমকালো। লালচে মুখের ওপর আর এক প্রস্থ লালের ছোপ। গরম জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে চিঠিটা বার করে ওর সামনে ধরল।—পাজী ছেলের দু'চারটে দুষ্টুমির কথাটথা আছে, কিন্তু তোমার কাছে আবার লজ্জা কি—পড়ে দেখো কি কাণ্ড!

বাপী গম্ভীর আবার। দু'হাতে দুটো কাঁধে চাপ দিয়ে ওকে চেয়ারে বসিয়ে দিল। টেবিলের ছোট আয়নাটা তুলে মুখের সামনে ধরল।

ঊর্মিলা হকচকিয়ে গেল একটু।—কি?

—গাল দুটো ফেটে এবারে খুশির রক্ত বেরুবে মনে হচ্ছে। আয়না যথাস্থানে রেখে মুখোমুখি খাটে বসল।—আমার পড়ে কাজ নেই, তুমি বলো।

যা শুনল, যে-কোনো মেয়ের মায়ের কাছে সেটা লোভনীয় হবার কথা। আরো তিন মাস আগে ওখানকার হায়ার কোর্স-এ বিজয় মেহেরা ভালো ভাবে উতরে গেছে সে-খবর আগেই এসেছিল। বুক ঠুকে সেখানকার এক মস্ত সংস্থায় ইণ্টারভিউ দিয়েছিল। বম্বে আর কলকাতায় তাদের বিরাট শাখা। সেখান থেকে হোম-অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট নিয়ে কলকাতায় উড়ে এসেছে সে। ও-ভাবে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট নিয়ে আসতে পারার ফলে খাস সায়েবদের গ্রেডে মাইনে, তাদের মতোই আনুষঙ্গিক সব সুযোগ-সুবিধে। এছাড়া দু'-বছরে একবার করে সপরিবারে হোমে ফেরার বা বাইরে বেড়ানোর ছুটি আর যাবতীয় খরচ-খরচা পাবে। কলকাতায় পা দিয়েই তাকে কাজে জয়েন করতে হয়েছে, আর শুরুতেই কাজের চাপ এত যে এয়ারে বাগডোগরা এসে ঊর্মিলার সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়ারও ফুরসৎ মিলছে না। এবারে বিয়ের তাগিদ। আর সবুর করার ধৈর্য নেই। সব ব্যবস্থা পাকা করে তাকে জানালেই সে ছুটির ব্যবস্থা করবে আর দেশে তার বাবা-মা-কেও চিঠি লিখে চলে আসতে বলবে।

ঊর্মিলা জিগ্যেস করল, এবারে?

সংকটই বটে। বাপী জবাব দিল, তাই তো ভাবছি...।

সঙ্গে সঙ্গে ঊর্মিলার সেই অবুঝ মেজাজ।—দু'বছরের ওপর তো বসে বসে শুধু ভাবলেই। এখন আর ভাবার সময় আছে?

বাপীর একটুও রাগ হল না। এই উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠা দেখে বরং মায়া হচ্ছে। ভালও লাগছে। প্রেমের গাছে ফোটা একখানা সুন্দর ফুলের মতো মুখ ঊর্মিলার। সফল হবার বাসনায় অধীর, উন্মুখ। নিজের অদৃষ্টে যা-ই থাক, বাপীরও উদার হবার ইচ্ছে। চোখে চোখ রেখে মুচকি হাসল। জবাব দিল, একেবারেই নেই মনে হচ্ছে।

ঊর্মিলা আবারও মুখ-ঝাপটা দিল বটে কিন্তু অখুশি নয়।—এখনো যদি তোমার কানে জল না ঢোকে তাহলে এবারে আমি ঠিক এখান থেকে সটকান দেব বলে দিলাম!

—কোথায়, কলকাতায়?

আবার কোথায়। মুখের কথা খসার আগেই মনে পড়ল কিছু। উৎসাহের ঝোঁকে বসার চেয়ারটা আরো এক হাত কাছে টেনে আনার ফলে দুজনের হাঁটুর মাঝে চার আঙুলেরও কম ফারাক। সামনে ঝুঁকল।—এই! তুমি তো কলকাতা যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলে, কালই চলে যাও না? যাবে?

-তোমার মা-কে কে রাজি করাবে, তুমি?

—আমি কেন, ব্যবসার কথা বলবে না, বলবে নিজের খুব দরকারী কাজে যাচ্ছ। তুমি চলে যাবার পর মা-কে যা বলার আমি সাফসুফ বলে দেব।

—সাফসুফ কি বলে দেবে?

—যা সত্যি তাই। মিষ্টি নামে এক মেয়ে ছেলেবেলা থেকে তোমার মন কেড়ে রেখেছে—তার সম্পর্কে কিছু খবর পেয়ে তুমি ছুটে চলে গেছ। ব্যস, এই এক চালে মা মাৎ। যাবে?

বাপী চেয়ে রইল খানিক।—ঠিক আছে। যাব।

এত সুবোধ এই ছেলে নয়।—সত্যি বলছ?

—হ্যাঁ, তবে আমি ভেবেছিলাম বিজয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য যেতে বলছ।

ঊর্মিলা কলে পড়ছে বুঝতে পারছে।—বা রে, তার সঙ্গে দেখা তো করতেই হবে, তা না হলে তোমাকে যেতে বলব কেন।

বাপীর নীরস মুখ, গলার স্বরেও তপ্ত ব্যঙ্গ ঝরল।—নিজের স্বার্থ ষোল আনা বজায় রেখে আমাকে গরম তেলের কড়ায় ফেলে মা-কে তুমি মাৎ করতে চাও, এটুকু বুঝতে আমার খুব অসুবিধে হয়নি।

ঊর্মিলা অপ্রস্তুত একটু। তাই চড়া গলা।—তোমার অত ভয়টা কিসের? মায়ের ছেলে নেই, তুমি গুটিগুটি দিব্বি ছেলের জায়গাটি জুড়ে বসেছো এখন—আমাকে ছাড়া যদিও চলে, তোমাকে ছাড়া আর তার চলেই না—সাহস করে সত্যি কথাটা বলে দিলে মা তোমার কি করবে?

একটা নরম জায়গায় মোচড় পড়ল। ঊর্মিলার কথাগুলো সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করার মতো। এটুকুর প্রতি বাপীর কত যে লোভ শুধু সে-ই জানে। ঊর্মিলা জোরের কথা বলছে, কিন্তু এটুকু হারাবার ভয়ও যে কত, ওর কোনো ধারণা নেই।

শিরে সংক্রান্তি। ভয় ছেড়ে বাপী জোরের দিকটাই আঁকড়ে ধরল। রাতে খাবার টেবিলে গম্ভীর। ঊর্মিলার মুখেও কোনো কথা নেই। এমন চুপচাপ ভাবটা খুব স্বাভাবিক ঠেকল না গায়ত্রী রাইয়ের চোখে। একজনের ঝাঁঝ দেখে আর অন্যজনের টিপ্পনী শুনে অভ্যস্ত। থেকে থেকে দুজনকেই লক্ষ্য করল। কিন্তু জিগ্যেস করল না।

খাওয়াব পরে গায়ত্রী রাই আগে ব্যবসার কোনো ফাইল-টাইল খুলে বসত, নয়তো দরকারী চিঠিপত্র লিখত। এ-কাজ অনেকদিন ছেড়েছে। এখন ঘুম না আসা পর্যন্ত বই-টই পড়ে। বিছানায় আধশোয়া হয়ে পাশ থেকে বইটা টেনে নেবার আগেই বাপী ঘরে ঢুকল। হাতের বই রেখে গায়ত্রী রাই আবার সোজা হয়ে বসল। অপ্রিয় কিছু শোনার আশঙ্কা।

বাপীর তেমনি ঠাণ্ডা মুখ।—কাল আমি একবার কলকাতা যাচ্ছি।

বক্তব্য শুনে স্বস্তি একটু। বিস্ময়ও। খানিক চেয়ে থেকে জিগ্যেস করল, কি ব্যাপার?

জবাব দেবার আগে বাপী দরজার দিকে ঘুরে তাকালো একবার। কেউ নেই। ঘরে ঢোকার সময় ঊর্মিলা দেখেছে। কোথাও থেকে আড়ি পেতে শুনছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাপী সোজাসুজি বলল, বিজয় মেহেরা লণ্ডন থেকে ফিরেছে। যতটা আশা করেছিল তার থেকেও বড় হয়ে ফিরেছে, কলকাতায় বড় চাকরি নিয়ে এসেছে। একবার গিয়ে দেখেশুনে বুঝে আসা দরকার।

আচমকা প্রচণ্ড একটা ঘা খেলে যেমন হয় প্রথমে সেই মুখ গায়ত্রী রাইয়ের। বিবর্ণ, সাদা। সেই সাদার ওপর রাগের লালচে আভা ছড়াতে লাগল। গলার স্বর অনুচ্চ তীক্ষ্ন।—কে বিজয় মেহেরা? সে কত বড় হয়েছে বা কত বড় চাকরি নিয়ে এসেছে তা দিয়ে আমার কি দরকার?

কোনরকম উচ্ছ্বাসের ছিটেফোঁটাও নেই বলেই বাপীর জবাবটা জোরদার শোনালো আরো। বলল, দরকার আছে। দু-তিনদিনের মধ্যে ফিরে এসে আপনাকে বলব। আপনাকে শুধু বিশ্বাস করতে হবে, আপনার বা ডলির কোনরকম ক্ষতির মধ্যে আমি যাব না—যেতে পারি না। উতলা হয়ে শরীর খারাপ করবেন না, বা আমি ফিরে আসার আগে এ নিয়ে ডলির সঙ্গে একটি কথাও বলবেন না।

গায়ত্রী রাই নির্বাক। চেয়ে আছে। এ-ছেলেকে বিশ্বাস করতে না পারলে পায়ের নিচে মাটি থাকে না। এ-কথা শোনার পর কিছুটা নিশ্চিন্ত। কিছুটা আশ্বস্ত। অশান্তি যা-কিছু তার সবটাই নিজের মেয়েকে নিয়ে, এই ছেলেকে নিয়ে নয় এ-বিশ্বাসও অটুট।

কলকাতায় যাতায়াতটা মেয়েকে ঠাণ্ডা করার জন্য বা অন্য কোনোরকম বোঝাপড়া করার জন্য ধরে নিয়ে আর জেরাও করল না।

বাপী বেরিয়ে এলো। সামনের বারান্দায় ঊর্মিলা দাঁড়িয়ে। রাগত মুখ। বন্ধুর ঘাড়ে দায় চাপিয়ে কিছুটা নিষ্কৃতি পাবে ভেবেছিল, উল্টে সব দায় কিনা ওর নিজের ঘাড়ে চাপল। রাগ হবারই কথা।

কিন্তু বাপীর গাম্ভীর্যে ফাটল নেই এখনো। বলল, বিজয়ের আপিস আর বাড়ির ঠিকানা লিখে কোয়েলাকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও। ভালো যদি চাও তোমার মায়ের সঙ্গে এ নিয়ে একটি কথাও বলবে না, তিনি যেন ভাবেন তুমি কিছু জানোই না। আর তাঁর শরীরের দিকে চোখ রাখবে।

বিকেল চারটের ফ্লাইট। মোটরে বানারজুলি থেকে বাগডোগরা দেড় ঘণ্টার পথ। বাদশার হাতে স্টিয়ারিং থাকলে সোয়া ঘণ্টার বেশি লাগে না। কিন্তু বাপী দেড়টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ার জন্য ব্যস্ত।

ঊর্মিলা ঘরের ভিতর। তার মা বারান্দায়। এই বাংলোর ফটকে বাদশা গাড়ি নিয়ে তৈরি।

গায়ত্রী রাই বলল, যাচ্ছ যখন দু'চার দিন বেশি থেকে কলকাতার বাজারটাও দেখে আসতে পারো।

এ-রকম কথা বাপী শিগগীর শোনেনি। ফিরতে দেরি হবার সম্ভাবনার কথা শুনলেই বেজার মুখ দেখেছে।

—টাকা যথেষ্ট নিয়েছ?

—হ্যাঁ, সে-জন্যে ভাববেন না।

তবু যদি দরকার হয় হোটেলের ঠিকানা দিয়ে টেলিগ্রাম কোরো। ঘরেই অনেক টাকা মজুত আছে তেমন দরকার বুঝলে আবু রব্বানী এরোপ্লেনে করে গিয়ে দিয়ে আসবে।

দুয়ে দুয়ে চার যোগ হল এবার। কলকাতার বাজার দেখার জন্য দু'চার দিন বেশি দেরি হলে আপত্তি নেই, তার মানে, যে-ফয়সলার জন্য যাচ্ছে তাতে আরো বেশি সময় লাগলে লাগবে। আর নিষ্পত্তিটা শেষ পর্যন্ত যদি মোটা টাকার টোপ ফেলে করতে হয় তাতেও কোনো অসুবিধে নেই।

হন্তদন্ত হয়ে বাংলো থেকে নেমে বাপী গাড়ীতে উঠে বাঁচল. এই একজনকে কোন রকম ভাঁওতার মধ্যে রাখতে চায় না। অথচ নিরুপায়।

এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে একটা সোফায় গা ছেড়ে দিয়ে বসল বাপী। প্লেন ছাড়তে ঢের দেরি এখনো। সোফায় মাথা রেখে চোখ বুজে পড়ে রইল খানিক। স্নায়ুর ওপর দিয়ে একটানা ধকল যাচ্ছে। চার বছর বাদে আবার সেই কলকাতায় উড়ে চলল বটে, কিন্তু ভিতরটা তার ঢের আগে থেকে অনির্দিষ্টের মতো উড়ে চলেছে। কোথাও ঠাঁই খুঁজে পাচ্ছে না। ঊর্মিলার সমস্যার নিষ্পত্তি কোথায় জানে না। নিজের তো জানেই না।

মাইকে একটা ঘোষণা শুরু হতে বাপী মাথা তুলে সোজা হয়ে বসল। না, কলকাতার ফ্লাইট সম্পর্কে কিছু নয়। ঘাড় ফেরাতে গিয়ে বাপী বড়সড় ঝাঁকুনি খেল একপ্রস্থ। ঠিক দেখছে, না ভুল দেখছে?

পাশের দিকের পনের বিশ হাত দূরে আর একটা সোফায় একটি মেয়ে বসে। বছর বাইশ-তেইশ হবে বয়েস। দীর্ঘাঙ্গী, ফর্সা। নাকে জেল্লা-ঠিকরনো সাদা পাথরের ফুল। সোজা হয়ে বসে ওকেই দেখছে, ওর দিকেই অপলক চেয়ে আছে।

নাকের এই ঝকঝকে ফুল দেখেই বাপী চিনেছে। ড্রইং-মাস্টার ললিত ভড়ের মেয়ে

কুমকুম। চার বছর আগে বানারজুলিতে ডাটাবাবুর ক্লাবে দেখেছিল। তারপর এই দেখল। চেহারা বদলায়নি তেমন। দোহারা কাঠামো একটু ভারির দিকে ঘেঁষেছে। আর একটু ফর্সা লাগছে। হাতে আগের মতো একগাদা কালো চুড়ি নেই। এক হাতে একটি শৌখিন ঘড়ি। অন্য হাতে সরু রুলি একগাছা। তাইতে বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। পরনে আকাশী রঙের সিল্কের শাড়ি।

সঙ্কোচ কাটিয়ে কুমকুমই উঠল। ঠোঁটের ফাঁকে বিব্রত হাসির রেখা। কাছে এসে বলল, এবারে চিনতে পেরেছ তাহলে বাপীদা!

বাপী মাথা নাড়ল, চিনেছে।

—আমি সেই থেকে তোমাকে দেখছিলাম...ভরসা করে সামনে আসতে পারছিলাম না।...বসব?

বাপী মাথা নাড়তে সামনের সোফাটাতে বসল। আজ বোধ হয় ভয় করার মতো সংগে কেউ নেই। সহজ খুশি-খুশি মুখ। কিন্তু সামনে বসার পর এই খুশি ভাবটা অকৃত্রিম মনে হল না বাপীর। তবে মেয়েটার শ্রী এ ক'বছরে ফিরেছে।

বাপী উল্টে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে কেন জানে না। জিগ্যেস করল, কেমন আছ?

হালকা জবাব দিল।—ভালো থাকতে তো চেষ্টা করছি খুব। ভালো দেখছ?

—ভালোই তো। ব্রীজমোহনের খবর কি?

ভুরুর মাঝে ভাঁজ পড়ল একটু।—এতদিন বাদেও ওই নাম মনে আছে তোমার! ভালোই আছে বোধ হয়, অনেককাল দেখিনি।

বাপীর কিছু জানতে বুঝতে বাকি নেই এটা ধরেই নিয়েছে। নইলে গোপনতার আশ্রয় নিত। একটা তিক্ত অনুভূতি ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে বাপীর। এ ক'বছরে আরো কত ব্রীজমোহন এই মেয়ের জীবনে এসেছে গেছে জানার কোনো কৌতূহল নেই।

একটু সামনে ঝুঁকে কুমকুম সাগ্রহে জিগ্যেস করল তুমি কলকাতা যাচ্ছ বাপীদা?

—হ্যাঁ।...তুমি কোথায়?

জবাব দেবার আগে কুমকুম আর এক প্রস্থ দেখে নিল তাকে। ওরা প্রাচুর্যের গন্ধ পায় বোধ হয়। কার কেমন দিন চলছে মুখ দেখেই বুঝতে পারে হয়তো। কিন্তু জবাব শুনে বাপী অবাকই একটু।

—আমি আজ দু'মাস ধরে কলকাতা যেতে চেষ্টা করছি। হচ্ছে না। বোধগম্য হল না বুঝে কুমকুম অনায়াসে বলে গেল, এখানকার অফিসারদের সপরিবারে হাওয়া-জাহাজে যাতায়াত করতে পয়সা লাগে না—একজন আমাকে কথা দিয়েছে নিয়ে যাবে। কিন্তু কিছুতে তার সময় হচ্ছে না, আমি মাসে মাসে খবর নিতে বা তাগিদ দিতে আসি এখানে।

শোনামাত্র বাপীরই কান গরম। একজন ওকে পরিবার সাজিয়ে বিনা পয়সায় কলকাতায় নিয়ে যাবে সেই আশায় দু'মাস ধরে এখানে ধর্ণা দিচ্ছে। বিনিময়ে ওকে কি দিতে হচ্ছে বা হবে ভাবতে ভিতরটা রি-রি করে উঠল। কিন্তু সেই চার বছর আগের মতোই মেয়েটার দু'চোখ চিকচিক করছে। গলার স্বরেও অদ্ভুত অনুনয়।—আমাকে একবারটি কলকাতায় নিয়ে যাবে বাপীদা? আমার যাওয়া খুব দরকার।

বাপী কিছু ভোলে না। চার বছর আগেও ব্যগ্র মুখে এই মেয়ে জিগ্যেস করেছিল কলকাতা কেমন জায়গা বাপীদা?

মুখে কঠিন আঁচড় পড়তে লাগল বাপীর। চাউনিটাও সদয় নয়। হাতের চকচকে ঘড়ি আর রুলির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে আবার ওর দিকে তাকাতেই কুমকুম বলে উঠল, এটা খেলনা ঘড়ি বাপীদা, পাঁচ টাকাও দাম নয়, আর এই গয়নাও সোনার নয়,

গিল্টি করা—সত্যি বলছি বাপীদা, নিজে যেতে পারলে আমি কারো আশায় বসে থাকতাম না—আমার যাওয়া খুব দরকার।

নীরস স্বরে বাপী জিগ্যেস করল, কেন দরকার?

ঢোক গিলে কুমকুম জবাব দিল, আমার ধারণা কলকাতায় গেলে বাবার সংগে দেখা হবে।

বাপীর একটুও বিশ্বাস হল না। আরো রুক্ষ স্বরে বলল, কলকাতা সোনার শহর, কোনরকমে গিয়ে একবার সেখানে পা ফেলতে পারলেই আর ভাবনা নেই—কেমন?

চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে তিরস্কারটুকু মেনেই নিল যেন। কাতর স্বরে বলল ভাবনা তো ছায়ার মতো আমার সংগে ফেরে বাপীদা, তার থেকে রেহাই পাব কি করে। ...সকলেই আমাকে ঘৃণা করে, তুমি চেনো বলে তোমার ঘেন্না আরো বেশি বোধ হয়। কিন্তু বাপীদা, যা-ই হই, আমি তোমার সেই মাস্টারমশায়ের মেয়ে—এইজন্যেও কি তুমি আমাকে একটু দয়া করতে পারো না?

বুকের তলায় উল্টো মোচড় পড়ল। যে মুখখানা চোখে ভাসল আশ্চর্য সেই মুখ আজও তেমনি কাছের। বাপী ভাবল একটু, তারপর ঠাণ্ডা গলায় জিগ্যেস করল, কাজ পেলে করবে?

অবাক হবার মতোই প্রশ্ন যেন। কি কাজ?

—যে কাজ করছ তার থেকে অনেক ভালো। নিজের জোরে নিজেকে চালাবে, কারো লোভ বা দয়ার অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে না। করবে?

এমন প্রস্তাবও কেউ দিতে পারে মেয়েটা ভাবতে পারে না। নিজের অগোচরেই সামান্য মাথা নাড়ল। করবে।

ব্যাগ থেকে একটা ছাপানো কার্ড বার করে বাপী ওর হাতে দিল।—আট-দশদিন বাদে বানারজুলিতে এসে আমার সংগে দেখা করবে।

বসে আরো দশ-পনের মিনিট কথা বলার মতো সময় ছিল হাতে কিন্তু বাপী উঠে পড়ল। আর ফিরেও তাকালো না। ঝোঁকের বশে কাজটা ভালো করল, কি মন্দ করল জানে না বলেই নিজের ওপর অসহিষ্ণু। আসে যদি রেশমার জায়গায় বসিয়ে দিতে পারবে।... রেশমার সংগে এই মেয়ের কোনো তুলনাই হয় না। রেশমা দু'জন হয় না। ওর কথা মনে হলে একটা ব্যথা হাড়ে-পাঁজরে টনটন করে বাজে। বুকের ভিতরে বাতাসের অভাব মনে হয়। না, রেশমার মতো আর কেউ আসবে না, আসতে পারে না। চৌকস মেয়ে দুই একজন দরকার। কুমকুম আসে তো আসবে। এতটুকু বেচাল দেখলে বা সততার অভাব দেখলে ছেঁটে দিতে বাপী একটুও দ্বিধা করবে না।

ভিতরটা বিরক্তিতে ছেয়ে আছে তবু। একটা অনিশ্চয়তার পাহাড় নিজের বুকের ওপর চেপে বসে আছে। কলকাতায় ছুটেছে বটে, কিন্তু ওটা শেষ পর্যন্ত কতটা নড়বে কতটা সরবে জানে না। তার মধ্যে মাস্টারমশাই ললিত ভড়ের এই দেহ-পসারিনী মেয়ের সংগে এমন অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ মোটেই শুভ লক্ষণ ভাবতে পারছে না।

কিন্তু দমদম এয়ারপোর্টে নামার দশ মিনিটের মধ্যে সমস্ত সত্তা দিয়ে আঁকড়ে ধরার মতো কত বড় বিস্ময় তার জন্য অপেক্ষা করছিল জানে না। ঘড়ি ধরে চারটে পঞ্চাশ ওর ডাকোটা ল্যান্ড করেছে। ঠিক পাঁচটায় বাপী বাইরের বিশাল লাউঞ্জে এসে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। বিজয় মেহেরার ঠিকানার সংগে ঊর্মিলা তার আপিসের টেলিফোন নম্বরও লিখে দিয়েছে। একটা ফোন করতে পারলে এখনও হয়তো তাকে আপিসেই পাবে। পেলে এই রাতেই হোটেলে ওর সংগে দেখা করতে বলবে। চৌরঙ্গী এলাকায় সব থেকে নাম-করা অভিজাত হোটেলে উঠবে তাও ঠিক করে রেখেছিল।

লাউঞ্জের সামনের দিকে ছোট বড় অনেকগুলি এয়ার অফিসের কাউণ্টার। সবই বে-সরকারী সংস্থা তখন। টেলিফোনের খোঁজে বাপী পায়ে পায়ে সেদিকে এগলো।

তখনি সেই অভাবিত বিস্ময়। পা দুটো মাটির সংগে আটকে গেল। শীতের শেষের সন্ধ্যার আলোর আলোয় বিশাল লাউঞ্জের এ-মাথা ও-মাথা দিনের মতো সাদা। সেই আলো হঠাৎ শতগুণ হয়ে বাপীর চোখের সামনে দুলে দুলে উঠতে লাগল।

অদূরে এক নামী এয়ার অফিসের ঝকঝকে কাউণ্টারের ভিতরে দাঁড়িয়ে হাসি-হাসি মুখে বাইরের কোনো যাত্রীর সংগে কথা কইছে যে মেয়ে তাকে দেখেই বাপীর দুচোখের ঢেলা বেরিয়ে আসার দাখিল। তাকে দেখেই এমন দিশেহারা বিস্ময়! কাউণ্টারের সামনের দিকে একটা বোর্ডে লেখা, 'ইনফরমেশন'।

তার ও-ধারে দাঁড়িয়ে মিষ্টি।

বাপী ভুল দেখছে না। মিষ্টি। মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি!

পরনে ধপধপে সাদা শিফন সিল্কের শাড়ি। গায়ে জেল্লা-ঠিকরনো সাদা ব্লাউজ। শাড়ির ওপর বাঁ-দিকের কাঁধে এয়ার অফিসের কালো ব্যাজ। কপালে কুমকুমের ছোট টিপ। এই বেশে আর এই আলোয় এমন ধপধপে ফর্সা দেখাচ্ছে ওকেও। সব মিলিয়ে সাদা আলোর গড়া রমণী অংগের কপালে শুধু একফোঁটা লালের কৌতুক।

যাত্রীটি তার জ্ঞাতব্য খবর জেনে নিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে চলে গেল। হাসি মুখে পাল্টা সৌজন্য জানিয়ে ওই মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মাথা নিচু করে তার কাজে মন দিল।

সংগে সংগে আবার একটা আনন্দের ঢেউ এসে বাপীকে যেন মাটি থেকে চার হাত ওপরে তুলে ফেলল। মাঝের সিঁথি মসৃণ সাদা। সেখানে কোনো রক্তিম আঁচড় নেই।

বাপী বুক ভরাট করে বাতাস নিল প্রথমে। তারপর খুব নিঃশব্দে কাউণ্টারের সামনে এসে দাঁড়াল।

—ইয়েস প্লীজ? রাঙানো ঠোঁটে অভ্যস্ত হাসি ফুটিয়ে ও-ধারের মেয়ে মুখ তুলল।

হাতে ট্রাভেল সুটকেস, কাঁধে দামী গরম কোট, বাপী সোজা দাঁড়িয়ে তার দিকে শুধু চেয়ে রইল।

প্রথমে ওই মেয়ের ভুরুর মাঝে সুচারু ভাঁজ পড়ল একটু। তারপরেই অভাবিত কাউকে দেখায় ধাক্কায় সেও হকচকিয়ে গেল কেমন। তারপর একটু একটু করে বিস্ময়ের কারুকার্যে সমস্ত মুখ ভরাট হতে লাগল।

বাপী চেয়েই আছে।

মিষ্টিও।

কথা বাপীই প্রথম বলল। বলল, ঠিক দেখছি?

স্থির জলে ছোট্ট একটা ঢিল ফেললে তলিয়ে যেতে যেতে ওটা ওপরে ছোট একটা বৃত্ত-তরঙ্গ এঁকে দেয়। তারপর সেই ছোট তরঙ্গ বড় হয়ে ছড়াতে থাকে। ছোট কটা কথা সামনের চারুদর্শনার মন-সরোবরে তেমনি টুপ করে ডুবল। পাতলা দুই ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসির আভাস দেখা দিল। তারপর সেটুকু সমস্ত মুখে ছড়াতে থাকল। বাপী হলপ করে বলতে পারে, এ কোন ইনফরমেশন কাউণ্টারে দাঁড়ানো সুদর্শনার পেশাদারি সৌজন্যের হাসি নয়।

মিষ্টিও ঠিক তেমনি করে ফিরে জিগ্যেস করল, আমি ঠিক দেখছি?

কান আর এর থেকে বেশি কেমন জুড়োয় মানুষের বাপী জানে না। দুজনের বিস্ময় দু'রকমের। গেজেটের পাতায় নাম দেখতে না পাওয়ার ফলে যাকে নিয়ে এত ভাবনা-চিন্তা এত বিশ্লেষণ, আকাশ থেকে মাটিতে নেমেই তাকে এয়ার অফিসের ইনফরমেশন কাউণ্টারে

দেখতে পাবে এ কোনো সুদূর কল্পনার মধ্যে ছিল না বলেই বাপীর বুকের তলায় এমন তোলপাড় কাণ্ড। নইলে চার বছর আগে যে মিষ্টিকে দেখেছিল এ-ও সেই মিষ্টি। এখানে এই বেশে আর এই পরিবেশে আগের থেকেও একটু বেশি চকচকে আর ঝকঝকে দেখাচ্ছে তফাৎ শুধু এইটুকু। কিন্তু মিষ্টির চোখে তফাৎটা যে ঢের বেশি বাপীর আঁচ করতে অসুবিধে হচ্ছে না। চার বছর আগে যাকে দেখেছিল তার পরনে সাদামাটা পাজামা পাঞ্জাবি, টালির বস্তির এক খুপরি তার বাস, ব্রুকলিন আপিসের এক বড়বাবুর মেয়েকে নাকচ করার ফলে লোয়ার ডিভিশনে কেরানীর চাকুরিটুকুও তার খোয়া গেছে। চার বছর আগের সেই ভেসে বেড়ানো ছেলে বুক ঠুকে ওকে বলেছিল, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক হওয়াটা যেমন তার অদৃষ্ট নয়, বস্তিতে থাকাটাও তেমনি আর বেশি দিনের সত্যি নয়। টনটনে আবেগে ঘোষণা করেছিল, সব বদলাবে, একেবারে অন্যরকম হয়ে যাবে—মিষ্টি চাইলেই হবে।

...এয়ার পোর্টে পুরুষের এই বেশে এই মূর্তিতে ওকে দেখে সেই বদলানোর ধাক্কাটাই মিষ্টির কাছে বড় বিস্ময়। দেখামাত্র আর চেনামাত্র কেমন করে বুঝেছে অনেক বড় হয়েছে, অনেক বদলেছে, অনেক অন্য রকম হয়েছে। বাপীর আরও আনন্দ, এই বিস্ময়ের সঙ্গে খুশির মিশেলও তেমনি স্পষ্ট। সকলের চোখের ওপর এভাবে চেয়ে থাকাটা যে-কোন মেয়ের কাছে অস্বস্তিকর। ওর দিকে তাকিয়ে যেতে-আসতে কাছে-দূরের কত পুরুষের জোড়া-জোড়া চোখ সরস হয়ে উঠছে বাপী আর কোন দিকে না চেয়েও আঁচ করতে পারে।

মৃদু হেসে বলল, দুজনেই ঠিক দেখছি বোধ হয়।

কোন মেয়ের যদি কোন ছেলেকে দেখামাত্র সুপুরুষ মনে হয় তো সেটা সেই ছেলের চোখেই সবার আগে ধরা পড়ে। চার বছর আগে যখন কলেজে পাজামা পাঞ্জাবি পরা ছেলেবেলার দুরন্ত সঙ্গীকে প্রথম দেখেছিল বা চিনেছিল, তখনও এই মেয়ের চোখে সুপুরুষ দেখার প্রসন্ন বিস্ময় উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল বাপীর মনে আছে। সেটুকুই এখন আরও স্পষ্ট।

হাসিমাখা দু'চোখ ওর মুখের ওপর রেখে মিষ্টি মুখেও বলল, আমি ঠিক দেখছি কিনা এখনো বুঝছি না। তুমি কোথাও থেকে এলে, না কোথাও যাচ্ছ?

—আমি বানারজুলি থেকে মিষ্টির কাছে এসেছি।

এতদিন বাদে দেখা হওয়ার এটুকু সময়ের মধ্যে এই লোক আবার এমন বেপরোয়া কথা বলবে ভাবেনি। বিশেষ করে লেকের ধারের সেই অপমান ভ্রষ্ট হেনস্থার পর। আজ যদি ওকে এখানে দেখে পাশ কাটিয়ে চলে যেত তাহলে অস্বাভাবিক কিছু হত না। কিন্তু স্বাভাবিক পথে চলা যে ধাত নয় তাও মিষ্টির থেকে বেশি আর কেউ জানে না। মুখে সুচারু বিড়ম্বনা। কথাগুলো নাকচ করার সুরে বলল, আমার সঙ্গে এখানে দেখা হবে তুমি জানতে?

—এখানে দেখা হবে জানতাম না। কোথাও দেখা হবে জানতাম।...এখানে আর কতক্ষণ কাজ তোমার?

—ছটা পর্যন্ত। হেসেই সামনের কাগজগুলো দেখালো।—তার মধ্যেও সারতে পারব মনে হয় না।

বাপী হাসছে মৃদু মৃদু। ওর হাতের মুঠো আর যে ঢিলে হবার নয় সেটা এই মেয়ে কি করে জানবে। বলল, তার মানে আমাকে বিদেয় হতে বলছ?

বানারজুলির দশ বছরের ফোলা-গাল ঝাঁকড়া-চুল নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে কত সময় মুখের ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠে ওকে বিদেয় করতে চেয়েছে। এই মিষ্টি চাউনি দিয়েই

বুঝিয়ে দিল, বিদেয় করতে চাইলেও বিদেয় হবে বলে মনে হয় না। মুখে বলল, না তা বলছি না—

বাপী মুখের কথাটুকুই আঁকড়ে ধরল তক্ষুনি।—হাতের কাজ তাহলে আজ না সারলেও চলবে?

চার বছর আগে ঠিক এমনি অনুরোধে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে আসার কথা মনে পড়ল মিষ্টির। চোখে চোখ, ঠোঁটে হাসি। অল্প অল্প মাথা দুলিয়ে বলল, এ কি কলেজ যে বেরিয়ে পড়লেই হল—চাকরি না?

—তাহলে কাজ সারো, দেখ কত তাড়াতাড়ি হয়। আমি বসছি।

ব্যাগ হাতে লম্বা পা ফেলে বিশ গজ দূরের লাউঞ্জে একটা সোফায় গিয়ে বসল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মিষ্টি তার দিকেই চেয়ে আছে। ঠোঁটের ফাঁকে হাসিটুকু এখনও ধরা আছে। পুরুষের গাম্ভীর্যে নিজের হাতঘড়িতে সময় দেখল। পাঁচটা পনের।

মিনিট দশের মধ্যেই একটা লোক ঝকঝকে পেয়ালা প্লেটে চা এনে ওর দিকে বাড়িয়ে দিল। বাপী বুঝেও জিগ্যেস করল, চা কে পাঠাল?

লোকটা অদূরের ইনফরমেশন কাউণ্টার দেখিয়ে দিল। মিষ্টি এখন এদিকেই চেয়ে। চোখোচোখি হতে মাথা নিচু করে কাজে মন দিল।

চা খেতে খেতে বাপী ঘুরে-ফিরে ওকেই দেখছে। সোজাসুজি চেয়ে থাকার লোভ সামলাতে হচ্ছে। একটু পরে-পরেই কেউ এসে কাউণ্টারের সামনে দাঁড়াচ্ছে। ফ্লাইট বা আর কিছুর খোঁজখবর নিয়ে চলে যাচ্ছে। মিষ্টির ঠোঁটের ফাঁকে পেশাদারী সৌজন্যের হাসিটুকু এখন অন্য রকম। বাপীর মনে হচ্ছিল এই মেয়েকে দেখেই হয়ত বেশির ভাগ লোকের কিছু না কিছুর খোঁজ নেওয়াটা দরকার হয়ে পড়ছে। নইলে সে যখন ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল তখন তো একজনও আসে নি।

যত দেখছে, বাপীর ভেতরটা লুব্ধ হয়ে হয়ে উঠছে। শিগগীর এমন হয় নি। অনেক, অনেক দিন ধরে প্রবৃত্তির এদিকটার ওপর একটা শাসনের ছড়ি উঁচিয়ে বসে ছিল। তার অস্তিত্ব কখনো ভোলে নি বলেই আষ্টে-পৃষ্ঠে তাকে শেকলে বেঁধেছিল।...ভুটানের পাহাড়ের বাংলোয় খসখসে গালচেয় নাক মুখ কপাল ঘষে ছাল তুলে লোভাতুরকে শায়েস্তা করেছিল, তারপর উদ্‌ভ্রান্ত যৌবনের ডালি রেশমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে প্রায় অমোঘ রসাতলের গহ্বর থেকে নিজেকে টেনে তুলতে পেরেছিল। ঊর্মিলার উষ্ণ ঘন সান্নিধ্যে এসেও তার থেকে অনেক সহজে ওই অন্ধ অবুঝকে শাসনের লাগামে বেঁধে রাখতে পেরেছে। সব পেরেছে এই একজনের জন্য। এই একজনের প্রতীক্ষায়। অথচ চার বছর আগেও এই মেয়েকে যখন কাছে পেয়েছিল, আর ভেবেছিল খুব কাছে পেয়েছে—তখনও চোখে ঠিক এই লোভ চিকিয়ে ওঠে নি। রেস্তরাঁয় মুখোমুখি বসে তাকে লোভের দোসর ভাবতে চায় নি। তার থেকে ঢের বেশি কিছু ভাবতে ইচ্ছে করেছিল।

আজ নিজেকে বশে রাখার তাগিদ নেই। প্রবৃত্তির ওপর ছড়ি উঁচিয়ে বসার চেষ্টাও নেই। চার বছর আগে বড় বেশি বোকা হয়ে গেছল। আবেগের দাস হয়ে পড়েছিল। তার থেকে ঢের বেশি বাস্তবের রাস্তায় হাঁটত বানারজুলির চৌদ্দ বছরের বাপী। দখল বজায় রাখার জন্য সে হিংস্র হতে পারত। চৌদ্দ বছর বয়েসের সেই সত্তাই আজ ছাব্বিশের প্রান্তে এসে দ্বিগুণ পুষ্ট। দ্বিগুণ সংকল্পবদ্ধ। এই সংকল্পে লোভ আছে ক্ষুধা আছে বাসনা আছে কামনা আছে। বাপী এই সব নিয়েই বসে আছে। দেখছে।

ঘড়িতে ছটা বাজতে কুড়ি। সন্তর্পণে উঠল। মিষ্টির সামনে এখন দুজন মাঝবয়েসী মানুষ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। প্রায় তিরিশ গজ সামনে এগনোর পর পাবলিক টেলিফোন পেল। রিসিভার তুলে চৌকো দো-আনি ফেলে অপারেটারের গলা পেল।

কিন্তু বাপী নম্বর জানে না, তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না। হোটেলের নাম বললে যে কোনো অপারেটর কানেকশন দিয়ে দেবে। দিল।

চৌরঙ্গী এলাকার সব থেকে অভিজাত হোটেলে একটা ভাল স্যুইট বুক করে ফিরে এলো। কাউণ্টারের ওধারে মিষ্টি তার দিকেই চেয়ে আছে। লাউঞ্জের চেয়ারের দিকে বাপীর পা আর এগোল না। দাঁড়িয়ে গেল।

সামনের কাগজপত্র সব তুলে নিয়ে মিষ্টি ভিতরের দরজা দিয়ে অদৃশ্য প্রায় আট-ন মিনিটের জন্য। বাপী সেই খোলা দরজার দিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিষ্টির ওভাবে লক্ষ্য করার মধ্যে গভীর অভিব্যক্তি কিছু আছে, কিন্তু দু-চার লহমায় সেটা ধরা গেল না।

—চলো।

বাপী চমকেই পাশে তাকালো। ওদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে মিষ্টি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। খুশিমুখে বাপী ঘড়ি দেখল। ছটা বাজতে দু মিনিট বাকি—হয়ে গেল?

—হয়ে গেল না। একজনের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে এলাম।

বাপী হাসল।—তোমার দায় নেবার জন্য কে আর না ঘাড় পেতে দেবে।

—এসো।

প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য ফিরে তাকালো না। সামনে এগলো। ও-দিক থেকে একজোড়া সাদা চামড়ার মেয়ে-পুরুষ এদিকে আসছে। পুরুষের এক হাত সঙ্গিনীর কাঁধ বেষ্টন করে আছে। জোড়ালো পুরুষের মত মাঝের চারটে বছর একেবারে মুছে ফেলার তাগিদ বাপীর। তার আগের আটটা বছরও। মিষ্টি বাঁ পাশে। বাপীর হাতে স্যুটকেস। বাঁ কাঁধের কোটটা ডান দিকে চালান করল। তারপর দ্বিধাশূন্য বাঁ হাত মিষ্টির বাঁ কাঁধে।

চলা না থামিয়েও মিষ্টি থমকেছে একটু। মুখও ওর দিকে ঘুরেছে। বাপীর দৃষ্টি অদূরের দরজার দিকে। কিন্তু লক্ষ্য ঠিকই করেছে। বারো বছর আগের সেই দুরন্ত দস্যির হাতে পড়াব মত মুখ অনেকটা। অস্বস্তি সত্ত্বেও কিছু বলল না—অথবা বলা গেল না।

—এরোড্রোম থেকে এত পথ ভেঙে রোজ বাড়ি ফেরো কি করে?

—কোম্পানির গাড়িতে।

—নিয়ে আসে দিয়ে আসে?

—হ্যাঁ।

বাইরে এলো। সামনের আঙিনা পেরিয়ে বিশ-তিরিশ গজ দূরে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। তেমনি কাঁধ বেষ্টন করেই সেদিকে চলল। অস্বস্তির কারণেই হয়ত মিষ্টি গম্ভীর। কিন্তু কিছু না বলাটা যে তারও জোরের দিকই, বাপী সেটা অস্বীকার করছে না। এই জোরের ওপর জবর দখলের স্পর্শে ভিতরটা আরও বেপরোয়া। কোন্ কবিতায় না কোথায় যেন পড়েছিল, রমণীর মন জোব করে জয় করে নেবার জিনিস।

মিষ্টি এবার বলল কিছু। আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি এর মধ্যে বাইরে-টাইরে থেকে ঘুরে এসেছ নাকি?

—না তো।

—বানারজুলিতেই ছিলে?

—হ্যাঁ, কেন?

—অত সহজে কাঁধে হাত উঠে আসতে ভাবলাম বিদেশ-টিদেশ গিয়ে ব্যাপারটা রপ্ত করে এসেছ।

হুল ফুটিয়ে এত সুন্দর করে এমন কথা সকলে বলতে পারে না। ফলে লোভ আরও দুর্বার হয়ে উঠল। ছিঁচকে লোভ নয়, পুরুষের লোভ। কিন্তু ভিতরে কেউ বলছে, আর

বাড়াবাড়ি ভাল্ল নয়। বিশ্বাস করে এই মেয়ে হয়তো এরপর ওর সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠতে চাইবে না। হেসেই কাঁধ থেকে হাত নামালো। কিন্তু মুখের উক্তি কম মোক্ষম নয়। বলল, না...বারো বছর আগে রশ্তটা শুধু একজনের ওপর দিয়েই হয়ে আছে।

মিষ্টি ঘুরে তাকালো একবার। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আঁচড় পড়ল কি পড়ল না। কৌতুকের স্মৃতি কিছু নয়, অবুঝপনা দেখেও সহিষ্ণু মেয়ের নিজেকে আগলে রাখতে পারার মত হাসির আভাস একটু। বলল, দু দিক থেকেই ও-সব ভোলার মতো সময় বারোটা বছর কম নয়।

বাপী এ-কথার এক বর্ণও বিশ্বাস করল না। নিজে কেমন ভুলেছে সে তো জানেই। এই মেয়েও ভোলে নি, ভুলতে পারে না। নইলে চার বছর আগে চেনার পর অনার্স ক্লাস বাতিল করে সমস্ত দিন ওর সঙ্গে কাটাত না। পরদিন লেকের ধারে যা ঘটে গেছে, তার মধ্যেও নিজেরও বিপাক বোঝাবার চেষ্টাটাই আসল ছিল। আর ভোলা এত সহজ হলে আজও আচরণ অন্য রকম হত। অন্যের ওপর কাজ চাপিয়ে দিয়ে এভাবে বেরিয়ে আসত না।...কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে তখন ওর দিকে চেয়ে কি দেখছিল বাপী এখন বোধ হয় আঁও আঁচ করতে পারে। অপ্রত্যাশিত যোগাযোগে আগের থেকেও ঢের সবল পুরুষ দেখছিল। পুরুষ পুরুষ হলে কোন মেয়ে তাকে সহজে ভুলতে পারে?

জবাব দেবার ফুরসৎ হল না, পাঞ্জাবী ড্রাইভার ট্যাক্সির দরজা খুলে দিয়েছে।

মিষ্টি এবারে সোজাসুজি তাকালো তার দিকে।—তুমি যাবে কোন্ দিকে?

—তোমার দিকে। ওঠো—বেঘোরে পড়বে না।

ঠোঁটের ফাঁকে আবার সেইরকম হাসির ফাটল একটু। অর্থাৎ বেঘোরে পড়ার মেয়ে সে নয়।

ট্যাক্সিতে উঠে ও-ধারের কোণের দিক ঘেঁষে বসল। বাপী উঠে দরজা বন্ধ করল। ট্যাক্সিঅলার উদ্দেশে বলল, চৌরঙ্গী।

ট্যাক্সি সোজা রাস্তায় পড়ে বেগে ছুটল। এদিকের অনেকটা পথ বেশ অন্ধকার। গাড়ির ভিতরে আরো বেশি। দুজনের মাঝে এক হাতের মত ফারাক। নড়েচড়ে বসে বাপীর এই ফাঁকটুকু আর একটু কমিয়ে আনার লোভ। কিন্তু পুরুষের এ-রকম চুরির হ্যাংলামো মানায় না। ভিতরে এমনি সাড়া পড়ে আছে সেই থেকে যে এটুকু খুব বড়ও মনে হচ্ছে না। এই সান্নিধ্যেরও এক অদ্ভুত স্বাদে উপোসী স্নায়ুগুলো টইটম্বুর হয়ে উঠছে। এই নীরবতার ঘোরে বাপী আরও অনেক অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু সেটা বিসদৃশ। বলল, তোমাকে এখানে এভাবে পাব ভাবতেও পারি নি।

পাব কানে কথাটা বাজল বোধ হয়। অন্ধকারে মিষ্টি ঘাড় ফেরালো।

—এখানে চাকরি করছ কত দিন?

—তা দেড় বছরের বেশি হয়ে গেল।

—এম. এ না পড়ে হঠাৎ চাকরির দিকে ঝোঁক?

—এম. এ পড়ে এর থেকে আর কি এমন ভালো চাকরি পেতাম?

অর্থাৎ পড়ার থেকে চাকরি বড়। চাকরি লক্ষ্য। অন্ধকারে এত কাছে থাকার দরুন মুখ দেখা যাচ্ছে, মুখের রেখা কিছু দেখা যাচ্ছে না।

—এম. এ পাশ করে কলেজে চাকরি করতে পারতে।

—বিচ্ছিরি। তার থেকে এ ঢের ভালো।

—নিজের চেষ্টাতেই জোটালে?

—না তো কি? গলার স্বর তরল একটু।—খবর পেয়ে দরখাস্ত করলাম, ইণ্টারভিউ দিলাম, পেয়ে গেলাম। মিষ্টি-হাসির শব্দ।—এর থেকেও ভালো পোস্টে সিলেক্টেড

হয়েছিলাম, কেউ রাজি হল না।

—কি পোস্ট?

—এয়ার হোস্টেস।

বাপীর গলারও আপত্তির আভাস।—সেটা এর থেকে ভালো?

—টাকার দিক থেকে তো ভালো। আর পাঁচরকম সুবিধেও আছে।

মিষ্টি টাকা চিনবে এ বাপী কোনদিন ভাবে নি। এখনও কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

—কে রাজি হল না?

—রাজি না হবার লোকের অভাব!

সহজ হাল্কা জবাবটা কানে চিনচিন করে বাজল। বলতে পারত, বাবু রাজি হল না, বা মা-বাবা রাজি হল না। রাজি না হবার ব্যাপারে আর কারও গলা মেলার সম্ভাবনা বাপী ছেঁটে দিল। চার বছর আগে সেই আঠার বছরের মিষ্টির সঙ্গে এই বাইশের মিষ্টির তফাৎ বাপী ভালই অনুভব করতে পারে। মেয়েদের বিকশিত সত্তার জোরটুকুর ওপর আস্থাভরে দু পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। চৌদ্দ-পনের-ষোল বা আঠার বছরের অনেক মেয়েই প্রেমের দু-চারটে পলকা বাতাসের ঝাপটা এড়াতে পারে না। মিষ্টির মতো মেয়ের এড়ানো আরও কঠিন। তা বলে উল্টো দিকের বাড়ির সেই সোনার চশমা মাখনের দলা ছেলে শেষ পর্যন্ত যে এই মেয়ের জীবনের দোসর হতে পারে না সেটা শুধু ওর চকচকে সাদা সিঁথি দেখেই বুঝছে না। ওর এখনকার এই সত্তার মধ্যেও সেই রকমই ঘোষণা স্পষ্ট। শুধু সেই লোকটাকে নয়, চার বছর আগে লেকের ধারের সেই বিকেলটাকেই ভেতর থেকে ছেঁটে দিয়েছে। আজ অপ্রত্যাশিত নাগালের মধ্যে পেয়ে শুরু থেকেই বাপীর এই আচরণ। অনুমান মিথ্যে হলে মিষ্টিই সুচারু সৌজন্যে ওকে বাতিল করে দিত। অন্যের ওপরে কাজ চাপিয়ে দিয়ে এভাবে ওর সঙ্গে চলে আসতই না।

ট্যাক্সি নির্জনতা পেরিয়ে লোকালয়ে এসে পড়েছে। দু' দিকের রাস্তা আর দোকান-পাটের আলোয় ট্যাক্সির ভিতরটাও অনেকটা পরিষ্কার। খানিক চুপ করে থেকে বাপী ওর দিকে ফিরল।—বানারজুলি থেকে বাগডোগরা এসে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে উড়ে এসেছি বিশ্বাস করতে অসুবিধে হচ্ছে?

মিষ্টির এবারের হাসির সঙ্গে বিড়ম্বনার মাধুর্য ছুঁয়ে আছে কিনা ঠাওর করা গেল না। মাথা নাড়ল একটু। জবাবও দিল।—হচ্ছে।

—বিশ্বাস হতে পারে এমন কিছু বলব?

চেয়ে রইল। ভরসা করে সায় দিতে পারছে না। কিন্তু শোনার কৌতূহল।

বাপীর গলার স্বরে আবেগের চিহ্ন নেই। যেন নেহাৎ সাদামাটা কিছু বলছে।—গেজেটে তোমার এম. এ পরীক্ষার ফল দেখতে বানারজুলি থেকে শিলিগুড়ি ছুটে গেছলাম। বি. এ পরীক্ষার ফল দেখতেও তাই করেছি। বি.এ'র ফল ভালো হয় নি, এম-এতে ফার্স্ট ক্লাস পাবে কি পাবে না ভাবতে ভাবতে নিজেই গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছিলাম। কেউ তখন গাড়ি চাপা পড়লেও খুব অবাক হবার কিছু ছিল না। কিন্তু গেজেট দেখে আমি হাঁ প্রথম। নামই নেই।

নিজের অগোচরে মিষ্টি আরও একটু ঘুরে বসেছে। চেয়ে আছে।

বাপী তেমনি ঢিমেতালে বলে গেল, ফেল করতে পারো এ একবারও মনে হল না। প্রথমে ভাবলাম ভাল প্রিপারেশন হয় নি বলে ড্রপ করেছ। তারপর আর যে সম্ভাবনার চিন্তাটা মাথায় এলো তাইতেই আমার হয়ে গেল। তক্ষুনি ঠিক করলাম, কলকাতা যাব। আমার কপাল ভেঙেছে কিনা দেখব। তবু নানা কারণে আসতে আসতে দিন কয়েক দেরিই হয়ে গেল।

মিষ্টি অপলক চেয়েই আছে সে বোধ হয় তারও খেয়াল নেই। দু চোখ চকচক করছে। বাপী অনুভব করছে, শুধু কান দিয়ে শুনলে এমনটা হয় না। কপাল ভাঙার কোন্ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে কলকাতায় উড়ে এসেছে তাও আর ভেঙে বলার দরকার হল না। বুঝেছে।

বাপীর ভিতরটা সেই ছেলেবেলার মতই একটু স্পর্শের লোভে লালায়িত। এক হাত ফারাকের এই এক মেয়েকে ঘিরে তার অন্তরাত্মা বাসনাবিদ্ধ। কামনাবিদ্ধ। কিন্তু এটা বানারজুলির জঙ্গল নয়।

তবু একটু সামনে ঝুঁকে বাপী জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছ?

মিষ্টি নিজের ভিতর থেকে নিজেকেই উদ্ধার করে সজাগ হল। ও-পাশের দরজার সঙ্গে আর একটু চেপে বসে সহজ হবার চেষ্টা। হেসেই বলল, তুমি একটা পাগল।

বাপীও হেসেই সায় দিল।—এত দিনে তাহলে বুঝছ।

হোটেলের সামনের রাস্তায় ট্যাক্সি থামতে মিষ্টি বুঝল কোথায় যাচ্ছে বা এই লোক কোথায় আস্তানা নেবে। এই বোঝাটাও বিস্ময়শূন্য নয় দেখে বাপীর মজাই লাগছে। এর থেকে নামী আর দামী হোটেল চৌরঙ্গী ছেড়ে সমস্ত কলকাতায়ও আর দুটো নেই। পয়সার হিসেবটা যাদের কাছে বড় তারা বড় একটা এমন জায়গায় আসে না। তখন পর্যন্ত সাদা চামড়া আর অবাঙালী মেয়ে-পুরুষের ভিড় বেশি এখানে।

মিষ্টি পাশে। গালচে বিছানো চওড়া করিডোর ধরে বাপী রিসেপশনে এসে দাঁড়াল। একজন আধবয়সী কেতাদুরস্ত অফিসার এগিয়ে এলো। সুটকেস রেখে বাপী ব্যাগ খুলে ছাপানো কার্ড তার হাতে দিতে লোকটি শশব্যস্তে বলল, ইয়েস সার, গট ইওর মেসেজ ওভার দি ফোন।

তার ইশারায় একজন তকমা-পরা বেয়ারা ছুটে এলো। বাপীর সুটকেস আর ঘরের চাবি নিয়ে সে প্রস্তুত। অফিসারকে বাপী জানালো সে কদিন থাকবে ঠিক বলতে পারে না। খাতাপত্র যা সই করার সুইটে পাঠিয়ে দিলে সই করে দেবে, আর আপাতত পাঁচ দিনের চার্জ অ্যাডভান্স করে দেবে।

লিফটে উঠে তিনতলায় সুইট। নরম পুরু গালচে বিছানো বিশাল ঘরের মাঝে শৌখিন হাফ পার্টিশন। একদিকে বসার ব্যবস্থা, অন্যদিকে শোবার। অ্যাটাচড বাথ। দু' দিকে দুটো টেলিফোন। বাপী চারদিক দেখে নিল একবার। উত্তরবাংলা মধ্যপ্রদেশ বা বিহারে টুরে বেরুলে সব থেকে বড় হোটেলেই উঠে। কিন্তু কলকাতার সঙ্গে তুলনা হয় না।

বাপী মিষ্টির দিকে তাকালো। এই লোকের এমন দিন ফেরার বিস্ময় এখনও কাটে নি। কিন্তু খুশিই মনে হল।

সুটকেস রেখে বেয়ারা চলে গেছে। বাপী বলল, বসো—

পার্টিশনের এধার থেকে কাঁধের কোটটা গদীর বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিল বাপী। তারপর নিজেও বসল।—কি খাবে বলো?

মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি হাসছে অল্প অল্প। কিছু খাবে না বললে শুনবে না জানে, আবার কি খাবে তাই বা বলে কি করে।

বাপী ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে রুম-সার্ভিস চাইল। তারপর একগাদা খাবারের অর্ডার দিল।

ফোন রাখতে মিষ্টি আঁতকে উঠল অত কে খাবে!

ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ছড়াচ্ছে বাপীর।—আমার এখন রাজ্যের খিদে।

জবাবটা একেবারে জল-ভাত সাদা অর্থের নয়। বিড়ম্বনা এড়াবার চেষ্টায় মিষ্টি বলল, যত খুশি খাও, আমার ওপর জুলুম কোরো না।

বাপী কি আরও বেপরোয়া হবে? জুলুম না করলে সেটা না খাওয়ারই সামিল হবে বলবে? বলল না। আরও জরুরী কিছু মনে পড়ল। ফোনের রিসিভারটা তুলে মিষ্টির দিকে বাড়িয়ে দিল।—ফিরতে দেরি হবে বাড়িতে জানিয়ে দাও।

আবারও একটু বিড়ম্বনার ধকল সামলে মিষ্টি জবাব দিল, তোমার পাল্লায় পড়েছি যখন ফিরতে দেরি হবে আগেই জানি। এয়ার অফিস থেকেই ফোন করে দিয়ে বেরিয়েছি।

বাপী রিসিভার জায়গায় রাখল আবার। দু চোখ ওর মুখের ওপর। রক্তে খুশির তাপ ছড়াচ্ছে, লোভেরও। চার বছর আগে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসার আগে দাদুকে নিজ থেকে ফোন করে ফিরতে দেরি হবে জানিয়ে এসেছিল মনে আছে। . .তার পরের পরিণাম মুছেই গেছে।

এবারে মিষ্টিরই সহজ হবার তাড়না। চারদিক একবার দেখে নিয়ে বলল, ভালো করে মুখ হাত ধুয়ে না এলে আমি কিছুই মুখে দিতে পারব না—মাথাটা ঝিমঝিম করছে। হাসল একটু, দু-তিন ঘণ্টা পর পর সমস্ত মুখে জল দেওয়াটা বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে আমার।

বাপী তক্ষুনি উঠে পার্টিশনের ওধারে গিয়ে বাথরুমের দরজা খুলল। ঝকঝকে পরিপাটি ব্যবস্থা। যাবতীয় সরঞ্জাম সাজানো।

ফিরে এসে বলল, যাও—

মিষ্টি উঠে গেল। ফিরল প্রায় সাত-আট মিনিট বাদে। সমস্ত মুখে ভালো করে সাবান ঘষে এসেছে বোঝা যায়। তোয়ালে দিয়ে মুছে আসা সত্ত্বেও ভেজা-ভেজা মুখ। ঘাড়ে মাথায়ও জল চাপড়েছে মনে হল। শুকনো চুলে মুক্তোর মতো দু-চারটে ফোঁটা আটকে আছে।

বাপী তাকালো। তারপর দু চোখ ওই মুখের ওপর অনড় খানিক। মিষ্টি আবার সামনে এসে বসার পরেও। এখানেও আলোর ছড়াছড়ি। কিন্তু সাবান দিয়ে সমস্ত প্রসাধন ধুয়ে মুছে আসার ফলে এখন আর অত ফর্সা লাগছে না। অকৃত্রিম তাজা বাদামী অনেকটা। ঠোঁটের লাল রংও ধুয়ে মুছে গিয়ে শুধু লালচে আভা আছে একটু।

হৃষ্টমুখে বাপী মন্তব্য করল, এতক্ষণে ঠিক ঠিক তোমাকে দেখছি। শাড়িটা বদলে অন্য শাড়ি পরে আসতে পারলে আরো ঠিক দেখতাম।

মিষ্টি মুখোমুখি সোফায় বসে হেসেই জিজ্ঞাসা করল, এ শাড়ি কি দোষ করল?

বাপী অম্লান বদনে জবাব দিল, বেজায় সাদা, যেন নিষেধ-নিষেধ ভাব।

দরজার বাইরে প্যাঁক করে শব্দ হতে মিষ্টিরই বাঁচোয়া।

—কাম ইন! বাপী সাড়া দিল।

দরজা ঠেলে দুজন বেয়ারা ট্রেতে গরম খাবার আর টুপী-আঁটা চায়ের পট ইত্যাদি নিয়ে ঘরে ঢুকল। দুজনের মাঝের টেবিলে সেগুলো সাজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মিষ্টি আগে থাকতে আবার জানান দিল, আমার দ্বারা অত চলবে না, এ তো একেবারে রাতের খাওয়া সারার মতো এনে হাজির করেছ।

—সারলেই না-হয়। শুরু তো করো।

খেতে খেতে প্রথমেই মিষ্টির যার কথা মনে পড়ল সে বনমায়া। উৎসুকও।—টৌল-গ্রামে বনমায়া কিল্ড লিখেছিলে—কি করে মরল? কে তাকে মারল?

বাপী সবিস্তারে বলল। মানুষের লোভের কথা বলল। দোসরকে বাঁচানোর চেষ্টার

বনমায়া ওভাবে নিজের জীবন খুইয়েছে সেই বিশ্বাসের কথাও বলল।

মিষ্টির খাওয়া থেমে গেছল। সব শোনার পর বিবশ।

—ও কি, খেতে খেতে শোনো। একটু থেমে বাপী আবার বলল, সেদিনও আমি শিলিগুড়ি গিয়ে তোমার বি. এ'র রেজাল্ট দেখে ফিরছিলাম বুঝলে? এসে দেখি বানারজুলির লোক ভেঙে পড়েছে বনমায়াকে দেখতে। বনমায়ার সেটা শেষ সময়, শুয়ে আছে। আমাকে দেখে চিনল, শুঁড় উঁচিয়ে সেলাম করল...

—থামো, আর শুনতে পারি না।

—মিষ্টির মুখে বেদনার ছায়াতে কোনো ভেজাল নেই। বাপী অখুশি নয়। ওর স্মৃতির গভীর থেকে বানারজুলি হারিয়ে যায় নি। একটু থেমে বাপী আবার বলল, ওর মরদটার খবর শুনবে?

মন্দ কিছু শুনতে হবে কিনা মিষ্টির চোখে সেই আশঙ্কা।

—পাগলা গুণ্ডা হয়ে গেছে। সামনে কাউকে পেলে তাকে মেরে মানুষের লোভের শোধ নিচ্ছে। ওটাকে মারবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, এখনো মারা যায় নি, জখম হয়ে আরো শয়তান হয়ে গেছে। গেল বছর আমি ওই যমের মুখোমুখি পড়ে গেছলাম। কি করে যে বাঁচলাম সেটাই আশ্চর্য।

কে বললে মিষ্টির বয়েস বাইশ, হালফ্যাশানের ঝকঝকে এই মেয়ে এয়ার অফিসের চাকুরে। তার চোখে মুখে সত্যিকারের ত্রাস।—ওটার মুখোমুখি পড়লে কি করে—জঙ্গলে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিলে বুঝি?

—বানারজুলির জঙ্গলে নয়, ভুটানের জঙ্গলে। আমি একটা পাথরে বসেছিলাম ওটা আসছে দেখিই নি। আর একজন সঙ্গে ছিল, সে দেখেছে, সে-ই বাঁচালো। ঘাবড়ে গিয়ে আমি সোজা ছুটতে যাচ্ছিলাম, তাহলে আর রক্ষা ছিল না। সঙ্গের সেই একজন আমাকে নিয়ে পাশের পাহাড়ে টেনে তুলল, আর বিশ-ত্রিশ সেকেণ্ড দেরি হলেও হয়ে যেত।

ঠোঁটের ডগায় আসা সত্ত্বেও রেশমার নামটা অনুক্তই থাকল। বুক নিঙড়নো একটা বড় নিঃশ্বাস ঠেলে বেরুলো। রেশমার নামটা করল না বলে নিজেকে অকৃতজ্ঞ ভাবছে।

দৃশ্যটা ভাবতে চেষ্টা করে মিষ্টি শিউরে উঠল। তোমার বনে-বাদাড়ে টহল দিয়ে বেড়ানোর অভ্যেস এখনো যায় নি?

রেশমার চিন্তা ঠেলে সরিয়ে বাপী হাসল। জবাব দিল না!

—সেই এক ময়াল সাপের মুখে পড়াটা আমি এখনো ভুলতে পারি নি। কখনো-সখনো স্বপ্ন দেখে ঘুমের মধ্যে আঁতকে উঠি।

কার জন্যে যে সেদিনের সেই মিষ্টিও প্রাণে বেঁচেছিল সেটা মুখে বলল না, চোখের ভাষায় বোঝা গেল। বাপী কিছুই ভোলে নি, কিছুই ভোলে না। মেমসায়েব অর্থাৎ ওর মায়ের সেদিনের কান-মলা পুরস্কারটাও মনে আছে। কিন্তু আজকের বাপী সেই বাপী নয়। অপ্রিয় প্রসঙ্গের ধার দিয়েও গেল না।

খাওয়া আর চা-পর্বও শেষ এই ফাঁকে। মিষ্টি বলল, এত খেলাম, সত্যি রাতের খাওয়া হয়ে গেল।

ওর ডিশ দুটোয় এখনো খানিকটা পড়ে আছে। বাপী তাগিদ দিল না। বেল টিপতে দরজা ঠেলে বেয়ারা এসে ট্রেসুদ্ধ নিয়ে চলে গেল।

মিষ্টি বলল, তোমার দিন অনেক বদলেছে বোঝাই যাচ্ছে—কি করছ?

এ পর্যন্ত নিজের পদমর্যাদার জাহির কারো কাছে করেছে মনে পড়ে না। ঠিক জাহির না করলেও আজ লোভ সামলানো গেল না। পকেটের মোটা ব্যাগ খুলে আর একটা ছাপা কার্ড বার করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিল।

মিষ্টি সাগ্রহেই কার্ডের ওপর চোখ বোলালো।—তুমি এখন মস্তলোক অন্তত—জেনারেল ম্যানেজার অ্যান্ড পার্টনার।...রাই অ্যান্ড রাই কিসের ফার্ম?

অল্প কথায় বলল। কত জায়গায় ফার্মের শাখা-প্রশাখা আছে জানিয়ে সুবিবেচনায় কলকাতারও যে জাঁকিয়ে বসার ইচ্ছে আছে তাও বলল।

—তুমি এই ফার্মের সর্বেসর্বা এখন?

—অ ঠিক না, মাথার ওপর কর্ত্রী আছে।

—কর্ত্রী?

ভিতরে বাপীর যে সাড়া জেগেছে, এই একজনকেই সব উজাড় করে বলা যায়। কে কর্ত্রী, কেমন কর্ত্রী বলল। কোথা থেকে কি ভাবে ওকে টেনে তুলেছে তাও বাদ গেল না। আর একই সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে ঊর্মিলার প্রসঙ্গও এলো।

মিষ্টি বেশ আগ্রহ নিয়ে শুনছিল। এবারে সহজাত কৌতূহলে জিগ্যেস করল, ঊর্মিলার বয়েস কত?

—তোমারই বয়সী হবে, সামান্য ছোটও হতে পারে। কিন্তু মেয়ের একেবারে রাজেশ্বরী মেজাজ।

—বিয়ে হয়েছে?

মজা করে সত্যি কথা বলতে আপত্তি কোথায় বাপীর? মাথা নেড়ে জবাব দিল, এই নিয়েই তো ফ্যাসাদ। মেয়ে এক ইঞ্জিনিয়ার-এর কাঁধে ঝোলার জন্য তৈরি, তার মা ওদিকে মেয়েকে আমার কাঁধে না ঝুলিয়ে ছাড়বে না। সঙ্কট বোঝো।

নির্লিপ্ত সুরে মিষ্টি বলল, অমন মা যখন সহায়, সঙ্কট আবার কি, ইঞ্জিনিয়ারকে হটিয়ে দাও।

কথার ফাঁকে বাপীর কার্ডটা নিজের হাত-ব্যাগে খুলে তাতে রাখল।

কিন্তু পরামর্শটা বেখাপ্পা ছন্দপতনের মতো লাগল বাপীর। চুপচাপ চেয়ে রইল একটু।—ইঞ্জিনিয়ারকে হটিয়ে দেব?

—তাছাড়া আর কি করবে। রাজত্ব-রাজকন্যা দুইই পাবে।

বাপীর একবার মনে হল মিষ্টি মেয়েলি ঠাট্টা করছে। কিন্তু ভিতরের অনুভূতিটা এমন যে তাও বরদাস্ত করার নয়। চাউনি ওই মুখের ওপর চড়াও হয়ে আছে। বলল, রাজত্ব বা রাজকন্যার লোভ নেই, আমার লোভ একটাই। গলার স্বরও ভারী।—বারো বছর ধরে পৃথিবীর সব বাধা আর সঙ্কটকে হটিয়ে আমি একজনের জন্যেই বসে আছি।

হাতের ব্যাগটা নাড়াচাড়া করছিল মিষ্টি। আঙুলগুলো থেমে গেল। দু-চোখ তার মুখের ওপর উঠে এলো। স্থির হল। মুখে যেন অদৃশ্য কঠিন রেখা পড়তে লাগল। হঠাৎ চাপা ঝাঁঝে বলল, তুমি মোস্ট আনপ্র্যাকটিকাল মানুষ।

এটুকুতেই ভিতরে তোলপাড় কাণ্ড বাপীর।—কেন?

গলা না চড়িয়ে মিষ্টি আরো ঝাঁঝালো জবাব দিল, একটা মেয়ের দশ বছর বয়েসের সঙ্গে বারোটা বছর জুড়ে দিলে কি দাঁড়ায় আর তার জগতে কত কি ঘটে যেতে পারে—ভেবেছিলে? শুধু নিজের স্বপ্নে বিভোর হয়েই বারোটা বছর কাটিয়ে দিলে?

বাপী স্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত। এই মিষ্টিকে সে দেখে নি। সহজ কথা এমন কঠিন করে বলতে পারে তাও ধারণার বাইরে। তার পরেই সচকিত। বুকের তলায় কাটা-ছেঁড়ার যন্ত্রণা। বাপী কি করবে। উঠে হ্যাঁচকা টানে ওই মেয়েকে সোফা থেকে টেনে তুলে তার হাড় পাঁজর নিজের সঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবে? তারপর চিৎকার করে বলবে, ভুল-ভ্রান্তি জানি না, কোনো বাধা মানি না, অনেক ঝড়জলের সমুদ্র সাঁতরে ডাঙায় উঠতে সময় লেগেছে বলেই এত দেরি—ডাঙায় না উঠলে কেউ আমাকে বিশ্বাস করত না, তুমিও

না। এই করবে? এই বলবে?

আশ্বস্থ হল। মিন্টির মুখের কঠিন লালচে আভা মিলিয়ে গেছে। নরম হয়েছে। চোখের কোণে সদয় কৌতুকের আভাস। ওটুকুতেই একটা দম-বন্ধ-করা জমাট অন্ধকার কিছু ফিকে হয়ে আসছে। তবু সামনে ঝুঁকে বাপী জিজ্ঞাসা করল, বারো বছরে তার জগতে কত কি ঘটে গেছে জানতে পারি?

চোখের কৌতুক ঠোঁটে ফাটল ধরালো এবার। জবাব দিল, তেমন কিছু না—তুমি সেই বারো বছর আগের মতোই আছো দেখছি, একটুও বদলাও নি।

—কেন?

টিপ-টিপ হাসি ঠোঁট থেকে চোখে আর চোখ থেকে ঠোঁটে নামা-ওঠা করছে।—ছেলেবেলায় রেগে গেলে যেমন দেখাতো, আর আমার ওপর হামলা করার জন্য যেমন ওত পেতে থাকতে—ঠিক তেমনি লাগছিল তোমাকে। আমার ভয়ই করছিল—

আবার লোভ লোভ—রাজ্যের লোভ বাপীর। ভয় যে ওর থোড়াই করছিল তাও স্পষ্ট। সেই কারণেই আরো লোভ। তবু একটু আগের ঝাঁঝালো মুখ ঝাঁঝালো কথার অস্বস্তি একটু লেগেই আছে। হাসিতে যোগ না দিয়ে গম্ভীর মুখেই আবার তাগিদ দিল, কিছু যদি হয়ে থাকে আমাকে খোলাখুলি বলো।

—খোলাখুলি কি আবার বলব। বিপরীত তরল ঝাঁঝ এবার।—জেনারেল ম্যানেজার হও আর পার্টনার হও, তোমার প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধির দৌড় কত তাই বলছিলাম। ঘড়ি দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।—অনেক রাত হয়ে গেল চলি।

অনুনয়ের সুরে বাপী বলল, আর একটু বোসো।

—না, আর না—এমনিতেই এ চাকরি চক্ষুশূল।

অগত্যা বাপীও উঠল। কাল কখন আসছ?

—কাল? কাল তো আমি কলকাতাতেই থাকছি না!

সঙ্গে সঙ্গে বাপীর চাউনি সন্দিগ্ধ আবার।—আমাকে এড়াতে চাও?

হাল ছেড়ে আবারও হাসল মিষ্টি।—তোমাকে নিয়ে মুশকিল। হাত-ব্যাগ খুলে খাম থেকে খোলা একটা টাইপ করা কাগজ ওর দিকে বাড়িয়ে দিল।—এই দেখো, কাল বিকেলের মধ্যে আমি দিল্লিতে। পরশু রাতে ফিরব।

ইন্টারভিউর চিঠি পড়ল বাপী। এয়ারওয়েজের আরো পদস্থ কিছু চাকরি হবে নিশ্চয়। ইচ্ছে হল চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বলে, এর আর দরকার কি আছে?

অতটা পারা গেল না। আবার হয়তো স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকার খোঁটা দেবে। শুধু বলল, না গেলে?

—পাগল নাকি! ছুটি নেওয়া হয়ে গেছে। ওখানেও তারা জানে আমি যাচ্ছি।

—তাহলে পরশু আসছ?

মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি হাসছে অল্প অল্প। মাথা নাড়ল।—পরশুও না। রাত দশটার পর প্লেন ল্যান্ড করবে।

—তার পরদিন?

—তার পরদিন বিকেলে হতে পারে।

—হতে পারে? অস্ফুট আর্তনাদের মতো শোনালো।

মিষ্টি অবুঝের পাল্লায় পড়েছে।—আচ্ছা হবে।

—কথা দিচ্ছ?

হাসিমাখা দু চোখ তার মুখের ওপর থেমে রইল একটু। মাথা নাড়ল। কথা দিচ্ছে।

—ঠিক আছে। চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মিষ্টি শশব্যস্তে বাধা দিল, না-না, পৌঁছে দিতে হবে না, একা চলা-ফেরা করে আমার অভ্যেস আছে।

কান না দিয়ে বাপী বাইরে এসে চাবি দিয়ে বন্ধ করল। বলল, আজ অন্তত তোমাদের বাড়ি গিয়ে হামলা করব না, ভয় নেই। দোরগোড়ায় নামিয়ে দিয়ে চলে আসব। এসো—

মিষ্টির নিরুপায় মুখ দেখে এখন বাপীরই মজা লাগছে।

॥ ছয় ॥

বেশ সকালেই ঘুম ভাঙল বাপীর। চোখ মেলে তাকানোর আগে পর্যন্ত হালকা মেঘের মতো ও একটা ভেলায় চেপে ভেসে বেড়াচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরটা অকারণ খুশিতে ভরাট হয়ে যাচ্ছিল।

চোখ মেলে তাকানোর পরেই ভেতরটা আর ততো খুশি নয়। কলকাতার সব চেয়ে সেরা হোটেলের আরামের গদীতে শুয়ে আছে। এই কলকাতায় ও আছে মিষ্টি নেই। বাতাস ছাড়া আলো যেমন, আপাতত মিষ্টি ছাড়া কলকাতা তেমন। আজকের দিনটা যাবে। কালকের দিনটা যাবে। তার পরের দিন সেই বিকেলে মিষ্টি এখানে এই ঘরে আসবে। ভাবতে গেলে বিতিকিচ্ছিরি লম্বা সময়।

বিছানায় গা ছেড়ে চোখ পাকিয়ে বাপী কিছু মিষ্টি চিন্তায় ডুব দিল। বানারজুলির সাহেব বাংলোব দশ বছরের মিষ্টি, কলকাতার কলেজে-পড়া আঠের বছরের মিষ্টি, আর এয়ার অফিসের চাকুরে বাইশ বছরের মিষ্টি—এই তিন মিষ্টিই চোখের সামনে ঘোরা-ফেরা করে গেল। লোভাতুর তন্ময়তায় বাপী দেখছে। কারো থেকে চোখ ফেরানো সহজ নয়। যখন যাকে দেখছে, বাপী নিজের সেই বয়সের চোখ দিয়েই তাকে দেখছে।

উঠল। মুখ হাত ধুয়ে টেলিফোনে দুকাপের এক পট চা আনিয়ে নিল শুধু। এখানে গায়ত্রী রাই নেই যে শুধু চা খেতে চাইলে ঠাণ্ডা চোখে বকবে।

চা খেতে খেতে সকৌতুকে নিজের বরাতের ওপর চোখ বোলাচ্ছে বাপী। চার বছর আগে এই কলকাতা শহরে সে পায়ে হেঁটে চষে বেড়াতো। বেশি খিদে পেলে ঠোঙায় মুড়ি কিনে খেতে খেতে পথ চলত। রাস্তার কল থেকে জল খেত। ঝকঝকে এই হোটেলের দরজার সামনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সুন্দরী মেয়েদের আনাগোনা দেখত। আজ এই হোটেলেই সে একজন সম্ভ্রান্ত আগন্তুক। বিলাসবহুল একটা সু[illegible] তার দখলে। টেলি-ফোন তুলে হুকুম করলেই যথেচ্ছ ভোগের উপকরণ নাগালের মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্য, এই ভোগবিলাসের সঙ্গে তবু ঠিক নাড়ির যোগ নেই বাপীর।

ঝপ করে যে মুখখানা সামনে এগিয়ে এলো, তাব একমাথা চুল, গালবোঝাই কাঁচা-পাকা দাড়ি, চওড়া কপালে মেপে সিঁদুর ঘষা। টালি এলাকার বাসিন্দা ব্রুকলিন পিওন রতন বণিকের মুখ। জোর গলায় বাপীর দিন-ফেরার ভবিষ্যদ্বাণী শুধু সে-ই করেছিল। বউকেও বলেছিল, হবে যখন দেখে নিস, বিপুলবাবুর ভাগ্যিখানা কালবোশেখীর ঝড়ের মতোই সব দিক তোলপাড় করে নেমে আসবে একদিন। ওই খুপরি ঘরের আশ্রয় ছেড়ে আসার দিনও বলেছিল আপনার কপালের রং অনেকটা ভালো হয়ে গেছে, আমার কথা মিলিয়ে নেবেন, দিন ফিরতে ভুলবেন না যেন।

বাপীর মনটা সবার আগে ওই রতন বণি[illegible] সঙ্গে দেখা করার জন্য আকুলিবিকুলি করে উঠল। কিন্তু যাবে কি করে। তামাম দুনিয়ায় এই একজনের কাছে নিজের বিবেক সব থেকে বেশি অপরাধী। কাল মিষ্টির দেখা পেয়েছে বলেই সেই বিবেকের চাবুক এই সকালেও অনুভব করল। কমলা বণিকের ঢলঢলে কালো মুখখানা জোর করেই স্মৃতির

শরীর থেকে টেনে উপড়ে ফেলে দিতে চাইল। সম্ভব হলে রতন বণিকের সঙ্গে দেখা একবার করবে। মুখে কিছু না বলেও বুকের তলায় কৃতজ্ঞতা উজাড় করে দিয়ে আসতে পারবে। বলতে পারবে তোমাকে ভুলি নি কোনদিন, ভুলব না। কিন্তু ওর ঘরের ত্রিসীমানায় গিয়ে নয়। সময় পেলে ওর আপিসে গিয়ে দেখা করে আসবে।

খবরের কাগজ পড়ল। মিষ্টি এখানে নেই, কলকাতায় বসে কাগজে আর এমন কি খবর পড়ার আছে। ধীরেসুস্থে শেভ করল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে স্নান সারল। পিছনের সব কালো ধুয়ে-মুছে ফেলার মতো স্নান একখানা। ভুটান জঙ্গলের উন্দাম ফকির তাকে সামনে এগোতে বলেছিল, পিছনে তাকাতে বলে নি।

ঘড়ির কাঁটা বেলা দশটার ওধারে সরতেই রিসিভার তুলে বিজয় মেহেরার আপিসের নম্বর চাইল। দু মিনিটের মধ্যে ওদিক থেকে মেহেরার ব্যস্ত গলা—মেহেরা হিয়ার!

এদিক থেকে কপট গাম্ভীর্যে বাপী বলল, বানারজুলির বাপী তরফদার।

—ফ্রেন্ড! সঙ্গে সঙ্গে ওধারে গলা উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ল।

উর্মিলার ফ্রেন্ড তাই তারও ফ্রেন্ড।—এই কলকাতা থেকে কথা বলছ? কবে এসেছ? কোথায় উঠেছ?

—ধীরে বন্ধু ধীরে। তোমার বুকের তলার দাপাদাপি ফোনে শো· যাচ্ছে। কখন দেখা হবে?

ওধার থেকে দরাজ হাসির শব্দ। হোটেলের হদিস দিয়ে বাপী ওকে চলে আসতে বলল। কিন্তু সেই বিকেল ছটার আগে বিজয়ের দম ফেলার সময় নেই। একটা বড় টেণ্ডারের ফয়সালা হবে আজই। ওদিক থেকে তার আরজি, কলকাতায় সে আনকোরা নতুন এখনো, বলতে গেলে এখন পর্যন্ত কিছুই চেনে না, তার থেকে ফ্রেন্ড যদি ঠিক ছটায় তার খিদিরপুরের ফার্মে চলে আসে তো খুব ভালো হয়—ছটার পর থেকে রাত পর্যন্ত সে তার খাতিরের গেস্ট।

বাপী রাজি হতে খুশির হাসি হেসে ফোন ছেড়ে দিল। এত ব্যস্ত বলেই হয়তো ফোনে তার প্রেমিকার সম্পর্কে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করল না।

কিন্তু বিকেল ছটা দূরের পাল্লা। বাপী এতক্ষণ করে কি। তক্ষুনি বন্ধু নিশীথ সেনের কথা মনে হল। এখনো বুথের আপিসের চাকরি করছে, না হবু কবিরাজ পাকা কবিরাজ হয়ে বসেছে এতদিনে, জানে না। চার বছরের মধ্যে চিঠিপত্রেও যোগাযোগ নেই। নোট বইএ ওর বাড়ির ফোন নম্বর লেখা আছে।

দুটো চোখের মতো কান দুটোও বাপীর জোরালো। ও-দিকের গলার আওয়াজ পেয়েই মনে হল নিশীথ ফোন ধরেছে। অর্থাৎ কবিরাজই হয়েছে, আপিস থাকলে এ-সময় তার বাড়ি থাকার কথা নয়।

গম্ভীর সুরে জিজ্ঞাসা করল, সিনিয়র কোবরেজ মশাই কথা বলছেন, না জুনিয়র?

—জুনিয়র। আপনার কাকে চাই?

—আপনাকেই। চট করে একবার না এলেই নয়।

—কোথায়?

হোটেলের নাম আর সুইট নম্বর বলল। ওদিকের বিমূঢ় মূর্তিখানা না দেখেও বাপী আঁচ করতে পারে। অমন একখানা হোটেলের কোনো রোগী ওর শরণাপন্ন ভাববে কি করে, বিশ্বাসই বা করবে কি করে।

—আমার নাম বাপী৷ চেনা-চেনা লাগছে?

—বা-আ-বাপী! কানের পর্দায় দ্বিতীয় দফা বিস্ময় আছড়ে পড়ল।—বাপী তুই? এতকালের মধ্যে একটা খবর নেই, কোন্ ভাগাড়ে ডুব দিয়ে বসেছিলি? ওই হোটেলের

কারো সঙ্গে দেখা করতে এসেছিস?

একটি কথারও জবাব না দিয়ে বাপী বলল, আধ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, চলে আয়। বিকেলের আগে ছাড়া পাচ্ছিস না বাড়ীতে বলে আসিস।

ঘড়ি ধরে আধ ঘণ্টার মধ্যেই দরজার বাইরে প্যাঁক করে আওয়াজ হল। বাপী তখন হাফ পার্টিশনের এ-ধারে আরামের শয্যায় শুয়ে।—কাম ইন।

ঘরে ঢুকে নিশীথ পার্টিশনের ও-ধার থেকে সন্তর্পণে গলা বাড়ালো। এ কোন্ স্বপ্নপুরীতে এসে হাজির হয়েছে ভেবে পাচ্ছে না। ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখে বাপী ডাকল, হাঁ করে দেখছিস কি? ভিতরে আয়।

বেঁটে-খাটো নিশীথের দু চোখ সত্যি ছানাবড়া। চোখে দেখেও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। ভিতরে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখে নিল আর এক দফা। লোয়ার ডিভিশন চাকরি যোগাড় করে যাকে জলপাইগুড়ি থেকে টেনে এনেছিল চার বছরের মধ্যে তার এমন ভাগ্য বিশ্বাস করে কি করে?

—এ-ঘরে সত্যি তুই থাকিস নাকি?

—পাগল! বাপীর ভূত থাকে। বোস্।

উঠে বসে গদীর বিছানাটা চাপড়ে দিল। এমন বিছানায় বসেও অস্বস্তি নিশীথের।

—কি ব্যাপার রে? চেয়ারাখানা আগের থেকেও তো ঢের খোলতাই হয়েছে—গুপ্তধনের হদিস-টদিস পেয়েছিস নাকি?

বাপী হাসছে মিটি-মিটি। জবাব দিল, পুরুষের ভাগ্য।

—ভাগ্যের জোরে তো মশার দশা গিয়ে একেবারে হাতির দশা চলছে মনে হচ্ছে—খুলে বলবি কিছু, না কি?

ওপর-পড়া হয়ে সে-ই খুঁটিয়ে জিগ্যেস করে বন্ধুর ভাগ্যের জোয়ারের মোটামুটি হদিস পেল। বনজ ওষুধের কাঁচা বা শুখা মাল হোলসেল দোকান থেকে ওদেরও কিনতে হয়। ওই সব বড় বড় হোলসেলাররা আবার যাদের কাছ থেকে মাল কেনে তারা কত মুনাফা লোটে নিশীথের ধারণা নেই। বাপী এই নামজাদা হোটেলে এসে ওঠা থেকে কিছুটা বোঝা যাচ্ছে।

ফোঁস করে বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা।—বরাত বটে একখানা তোর, পেলি কি করে?

গায়ত্রী রাইয়ের প্রসঙ্গ ধামাচাপা। এখনো তার নাম উল্লেখ করল না। এমন ভাগ্য দেখে ওর আনন্দ আটখানা হওয়া সহজ নয়। একসময় বাপী ওর করুণার পাত্র ছিল তো বটেই।

—তুই যা বললি ভাই, সবই বরাত রে ভাই। তোর খবর বল্ শুনি, বিয়ে-থা করেছিস?

নিজের প্রসঙ্গেও নিশীথ বীতশ্রদ্ধ। সরকারী আপিসের সেই টেম্পোরারি চাকরি করেই গেছে। বাবার দাপটে আদাজল খেয়ে কোবরেজিতেই লেগে যেতে হয়েছে। বছর আড়াই আগে কিছু টাকা খরচ করে বাবা কাশীর কোথা থেকে আয়ুর্বেদের একটা চটকদার ডিপ্লোমা এনে দিয়েছে ওকে। রোগী এলে বাবা ওকেই আগে সামনে ঠেলে দিতে চেষ্টা করে, আর ছেলের সম্পর্কে আয়ুর্বেদীয় জ্ঞানগরিমার গুণকীর্তন শোনায়। কিন্তু লোকে তাতে খুব একটা ভোলে না। বাবার সঙ্গে ছেলের এখন বিয়ে নিয়েই মন-কষাকষি চলছে। ছেলের জন্য বাবা এখন একটি জ্যান্ত পুঁটলি ঘরে আনতে চায়। মেয়ের গায়ের রং ময়লা আর ওর মতোই বেঁটে-খাটো। বাবার চোখে সব দিক থেকে রাজ-যোটক। মেয়ের বাপের বাজারে নিজস্ব বড় একটা মুদি দোকান। অঢেল কাঁচা পয়সা। তিনটি মাত্র মেয়ে। ছেলে নেই। মেয়ে ক্লাস সেভেনে পর্যন্ত পড়ে এখন ঘরে বসে বিশ্রাম করছে। এমন রূপগুণের পুঁটলিকে বিয়ে করতে আপত্তি দেখে বাবার উঠতে বসতে হুমকি।

কথায় কথায় মাকে শোনায়, কুঁজোর আবার চিৎ হয়ে শুয়ে চাঁদ দেখার সাধ!

সখেদে আবার একটা গরম নিঃশ্বাস ছাড়ল নিশীথ।—আমার অবস্থাখানা বোঝ একবার—

সহানুভূতির দায়ে বাপী তাকে একনম্বরি লাঞ্চ খাইয়ে কিছুটা তুষ্ট করল। ডাইনিং হলএ নগদ খরচায় এ-পর্ব সমাধা করেছে। বিল মেটাবার সময় বাপীর ঢাউস ব্যাগে একশ টাকার নোটের তাড়া দেখেও নিশীথের দু-চোখ গোল!

হাতে অঢেল সময় এখনো। বেরিয়ে এসে বাপী একটা ট্যাক্সি নিল। বনজ ওষুধের পাইকিরি বাজারটা একবার ঘুরে দেখবে। চার বছরে ব্যবসার স্বার্থ ওরও রক্তে এসে গেছে।

পাইকারদের আসল ঘাঁটি বড়বাজারে। দমদম আর উল্টোডাঙার দিকে তাদের গোডাউন। নিশীথ ওকে বড়বাজারে নিয়ে এলো। মাঝারি দুজন ডিলারের সঙ্গে ওর কিছু যোগাযোগ আছে। বড় মাঝারি ডিলারদের বহু ঘাঁটিতে হানা দেবার ফলে বাপীর আগ্রহ চারগুণ বেড়ে গেল। এমন সোনার বাজার এখানে কল্পনা করে নি। বাপীর বেশ-ভূষা চেহারাপত্র আর ছাপা কার্ড দেখে আর কথাবার্তা শুনে মালিকরা খাতিরই দেখিযেছে। ভারতের এত জায়গায় যাদের শাখা-প্রশাখা, তার বাঙালী পার্টনার আর জেনারেল ম্যানেজারকে হেলাফেলা করবেই বা কেন।

ঘুরে ঘুরে বাপী মোটামুটি তথ্য যোগাড় করল. আগের দিন হলে গায়ত্রী রাই তক্ষুনি তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে কলকাতায় চালান করত হয়তো। দেশজোড়া নাম আছে. এখানকার এমন কটা বড় কবিরাজি কারখানাতেই কম করে তিরিশ লক্ষ টাকার বনজ উপকরণ লাগে। গ্রীষ্মকালে কবিরাজির মন্দা বাজার. শীতকালে জমজমাট। এছাড়া বড় ফার্মেসিউটিক্যাল ফার্মগুলোতেও পনের বিশ লক্ষ টাকার মাল সরবরাহ হয়ে থাকে। আর মাঝারি বা ছোট কবিরাজি বা ওষুধ তৈরির কারখানাগুলোর চাহিদা যোগ করলে তা-ও কম ব্যাপার নয়! এখানে বাসে বা ট্রেনে বেশির ভাগ মাল আসে মোকাম থেকে।

ব্যবসা সম্পর্কে বাপীর কথাবার্তা শুনে আর তৎপরতা দেখেও নিশীথ চুপ মেরে গেছে। উদ্দেশ্যও বুঝেছে। ওকে নিয়ে সেই ট্যাক্সিতেই বাপী দমদম চলে গেছে গোডাউন-গুলো দেখতে। তারপর বাপীই বলেছে, ব্রোকারের মারফৎ শুধু মাল চালান দেওয়া নয়, সুযোগমতো যতো শিগগীর পারে গোডাউন ভাড়া করে এখানে রিজিয়ন্যাল সেন্টার খুলবে।

ব্যাপারখানা কত বড় নিশীথের এরপর আঁচ করতে অসুবিধে হয় নি। উত্তরবাংলা বিহার মধ্যপ্রদেশের অনেক জায়গায় ওদের রিজিয়ন্যাল সেন্টার আছে, আর সে-সব জায়গায় রিজিয়ন্যাল ম্যানেজার কাজ করছে কথায় কথায় তাও জেনে নিয়েছে।

ফিরতি পথে ট্যাক্সিতে বসে নিশীথ জিজ্ঞাসা করল. এইসব রিজিয়ন্যাল ম্যানেজারদের মাইনে কত রে?

মাইনে শুনে আর তার ওপর বরাদ্দ কমিশনের অঙ্ক শুনে নিশীথ নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। তারপর আবার চুপ।

কলেজ স্ট্রীটে বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামতে নিশীথ ওকেও জোর করে নামাতে চাইল। কিন্তু ঘড়িতে তখন পাঁচটা বাজে। ছটায় খিদিরপুরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। শুনে অনুনয়ের সুরে নিশীথ বলল. আচ্ছা এক মিনিটের জন্য একবার নেমে আয়।

কি হল না বুঝে বাপী নেমে এলো। নিশীথের দু চোখ এমন চকচক করছে কেন হঠাৎ বাপী বুঝছে না। পরক্ষণে বোঝা গেল।

—এখানে তোদের রিজিয়ন্যাল অফিস হলে আমার ম্যানেজারের চাকরিটা পাবার

ব্যবস্থা করে দিতে পারবি?

ভিতরে ভিতরে বাপী বিরক্ত। এ ব্যাপারে সে নির্মম। তক্ষুনি বলল, আমার কি হাত বল, মালিক খুব কড়া লোক—

—তুই চেষ্টা করলেই হবে ভাই। আঙুল তুলে তিনখানা বাড়ির পরের একটু পুরনো বাড়ি দেখালো।—ওই বাড়ির দোতলায় একটি মেয়ে থাকে, বাবা মা নেই, কাকাদের কাছে থাকে। এবারে বি-এ পাশ করেছে। মেয়েটা ফর্সা নয়, কিন্তু ভারী সুশ্রী আর কি মিষ্টি গান গায়। রোজ সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে আমি শুনি। আজ পর্যন্ত কথা হয় নি বটে, তবু ওই মেয়েও আমাকে বেশ লক্ষ্য করেছে জানি। কিন্তু কোবরেজের ছেলে কোবরেজ হয়ে সেদিকে হাত বাড়াতে গেলে ওরা ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবে। একটা ভালো চাকরি পেলে আশা ছিল...।

চোখে-মুখে প্রত্যাশা উপচে পড়ছে। বাপীর মনে আছে ওই একদিন বলেছিল, কবি-রাজের ছেলে হবু কোবরেজের সংগে কোনো আধুনিক মেয়ে প্রেমে পড়েছে এমনটা নাটক-নভেলেও দেখা যায় না। বাপী দেখছে ওকে। এই আবেদন যে কত মোক্ষম নিশীথও জানে না।

—ঠিক আছে, লেগে থাক। আমি চেষ্টা করব।

বলতে পারত, এখানে রিজিয়ন্যাল ইউনিট হলে চাকরি তোর হয়েই গেছে ধরে নিতে পারিস। কিন্তু অতটা বলে কি করে, একটু আগেই বলেছে ওর হাত নেই আর মালিক কড়া লোক।

বিজয় মেহেরা আগেও সুপুরুষ ছিল। এখন আরো খোলতাই হয়েছে। ফর্সা মুখে লালচে আভা, মাথার পাতলা চুল এখন বাদামী ঘেঁষের। আগের থেকেও কমনীয় জোরালো পুরুষে ছাঁদ।

সহজ আনন্দে বাপীকে জাপটে ধরল। বলল, মাত্র দশ মিনিট আগে ফ্রি হলাম। তারপরেই তুমি আসছ মনে পড়তে দশটা মিনিট যেন দশ ঘণ্টা!

বাপীর ভালো লাগছে। ছেলে কাজের সময় কাজ-পাগল আর প্রেমের সময় প্রেম-পাগল। টিপ্পনী কাটল, আমি আসছি বলে, না ডলির দূত আসছে বলে?

হা-হা শব্দে হাসল। তারপর পাল্টা জবাব দিল, তুমিও আমার কাছে কম নও। লণ্ডনে থাকতে ডলির যত চিঠি পেয়েছি তার সবগুলোতে [illegible]-এর একগাদা করে প্রশংসা। মাঝে মাঝে ভয় ধরেছে, আমার কপাল না ভাঙে।

অফিস আর ফ্যাক্টরি এলাকার মধ্যেই একদিকে রেসিডেনসিয়াল কোয়ার্টারস। তাছাড়া মস্ত ক্লাব আছে, ঢালাও খানাপিনার ব্যবস্থাও আছে সেখানে। দুঘরের সুন্দর একটা ফ্ল্যাটে থাকে। আগে বাপীকে সেখানে নিয়ে এলো।

—ডলি কেমন আছে বলো।

—খুব ভালো। পাকা ফলটির মতো তৈরি।

এক্ষুনি ছুটে গিয়ে দেখতে পাচ্ছে না বলে গলা দিয়ে একটা হাল্কা খেদের আওয়াজ বার করল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তুমি কলকাতায় এসেছ কেন?

নির্জলা সত্যি কথাটা বলে কি করে। জবাব দিল, ডলির তাগিদে।

খুশি। হাসছে—একেবারে গ্রীন সিগন্যাল নিয়ে এসেছ তাহলে?

বাধ্য হয়ে এবারও সত্যের অপলাপ—অতটা নয়, রেড থেকে ইয়েলো হব-হব বলতে পারো।

সংগে সংগে অসহিষ্ণু রাগের ঝাপটা।—এতদিন পরে ইয়েলো হব-হব। অথচ ভুলি

প্রত্যেক চিঠিতে আমাকে লিখেছে ফ্রেন্ড যখন ফয়সলার ভার নিয়েছে তোমার কোনো ভাবনা নেই! আমি কি ভিখিরি নাকি যে কবে তিনি দয়া করবেন সেই আশায় বসে থাকব!

এবারে বাপীও গম্ভীর একটু। প্রায় অনুযোগের সুরে বলল, আচ্ছা বিজয়, তোমার হবু শাশুড়ী কেমন আছেন একবারও জিগ্যেস করলে না তো?

অপ্রস্তুত একটু।—ডলি লিখেছিল বটে শরীর ভালো যাচ্ছে না, কেমন আছেন?

—বেশ খারাপ।

—কি হয়েছে? এবারে উদ্বিগ্ন একটু।

—হার্টের কি-সব ভাল্ব-টাল্ব ড্যামেজ। ফরেনে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোর কথা ভাবছি।...এর মধ্যে তোমার গ্রীন সিগন্যালটাই যদি বড় করে দেখো সেটা কেমন হবে?

সমস্যাটা অস্বীকার করা গেল না।—গেলে ডলিও সঙ্গে যাবে?

—একমাত্র মেয়ে কাছে থাকবে না সেটা হয় কিনা তুমিই ভাবো।

বিজয়ের বেজার মুখ। এই থেকেই বোঝা গেল ছেলেটার মায়া দয়া আছে। তবু বলল, বিয়েটা হয়ে যেতে বাধা কি, তারপর না-হয় যাক।

—সে চেষ্টাও করতে পারি। তাছাড়া বাইরে উনি যেতে চাইবেন কিনা তাও জানি না। মোট কথা, এমন একটা অবস্থার মধ্যে তাঁর মুখ না তাকিয়ে তুমি যদি তাড়াহুড়ো কিছু করে ফেলার জন্য জুলুম করো তাহলে আমাদের সকলকেই মুশকিলে ফেলবে। তোমাকে ধৈর্য ধরে আর একটু অপেক্ষা করতে হবে।

বিজয় চুপ খানিকক্ষণ। তারপর হালছাড়া গোছের বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে।...তবে আমি আশা করেছিলাম, ডলির মায়ের মন খানিকটা তৈরি হয়ে আছে।

—ওই চাকরি ছেড়ে তুমি ব্যবসায় চলে এসো, দশ মিনিটের মধ্যে আমি তাঁর মন তৈরি করে দিচ্ছি।

—তা কখনো হয়!

—তা যখন হয় না, এমন একটা তসুখের সময় একমাত্র মেয়েকে চোখের আড়াল করা কত শক্ত সেটাও তোমাকে বুঝতে হবে। তুমি শুধু ঠান্ডা মাথায় একটু অপেক্ষা করো, আমি দেখছি কত তাড়াতাড়ি কি করা যায়।

বিজয় ক্লাব ক্যানটিনে ডিনারে নিয়ে গেল তাকে। খাওয়ার ফাঁকে তার চাকরি-বাকরির খোঁজও নিতে ভুলল না বাপী। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে এই দু'ঘণ্টা সময়ের মধ্যে, ওর কম করে গোটা পনের সিগারেট খাওয়া সারা।

খাওয়া শেষ করেই আবার সিগারেট ধরাতে বাপী বলল, তোমার সিগারেটের মাত্রা বেড়েছে মনে হচ্ছে—

—তা কি করব। সমস্ত দিন খাটাখাটুনির পর এই তো সঙ্গী।

—ড্রিংকএর মাত্রা বাড়েনি তো?

নিঃসংকোচে হেসেই জবাব দিল, তাও বেড়েছে, আজ তোমার কম্প্যানি পেলাম বলে দরকার হল না—ভালো চাও তো তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করো।

বাপীও হেসেই সাবধান করল, এ দুয়ের কোনোটাই কিন্তু তোমার হবু শাশুড়ী ভালো চোখে দেখবেন না।

সিগারেটে আরামের টান দিয়ে বিজয় বলল, তাঁর সামনে প্লেন ওয়াটার ছেড়ে ডিসটিলড ওয়াটার খাবো।

আবার আসবে কথা দিয়ে বাপী হোটেলে ফেরার ট্যাক্সি ধরল।

ভোরের আলোয় চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চা ছেলের মতো বাপীর মনে হল, আর মাত্র এই দিন আর রাতটা কাটলে তারপর যা কিছু সব মিষ্টি। এই দিন আর রাতটাকে চোখের পলকে পিছনে ঠেলে দিতে পারলে দিত। কিন্তু মিষ্টির প্রতীক্ষাটুকুও খুব মিষ্টি গোছের কিছু।

নিশীথের দুপুরে আসার কথা। বাপী ওকে সকালেই আসতে বলেছিল, কিন্তু সকালে পাশে না থাকলে বাবা এই বয়সেও কটু কথা শোনায়। চায়ের পাট শেষ করে দাড়ি কামাতে কামাতে বাপী ভাবছিল ও এলে একবার ব্রুকলিনে গিয়ে আগে রতন বণিকের সঙ্গে দেখা করবে। তারপর আজ আর কোনো কাজটাজ নয়, দুপুরের শোয়ে নিশীথকে নিয়ে একটা সিনেমা দেখবে। কতকালের মধ্যেও সিনেমা-টিনেমার ধারেকাছে ঘেঁষেনি।

সকাল তখন সোয়া নটা। ঘরের টেলিফোন বাজল। বিজয় আর নিশীথ দুজনেই টেলিফোন নম্বর নিয়েছিল। ওদেরই একজন হবে ধরে নিয়ে সাড়া দিল।

ওদিক থেকে অপরিচিত গলায় প্রশ্ন এলো, বাপী তরফদার?

সায় দেবার পর যা শুনল, বাপীর হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে ওঠার দাখিল।—আমি সুদীপ নন্দী...মিষ্টির দাদা, তোমাদের বানারজুলির দীপুদা...চিনতে পারছ?

সহজ হবার দায়ে বাপী চুপ একটু। তাছাড়া হঠাৎ এমন একজনের টেলিফোন অপ্রীতিকর কিছু শোনার আশঙ্কাই বেশি। জবাব দিল, আমি চিনতে পেরেছি, তোমার মনে আছে সেটাই আশ্চর্য।

ওদিক থেকে মোলায়েম হাসির শব্দ।—আমার মনে থাকবে না কেন, আমি তো তখন অ্যাডাল্ট।...তুমি এত বড় হয়েছ জেনে মা আর আমি খুব খুশি হয়েছি। সেদিন বাড়ির দোরগোড়ায় এসেও না দেখা করে চলে গেছ শুনে মা মিষ্টির ওপরেই খুব রাগ করেছে।

রোসো বাপী তরফদার, রোসো। বুকের তলায় লাফঝাঁপে বে-সামাল হয়ো না। হেসে বলল, রাত হয়ে গেছল, মিষ্টি তো দিল্লি থেকে আজ রাতেই ফিরছে?

—হ্যাঁ। আমি কাল দিনে দুবার আর সন্ধ্যের পর একবার তোমাকে ফোন করেছিলাম ...তুমি ঘরে ছিলে না।

—তাই নাকি? বাপীর গলায় অন্তরঙ্গ খেদ।—জানি না তো, অপারেটারকে বলে রাখলে আমিই ফোন করতাম...

—তাতে আর কি হয়েছে...তুমি আজ বিকেলেই এসো না একবার, এখানেই চা-টা খাবে? মা-ও বার বার বলছেন তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে...অবশ্য এসো—আসবে তো?

বুকের তলায় আবারও খুশির দামাল বাতাস। মিষ্টি দিল্লি রওনা হবার আগে এদের তাহলে যা বোঝাবার বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। নইলে এদের কাছ থেকে এমন আমন্ত্রণের আর কোনো অর্থ হয় না। আপত্তি করার কোনো প্রশ্ন নেই। জিজ্ঞাসা করল, বিকেলে কখন?

—আমি পাঁচটার মধ্যে কোর্ট থেকে ফিরব...ধরো সাড়ে পাঁচটা ছটা?

—তুমি কোর্টে প্র্যাকটিস করছ?

—হ্যাঁ, হাইকোর্টে। বিলেত থেকে ফিরে এসে ব্যারিস্টারি করছি, মিষ্টি বলেনি?

বাপী তাড়াতাড়ি সামাল দিল, হ্যাঁ তাই তো, চার বছর আগেই শুনেছিলাম তুমি ব্যারিস্টারি পড়তে গেছ। ঠিক আছে বিকেলে যাব, কিন্তু একটা শর্তে।

—কি?

—রাতে আমার এখানে তোমার ডিনারের নেমন্তন্ন। তোমাকে নিয়ে একসঙ্গে ফিরব।

—ওয়াণ্ডারফুল! বানারজুলির গাঁট্টা-মারা সুদীপ নন্দীর অস্তিত্ব নেই আর।—

তোমার হোটেলের ডিনার মানে তো মস্ত ব্যাপার! গলা খাটো করে জিগ্যেস করলো, বিলিতি খাওয়াবে তো?

—নিশ্চয়, যা তোমার ইচ্ছে আর যত ইচ্ছে। ডান?

—ডান।

—ঠিক আছে, ছটার মধ্যে যাচ্ছি।

রিসিভার নামিয়ে বাপী হাওয়ায় ভাসল খানিকক্ষণ।...মিষ্টি বেশি রাতে ফিরবে, কোনো অছিলায় আজই তার সঙ্গে দেখাটা হয় না? কি করে হবে, বাপী যে আবার আনন্দে কাঁসি হারিয়ে বোকার মতো দীপুদাকে হোটেলে ডিনারের নেমন্তন্ন করে বসল! তাহলেও ভালোই করেছে। ওই মা-ছেলেকে বশে আনতে পারাটাও কম ব্যাপার নয়।

নিশীথকে টেলিফোন করে আসতে বারণ করে দিল। জরুরী কাজ পড়ে গেছে। পরে কবে কখন দেখা হবে, টেলিফোনে জানাবে। এই দিন আর ওর সঙ্গ ভালো লাগবে না, সিনেমা-টিনেমাও না।

ফের বাতাসে সাঁতার কাটার ফাঁকে আবার মনে হল কিছু। ও অনেক বড় হয়েছে, মিষ্টির মা আর দাদার এত খাতির অনেকটা এই কারণে। তা না হলে উল্টে ওর ওপর অসন্তুষ্ট হত তারা। এই দুজনের কাছে বড় হওয়াটা আরো জাঁকিয়ে তোলার তাগিদ। রিসিভার তুলে সোজা ম্যানেজারকে চাইল। বক্তব্য, আজ বিকেল থেকে ওর জন্য ভালো একটা সার্ভিস-কার অ্যারেঞ্জ করা সম্ভব কিনা। শুধু আজকের জন্য নয়, পর পর কয়েক-দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওই গাড়ি তার হেপাজতে থাকবে। তার জন্য যত খরচ লাগুক, আপত্তি নেই।

ঘণ্টা দুই বাদে ম্যানেজার জানালো, ভালো সার্ভিস-কারই পাওয়া গেছে। গাড়ি নিচে আছে, সে ইচ্ছে করলে দেখে যেতে পারে।

বাপী তক্ষুনি নেমে এলো। তখন বিলিতি গাড়িরই ছড়াছড়ি বেশি। ঝকঝকে গাড়ি। তকমা-পরা ড্রাইভার। তাকে ঠিক পাঁচটায় আসতে বলে বাপী হৃষ্টচিত্তে ওপরে উঠে এলো।

সাতাশি নম্বরের সেই বাড়ি। মাত্র চার বছর আগে এই বাড়িরই দোরগোড়ায় পাড়ার স্তাবকের দল কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে ওকে ছেঁকে ধরেছিল, ছিঁড়ে খেতে চেয়ে-ছিল। আজ সেই বাড়িতেই বাপী তরফদার সমাদরের অতিথি। টাকা যার, মামলা তার। বাপী সেই মেজাজেই দূর থেকে দোতলার বারান্দার দিকে তাকালো। রেলিংএর কাছে মনোরমা নন্দী দাঁড়িয়ে। পাশে দীপুদা।

এই গাড়ি দেখেও তাদের চোখ ঠিকরেছে বাপী আঁচ করতে পারে। গাড়ি থামতে ড্রাইভার আগে নেমে শশব্যস্তে দরজা খুলে দিল। বাপী নামল।

দীপুদা ছুটে নেমে এসে ওকে সাদরে জাপটে ধরে ভিতরে নিয়ে গেল। মনোরমা নন্দীও নেমে এসেছেন। এখন আর ব্যঙ্গ করে বাপীর তাঁকে মেমসায়েব বলতে ইচ্ছে করছে না। হাসিমুখে এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

—বাঃ, ভারী সুন্দর চেহারা হয়েছে তো তোমার, না জানলে আমি চিনতেই পারতুম না! বোসো বোসো।

অন্তরঙ্গ হেসে দীপুদা বলল, কেন, ছেলেবেলাতেই তো বেশ চেহারা ছিল ওর।

মিসেস নন্দীর মুখের হাসি খুব প্রাঞ্জল ঠেকল না বাপীর। হাসির ওধারে যাচাইয়ের চোখ। ছেলের কথার জবাবে বললেন, তা ছিল, কিন্তু কি দুষ্টু, কি দুষ্টুই না ছিল তখন!

হৃষ্টমুখে দীপুদা মন্তব্য করল, অমন দুষ্টু ছিল বলে আমি তখনই জানতাম ও কালে-দিনে বড় হবে।

বাপীর মজাই লাগছে। তার কানে এখনো মহিলার শাসনের স্পর্শ লেগে আছে। পিঠের চাবুকের দাগ আজও মেলায়নি। দীপুদার কথায় কথায় গাট্টা মারাও ভোলেনি। কিন্তু আজ টাকা যার, মামলা তার।

মনোরমা নন্দীর বাবা মারা গেছেন শুনল। এক মেয়ে, তাই বাড়িটা এখন তাঁর। দীপুদা বিয়ে করেছে। ছেলেও আছে। বউকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিল। বেশ সুশ্রী, কিন্তু রোগা। তাদের দেড় বছরের ফুটফুটে ছেলেটাকে বাপী আদর করে কোলে তুলে নিল। চারদিক তাকিয়ে বাপীর কেন যেন মনে হল বিলেত-ফেরত দীপুদার ব্যারিস্টারির পসার তেমন জমজমাট নয়।

আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি নেই তা বলে। মনোরমা নন্দী জোর করেই অনেক কিছু খাওয়ালেন। শাঁসালো ডিনারের লোভে দীপুদা সামান্য খেল। মা-ছেলে তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওর খবর নিতে লাগল। অর্থাৎ ঠিক কত বড় হয়েছে আঁচ করার চেষ্টা। মহিলা শেষে জিজ্ঞেস'ই করে ফেললে, এত বড় ফার্মের তুমিই সকলের ওপরে, না তোমার ওপরে আর কেউ আছে?

—মালিক আছেন। তবে আমাকেই সব করতে হয়।

—মাইনে তো তাহলে অনেক পাও নিশ্চয়?

সত্যি যা তার চেয়ে ঢের বেশি বাড়িয়ে বলার লোভ সামলালো বাপী।—অনেক আর কি...হাজার আড়াই।...তবে আসল রোজগার পার্টনারশিপের শেয়ার আর কমিশন থেকে, সেটা মাইনের থেকে অনেক বেশি।

বাহান্ন সালে যুদ্ধোত্তর স্বাধীন ভারতের আর্থিক কাঠামোর দিকে তাকালে রোজগারের এই জলুস যে কোনো মধ্যবিত্তের চোখ ঠিকরে দেবার মতো। যুদ্ধের আপিসগুলো গোটানোর ফলে যে সময় ঘরে ঘরে বেকার, সামগ্রিক ব্যবসার বাজারও মন্দা।

মা আর ছেলে দুজনের কারো মুখে কথা সরে না খানিকক্ষণ। নিজের বিত্তের ঢাক বাজানো এই প্রথম। বাপীর নিজেরই কান জুড়লো। চোখও। বানারজুলির গরিব কেরানীর ছেলে এতদিনে তার হেনস্থার জবাব দিতে পেরেছে।

বাইরেটা শুধু সহজ নয়, অন্তরঙ্গও।—আপনাদের খবর কি বলুন—মেসোমশাই এখন কোথায় পোস্টেড?

বানারজুলির সেই দাপটের বড়সাহেবকে আজ অনায়াসে মেসোমশাই বলতে পারল। মনোরমা নন্দী জবাব দিলেন, তাঁর তো সেন্টারের চাকরি এখন, ভাঁড়ুয়ায় আছেন। টান-ধরা তপতপে মুখ।—খবরের কথা আর কি বলব, কি যে মতি হল মেয়েটার, আমাদের সুখ-শান্তি সবই গেছে।

বাপী হতভম্ব হঠাৎ। এই কথা কেন! মিষ্টি এয়ার অফিসে কাজ করছে বলে? জিজ্ঞাসা করল, মিষ্টি কি করেছে?

এবারে মা আর ছেলে দুজনেই অবাক একটু। মনোরমা নন্দী ফিরে জিগ্যেস করলেন, কেন সেদিন মিষ্টি তোমাকে বলেনি কিছু?

বাপী আরো বিমূঢ়। মাথা নাড়ল। কিছু বলেনি।

সুদীপ নন্দীর ব্যারিস্টারি মাথাও যেন বিভ্রান্ত একটু।—হোটেল থেকে ফিরে মায়ের কাছে তোমার সম্পর্কে কত কথা বলল, মায়ের কাছে তোমার কার্ড নিয়ে বাড়িতে ডাকার কথাও বলে গেছে—আর নিজের সম্পর্কে ও তোমাকে কিছু জানায়নি!

অজ্ঞাত আশঙ্কায় বাপী দুজনকেই দেখে নিল একবার করে। আবারও মাথা নেড়ে জিগ্যেস করল, সুখ-শান্তি নষ্ট হবার মতো মিষ্টি কি করেছে?

কি জবাব দেবেন ভেবে না পেয়ে মনোরমা নন্দী ছেলের দিকে তাকালেন। দীপুদা

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বলল, মা আবার বেশি-বেশি ভাবছে, তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়—চলো তোমার হোটেলেই তো যাচ্ছি, শুনবে'খন।

বাপীও উঠে দাঁড়াল। দীপুদার এ কথায়ও স্বস্তি বোধ করল না। মনোরমা নন্দীর মুখখানাই আর এক দফা দেখে নিল। ওই মুখে সুখ-শান্তির অভাবের অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট এখন। নিজের ঘড়ির দিকে তাকালো, তারপর আবার মনোরমা নন্দীর দিকে।—মিষ্টির ফিরতে রাত হবে, তবু আমাকে একবার ফোন করতে বলবেন তো!

ফের বিপাকে পড়ার মুখ মহিলার। জবাব দিলেন না, এমন কি মাথাও নাড়লেন না।

বাপীর অপরিসীম ধৈর্য। গাড়িতে দীপুদাকে একটি কথাও জিগ্যেস করল না। হোটেলে ফিরেও আগে তার জমজমাট ডিনার ব্যবস্থা করল। আস্ত একটা খাস বিলিতি বোতল সোডা ইত্যাদি নিজের সুইটে আনিয়ে নিল। খানাপিনা শুরু করার পরেও দীপুদা খানিকক্ষণ নিজের কথাই চালিয়ে গেল। বিলেতে কতদিন ছিল, কেমন ছিল, এখানে ফিরে সব দেখেশুনে সে-তুলনায় কতটা বীতশ্রদ্ধ, সুযোগ-সুবিধে হলে সপরিবারে আবার সেইখানেই চলে যাবার বাসনা, এ-দেশে কেউ মানুষের দাম দেয় না, টাকা-পয়সার অভাব নেই যখন বাপী যেন ও-দেশটা ঘুরে দেখে আসে, ইত্যাদি। বাপীর হার্ড ড্রিংক চলে না শুনেও হতাশ একটু। নিজের গেলাস বার দুই খালি হবার পরেও নিষ্ফল অনুরোধ, দেখই না একটু টেস্ট করে, খারাপ লাগবে না।

তার গেলাস আরো এক-দফা খালি হবার পর বাপী নিজের হাতে বোতলের জিনিস এবার একটু বেশিই ঢেলে দিল। সোডা মেশালো। তারপর ঠাণ্ডা মুখে জিজ্ঞেস করল, মাসিমা কি বলছিলেন, মিষ্টি কি করেছে?

এবারে সুদীপ নন্দী গলগল করে যা বলে গেল তাতে ব্যারিস্টারি বাকচাতুরি থেকে স্থূল গোছের উষ্মাই বেশি।

বি-এ পরীক্ষার আগেই মিষ্টি উল্টোদিকের বাড়ির এক ছেলেকে বিয়ে করেছে। গোপনে রেজিস্ট্রি বিয়ে। ছেলের নাম অসিত চ্যাটার্জি, মিষ্টির থেকে কম করে আট বছরের বড়। ছেলেটা রূপে কার্তিক, গুণে মাকাল ফল। দুবারের চেষ্টায় আর-এ পাশ করেছে। সাড়ে তিনশ' না চারশ টাকা মাইনেয় সবে একটা ফার্মে ঢুকেছিল। এখনো পাঁচশ' টাকার বেশি মাইনে পায় কিনা সন্দেহ। মিষ্টিটা এত বোকা গাধা কে জানত, ছয় মাস না যেতে হাড় কালি। ছেলের বাপ-মা আর বাড়ির সব এমন গোঁড়া যে জানাজানি হবার পর বউ ঘরে নেওয়া দূরে থাক, তারা ছেলেকেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে। মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

দীপুদা আগে কিছু জানত না। মিষ্টির বিয়ের এক মাস বাদে সে বিলেত থেকে ফিরেছে। এসে দেখে বাবা ছুটি নিয়ে কলকাতায় বসে আছে, আর মায়ের মুখ কালি। গুণধর জামাইয়ের এত দেমাক যে শ্বশুর-শাশুড়ী ভুরু কোঁচকালেও তার অপমান হয়। হুমকি দিয়ে কথা বলতেও ছাড়ে না। মিষ্টির বি-এ পরীক্ষা হতেই জোর কবে তাকে নিয়ে গিয়ে আলাদা ঘরভাড়া করেছে। কিন্তু চলে কি করে? ওদিকে তো গুণের ঘাট নেই। মদের নেশা জুয়ার নেশা সবই আছে। এসব অবশ্য পরে জানা গেছে।

ছ'মাস না যেতে মিষ্টি মরতেই বসেছিল। ছেলেপুলে হবে, এদিকে টাকা-পয়সার জোর নেই, উঠতে বসতে অশান্তিরও শেষ নেই। অত সুন্দর মেয়েটার দিকে তাকালে তখন ভয় করে। বাছাধনের তখন টনক নড়ল, বউকে মায়ের কাছে পাঠাতে চাইল। কিন্তু মিষ্টির আবার তখন এমন গোঁ, কিছুতে আসবে না। আসবে কি করে, বাবা মা দাদা কাকে না অপমান করেছে অসিত চাটুজ্জে?

দীপুদাদের অজান্তে এরপর মিষ্টি শেষই হতে বসেছিল। পেটের ছেলে নষ্ট হয়ে

গেছে। তার ফলেই প্রাণ-সঙ্কট। অসিত চ্যাটার্জি সস্তার একটা হাসপাতালে এনে ফেলেছিল ওকে। সেখানেও আজেবাজে ডাক্তার দিয়ে অপারেশন হয়েছে। পরে দীপুদা আর তার মা কলকাতার সব থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে আসতে সে আবার অপারেশন করেছে। তাইতেই রক্ষা সেই বড় ডাক্তারও বলেছে, বাজে হাতে পড়ে মেয়েটার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। তবে প্রাণে যে বেঁচেছে এই ঢের।

এরপর টানা ছ'মাস মিষ্টি মায়ের কাছে ছিল। মেয়েটার শরীরের বাঁধুনি ভালো বলতে হবে, তিন মাস না যেতেই আগের শ্রী-স্বাস্থ্য সবই ফিরে পেয়েছে। পরের তিন মাসের মধ্যে এয়ার অফিসের চাকরিটাও নিজের চেষ্টাতেই পেয়ে গেছে। মা ওকে আর ছাড়তেই চায় নি। কতবার করে বলেছে, ভুল যা হয়েছে—হয়েছে, কাগজের বিয়ে ছিঁড়ে ফেললেই ছেঁড়ে। দীপুদাও বোনকে অনেক বুঝিয়েছে। কিন্তু মাথায় যে কি ওটার, হাঁ না কিছুই বলে না, শুধু হাসে। তাইতেই মা আর সে ভেবেছিল হয়তো রাজি হবে। কিন্তু ছ'মাস পার হতে নিজে থেকে আবার ওই অসিত চ্যাটার্জির কাছেই চলে গেল।

এখন অবশ্য লোকটা অনেকখানি ঢিট হয়েছে। তবু অমন একটা বাজে লোকের সঙ্গে বোন সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে এ দীপুদা বা তার মা বিশ্বাসই করে না। কিন্তু ও-মেয়ের মাথায় কি আছে কে জানে, মা তাগিদ দিলে হাসে, আবার বেশি বললে বিরক্ত হয়। মনোহরপুকুর রোডে মোটামুটি একটা ভালো ফ্ল্যাটেই থাকে এখন। সেদিন বাপী ওকে মায়ের বাড়ি পৌঁছে দিতে ঘণ্টাখানেক সেখানে থেকে তারপর নিজের বাড়ি চলে গেছে। আজ মিষ্টি ফিরবে বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গে দেখা হবে না বা কথা হবে না। কারণ ওর বাড়িতে টেলিফোনও নেই।

সমস্ত রাত চোখে-পাতায় এক হয়নি বাপীর। ঘুমোতে চেষ্টাও করেনি।

তার জগৎ অন্ধকার। এ অন্ধকার দূর করার মতো আলো নেই কোথাও। আগুন আছে। সেই আগুন বুকের তলায়। এ আগুন বাইরে নিয়ে এলে ওই অন্ধকারে যে ক্রুদ্ধ হিংস্র পশুটা থাবা চাটছে, সেটাও পুড়বে। বাপী তরফদার আর ওকে ধ্বংস করতে চায় না।

পরদিনই বানারজুলি চলে যাবার চিন্তা বাতিল। সকালে নিশীথ টেলিফোন করে আসতে চেয়েছে। বাপী বলেছে, আজ না, খুব ব্যস্ত। সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার নামিয়ে রেখেছে। একটু বাদে আবার টেলিফোন। বিজয় মেহেরা। তাকেও বলেছে, আজ না।

সকাল পেরিয়ে দুপুরও গড়াতে চলল। বাপী নরম গদীতে শুয়ে। অপেক্ষা করছে। এই বিকেলে মিষ্টি আসবে কথা দিয়ে গেছে। বাপীর ধারণা আসবে। সমস্ত ঘটনা ওর কানে দেবার জন্যেই মাকে আর দাদাকে বলে গেছে ওকে বাড়িতে চা'য়ে ডাকতে। নিজে কেন বলেনি? ভয়ে? তাই যদি হয়, তাহলে বিকেলে আর আসবে না। কিন্তু অত ভীতু বাপী ওই মেয়েকে এখনো কেন ভাবছে না, জানে না।

...এলে কি হবে?

বাপী তাও জানে না।

এলো। একলা নয়। সঙ্গে অসিত চ্যাটার্জি। তার পরনের ট্রাউজার বা কোট তেমন দামী নয়। চোখে আগের মতোই সোনার চশমা। গায়ের রং আগের তুলনায় কিছুটা ঝলসেছে। বিব্রত হাসি-হাসি মুখ।

মিষ্টির পরনে গাঢ় খয়েরি রংয়ের দামী শাড়ী। গায়ে চকচকে সাদা ব্লাউস।

সিঁথিতে সরু সিঁদুরের আঁচড়। কপালে লাল টিপ। কালকের থেকে ঢের বেশি সুন্দর। হিংস্র উল্লাসে ভোগের রসাতলে টেনে নিয়ে যাবার মতোই লোভনীয়।

নিজের এমন স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়ের ক্ষমতা কি বাপীর জানা ছিল! দু-হাত বাড়িয়ে সরগরম অভ্যর্থনা জানালো।—এসো অসিতদা এসো—চার বছর আগে লেকে তোমার সেই গলাধাক্কা খাবার পর থেকে তুমি আমারও হীরো হয়ে বসে আছ জানো না—

এরকম অভ্যর্থনার জন্য লোকটা প্রস্তুত ছিল না বোঝা যায়। খুব স্বেচ্ছায় হয়তো আসেনি এখানে। মিষ্টির বাড়ির রাস্তায় আর লেকে যাকে অত হেনস্থা করা হয়েছে, সে এখন এই হোটেলের এমন ঘরের বাসিন্দা, সে-কারণেও হয়তো সহজ হওয়া মুশকিল। মিনমিন করে জবাব দিল, ও-সব ছেলেবেলার ব্যাপার তুমি এখনো মনে করে বসে আছ...

হাত ধরে বাপী সাদরে তাকে গদীর বিছানাতেই বসিয়ে দিল। আধা পার্টিশনের ওধার থেকে একটা সোফা মিষ্টির সামনে টেনে আনল। তারপর নিজের খাটের একদিকে বসে ওই সোনার চশমার ওপর চড়াও হল আবার।—কাল দীপুদার মুখে সব শোনার পর থেকে কেবল তোমার কথাই ভাবছিলাম। তুমি একটা পুরুষের মতো পুরুষ, আমাকে তোমার শিষ্য করে নিলে বর্তে যাই।

চকচকে চশমার ওধারের চোখ দুটো স্বস্তি বোধ করছে না খুব। আবারও শুকনো হাসি টেনে বলল, কি যে বলো, কত বড় একজন মানুষ তুমি এখন...

—গুলি মেরে দাও, ধন-জন-যৌবন জোয়ারের জল—এলো তো এলো, গেল তো গেল। কিন্তু তুমি যে কেরামতি দেখিয়েছ, সন অফ কুবেরও ভেড়ার মতো তোমার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকবে।

মিষ্টি বাপীর দিকেই চেয়ে আছে। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ছুঁয়ে আছে। কিন্তু এর নাম হাসি নয়, হাসির মতো কিছু। ও মুখ দেখছে না, ভেতর দেখছে।

ও-রকম করে হাসলে আর অমন করে চেয়ে থাকলে বাপী কি করে বেশিক্ষণ এই হাসির মুখোশ ধরে রাখতে পারবে? ওর ভিতরটা কি-রকম লোলুপ হিংস্র ব্যভিচারী হয়ে উঠেছে মিষ্টি কি তা আঁচ করতে পারছে? পারলে অমন করে হাসত না। ও-ভাবে চেয়ে থাকতে পারত না।

টেবিলের ওপর বিলিতি মদের বোতলটা পড়ে আছে। দীপুদা ছ'আনা শেষ করে গেছে, বাকিটা আছে। অসিত চ্যাটার্জি ঘন ঘন ওই বোতলটার দিকে তাকাচ্ছে।

বাপী উঠে ছোট সেণ্টার টেবিল তার সামনে পেতে দিল। তারপর বোতলটা এনে রেখে জিগ্যেস করল, জল চাই, না সোডা?

অসিত চ্যাটার্জির দু চোখ খুশিতে চিকচিক করছে এখন।—জলই ভালো, কিন্তু মিলু রেগে যাচ্ছে।

মিলু শুনেই কানের পর্দা দুটো ছেঁড়ার দাখিল বাপীর। মালবিকা ওর মিলু। জলের জাগ্ আর একটা গেলাস তার সামনে রেখে বাপী তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দিল, শিবঠাকুরকেও পার্বতী গাঁজাখোর বলে গাল পাড়ত,—এসব দেখে মেজাজ না চড়ালে ওদের মান থাকে না। কাল দীপুদা মাত্র অতটুকু সাবাড় করে রেখে গেছে, আজ তোমার কেরামতি দেখাও।

দীপুদার নামটা সবুজ নিশানের কাজ করল। গেলাসে বোতলের জিনিস একটু বেশিই ঢেলে নিয়ে অসিত চ্যাটার্জি মিষ্টিকে বলল, এমন জিনিস পেলে কে আর লোভ সামলাতে পারে! বাপীকে জিগ্যেস করল, তোমার গেলাস কোথায়?

—আজ তুমিই চালাও। আমি এরপর দিনক্ষণ দেখে হাতেখড়ি দেব ভাবছি। রোসো, কিছু খাবার-দাবার আনাই—

আধঘণ্টার মধ্যে অসিত চ্যাটার্জি ভিন্ন মানুষ। বাপী যে এমন রত্ন ছেলে সে ভাবতেই পারেনি। মিলুও কখনো বলেনি। মাত্র একদিনের আলাপে বাপী আপনার জন হয়ে গেছে

তার, অথচ পান থেকে চুন খসলে আপনার জনেরাই দূরে সরে যায়,—যাচ্ছেও, ইত্যাদি।

মিষ্টির তাড়া খেয়ে আরো ঘণ্টাখানেক বাদে উঠল। বোতলের নিচে দু'ইঞ্চির মতো জিনিস পড়ে আছে। মিষ্টি খাবার ছোঁয়নি, শুধু এক পেয়ালা চা খেয়েছে। কিন্তু সে খাবারও প্রায় সবটাই অসিত চ্যাটার্জির উদরে গেছে। এখন ভালো মতো দাঁড়াতেও পারছে না। মিষ্টির মুখ লালচে দেখাচ্ছে এখন। কিন্তু রাগ যার ওপর হবার কথা, অর্থাৎ বাপীর দিকে সাহস করে যেন তাকাতেও পারছে না।

অন্তরঙ্গ জনের মতো লোকটাকে ধরে বাপী লিফটএ নিচে নামল। দরজার কাছে এসে অস্ফুট স্বরে বলল, আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসছি।

—ট্যাক্সির দরকার নেই, গাড়ি আছে। আঙুল নেড়ে বাপী তার সার্ভিস-কারের তকমা-পরা ড্রাইভারকে ডাকল। গাড়ি নিয়ে লোকটা সমস্ত দিন বসেই আছে।

—সাহেবকে আর মেমসাহেবকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে এসো।

থমথমে দু চোখ মিষ্টির মুখের ওপর স্থির কয়েক পলক। এতক্ষণ দুটো চোখ দিয়ে আর হিংস্র সত্তা দিয়ে যে আদিম পশু ওই তাজা নরম দেহটা ছিন্নভিন্ন করছিল, এখনো সে মুখোশের আড়ালে।

তাকালো মিষ্টিও। এখনো অভিযোগ নেই। শুধু কিছু যেন বোঝাতে চায়। ঠোঁটের ফাঁকে আবার সেই রকমই হাসির ছোঁয়া লাগল। যার নাম ঠিক হাসি নয়। হাসির মতো কিছু।

ঘুরে লম্বা লম্বা পা ফেলে বাপী তার ঘরে ফিরে চলল।

॥ সাত ॥

নিজের পৃথিবী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জীবন প্রতারণা করেছে? বাপী তরফদার কার ওপর শোধ নেবে? কাকে ক্ষমা করবে? নিজের দুটো পা কপাল পর্যন্ত ওঠে না। নইলে সবার আগে ওটাকেই থেঁতলে দিত। এই কপালের ওপর বড় বেশি আশা ছিল। আস্থা ছিল। প্রেম প্রীতি ভালবাসার কোনো দুর্জয় শক্তির উপর নির্ভর করে বসেছিল। যেন যত খুশি লম্বা দুটো হাত বাড়িয়ে তারা স্থান-কালের গণ্ডী টপকে কারো জন্যে কাউকে আগলে রাখতে পারে। এই বিশ্বাসে সত্তার সব কড়ি উজাড় করে ঢেলে দেয় এমন বোকাও কেউ আছে!

আজ ফিরছে গায়ত্রী রাই জানে না। বাগডোগরায় তাই গাড়িও অপেক্ষা করে নেই। লাউঞ্জে পা দিতেই একদিকের সোফার দিকে চোখ গেল। যাবার সময় যে সোফায় মাস্টার-মশাই ললিত ভড়ের মেয়ে কুমকুম বাপীর সামনে এসে বসেছিল। হাওয়া আপিসের এক অফিসার স্ত্রী সাজিয়ে ওকে কলকাতায় নিয়ে যাবে এ আশায় দু মাস ধরে দিন গুনছিল আর এখানে হানা দিচ্ছিল। আত্মনির্ভর জীবনে ফেরানোর আশ্বাস দিয়ে বাপী তাকে আট দশ দিন বাদে বানারজুলির ঠিকানায় দেখা করতে বলেছিল। বাপীর গলা দিয়ে নিঃশব্দ একটা কটূক্তি বেরিয়ে এলো।

এলে কি হবে? রেশমার কাজে লাগিয়ে দেবে, না দূর করে তাড়াবে? বাসনার যে আগুন শিরায় শিরায় জ্বলছে, নাগালের মধ্যে এলে আর কোনো মেয়ের তার থেকে অব্যাহতি আছে!

ইচ্ছে করেই বিকেল পার করে দিয়ে বানারজুলিতে পৌঁছুল। গত এক-দেড় বছরের মধ্যে সাইকেল রিকশা চালু হয়েছে এখানে। একটায় উঠে বসল। রিকশাঅলাটাকে হুকুম করল খুব আস্তে চালাতে। বানারজুলির আকাশ বাতাস জঙ্গল সব অন্ধকারে ডুবে

যাক। আরো ঘন হোক, আরো গাঢ় হোক। বুকের ভেতরটা যেমন কালি হয়ে আছে তেমনি হোক।...সেই কবে আবু রব্বানী বলেছিল, তার মুখ দেখলেই ভেতর-বার সাফ মনে হয়, মেমসায়েবের পছন্দ হবে ; কিন্তু আজ অন্তত বাপীর নিজের ওপর বিশ্বাস নেই। এই মুখ আজ অন্ধকারেই সেঁধিয়ে থাক।

—মিস্টার তরফদার, এক মিনিট। সাইকেল রিকশার টিমটিম আলোয়ও মুখ চিনে যে লোকটা হাত তুলে ডেকে থামালো, সে চা-বাগানের ক্লাবের ম্যানেজার ডাটাবাবু। রাস্তার উল্টো দিক থেকে হনহন করে আসছিল। ক্লাবে সন্ধ্যায় আসর বসার আগে ফেরার তাড়া সত্ত্বেও ওকে দেখে দাঁড়িয়ে গিয়ে রিকশা থামিয়েছে।

—কি মুশকিলে পড়েছি বলুন তো, কত দিনের মধ্যে আপনাদের কোনো চালান নেই, এদিকে ভাল মাল প্রায় শেষ—আপনি এখানে নেই খবর পেয়ে আবু রব্বানীর কাছে গেছলাম, ও বলল, আপনি কলকাতা থেকে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিছু মাল যে আমার এক্ষুনি দরকার।

বাপীর ইচ্ছে হল রিকশা থেকে নেমে ঠাস করে তার গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়। তার বদলে ঝাঁঝালো জবাব দিল, আপনার জন্যে আমি ঘরে মদের বোতল মজুত করে বসে আছি যে এক্ষুনি পাঠিয়ে দেব?

মেজাজের ঝাপটায় ডাটাবাবু বে-সামাল।—না না, তা বলছি না, যত তাড়াতাড়ি হয়—

—চলো! ঝাঁঝালো বিরক্তির হুকুম রিকশাঅলাকে।

আগের বাঁকের মাথায় নেমে রিকশার ভাড়া মিটিয়ে ট্র্যাভেল সুটকেস হাতে বাপী বাংলোর দিকে এগলো। বারান্দায় আলো জ্বলছে। মা বা মেয়ে সেখানে বসে নেই। এগিয়ে এসে নিঃশব্দে নিজের বাংলোর গেট খুলে ভেতরে এলো।

ফেব্রুয়ারির শেষ এটা। কলকাতার তুলনায় এখনো এখানে ঠাণ্ডা বেশি। অন্ধকার ঘরের জানালা-টানলাগুলোও না খুললে চলে। তবু টর্চ জ্বেলে বাপী ঘরের ভেতরটা দেখে নিল একবার। সুটকেসটা একদিকে আছড়ে ফেলল। কাঁধের কোটটা দূরে থেকে আলনার দিকে ছুঁড়ে দিল। তারপর বিছানায় সটান শুয়ে পড়ে টর্চ নিভিয়ে দিল। পরনের ট্রাউজার বদলে পাজামা পরার ধৈর্যও নেই।

মাথাটাকে শূন্য করে দেবার চেষ্টা। কোনরকম চিন্তা মাথায় ঢুকতে দেবে না। ভালো না মন্দ না। আশা না হতাশা না। কিন্তু এমন অসম্ভব চেষ্টার সঙ্গে যুঝতে হয়। বাপী যুঝছে।...এই রাত পোহাবে। তখন আর অন্ধকারে সেঁধিয়ে থাকা যাবে না। মুখ দেখাতে হবে। দেখতে হবে। কিন্তু মাথার এই দাপাদাপি বন্ধ না হলে ভোর হবার আগেই পালাতে হবে কোথাও।

কতক্ষণ কেটেছে জানে না। আধ ঘণ্টা হতে পারে। জোরালো আলোর ঘায়ে বিষম চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো।

ঘরের আলো জ্বেলে বিমূঢ় বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে আছে ঊর্মিলা। পরনে সাদা ফ্রক। তার উপর কার্ডিগান। বাপীর মুখখানা ভালো করে দেখে নিচ্ছে।

বিছানার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল।—ফিরে এসে এমন ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছ? তুমি ফিরেছ মা জানে?

সরল বিশ্বাসেও কেউ হিংস্র পশুর খাঁচা খুলে দিলে কি হয়? বাপী চেয়ে আছে। ওর ভিতরের কেউ চিৎকার করে বলতে চাইছে, শিগগির চলে যাও—পালাও। কারণ, আর কেউ ওকে আরো কাছে টানার জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছে। মাথা নাড়ল কি নাড়ল না। অস্ফুট স্বরে জিগ্যেস করল, তুমি জানলে কি করে?

—আমি ক্লাবে ডাটাবাবুর জন্য বসেছিলাম। কটা দিনের মধ্যে তোমাদের কারো কোনো

খবর নেই...যদি চিঠিপত্র এসে থাকে। ভাটাবাবু বলল, তুমি ফিরেছ আর তোমার মেজাজও খুব খারাপ। কি হয়েছে...তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন?

—কি রকম দেখাচ্ছে?

ঊর্মিলা এতেই অসহিষ্ণু। গায়ের কার্ডিগানটা খুলে অদূরের চেয়ারে ছুঁড়ে দিয়ে আরো একটু কাছে এসে বলল, আমি জানি না, খবর কি বলো?

বাপীর চাউনিটা ওর মুখ থেকে বুকে নেমে আবার মুখে উঠে এলো। এই মেয়ের এমন মুখর যৌবনের দিক থেকে জোর করেই চোখ ফিরিয়ে ছিল এত দিন। আর তার দরকার আছে? ঠিক এই মুহূর্তে যে সংকল্পটা উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেল সেটাকে প্রশ্রয় দেবে, না ঠেলে সরাবে?

জবাব দিল, খবর ভালো না।

সংগে সংগে ঊর্মিলার ফর্সা মুখ ফ্যাকাশে একটু। উদ্‌গ্রীবও।—আঃ! চেপেচুপে কথা বলছো কেন? কার খবর ভালো না, আমার না তোমার?

মগজে লোভের হাতছানি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। নয় কেন? প্রেম ভালবাসার কি মানে? শুধু শব্দ ছাড়া আর কি? মোহ ছড়ায়, ভোলায়। একবার দখলের আওতায় পাকাপাকি ভাবে টেনে নিয়ে আসতে পারলে এই মেয়েরই বা মোহ কাটতে আর ভুলতে কত সময় লাগবে? তবু আরো একবার ভিতরের আর কেউ বাপীকে এই লোভ থেকে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করল। জোর করে ও-পাশ ফিরে বলল, আলোটা নিভিয়ে দিয়ে চলে যাও, আমার মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে—কাল কথা হবে।

কিন্তু ঊর্মিলারও ধৈর্যের শেষ। খাটের ওপর বসে পড়ে এদিক থেকেই ঝুঁকে তার মুখ দেখতে চেষ্টা করল। তারপর চিরাচরিত অসহিষ্ণুতায় এক হাতে বাপীর চুলের মুঠি আর অন্য হাতে বুকের কাছটা ধরে জোর করেই আবার তাকে নিজের দিকে ফেরাতে চেষ্টা করে বলে উঠল, তোমার মাথায় কিচ্ছু যন্ত্রণা হচ্ছে না—কি হয়েছে আমি এক্ষুনি শুনতে চাই। তুমি বলবে কি বলবে না?

বাপীর মুখের ওপর ওর নিঃশ্বাসের হলকা, পাঁজরে মাথায় ওর হাঁটুর ওপরের আর হাতের উষ্ণ স্পর্শ। ঘন নাগালের মধ্যে তপ্ত দুরন্ত যৌবন। যা ঘটার মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল। তারপর ঘটে যেতে লাগল। কঠিন দুটো হাতের ঝটকা টানে ওই সুঠাম নারীদেহ বাপী তরফদারের বুকের ওপর। নরম দুটো অধর নিজের দুটো ঠোঁটে বিদীর্ণ করে করে রসাতলের গহ্বরে তলিয়ে যেতে চাইল। নিজের শক্ত বুকের ওপর ওই উষ্ণ নরম বুক গুঁড়িয়ে দেবার আগে হাত দুটোও আর বুঝি ক্ষান্ত হবে না।

সমস্ত ব্যাপারটা এমন অবিশ্বাস্য যে ঊর্মিলার সম্বিৎ ফিরতেই সময় লাগল খানিকক্ষণ। তারপর প্রাণপণে ওই অমোঘ গ্রাস থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছিটকে নেমে দাঁড়াল। কপালের ওপরে বিশৃঙ্খল চুলের গোছা এক হাতে পিছনে ঠেলে দিল। দেখছে। হাঁপাচ্ছে। দুই চোখ বিস্ফারিত। এই লোককে সে চেনে না, কখনো দেখেনি।

এবারে দুই চোখে ওই নরম দেহ ফালা-ফালা করছে। ঠোঁটের হাসি ধারালো ছোরার মতো ঝিলিক দিচ্ছে। গলার স্বরেও কোনো দ্বিধার পরোয়া নেই আর।—ঠিক আজই আমি এরকম করে বলতে চাইনি তোমার দিকের খারাপ খবরটা কি। তুমি জোর করে বলালে।

নিজের দুটো কানের ওপরেও বিশ্বাস খুইয়ে বসেছে ঊর্মিলা। হাঁপাচ্ছে এখনো। চেয়েই আছে।

—দেখছ কি? আর অত অবাক হবারই বা কি আছে? এই মূর্তি দেখেই ভেতর আরো নির্মম বাপীর।—এ তো আমার পাওনাই ছিল। ড্রাইভিং শেখানোর গুরুদক্ষিণা

হিসেবে অনায়াসে চুমুও খেয়ে ফেলতে পারো, বলেছিলে না? তবে এতে হবে না, এর থেকে ঢের বেশি দক্ষিণা দেবার জন্য তৈরি হওগে যাও।

শুধু চোখে নয়, গলা দিয়েও এবারে অস্ফুট আর্তস্বর বেরুলো ঊর্মিলার।—এ তুমি কি করলে বাপী! তুমি না ফ্রেন্ড? কলকাতায় গিয়ে হঠাৎ কি হয়ে গেল তোমার? তুমি এমন কথা বলছ কেন?

বাপীর হাসিতে এতটুকু মায়ামমতার ছোঁয়া নেই। দু চোখে নরম তাজা দেহ লেহন করছে এখনো। একটু আগের উষ্ণ স্পর্শ আগুন হয়ে মাথার দিকে উঠছে। জবাব দিল, ফ্রেন্ড বলেই আমার দাবি বেশি, কলকাতায় গিয়ে এই বাস্তব বুদ্ধিটুকু নিয়ে ফিরে এসেছি। এমন কথা বলছি কারণ তোমার মা যা চান তাই হবে। আর কদিনের মধ্যে ডলি মিসেস তরফদার হবে। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে?

ঠোঁটে হাসি। গলার স্বর অকরুণ। চোখে আবারও ওকে দখলের মধ্যে টেনে আনার অভিলাষ। ঊর্মিলা সত্রাসে চেয়ে রইল একটু। তারপর ছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। গায়ের কার্ডিগানটা চেয়ারেই পড়ে থাকল।

মিনিট দশেক বাদে বাপী খাট থেকে নামল। ঠাস ঠাস করে ঘরের জানালাগুলো খুলে ফেলল। বাথরুমে এসে চোখে-মুখে ঠান্ডা জলের ঝাপটা দিল। একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণা ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে। ওটা নির্মূল করার আক্রোশেই বাপী মাথাটা কলের তলায় পেতে দিল। তোয়ালে মাথায় বুলিয়ে ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াতে হল।

চেয়ারেব কাঁধে হাত রেখে গায়ত্রী রাই দাঁড়িয়ে। মাত্র কটা দিনের অদেখা এই মুখ আরো সাদা, রক্তশূন্য। শরীর আরো খারাপ হয়েছে, না মেয়ে গিয়ে কিছু বলেছে বলে এমন বিবর্ণ মূর্তি বোঝা গেল না। কিন্তু প্রথম কথায় মনে হল না, মহিলা মেয়ের কাছ থেকে বড় রকমের কিছু ধাক্কা খেয়ে এসেছে। এক নজর দেখে নিয়ে বলল, এই ঠান্ডায় মাথা ভিজিয়ে এলে, মোছো ভালো করে, জল ঝরছে।

বাধ্য ছেলের মতো ঘরের আর একটা শুকনো তোয়ালে দিয়ে আবার মাথাটা মুছে নিল। একটু সময় দরকার। কিছু শোনার জন্য আর কিছু বলার জন্য প্রস্তুতি দরকার। তোয়ালেটা জায়গামতো রেখে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বাপী বলল, বসুন। খুব ভালো দেখছি না তো, কেমন ছিলেন?

—ভালো না।

বেশি অসুস্থ না হলে এরকম বলে না। চিরুনি থেমে গেল। আয়নার ভেতর দিয়ে বাপী তার দিকে তাকালো। মহিলা এখনো দাঁড়িয়ে। ওর দিকেই চেয়ে আছে।

—সেই কষ্টটা আবার বেড়েছিল?

বাজে কথায় সময় নষ্ট হচ্ছে বলেই যেন বিরক্ত।—কষ্ট লেগেই আছে, ও নিয়ে ভেবে কি করবে, তুমি কখন ফিরেছ?

—বেশিক্ষণ নয়। চিরুনি রেখে এগিয়ে এলো।—আমি নিজেই তো যেতাম, আপনার কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল।

চেয়ারটা তার সামনে টেনে দিতে গিয়ে বাপীর দু চোখ হোঁচট খেল একপ্রস্থ। ঊর্মিলার কার্ডিগান এখনো চেয়ারেই পড়ে আছে। গায়ত্রী রাই দেখেছে। ঠান্ডা মুখে বাপী ওটা তুলে আলনায় রাখল।

গায়ত্রী রাই চেয়ারে বসল। ও খাটে এসে বসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর জিগ্যেস করল, ডলির কি হয়েছে?

জবাব না দিয়ে বাপী চুপচাপ চেয়ে রইল খানিক। ভাবলেশশূন্য এই সাদা মুখ দেখে আশা করছে কি হয়েছে বা কতটা হয়েছে মেয়ে হয়তো এখনো সেটা বলে নি।

কিছু যে হয়েছে তাই শুধু বুঝে তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। ফিরে জিগ্যেস করল, ডলি কিছু বলেছে আপনাকে?

—না।

—কি করছে?

—ঘরে গিয়ে বিছানায় আছড়ে পড়ে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে কাঁদছে। ওর বাবা মারা যেতে এভাবে কাঁদতে দেখেছিলাম। তারপর আর দেখিনি। রাগ হলে তেজে ফোটে, কাঁদে না। কি হয়েছে?

মিথ্যের সঙ্গে সত্তার বিরোধ বাপীর। এই একজনের চোখে চোখ রেখে মিথ্যে বলা আরো কঠিন। তাছাড়া একলা ঘরে পশুর মতো যেভাবে দখল নেওয়া হয়েছিল আর হামলা করা হয়েছিল, কান্না থামলে মেয়ে মায়ের চোখে সেই নিষ্ঠুর লোলুপতার দিকটাই বড় করে তুলবে। শেষ মুহূর্তে সেই দখল না ছিঁড়তে পারলে ওই পশুর হাত থেকে আজ আর অব্যাহতি ছিল না মেয়ে তাও বলতে ছাড়বে না। বাপীর চিন্তায় এখনো কোনো বিবেকের দংশন নেই, কোনো আপোস নেই। এই মুহূর্তে তাই মাথা খুব ঠান্ডা।

ধীর গলায় জবাব দিল, আমাকেই বিয়ে করতে হবে, আর কারো চিন্তা আর আমার বরদাস্ত হবে না, আপনার মেয়েকে আজ সেটা আমি খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছি।

গায়ত্রী রাই অপলক চেয়ে আছে। আগের মতো সেই ভেতর-দেখা চোখ। শুধু এ-জন্যেই মেয়ে রাগে না ফুঁসে বা গর্জে উঠে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে এ যেন বিশ্বাস করার মতো নয়। গলার স্বর নীরস একটু।—এ বোঝানোটা আরো অনেক আগে থেকে শুরু করোনি কেন?

—অসুবিধে ছিল।

অপলক চাউনিটা মুখের ওপর বিঁধেই থাকল খানিক। বোঝার চেষ্টা। জিগ্যেস করল, কলকাতায় গিয়ে সেই ছেলের সঙ্গে ফয়সালা করে এসেছ?

—না। এখানে এসে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে মন স্থির করেছি।

দেখছেই। পরের প্রশ্নটাতেও তাপ-উত্তাপ নেই।—এতদিন তোমার নিজেরও মন স্থির ছিল না?

ভিতরে ভিতরে বাপী সচকিত। মায়ের কাছে এরপর নালিশ যদি করে ঊর্মিলা, পশুর মতো দখল নেবার কথাই শুধু বলবে না, মিষ্টির কথাও বলবেই। শয়তান বুদ্ধি যোগাচ্ছে বাপীকে। জবাব দিল, ছিল না। কেন ছিল না আপনার জানা দরকার। ডলিকে নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, সব শুনে আপনি যদি আমাকে বাতিল করেন, সে-বিচার মাথা পেতে নেব।

চাউনিতে ব্যতিক্রম দেখা দিল একটু। জিজ্ঞাসু।

ধীর নির্লিপ্ত সুরে বাপী বলে গেল, ছেলেবেলায় এখানকার এক মেয়েকে আমি খুব পছন্দ করতাম। তখনকার রেঞ্জ অফিসার, জঙ্গলের বড়সাহেব। আমার বাবা তার আন্ডারে সামান্য কেরানী। অত বড় ঘরের মেয়ের সঙ্গে মিশতে চাইতাম বলে হামেশা তারা অপমান করত, তার ছেলে মারত, মা কান মলে দিত। সেই আক্রোশে ওই মেয়ের ওপর আমার পছন্দটা হামলার মতো হয়ে উঠেছিল। সেই পছন্দের শাস্তি কি পেয়েছিলাম এই দেখুন—

একটুও অবকাশ না দিয়ে ঘুরে বসে একটানে ট্রাউজারের তলা থেকে শার্টটা টেনে মাথার দিকে তুলে ফেলল সে।

আধ-হাত-প্রমাণ পাঁচ-ছটা এলোপাথাড়ি সাদা দাগ পিঠের চামড়ায় স্থায়ী হয়ে আছে। জামা নামিয়ে বাপী আস্তে আস্তে ঘুরে বসল আবার। গায়ত্রী রাইয়ের সাদাটে মুখ বিমূঢ় এখন।

তেমনি নিরুত্তাপ গলায় বাপী বলে গেল, বাবার তখন জ্ঞান ছিল না, চাবুকে চাবুকে বড়সাহেব আর তার মেয়ে আর তার মায়ের আর আরো অনেকের সামনে আমাকে অজ্ঞান করে ফেলেছিল। রক্তে জামা ভিজে গেছল। আমার বয়েস তখন চোদ্দ, সেই মেয়ের দশ। তার কিছুদিনের মধ্যে তারা এখান থেকে বদলি হয়ে চলে যায়। কিন্তু আমি তাদের কোনদিন ভুলিনি, ভুলতে চাইনি। বি-এস-সি পাশ করার পর কলকাতায় যখন চাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তখন আবার সেই মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আবারও অপমানে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আমি বানারজুলিতে ফিরে এসে আপনাকে পেয়েছি। কিন্তু এই চার বছরের মধ্যেও সেই মেয়ের সঙ্গে ফয়সালার চিন্তা আমার মাথা থেকে যায় নি। এবারে কলকাতা গিয়ে দেখলাম সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।

এর পরেও হতভম্বের মতো চেয়েই আছে গায়ত্রী রাই। রাগের চিহ্নও নেই, শুধুই বিস্ময়। এরই ফাঁকে বাপী ভিতরের আশঙ্কা ব্যক্ত করে ফেলল।—ডলি হয়তো আপনাকে এই মেয়ের কথা বলেও আমাকে বাতিল করতে চাইবে।

একটু নড়েচড়ে আত্মস্থ হল মহিলা। এবারে সদয় মুখ নয় খুব।—এত সবও ডলিকে তোমার বলা হয়ে গেছে তাহলে?

—আমি একটি কথাও বলিনি। এতটা ও জানেও না। ছেলেবেলার ব্যাপারটা আবু রব্বানী জানত। রেশমা আর দুলারির কাছে আবু সে-গল্প করেছে। ডলি রেশমার মুখ থেকে শুনেছে।

গায়ত্রী রাই ছোট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল একটা। ভালবাসা-টাসা নয়, যে-মেয়ের কথা শুনল তাকে ভুলতে না পারার পিছনে পুরুষের আক্রোশটাই বড় করে দেখছে। অপমান ভোলার ছেলে যে নয় তার থেকে বেশি আব কে অনুভব করতে পারে। তবু জিজ্ঞাসা করল, সেই মেযের যদি বিয়ে না হয়ে যেত তাহলে কি করতে?

সত্যি কি বাপীর মুখে শযতান কথা যোগাচ্ছে? সাদামাটা এক জবাবে মহিলার সমস্ত সংশয়ের অবসান। বলল, তাহলে আমার এতদিনের রোগ ছেড়ে যেত কিনা আমি জানি না।

নীলাভ দুটো চোখের গভীর স্নেহের এমন উৎসও কি বাপী খুব বেশি দেখেছে? গায়ত্রী রাই ওকে দেখছে এখনো। পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে সেই স্নেহ হাসির আকার নিচ্ছে। বলল, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আমার কাছে তোমার ছেলেবেলার কথা তুলে ডলির খুব সুবিধে হবে না।

এতক্ষণে বাপী হাসল একটু।—আপনি যেমন ভাবছেন তেমন সুবিধেও হবে না। আমার জ্বর ছাড়লেও ডলিব ছাড়েনি। বেগতিক দেখলে ও এখান থেকে পালাবে, হয়তো চিঠি লিখে বিজয মেহেরাকে এখানে আনাবে। মাথা ঠাণ্ডা হবার আগে এরকম কিছু না করতে পারে আপনার দেখা দরকার।

স্নেহ-উপচনো ধমকের সুরে গায়ত্রী রাই বলে উঠল, আমার কি দায়! তুমি আগলাবে, তুমি দেখবে। ওর মন ফেরানোর মতো সময় আর সুযোগ কম পেয়েছিলে তুমি?

বাপী চুপ।

—কলকাতায় সেই ছেলের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

বাপী মাথা নেড়ে সায় দিল।

—কি বুঝলে?

রণে বা প্রেমে নীতির বালাই রাখতে নেই। প্রেমে না হোক, রণে জেতার দুরন্ত জেদ এখন। ঠাণ্ডা জবাব দিল, বড় হয়েই ফিরেছে, ভালো মাইনে, ফ্যাক্টরিব মধ্যেই কোয়ার্টারস। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খাটুনি চলছে এখন, ফুরসত নেই বলে এখানে আসতে পারছে না। এক্ষুনি বিয়েটা করে ফেলতে চায়। একটু থেমে বিরূপ প্রতিক্রিয়াটুকু

লক্ষ্য করে যোগ করল, সিগারেট খাওয়াটা আগের থেকেও অনেক বেড়েছে দেখলাম। আর সকাল-সন্ধ্যা কাজে ডুবে থাকার পর রাতে একা ভালো লাগে না বলে ড্রিংকস-এর মাত্রাও বেড়ে গেছে নিজেই বলল।

কাউকে পিছন থেকে ছুরি বসানোর মতো একটা গ্লানি বুকের ভিতরেই গুঁড়িয়ে দেবার আক্রোশ বাপীর।

কঠিন আঁচড়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গায়ত্রী রাইয়ের মুখে। রাগ বেশি হলে অল্প অল্প শ্বাসকষ্ট হয়ই। একটু লক্ষ্য করেই বাপী তাড়াতাড়ি বলল, আপনার শরীর ভালো দেখছি না, এ-সব কথা এখন থাক—

—কলকাতায় তাকে তুমি কি বলে এসেছ?

—বলেছি আপনি খুব অসুস্থ, চিকিৎসার জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়া দরকার হতে পারে। বিয়ে এক্ষুণি সম্ভব নয়।

—আমি রাজি হব না একথা তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে এলে না কেন?

—জানালে ছুটি নিয়ে ডলির সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যে সে ছুটে আসত। আপনার মেয়ে তখন আরো অবাধ্য হত। এখনো কারো কথা শুনবে মনে হয় না।

গায়ত্রী রাই আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।—না শুনলে আমি কোনদিন ক্ষমা করব না, সেটা তার জানতে বুঝতে বাকি থাকবে না।

দরজার দিকে এগুলো। বাপীর উচিত তাকে ধরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসা। মন ঝুঁকলেও আজ আর এটুকু পারা গেল না। পিছনের দরজা পর্যন্ত এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সব ছেড়ে কেন যেন মহিলার স্যান্ডাল পরা ধপধপে ফর্সা দুই পায়ের দিকে চোখ গেল। মনে হল এমন দুখানা পা-ও বেশি দেখেনি।

বিবেকের গলা টিপে ধরে আছে। কিন্তু যতক্ষণ না একেবারে মরছে ওটা ততক্ষণ ছটফটানি আছেই। যন্ত্রণা আছেই। থাকুক। গুমরোক। আপনি ঢিট হবে। শয়তানের হাতে হাত মিলিয়েছে বাপী তরফদার। তার কাছে কারো জারিজুরি খাটবে না। সে নরকে টেনে নিয়ে যাবেই। বিবেকের দাস হয়ে থাকলে স্বর্গসুখ যে কত জানতে বাকি আছে? তার থেকে নরকের রাজত্ব ঢের ভালো।

ঘণ্টাখানেক বাদে কোয়েলা এসে তাকে খেতে ডেকে নিয়ে গেল। খাবার টেবিলে শুধু সে আর গায়ত্রী রাই মুখোমুখি। ঊর্মিলা নেই। থাকবে না জানা কথাই। দু চোখ তবু তার মায়ের মুখের ওপর উঠে এলো।

—ডলি খাবে না। তুমি শুরু করো।

ঠাণ্ডা মুখে মহিলা নিজেও খাওয়া শুরু করল। ইদানীং তার রাতের খাওয়া নামমাত্র। কিন্তু তাতে এতটুকু ব্যতিক্রম দেখা গেল না। মেয়ে খেল না বলে ওই মুখে কোন রকম প্রশ্রয়ের ছিটেফোঁটাও নেই। কিন্তু বাপীর কি হল? এক মেয়ে খাবে না শুনে জঠরে খিদে সত্ত্বেও মুখে রুচি নেই। শয়তানেরও মায়ামমতা আছে?

পরদিন সকালে বারান্দার চা-পর্বেও ঊর্মিলা অনুপস্থিত। ভিতরের ঘরেও তার অস্তিত্বের আভাস মিলল না। সতর্ক করার পরেও মেয়েকে আর একলা কোথাও ছেড়ে দেবার মতো কাঁচা নয় মহিলা। তবু আশঙ্কা। জিগ্যেস করল, ডলি কোথায়?

—বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। খুব মৃদু আর নিরুত্তাপ কঠিন সুরে বলল, ওকে যতটা বোঝানো দরকার বুঝিয়ে দিয়েছি। কোয়েলা চোখ রাখবে, তুমিও একটু খেয়াল রেখো। কিছু মতলব ভাঁজছে হয়তো, নইলে ক্ষেপে উঠত।

বাপী তরফদার নয়, সংগোপনে শয়তান বড়সড় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মেয়েকে কতটা বোঝানো হয়েছে এই মুখ দেখে বাপী আঁচ করতে পারে। তার পরেও মেয়ে

ওর পশ্বর মূর্তিটা মায়ের সামনে তুলে ধরেনি। দেহ দখলের হামলার কথা বলেনি। এখনো রাগে দুঃখে অপমানে ফুসছে হয়তো। পরে বলতে পারে। কিন্তু বাপী আর পরোয়া করে না। বললেও এই মা-টি আরো অকরুণ সংকল্পে মেয়ের বিরুদ্ধেই পরোয়ানা জারি করবে। যতটুকু বিশ্বাস করবে তাও পুরুষের দাপট আর পুরুষের অসহিষ্ণুতা ধরে নেবে। মনে মনে মহিলা বরাবর ওকে পুরুষের সম্মান দিয়ে এসেছে বলেই আজ তার এত স্নেহ, এমন অন্ধ বিশ্বাস।

এ কদিন ছিল না, বাপী তবু আজও আপিস ঘরের দিক মাড়ালো না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। আবুকে দরকার। এক্ষুনি গেলে ঘরেই পাবে হয়তো।

আবুর দুটো ঘরেরই ভোল পাল্টে গেছে অনেক দিন। পয়সার ব্যাপারে ভাগ ভিন্ন ভোগে বিশ্বাস নেই বাপীর। ফলে কাঁচা টাকার মুখ আবুও কম দেখছে না। মাটির ঘর বাতিল করে কাঠের ঘর তুলেছে। তাতে হলদে সবুজ রংয়ের জেল্লা তুলেছে। টকটকে লাল টালির ছাদ বসিয়েছে। শুধু দোস্ত-এর কাছে কেনা, নইলে আবু রব্বানী এখন বুক চিতিয়ে নবাবী চালে চলে!

গলা পেয়েই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। দোস্ত্ হুট করে কলকাতা কেন চলে গেছল জানে না। ফেরার খবরও রাখে না। বাপীর সাড়া পেলে যত কাজই থাক দুলারিও না এসে থাকতে পারে না। কিন্তু আজ আবুকে নিরিবিলিতে দরকার বাপীর।

আবু সাদর আপ্যায়ন জানালো, তুমি বাইরে থেকে হাঁক দাও কেন বাপীভাই, সোজা ভিতরে চলে আসবে। এসো—কলকাতা গেছ শুনলাম, এদিকে ডাটাবাবু তো তুমি নেই বলে চোখে অন্ধকার দেখছে।

—বাদশাকে আজ জিপ দিয়ে পাহাড়ে পাঠিয়ে দেব'খন, সে ব্যবস্থা করবে।...এখন আর বসব না, তুমি জঙ্গলের কাজে বেরুচ্ছিলে তো?...এসো।

দিন বদলালেও দুলারির ধাত বদলায়নি, মুখে কথা কম। দেখে বেশি। আজ বাপীর তাইতেই অস্বস্তিও বেশি।

জঙ্গলের পথে পা চালিয়ে বাপী সোজা প্রস্তাব করল, তোমাকে দিনকতক ছুটি নিতে হবে।

আবু হাঁ। কারো কাজে কোনো গুরুতর গাফিলতি ঘটে গেলে এ-রকম প্রস্তাব আসে জানে। দাঁড়িয়ে গিয়ে মুখের দিকে তাকালো।

তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বাপী আবার বলল, ছুটি নিয়ে আমার নিজের একটু কাজে লাগতে হবে তোমাকে।

আবুর বন্ধ নিঃশ্বাস মুক্তি পেয়ে বাঁচল। কিন্তু এবারে অবাক তেমনি।—কি করতে হবে?

—সকালে দুপুরে আর বিকেলে একজনের ওপর নজর রাখতে হবে। তোমাদের মেমসায়েবের মেয়ে খুব সম্ভব আবার পালাতে চেষ্টা করবে।

—এতদিনের মধ্যেও মিসিসায়েবের সেই জ্বর ছাড়েনি?

বাপী মাথা নাড়ল। ছাড়েনি।

বেশ মজাদার উত্তেজনার রসদ পেল আবু। দোস্তএর এমন গম্ভীর মুখ না দেখলে কিছু চপল রসিকতা করে বসত। সোৎসাহে বলল, কিন্তু আমি একলা কত দিক আগলাবো? আমার দু'তিনজন সাগরেদকেও লাগিয়ে দিই তাহলে?

বাপীর ঠাণ্ডা মুখে বিরক্তির আভাস। মাথাটা আর একটু সাফ করো।—বিয়ের আগে আমার বউ পালাতে পারে বা পালাবার চেষ্টা করতে পারে এটা জানাজানি হয়ে গেলে আমার মান থাকবে? বানারজুলি থেকে বেরুনোর একটাই পথ, তুমি সাইকেল

নিয়ে ডাটাবাব্র ক্লাবের রাস্তা আগলালেই হবে—যেমন দরকার ব্ঝবে করবে।...এদিকে কোয়েলার চোখে ধ্লো দেওয়া সহজ হবে না, আর আমিও চোখ ব্জে থাকছি না।

শেষের কথাগ্লো আর কানে গেল কিনা সন্দেহ। বিস্ময়ের অক্ল দরিয়ায় পড়ে হাব্ডুব্ দশা।—তোমার বউ! তুমি বিয়ে করবে মিসিসায়েবকে?

যে ম্র্তি দেখে আর যে কথা শ্নে হাসির কথা, তাই দেখে বা শ্নে বাপীর রাগ হচ্ছে কেন জানে না। জবাব দিল, তোমাদের মেমসায়েবের সেই রকমই হ্কুম।

বিস্ময় আর উত্তেজনার ধকল সামলে আব্ জিজ্ঞাসা করল, মিসিসায়েব বেঁকে বসেছে?

—হ্যাঁ।

আব্র সামনেই যেন দিশেহারা হবার মতো সমস্যা।—তাহলে কি করে হবে...ধরে-বেঁধে বিয়ে করবে?

বাপী ভিতরে ভিতরে তেতেই উঠেছে। গলার স্বরে পাল্টা শ্লেষ।—মরদ বেঁচে থাকতেও ভিতরে ভিতরে দ্লারির দিকে হাত বাড়াওনি তুমি? দ্লারির মেজাজ দেখে নিজে হাল ছেড়েছিলে?

এবারে একম্খ হাসি আব্র।—তার রাগের মধ্যেও একট্ আশনাইয়ের ব্যাপার ছিল যে বাপীভাই। তোমারও যদি তাই হয়ে থাকে তো কুছ পরোয়া নাই—ধরে-বেঁধে ঘরে এনে ঢোকাও, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাপী চ্প। আশনাই অর্থাৎ প্রেম থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে শ্নেও ভিতরটা অসহিষ্ণ্। খ্শি আর উত্তেজনায় আব্ টইটম্ব্র।—ইস! তুমি অনেক ওপরে উঠে গেছ দোস্ত, নয়তো তোমাকে কাঁধে নিয়ে ধেই ধেই করে খানিক নেচে নিতাম।

ফেরার পথে সামনের গেটের কাছে বাপীর পা থেমে গেল। ঊর্মিলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। এদিকেই চেয়ে আছে। পিছনে তার মা চোখে চশমা এঁটে লিখছে কিছ্।

ঊর্মিলা চেয়ে রইল।

এত দ্র থেকেও ঝলকে ঝলকে তপ্ত আগ্ন ঠিকরে এসে বাপীর ম্খ ঝলসে দিতে লাগল।

গেট ছেড়ে বাপী নিজের বাংলোর দিকে পা বাড়ালো। আগ্নে ঝলসালে লোহা ছাই হয়, না উল্টে দগদগে লাল হয়? বাপীর মেজাজেরও সেই অবস্থা।

পর পর চার দিন দেখা হল এরপর। চোখাচোখি হল। দ্বার তিনবার করে। একদিনও ঊর্মিলা খাবার টেবিল বা চায়ের টেবিলে আসেনি। গায়ত্রী রাই তাকে ডাকেনি। কোয়েলা তার খাবার বা চা ঘরে দিয়ে এসেছে। যেতে আসতে তব্ দেখা হয়েছে। বেশ তফাতে দাঁড়িয়ে ঊর্মিলা দেখেছে ওকে। দ্ই চোখে গলগল করে ঘ্ণা ঠিকরেছে। বিদ্বেষ উপচে উঠেছে। কিন্তু ঘ্ণার আঘাতে কাব্ হবে বাপী তরফদার? বিদ্বেষ তাকে সংকল্প-ছাড়া করাবে? এই দেখে বরং ভিতরটা তার আরো ধারালো কঠিন হয়ে উঠেছে।

রাত্রি। তখনো খাবার ডাক আসেনি। এ সময়টা বাপীর বই পড়ে কাটে। কদিন হল বই পড়ার নেশাও ছেড়ে গেছে। চ্পচাপ চোখ ব্জে শ্য়ে ছিল। মাথাটাকে শ্ন্য করে দেবার ধকল পোহাচ্ছিল।

একটা ষষ্ঠ অন্ভূতির ধাক্কায় চোখ মেলে দরজার দিকে তাকালো।

ঊর্মিলা। ভিতরে এসে দ্ হাত কোমরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তপ্ত লাল ম্খ। চোখো-চোখি হতে গলগল করে ঘ্ণা ঠিকরোতে লাগল। প্রস্তুত ছিল না বলেই হয়তো বাপী বে-সামাল একট্।

আরো পোড়ানো আরো ঝলসানোর জন্যেই যেন আরো একট্ এগিয়ে এলো ঊর্মিলা।

গলায়ও হিসহিস আগুন ঝরল।—দেখছ কি? একাই এসেছি। গেটে দাঁড়িয়ে মা তোমার ঘরে ঢুকতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেছে। কি দেখছ? দরজা বন্ধ করে দেব? তাহলে সুবিধে হবে? আজ সব সাধ মেটাবে?

আত্মস্থ হবার চেষ্টায় বাপী নিজের সঙ্গে প্রাণপণে যুঝছে। নিজের অগোচরে উঠে বসেছে। গলা দিয়ে অস্ফুট স্বর বেরুলো, বোসো—

—বসব? তোমার কাছে এসে আনন্দে গল্প করতে এসেছি আমি? তুমি বেইমান, তুমি বিশ্বাসঘাতক, তোমার পরামর্শে বাড়িতে মা আর কোয়েলা ছায়ার মতো আমার সঙ্গে লেগে লেগে আছে, একটা চিঠি লিখতে বসলেও সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে—বাংলো থেকে নামলে কোয়েলা পিছু নেয়—কাজকর্ম ছেড়ে আড়াল থেকে তুমি চোখে আগলাচ্ছ—ক্লাবের সামনে আবু রব্বানীকে মোতায়েন রেখেছ—চারদিক থেকে আমাকে শিকলে আটকেছ—কিন্তু এই করে কি পাবে তুমি? কি পাবে আশা করো?

বাপী নির্বাক। এখনো নিজের বশে নেই। ঊর্মিলার হিসহিস গলার স্বর চড়ছেই।—যে রেশমা তোমাকে পুজো করত সেই রেশমার মরা মুখ তোমার মনে আছে? আছে? আর একখানা মরা মুখ দেখতে চাও? এত পাহারা দিয়েও সেটা ঠেকাতে পারবে? এই জ্যান্ত ডলি তোমার কোনো দিন ভোগে আসবে না সেটা জেনে রেখো আর মাকেও জানিয়ে দিও। বুঝলে? বুঝলে?

বোঝার ধকলে বাপীর কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। চেয়েই আছে।

ঊর্মিলাও।

বাপী অপলক।

ঊর্মিলাও।

পরের মুহূর্তে ও যা করে বসল তাও অভাবিত। এত বোষ এত ঘৃণা হঠাৎ কান্না হয়ে ভেঙে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে উপচে-ওঠা আবেগে এগিযে এসে ওই বিছানায় বসে পড় দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরে সমস্ত যন্ত্রণা উজাড় করে ঢেলে দিত চাইল।—বাপী, এ হবে না—এ হতে পারে না। তুমি আমার ফ্রেন্ড—এত বিশ্বাসঘাতকতা তুমি করতে পারো না,—এমন বেইমান তুমি হতে পারো না—কলকাতায় গিয়ে তোমার সাংঘাতিক কিছু নিশ্চয় হয়েছে—তাই তুমি পাগল হয়ে গেছ। বাপী—তোমাকে আমি কত ভালবাসি তুমি জানো না—আমার ফ্রেন্ড এমন কাজ করতে পারে না—আমার এত ভুল হতে পারে না—এত বিশ্বাস না থাকলে আমি নির্ভয়ে তোমার কাছেই ছুটে আসতে পারতাম না'

কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বাপী মূর্তির মতো বসে।

॥ আট ॥

ঊর্মিলা আবার দুপুরে আর রাতে অন্য দুজনের সঙ্গে খাবার টেবিলে এসে বসছে। সকাল বিকালের চায়ের টেবিলেও আসছে। একটা বড় রকমের অশান্তির মোকাবিলার সংকল্পে কঠিন হাতে বাৎসল্যের রাশ টেনে ধরে বসেছিল গায়ত্রী রাই। কিন্তু হঠাৎ কোনো জাদুমন্ত্রে মেয়ের সুমতি ফিরে এলো কিনা ঠাওর করতে পারছে না। তার আচরণ কৃত্রিম হলে মায়ের চোখে ধরা পড়তই। স্নায়ুর সব টানা-পোড়েন একেবারে ঠাণ্ডা, ভোরের যুঁইফুলের মতো কাঁচা আর তাজা মুখ। মেয়ের রাগ-বিরাগের চিহ্ন নেই। আবার মুখে কথাও নেই। বড়সড় কিছু কৌতুকের ব্যাপার ঘটে গেছে যেন। সেটা চোখে ঝিকমিক করে, ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আঁচড় কাটে। গায়ত্রী রাই তখন ইচ্ছে করেই অন্য দিকে মুখ

ফেরায়। কারণ মাকে ফাঁকি দিতে পারলে ওই ছেলের মুখখানাই যে মেয়ের পর্যবেক্ষণের বিষয়, সেটা বুঝতে পারে।

বাপী সবই লক্ষ্য করে। মেয়ের থেকেও উল্টে ওরই আচরণ মহিলার কাছে বেশি দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে তাও আঁচ করতে পারে। সর্বদাই গম্ভীর। সেটা কৃত্রিম নয়। একটা অসহিষ্ণুতার বাষ্প চারিদিক থেকে ওকে ছেঁকে ধরেছে। মেয়ে উঠে গেলে প্রত্যাশিত সুখবর শোনার আশায় গায়ত্রী রাই ওর দিকে ফেরে। কাজের অছিলায় বাপী তক্ষুনি উঠে চলে যায়। কদিন ধরে কাজের ভূত মাথায় চেপেছে। কেবল কাজ আর কাজ।

চায়ের টেবিলে সেদিন জানান দিল, এখনই সে একবার পাহাড়ে যাচ্ছে।

গায়ত্রী রাই সাদা মনে জিজ্ঞেস করল, কেন?

--আপনি সবেতে মাথা দেন কেন, নিজে কি করে ভালো থাকবেন সে চেষ্টা করুন না।

ছেলের ধমক খেয়ে মা যেমন হাসি চেপে বেচারি মুখ করে চেয়ে থাকে, গায়ত্রী রাইয়ের চাউনিও অনেকটা সেই রকম।

গম্ভীর মুখেই বাপী বলল, ক্লাবে মাল টান পড়েছে তাই যাওয়া দরকার।

একটু চুপ করে থেকে গায়ত্রী হঠাৎ বলল, এ কাজ বন্ধ করে দিলে কি হয়?

—কোন কাজ, লিকার সাপ্লাই?

—হ্যাঁ।

বাপী গম্ভীর।—কি আর হবে, মোটা লোকসান হবে। আপনি মালিক, হুকুম করলেই বন্ধ হবে।

হালকা প্রতিবাদের সুরে গায়ত্রী রাই বলল, সাপ আর সাপের বিষ চালানোর কারবার বন্ধ করার সময় তুমি মালিকের হুকুমের অপেক্ষায় ছিলে? না সেই লোকসান গায়ে লেগে আছে?

রেশমার অঘটনের পরেব বছর থেকেই ব্যবসার ওদিকটা বাপী জোর করে তুলে দিয়েছিল। সাপ ধরার মৌসুমে যারা আসে তারা বেজার হয়েছিল। সব থেকে বেশি বেজার হয়েছিল পাহাড়ের বাংলোর ঝগড়ু। সাপের গলা টিপে বিষ বার করা বন্ধ হলে তার আর কাজের আনন্দ কি? আবুর তত্ত্বাবধানে এই ব্যবসা জাঁকিয়ে উঠছিল তাই আপত্তি তারও ছিল। বাপী কারো কথায় কান দেয়নি। গায়ত্রী রাইকে বলেছিল, আপনার সব লোকসান উশুল হয়ে যাবে, যে কাজে লেগে আছি তার এখনো ঢের স্কোপ।

কথার খেলাপ হয়নি, এদিকের ব্যবসা এত বেড়েছে যে ওদিকের লোকসান চোখেও পড়েনি। কিন্তু কোন তাড়না বা যন্ত্রণার ফলে বাপী ওই মারাত্মক কারবার একেবারে তুলে দিয়েছে তা আজও ব্যক্ত করার নয়। একটু গুম হয়ে থেকে বাপী গম্ভীর শ্লেষের সুরে বলল, তাহলে শুধু মদ কেন, নেশার আর যা কিছু নিয়ে আছি আমরা সে সবও বন্ধ করে দিন। নেশা নেশাই।

ভেবেছিল জব্দ হবে। কিন্তু জবাবে যা শুনল, মেজাজ সুস্থির থাকলে বাপীর মন নরম হবার কথা। শ্লেষ গায়ে না মেখে মহিলা হাসল একটু।—এ চিন্তাও মাঝে মাঝে মনে আসে।...যত দিন নিজের রক্তের জোর ছিল, ভয়-ভাবনা কিছু ছিল না। সব দায় নিজের ভাবতাম। এখন তোমাদের এর মধ্যে জড়াতে অস্বস্তি হয়। অনেক হয়েছে, ও সবও এখন বন্ধ করে দিলে আমার আপত্তি হবে না। গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসল।—তোমার রাগের কি হল, এক্ষুণি তোমাকে কিছু করতে বলছি না। মনে হল তাই ভেবে দেখতে বলেছি। আজ পাহাড়ে যাচ্ছ যাও—

টেবিলের এ পাশ থেকে আলতো করে ঊর্মিলা বলল, আমিও যেতে পারি—

চাপা গর্জনের সুরে বাপী তক্ষুণি বলল, না!

এই মেজাজ দেখে গায়ত্রী রাই সত্যি হকচকিয়ে গেল। আরো অবাক, যে মেয়ে কারো হম্বি-তম্বির ধার ধারে না, সেও চুপ। কিছু একটা ব্যাপার চলেছে দুজনের মধ্যে তাও বোঝা যাচ্ছে। একটু সময় নিয়ে গায়ত্রী রাই মোলায়েম করেই জিজ্ঞাসা করল, তুমি আজ ফিরছ না?

—বিকেলে ফিরব।

—তাহলে ও যেতে চাচ্ছে যাক না, রাগের কি আছে।

তেমনি চাপা ঝাঁঝে বাপী জবাব দিল, রাগ হয় স্বার্থপরতা দেখলে—বুঝলেন? আপনি নিজে ছাড়া আপনাকে দেখার আর কেউ কোথাও নেই, এ এখন থেকেই খুব ভালো করে জেনে রাখুন।

গায়ত্রী রাই হাঁ করে কয়েক পলক চেয়ে রইল তার দিকে। রাগের হেতু বোঝা গেছে। তার জন্যেই বাড়িতে কারো থাকার দরকার। আর সে খেয়াল না থাকার মানেই স্বার্থ। চোখের দু কোণ শিরশির করে উঠল। মেয়ের দিকে ফিরল। আগে হলে মেয়ে তেল-তেল বলে চেঁচিয়ে উঠে জব্দ করতে চেষ্টা করত। পুরুষের যে রাগ আর শাসন মেয়েরা চেষ্টা করলেও অশ্রদ্ধা করতে পারে না, নিজের মেয়েরও এখন সেই মুখ।

বাপী উঠে এলো। মহিলার নীরব প্রতিক্রিয়া অনুভব করতে পারে বলেই ভেতরটা আরো তিক্তবিরক্ত। নিজের ঘরে এসে বেশ-বাস বদলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ভিতরের অসহিষ্ণুতা গাড়ীর বেগের সঙ্গে মিশছে। খানিকক্ষণের মধ্যে গাড়ি ভুটানের রাস্তায় ছুটল। আর তক্ষুনি রেশমার মুখখানা চোখে ভাসল। রেশমার হাসি-কৌতুক, ছলা-কলা...নিজের সত্তা-দগ্ধানো বন্যা আক্রোশ। ও কি কোথাও থেকে বাপীকে দেখছে এখন?

রেশমার সঙ্গে সঙ্গে আর এক মেয়ের কথা মনে আসে কেন জানে না। অথচ স্বভাব-চরিত্রে দিন-রাতের তফাৎ দুজনের। মাষ্টারমশাই ললিত ভড়ের মেয়ে কুমকুম।...এখানে এসে দেখা করার কথা ছিল। বাপী ওকে এই ভুটান এলাকায় রেশমা যা করত ` কাজে লাগাবে ঠিক করেছিল। আট-দশদিন ছেড়ে দু সপ্তাহ গড়াতে চলল। আর আসবে মনে হয় না। এরপর এলে সোজা বিদায় করে দিতে অসুবিধে হবে না।

সন্ধ্যার একটু আগে ডাটাবাবুকে মাল বুঝিয়ে দিয়ে আবার গাড়িতে বসতেই আবু রব্বানী সামনে এসে দাঁড়াল।—কি ব্যাপার বাপীভাই. মিসিসায়েব যে আজ আমাকে খুব নাকাল করে দিয়ে গেল—তোমাদের মন-বোঝাবুঝি হয়ে গেছে নাকি?

নাকাল হয়েছে বলল বটে কিন্তু মুখে খুশি উপচে পড়ছে। বাপীর স্নায়ু তেতেই আছে। তবু ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

—ক্লাবের সামনে আগেও দু-তিন দিন তাকে দেখেছি তখন একটা কথা বলা দূরে থাক. চোখে আগুন ঠিকরতো—আজ খানিক আগে আমাকে দেখে হেসে কাছে এলো, বলল, তোমার ডিউটি এখনো চলছে. আমাকে ভেবাচাকা খেয়ে যেতে দেখে আরো মজা পেয়ে বলল, আর ডিউটির দরকার আছে কিনা তোমার দোস্তকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিও।...তুমি তো কিছুই বলোনি আমাকে. সত্যি আর দরকার নেই?

বাপী মাথা নাড়ল, দরকার নেই। তারপর স্টার্ট দিয়ে চোখের পলকে গাড়ি হাঁকিয়ে দিল।

পরের সাতটা দিন বাপী বাইরের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত যে আপিসে বসারও ফুরসৎ নেই। কাজ-কাজ করে হঠাৎ এত ক্ষেপে গেল কেন ছেলেটা গায়ত্রী রাই বুঝছে না। দুদিনের জন্য এর মধ্যে টুরে চলে গেল একবার। কোথায় কি এমন জরুরি কাজ কিছুই বলে গেল না। ফিরে আসার পরেও কিছু জিগ্যেস করার উপায় নেই। ডাক্তার সম্পূর্ণ বিশ্রামের হুকুম জারি করেছে। ফলে ব্যবসা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে যাওয়াটাও এই

ছেলের বিবেচনায় দোষের এখন। এছাড়া আরো দুদিন সকালে বেরিয়ে রাতে ফিরেছে। অত ভোরে তাকে ডাকেনি। কোয়েলা বা মালিকে বলে গেছে ফিরতে রাত হবে, ওর জন্য যেন অপেক্ষা করা না হয়। মাথায় কিছু চাপলে তার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সুস্থির থাকতে পারে না এ বরাবরই লক্ষ্য করেছে। তবু এ-সময়ে কাজের ঝোঁক ভালো লাগছে না। তা বলে দুশ্চিন্তা কিছু নেই। মেয়েকে এত ঠাণ্ডা আর এমন নরম কখনো দেখেনি। সর্বদা কাজে কাজে থাকে, নিজের হাতে ওষুধপত্র দেয়। দুপুরে একটু ঘুমনো অভ্যেস হয়ে গেছে, তখনো ঘরেই বসে থাকে। ওকে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকতে বললে পলকা ঝাঁঝে জবাব দেয়, দরকার নেই বাপু, তোমার সেবায় পান থেকে চুন খসলে মাথা কাটতে আসবে।

গায়ত্রী রাইয়ের দু কান জুড়িয়ে যায়। মনের মতো ফয়সলা যে কিছু হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। মেয়ে কিছু বোনা বা একটা বইটই নিয়ে সামনে বসে থাকে। গায়ত্রী রাই থেকে-থেকে মুখখানা দেখে তার। ভাগ্য দেখে।

সেদিনও সকালে বেরিয়ে বাপী ফিরল প্রায় রাত আটটার পর। সামনের বাংলোর গেটের কাছে অন্ধকারে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গাড়ি থামালো। একজন নয়, সেখানে দাঁড়িয়ে তিনজন। মালি, আধবুড়ো ড্রাইভার বাদশা, আর আবু রব্বানী। জোরালো আলোয় বারান্দায় কোয়েলাকেও দেখল। কার গাড়ি বোঝামাত্র সে ভিতরে ছুটল।

গাড়ি থামিয়ে বাপী নিস্পন্দের মতো বসে রইল। চট করে নামতেও পারল না। সবার আগে আবু ছুটে এলো। চাপা উত্তেজনায় তার দু চোখ কপালে—সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে বাপীভাই, সকাল আটটায় চা-টা খাওয়ার পর মিসিসায়েব কখন বাংলো ছেড়ে বেরিয়েছে কেউ দেখেনি, এখন পর্যন্ত তার পাত্তা নেই!

বাপী বসেই আছে। পাথরের মতো নিষ্প্রাণ ঠাণ্ডা। উদ্বিগ্ন মুখে পরের সমাচার জানালো আবু। বেলা এগারোটা নাগাদ ওর কাছে খবর গেছে মিসিসাহেবকে পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর থেকে বাদশা ড্রাইভারকে নিয়ে আবু তামাম বানারজুলি চষেছে। পাহাড়ের বাংলোয়ও গেছল। সেখানেও নেই। অ্যাকাউণ্টেণ্টকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে দিয়ে মেমসায়েব বাপীভাইয়ের খোঁজে এদিকের প্রায় সব কটা ঘাঁটিতে ফোন করিয়েছে। বিকেল থেকে মেমসায়েব খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে, দাঁড়ানো থেকে পড়ে যাচ্ছিল, কোয়েলা ধরে ফেলতে রক্ষা। এখনো খুব ছট্‌পট করছে। কোয়েলা ডাক্তার ..কার কথা বলতে এমন ধমক খেয়েছে যে ভরসা করে আর কেউ কিছু বলতেও পারছে না। মুখ ..জে তার কষ্ট দেখতে হচ্ছে। সকলে সেই থেকে বাপীভাইয়ের ফেরার অপেক্ষায় দম বন্ধ করে বসে আছে।

গায়ত্রী রাইয়ের বেশি রকম অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা কানে আসতে বাপীর সম্বিৎ ফিরল। ত্রস্তে গাড়ীর দরজা খুলে বাংলোর দিকে এগলো।

ঘরে সবুজ আলো জ্বলছে। গায়ত্রী রাই বিছানার পাশে ইজিচেয়ারে শুয়ে। সবুজ আলোর জন্য কিনা বলা যায় না, রক্তশূন্য মুখ নীলবর্ণ। সমস্ত দেহেও সাড়া নেই যেন। চাউনিতে অব্যক্ত যন্ত্রণা। যন্ত্রণা প্রতিটি শ্বাসেও।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বাপী তার পাশে মেঝেতেই বসে পড়ল। পালস দেখার জন্য একটা হাত ধরতেই এক ঝটকায় হাতটা টেনে নিল গায়ত্রী রাই। মুহূর্তের মধ্যে ঋজু সোজা কঠিন। চোখে সাদা আগুনের হল্কা।—আর কি দেখবে? আর কি দেখার আছে?

বাপী নিরুত্তর। থমথমে মুখ। চোখে চোখ।

সব থেকে কাছের জনকে নাগালের মধ্যে পেয়ে এতক্ষণের জমা যন্ত্রণার সমস্ত আক্রোশ তারই ওপর ভেঙে পড়ল।—সমস্ত দিন কোথায় এত কাজ দেখাচ্ছিলে? কোথায় যাও

না যাও বলে যেতেও মানে লাগে তোমরা আজ-কাল—কেমন? ও আমার চোখে ধুলো দিতে পেরেছে তোমার জন্য,—শুধু তোমার জন্য বুঝলে? ওকে বিশ্বাস করে এত নিশ্চিন্ত মনে তুমি কাজে ডুবে ছিলে কি করে? তোমার অপদার্থতার জন্য আমারও ভুল হয়েছে—

রাগে দুঃখে উত্তেজনায় কাঁপছে। সমস্ত মুখ আরো বিবর্ণ। বাপী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে এগলো।

—স্টপ! গায়ত্রী রাই পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল।

বাপী ঘুরে দাঁড়াল।

—কোথায় যাচ্ছ?

—ঘরে। বাপীর অনুচ্চ গলার স্বরও কঠিন একটু।—আমাকে কাছে দেখলে নিজের এতটুকু ক্ষতি যদি আপনি করেন, তাহলে কোথায় যেতে পারি এরপর তাও ভাবতে হবে।

গায়ত্রী রাইয়ের দু চোখে এখনো সাদা আগুন। আবারও ফেটে পড়ার মুখে সামলে নিল। সে শক্তিও আর নেই বোধ হয়। চেয়ারের গায়ে শরীরটা ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজল।

বাইরে এসে বাপী চাপা গলায় আবুকে বলল, বাদশাকে ডেকে গাড়ি নিয়ে চলে যাও, যেখানে থেকে পারো চা-বাগানের ডাক্তারকে ধরে নিয়ে এসো।

ভিতরে শুধু কোয়েলা দাঁড়িয়ে। রাগে আর কান্নায় তার কালো মুখ ফেটে পড়ছে। বাপী আবার এসে ইজিচেয়ারের পাশে মেঝেতে বসল। এবারে হাত টেনে নিতে গায়ত্রী রাই বাধা দিল না। দু চোখ বোজা তেমনি।

পালস-এর গতি বাপীর ভালো ঠেকল না। বাপী এবার হাঁটুর ওপর বসে নিঃসঙ্কোচে নিজের একটা হাত তার বুকের ওপর রেখে একটু চাপ দিল। এবারে গায়ত্রী রাই আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকালো।

বুকের ধপধপ শব্দ হাতেও স্পষ্ট টের পাচ্ছে বাপী। হাত সরিয়ে নিল। মহিলা অপলক চেয়ে আছে তার দিকে। বাপীর মনে হল, হাতটা ওখানে থাকুক তাই যেন চাইছিল। একটা উদ্গত অনুভূতি চেপে বাপী কোয়েলার দিকে তাকালো।—দুপুরে কিছু খাওয়া হয় নি তো?

কোয়েলা মাথা নাড়ল। হয় নি।

—এক গেলাস গরম দুধ নিয়ে এসো।

সঙ্গে কয়েক চামচ ব্র্যান্ডি মেশালে ভালো হত বোধ হয়, কিন্তু ও জিনিসটা খাওয়ানো যাবে না জানে, তাই শুধু দুধই আনতে বলল। দুপুরের পরে একবার একবার দুধ এনে কোয়েলা প্রচণ্ড ধমক খেয়েছে, দ্বিধান্বিত মুখে তাই কর্ত্রীর দিকে তাকালো। বাপীরও চাপা ধমক।—ওদিকে দেখছ কি, আমি তোমাকে দুধ আনতে বলেছি!

কোয়েলা ত্রস্তে চলে গেল। এই ধমক খেয়ে রাগের বদলে স্বস্তি বরং।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে উষ্ণ দুধের গেলাস নিয়ে ফিরে এলো। হাত বাড়িয়ে বাপী ডিস থেকে গেলাসটা তুলে নিয়ে আবার দুই হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসল। অন্য হাতটা মহিলার ঘাড়ের তলা দিয়ে গলিয়ে দিয়ে খানিকটা তুলে দুধের গেলাস মুখে ধরল।

একটুও আপত্তি না করে গায়ত্রী রাই দুধ খাচ্ছে, দু চোখ বাপীর মুখের ওপর।

দুধের গেলাস কোয়েলাকে ফেরত দিয়ে বাপী জলের গেলাস নিল। দু ঢোক জল খাইয়ে সেই গেলাসও কোয়েলাকে দিয়ে বাপী পকেট থেকে রুমাল বার করে আলতো করে তার মুখ মুছিয়ে দিল।

গায়ত্রী রাইয়ের অপলক দু'চোখ তখনো বাপীর মুখের ওপর। তাই দেখে বুকের তলায় অদ্ভুত মোচড় পড়ছে বাপীর। চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। দু চোখ ভরে দেখতে

ইচ্ছে করে। এই দেখার তৃষ্ণা কোন যুগ ধরে বুকের ভেতরেই কোথাও লুকিয়েছিল। সহজ হবার তাড়নায় আবার তাকে শুইয়ে দিয়ে বাপী হাসতে চেষ্টা করল। বলল, অত ভাবছেন কেন, যা হবার তাই হয়, দেখছেন না আমি কোথা থেকে উড়ে এসে কোন জায়গাটা জুড়ে বসেছি।

গায়ত্রী রাই কি জীবনে কখনো কেঁদেছে? বাপী জানে না। এখনো যেভাবে চেয়ে রইল কাঁদতে পারলে হয়তো হাল্কা হত। বাপী আবার বলল, মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, মেয়ের খবর ঠিকই পাবেন...আর ভালো খবরই পাবেন।

কানে যেতে আস্তে আস্তে নিজে থেকেই সোজা হয়ে বসল এবার। চাউনি বদলে গেল। সবুজ আলোয় নীলাভ তীক্ষ্ম কঠিন মুখ। খবর পাব...! ভালো খবর পাব? তুমি এই সান্ত্বনা দিচ্ছ আমাকে? ও যা চায় তাই হতে দেবে তুমি? তাই যদি হয় নিষ্ঠুর বেইমান মেয়েকে আমি কোনদিন ক্ষমা করব ভেবেছ?

উত্তেজনা দেখে বাপী আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু কিছু করতে হল না বা বলতে হল না। আবু ডাক্তারকে সঙ্গে করে ঘরে ঢুকেছে। বিরক্তি চাপতে না পেরে গায়ত্রী রাই হাল ছেড়ে চেয়ারের গায়ে মাথা রাখল আবার।

আবু বুদ্ধিমান। মেয়ের সম্পর্কে ডাক্তারকে বলেই এনেছে নিশ্চয়। কারণ হঠাৎ এরকম হল কেন ডাক্তার একবারও জিজ্ঞাসা করল না। চুপচাপ পরীক্ষা শুরু করে দিল। বাইরে এসে বাপীকে জানালো হার্টের অবস্থা আগের থেকেও বেশ খারাপ। আগামী কালের মধ্যে আর এক দফা বুকের যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্দেশ দিল। শিলিগুড়ির বড় হার্ট-স্পেশালিস্টকে আবার নিয়ে আসার পরামর্শও দিল। এই রাতটার জন্য শুধু কড়া ঘুমের ওষুধ।

টানা ঘুমে রাত কেটে গেল। খুব ভোরে চোখ তাকিয়ে গায়ত্রী রাই দেখে পাশের ইজিচেয়ারে বাপী শুয়ে। আস্তে আস্তে বসল। বাপীও সজাগ তক্ষুনি।

—সমস্ত রাত তুমি এভাবেই কাটালে নাকি?

—খুব ভালো কাটালাম। এখন কেমন লাগছে?

জবাব না দিয়ে গায়ত্রী রাই চুপচাপ চেয়ে রইল একটু। ব্যথাটা নিজের মেয়ের থেকে এই ছেলের জন্য বেশি কিনা জানে না। বলল, ঘরে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও।

আড়মোড়া ভেঙে বাপী উঠে দাঁড়াল।—নাঃ, আমার এখন অনেক কাজ। কোয়েলা—!

সঙ্গে সঙ্গে কোয়েলা হাজির। বাপী হুকুম করল, আমার জন্য শুধু এক পেয়ালা চা আর ওঁর জন্য দুধ—খুব তাড়াতাড়ি।

কোয়েলা চলে গেলে বাপী এদিকে ফিরল।—আমি চট করে মুখ-হাত ধুয়ে আসছি, আপনিও যান। থাক, কোয়েলা আসুক।...চা খেয়ে আমি তিন-চার ঘণ্টার জন্য একবার বেরুবো. আপনাকে ততক্ষণ সব ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে থাকতে হবে।

এই ছেলেকে খুব সহজ আর নিশ্চিন্তই দেখছে গায়ত্রী রাই। আশায় উদ্‌গ্রীব হঠাৎ।—ওর খোঁজে যাবে? পাবে?

সকালের শিথিল স্নায়ুগুলোতে টান পড়ল আবার। গম্ভীর শাসনের সুরে বলল, খোঁজে গেলে না পাবার কোনো কারণ নেই। যাব কিনা সেটা আপনি কতটা সুস্থ থাকেন তার ওপর নির্ভর করছে। এখন আমি শিলিগুড়ি থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে আসতে যাচ্ছি। আপনাকে আমি আবার বলছি, আমাকে বিশ্বাস করুন, করে একটু নিশ্চিন্ত থাকতে চেষ্টা করুন।

বেরিয়ে এলো।

শিলিগুড়ির বড ডাক্তারকে অনেক টাকা কবুল করে বাপী একটা রাত বানারজুলিতে

ধরে রাখল। যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁর ছুটি। রিপোর্ট সব হাতে পেয়ে তিনিও তেমন কিছু আশ্বাস দিয়ে যেতে পারলেন না। হার্টের আরো ভাল্ব খারাপ হয়েছে। হঠাৎ কিছু ঘটেও যেতে পারে, আবার খুব সাবধানে থাকলে কিছুকাল চলেও যেতে পারে। চিকিৎসার সমস্ত ফিরিস্তি চা-বাগানের ডাক্তারকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি।

গায়ত্রী রাইয়ের মনের জোরের খবর বাপীর থেকে আর কে ভালো রাখে। কিন্তু এখন যে জোরটা দেখছে সে যেন প্রাণের দায়ে।...ও বলেছে, মেয়ের খোঁজে যাবে কিনা সেটা তার সুস্থ থাকার ওপর নির্ভর করছে। তাই সুস্থ থাকার প্রাণপণ চেষ্টা। বলেছে বিশ্বাস করতে, বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত থাকতে। দুর্যোগের আকাশে রামধনু দেখার মতো এই বিশ্বাসটুকুই আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা। এই ছেলে কখনো তাকে মিথ্যে ভোলাবে না।

একান্ত চেষ্টার ফলে সত্যি কাজ হল। চারদিনের মধ্যে অনেকটা সুস্থ। পালস আর ব্লাডপ্রেসার স্বাভাবিক। বাপী যতক্ষণ সামনে থাকে, মহিলা ভাব দেখায় যেন কিছুই হয় নি। দিন-রাতের তিন ভাগ সময় বাপী কাছেই থাকে। কত ভালো আছে বোঝানোর তাগিদে এজন্যেও আগের মতো চোখ রাঙানোর চেষ্টা।—কাজ কর্ম শিকেয় তুলে দিন-রাত এখানে পড়ে থাকলে চলবে?

কিন্তু ধৈর্যের শেষ আছে। সেদিন কাছে ডেকে বাপীর মুখ নিজের ঠাণ্ডা দু' চোখের আওতায় বেঁধে নিয়ে বলল, বিশ্বাস করে তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছিলে, আমি চেষ্টা করেছি।...আজ ছ'দিন হয়ে গেল, আর কত যন্ত্রণার মধ্যে আমাকে রাখতে চাও?

বাপী চুপচাপ চেয়ে রইল খানিক। পাপপুণ্য মানে না,—এই যন্ত্রণা দেখার নামই বোধ হয় পাপ। মুহূর্তে মন স্থির করে নিল। ভাগ্যের পাশায় একদিন যে দান পড়েছিল আজ সেটা যদি একেবারে উল্টে যায় তো যাক।

কোয়েলা!

বাপীর ডাক শুনে কোয়েলা তক্ষুণি দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল।

—ডলির ঘর থেকে তার বড় সুটকেসটা নিয়ে এসো।

গায়ত্রী রাই অবাক।—ওর সুটকেস কেন?

—বলছি।

কোয়েলা সুটকেস এনে দিতে বাপী সেটা বিছানায় গায়ত্রী রাইয়ের সামনে রাখল। পকেট থেকে একটা চাবি বার করে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল খুলুন—

—এ চাবি তুমি কোথায় পেলে?

—ডলির কাছ থেকে চেয়ে এনেছি। খুলুন ওটা।

মেয়ে কিছু লিখে রেখে গেছে ধরে নিয়ে স্তব্ধ মুখে গায়ত্রী সুটকেসটা খুলল। তারপর বাপীর দিকে তাকালো।

—ওপরের জামাকাপড়গুলো সরিয়ে কটা চিঠি পান দেখুন।

বিমূঢ় মুখে গায়ত্রী রাই মেয়ের জামাকাপড়গুলো বিছানায় নামিয়ে আরো হতভম্ব সুটকেসের নীচে একগাদা খাম। কম করে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটা হবে সবগুলোতে লণ্ডনের ছাপ।

নিজের অগোচরে গায়ত্রী রাই সেগুলো সব হাতে তুলে নিয়েছে। প্রায় দুর্বোধ্য বিস্ময়ে খামগুলো দেখছে।—এ সব কি ব্যাপার?

—বিলেত থেকে লেখা বিজয়ের চিঠি। ডলিও এর থেকে কম চিঠি লেখেনি। আড়াই বছর ধরে দুজনে দু'জনকে চিঠি লিখে দিন গুনেছিল...

গায়ত্রী রাইয়ের ফ্যাকাশে মুখ কঠিন হয়ে উঠছে।—তুমি এটা জানতে?

—ও-চিঠি আপনার চোখে বা হাতে না পড়ে সে-ব্যবস্থা আমাকেই করে দিতে হয়ে-

ছিল।

রাগ নয়, একটা অবিশ্বাস যেন যন্ত্রণার মতো ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে!—তুমি তাহলে আমার মেয়েকে কখনো ভালবাসনি...কখনো চাওনি?

—ভালো যখন বেসেছি তখন কোনো লোভ ছিল না। শেষে কোন আক্রোশে আপনার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওকে পেতেও চেয়েছিলাম জানলে আপনিও আমাকে ঘৃণা করতেন। আমার চরিত্রের সেই কদর্য দিকটা ডলি দেখেছে।...কিন্তু এই কদর্যের ওপর তার এত বিশ্বাস যে শেষে ও-ই আমাকে রক্ষা করেছে। রক্ষা আপনাকেও করেছে।... আত্মহত্যার জন্য ও তৈরি হয়ে বসেছিল।

গায়ত্রী রাই নির্বাক, স্তব্ধ।

খুব শান্তমুখে বাপী আবার বলল, ডলি যাকে বেছে নিয়েছে সে একটা ছেলের মতো ছেলে এও আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, ড্রিংক একটু-আধটু করে, কিন্তু নিজের আক্রোশে আপনাকে ওর ওপর আরো বিরূপ করে তোলার জন্য আমি সেই কথা তুলে ছিলাম, ড্রিংক করে অমানুষ হবার ছেলে সে নয়, আমি ড্রিংক না করলেও আমার থেকে অন্তত ঢের ভালো।

গায়ত্রী রাই শুনছে, সামনে যে বসে আছে তাকে দেখছে, হিসেব জানে, এখনো কিছু হিসেব মেলাতে বাকি যেন। চাউনিও সন্দিগ্ধ একটু।—ডলি কোথায় এখন...কলকাতায়?

—শিলিগুড়িতে।

—শিলিগুড়িতে কোথায়?

—একটা হোটেলে।...বিজয় মেহেরার কাছে।

গলার স্বর অভিমানে অকরুণ কিনা বলা যায় না।—তাদের বিয়ে হয়ে গেছে তাহলে? না হবে বলে আগে থাকতেই একসঙ্গে আছে?

বাপী জানে নিজেরই চরম সংকটের মুহূর্ত এটা। তবু শান্ত। তবু ঠাণ্ডা।—বিয়ে হয়ে গেছে। দুদিন টুরে থাকার নাম করে কলকাতায় গিয়ে বিজয়কে এরোপ্লেনে নিয়ে এসে শিলিগুড়িতে রেখেছিলাম, টাকা খরচ করে পিছনের তারিখ দিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে নোটিস দেওয়া হয়েছিল।. ছ'দিন আগের সেই সকালে ডলিকে আমিই নিজের গাড়িতে করে শিলিগুড়ি নিয়ে গেছি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিয়েছি।

প্রথমে নিজের দুটো কানের ওপর অবিশ্বাস গায়ত্রী রাইয়ের, কিন্তু এই মুখ দেখেই বুঝছে অবিশ্বাস করারও কিছু নেই আর। সমস্ত সংযম ছিঁড়ে-খুঁড়ে গলা দিয়ে আর্ত স্বর বেরিয়ে এলো।—তুমি! তুমি ওকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিয়েছ? এত...এত উপকার করেছ তুমি আমার?

আবেগ সামলে নিতে বাপীরও সময় লাগল একটু। উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে।—উপকার সত্যি করেছি। এত ভালো কাজ জীবনে আর করেছি কিনা জানি না। এরপর আপনি যেমন খুশি শাস্তি দেবেন, তাও আমি আশীর্বাদ ধরে নেব।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। সোজা নিজের বাংলোয়। নিজের ঘরে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। অনেক দিনের টান-ধরা স্নায়ুগুলো সব একসঙ্গে শিথিল হয়েছে। অবসাদ সম্বল।

বাপী ঘুমিয়েই পড়ল।

কারো ডাক শুনে চোখ মেলে তাকিয়েছে। কোয়েলা। ঘরে আলো জ্বলছে। বাপী তাড়াতাড়ি উঠে বসে ঘড়ি দেখল। রাত নটা বাজে। কোয়েলা জানালো মালকান খেতে ডাকছে।

এই রাতেই আবার ওই একজনের সামনে বসে খাওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পেলে

বেঁচে যেত। তার রোষ যদি মাথায় বজ্র হয়ে নেমে আসত, এর থেকে মুখ বুজে তাও সহ্য করা সহজ হত।

এতবেলা পাবার পরেও বসে থাকতে দেখে কোয়েলা আবার জানান দিল, সে দুবার এসে ফিরে গেছে, সাহেব ঘুমুচ্ছে দেখে ডাকেনি—মালকান এবার ডেকে দিতে হুকুম করেছে।

—তুমি যাও, আসছি।

চোখে মুখে জল দিয়ে পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই এলো। কোয়েলা বলল, খাবার মালকানের ঘরে দেওয়া হয়েছে।

পায়ে পায়ে বাপী শোবার ঘরে ঢুকল। গায়ত্রী রাই পিছনে উঁচু বালিশে ঠেস দিয়ে বিছানায় বসে। বিষম সাদা মুখ। গালের পাশে চামড়ার নিচে একটা নীল শিরা উঁচিয়ে আছে। বাপী ঘরে ঢুকতে একটুও না নড়ে তার দিকে তাকালো। বাপীও।

সামনের ছোট টেবিলে একজনেরই খাবার দেওয়া হয়েছে।

—অসময়ে ঘুমুচ্ছিলে...শরীর খারাপ?

বাপী মাথা নাড়ল। শরীর ঠিক আছে। তবু গত পাঁচ-ছ'দিন যাবৎ স্নায়ুর ওপর দিয়ে কতটা ধকল গেছে মহিলা নিঃশব্দে আঁচ করে নিল বোধ হয়।—খেয়ে নাও।

এই মুখ সদয়ও নয়, নির্দয়ও নয়। গলার স্বরও নরম নয় বা কঠিন নয়। বাপী টেবিলের খাবারের দিকে তাকালো একবার, তারপর দাঁড়িয়েই রইল। একলা খেতে বসার দ্বিধা স্পষ্ট।

গায়ত্রী রাইয়ের চাউনি আরো ঠাণ্ডা। কথাও—আমি তোমার হুকুম এখনো মেনে চলেছি, ঘড়ি ধরে সময়মতো খেয়ে নিয়েছি। বোসো!

বাপীর চোখের কোণদুটো হঠাৎ শিরশির করে উঠল কেন জানে না। শাস্তির জন্য প্রস্তুত? কিন্তু সূচনা যা দেখছে সমস্ত সংযম খুইয়ে নিজেই ভেঙে না পড়ে! ছোট টেবিলের সামনে বসল। চুপচাপ খাওয়া শেষ করল।

গায়ত্রী রাইয়ের দু' চোখ তার মুখের ওপর স্থির সেই থেকে। এবারে জিজ্ঞাসা করল, তারা কলকাতায় চলে না গিয়ে শিলিগুড়িতে বসে আছে কেন?

বাপীর জবাবেও আর রাখা-ঢাকার চেষ্টা নেই। আপনি একবার ডাকবেন সেই আশায়। ...নইলে বিজয়ের ছুটি নেই, ওর ফেরার তাড়া খুব।

গলা চড়াল না। কিন্তু কঠিন।—ডলির এত আশা করার কথা নয়।......এ-রকম আশাও তাহলে তুমিই দিয়েছ?

বাপী নিরুত্তর। এই অনুযোগের সবটাই প্রাপ্য নয়। খানিকটা হয়তো তার মেয়ের ঘাড়ে চাপানো যেত। শিলিগুড়ি থেকে বড় ডাক্তার আনার সময় ঊর্মিলা খবর জেনেছে। একবারটি এসে মা-কে দেখার জন্য তখন ঝোলাঝুলি করেছিল। সেই অবস্থায় মহিলার মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবেই বাপী রাজি হয়নি। পরে অবস্থা বুঝে দুজনকেই নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়ে এসেছিল।

জবাবের অপেক্ষায় গায়ত্রী রাই চুপচাপ আবার খানিক চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে মাথাটা বালিশের ওপর রাখল। দু' চোখ বোজা এখন। পাঁচ গজের মধ্যে বসেও বাপী শ্বাস-প্রশ্বাস ঠাওর করতে পারছে না। একটু বাদে তেমনি ঠাণ্ডা কটা কথা কানে এলো। —ঠিক আছে। কাল সকালের দিকে নিয়ে এসো। আর টাকা নিয়ে যেও। বিকেলের প্লেনে ওদের কলকাতার টিকিট বুক করে এসো।

বাপী তাই করেছে। বিকেলের প্লেনে দুটো কলকাতার টিকিটও কেটেছে। নির্দেশ অমান্য করার জোর আর নেই। টিকিটের কথা ঊর্মিলাকে বলেনি। আশা হাওয়া যদি

হঠাৎ বদলায়। যাওয়া যদি ওদের না হয়। তাছাড়া, বিদায় করার জন্য একেবারে তৈরি হয়ে মেয়ে-জামাইকে ডেকে পাঠানো হয়েছে, এ বলেই বা কি করে।

মা যেতে বলেছে শুনে ঊর্মিলা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ফ্রেন্ডের মুখখানা ভালো করে দেখার পর হাওয়া মোটে সুবিধের মনে হয়নি। যে-ঝড়টা গেছে, শুকনো হাসির তলায় বাপীর সেটা চাপা দেবার চেষ্টা। খুঁটিয়ে কিছু জিগ্যেস করারও ফুরসৎ পেল না ঊর্মিলা। এসেই আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হওয়ার তাড়া লাগিয়েছে। তাছাড়া বিজয়ের সামনে খোলাখুলি জিগ্যেস করাও মুশকিল। এ-ছেলে মায়ের কতটুকু আর জানে। এমনিতেই ঘাবড়ে আছে। মা ডেকেছে শুনেও বাপীকে বলছিল, গিয়ে আবার ফ্যাসাদে পড়ব না তো, শুধু ডলিকে নিয়েই যাও না।

স্বাভাবিক ভ্রূকুটিতে তার ভয় বরবাদ করতে চেয়েছে ঊর্মিলা।—আ-হা, কি বীর-পুরুষ! বলল বটে, কিন্তু নিজের ভিতরেই চাপা অস্বস্তি।

বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ বাপী ওদের নিয়ে বানারজুলির বাংলোয় পৌঁছল। গায়ত্রী রাই নিজের শয্যাতেই বসে আছে। দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় ওই বিছানায় উঁচু বালিশে ঠেস দিয়ে কাটে। শ্বাসকষ্টের রোগীর এ ভাবে বসতে সুবিধে। কিন্তু ইদানীং শ্বাসকষ্ট বেশি কি কম মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই।

মেয়ে জামাই ঘরে পা দেবার পর থেকে বাপী নির্বাক দ্রষ্টা, নীরব শ্রোতা। সামনে কয়েকটা চেয়ার পাতা। বাইরের অতিথি আসছে জেনে বাড়ির অসুস্থ কর্তা যেমন ঘরে চেয়ার পেতে রাখতে বলে, গায়ত্রী রাইয়ের অভ্যর্থনার আয়োজনও সেই গোছের।

ঘরে পা দিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়েই নিঃশব্দে আঁতকে উঠল ঊর্মিলা। বিজয় মেহেরা না পারুক, কঁদিনের মধ্যে তফাৎটা মেয়ে বুঝতে পারছে। মোমের মতো সাদা মুখ মায়ের। মুখে না হোক, দুই চোখেও যদি একটু উষ্ণ তাপের স্পর্শ পেত ঊর্মিলা, হয়তো ছুটে গিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরত, কাঁদত।

কিন্তু ঐ বিষম সাদা মুখ তেমনি একটা নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে আগলে রেখেছে নিজেকে। মেয়েকে একবার দেখল শুধু। তারপর জামাইয়ের দিকে তাকালো। ঊর্মিলা স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল।

ব্যক্তিত্বের এরকম অভিব্যক্তি হয়তো বিজয় মেহেরার কল্পনার মধ্যে ছিল না। প্রণামের উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি পা ছোঁবার জন্য এগিয়ে এলো। কিন্তু দুটো পা-ই পাতলা চাদরের তলায়।

—থাক। আঙুলে তুলে গায়ত্রী রাই চেয়ার দেখালো।—বো' ''।

বিজয় মেহেরা বসে বাঁচল।

কিন্তু তার পরেও ওই দু' চোখ মুখের ওপর অনড়। কথায় অনুযোগের লেশমাত্র নেই। কি আছে সেটা বাপী অনুভব করতে পারছে। ঊর্মিলাও পারছে।

—কঁদিন তোমরা আমার জন্য শিলিগুড়ির হোটেলে কাটালে শুনলাম। আমি জানতাম না, বাপী কাল রাতে বলল।...ছুটি-ছাটা না থাকায় তোমার অসুবিধের কথা ভেবে ওর খুব চিন্তা, তাই না বলে পারল না।

ফাঁপরে পড়া ভাবটা কাটিয়ে উঠে বিজয় মেহেরার সহজ হবার চেষ্টা। সায় দিয়ে বলল, নতুন জয়েন করেছি, তার ওপর কাজের এত চাপ...ছুটি বলে কিছু নেই এখন।

গায়ত্রী রাইয়ের সামান্য মাথা নাড়ার অর্থ, সমস্যাটা বুঝেছে। বলল, আর দেরি কোরো না, খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলের প্লেনেই চলে যাও। বাপীর দিকে তাকালো।—ওদের প্লেনের টিকিট কাটা হয়েছে তো?

বাপী হাঁ-না কিছুই বলল না। ঊর্মিলার মুখ আরো ফ্যাকাশে। কিন্তু মেহেরা ছেলেটা

সরলাই। শাশুড়ির উদারতা দেখে তারও একটু উদার হবার ইচ্ছে। বলল, আপনার শরীর খুব খারাপ শুনলাম, ডলি না হয় এখন আপনার কাছেই থাক না—

ঠাণ্ডা দু চোখ আবার তার মুখের ওপর—তোমার নিয়ে যেতে কোনো অসুবিধে আছে?

—না, না—আমি ভালো কোয়ার্টার্সই পেয়েছি...

—তাহলে নিয়ে যাও।...আমার চোখে ধুলো দিয়ে ডলি এখান থেকে চলে যাবার পর একে-একে ছটা দিন চলে গেছে। ওকে সাপে কেটেছে কি কোথাও কোন অঘটন ঘটেছে বা কি হয়েছে ছ-ছটা দিনের মধ্যে আমাকে কেউ কিছু বলেনি। তখন আমার শরীরের কথা কেউ ভাবেনি। যাক, তুমি নিশ্চিন্ত মনে ওকে নিয়ে চলে যাও। বাপী আছে...তার কর্তব্যজ্ঞান খুব।

বাপী বারান্দায় চলে এলো। একটু বাদে ঊর্মিলাও এসে চুপচাপ সামনে বসল। অপরাধের একই বোঝা দুজনের বুকে চেপে আছে। নিজেদের মধ্যে ফয়সলা যখন হয়েই গেছল, সব ভয়-ভাবনা ছেঁটে দিয়ে একসঙ্গে দুজনে যদি এই একজনের কাছেই এসে ভেঙে পড়ত, কি হতে পারে না বা কি হবেই হবে খোলাখুলি সেই ঘোষণাই করত—তাহলে কি হত? রাগ করত, আঘাত পেত কিন্তু এই বিয়েই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে দিতে হত। আজ মনে হচ্ছে, ওরা তার দাপটই দেখেছে শুধু ভেতরটা দেখেনি।

দুপুরে খাওয়ার টেবিলেও একটা স্তব্ধতা থিতিয়ে থাকল। নতুন জামাইয়ের খাতিরেও বাপীর সহজ হবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। গায়ত্রী রাই নিজের ঘরে। তার সময়ে খাওয়া সময়ে বিশ্রামের আজও ব্যতিক্রম ঘটল না। এদিকে তার নির্দেশেই কোয়েলার পরিপাটি ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি নেই। বিশেষ আয়োজনের ফলে লাঞ্চে বসতে অন্য দিনেব তুলনায় দেরি হয়েছে।

খাওয়ার পরে বাপী বার দুই মহিলার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। ঊর্মিলাও। ...শুয়ে আছে। সাড়া নেই। চোখ বোজা। এ বিশ্রামের অর্থ এত স্পষ্ট যে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতেও দ্বিধা।

মেয়ে জামাইয়ের যাবার সময় হবার খানিক আগে গায়ত্রী রাই উঁচু বালিশে ঠেস দিয়ে বসেছে আবার।

ওরা ঘরে এলো। পিছনে বাপী। সকলকে ছেড়ে গায়ত্রী রাই জামাইযের দিকে তাকালো। —যাচ্ছ?

বিজয় জানান দিল,—এখনো আধ ঘণ্টা মতো সময় আছে।

—এয়ার অফিস পথ কম নয়...হাতে সময় নিয়ে রওনা হওয়াই ভালো। বাপীকে জিজ্ঞাসা করল, ওদের বাগডোগরা ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে, বাদশাকে বলে রেখেছে?

বাপী মাথা নাড়ল। বলা হয়েছে।

জামাইয়ের দিকেই ফিরল আবার।—তোমার সঙ্গে যেতে পারে এরকম একটু বড় ব্যাগট্যাগ কিছু নেই?

হেতু না বুঝেই সে তাড়াতাড়ি জবাব দিল, এয়ার ব্যাগ আছে—

—নিয়ে এসো।

—অত কিছুই না। আরো ঢের পাবে।

এবারেও কিছু না বুঝেই বিজয় হন্তদন্ত হয়ে পাশের ঘর থেকে ব্যাগটা নিয়ে এলো। গায়ত্রী রাই বালিশের তলা থেকে শক্ত সুতোয় বাঁধা বড় একটা খামে মোড়া প্যাকেট তার দিকে বাড়িয়ে দিল।—এটা সাবধানে ওর মধ্যে রাখো. আর ব্যাগ নিজের সঙ্গে রেখো।

ঊর্মিলা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিজয় ভেবে পেল না কি ব্যাপার।—কি আছে এতে?

—আগে রাখো ঠিক করে।

বিমূঢ় মুখে তামিল করল। প্যাকেট ব্যাগে ঢোকালো।

গায়ত্রী রাই বলল, চল্লিশ হাজার টাকা আছে ওখানে।...যে তাড়াহুড়োর ব্যাপার করলে, কিছুই করা গেল না। তোমাদের যা পছন্দ ওই থেকে করে নিও।

বিজয় মেহেরা আঁতকেই উঠল।—অত টাকা কি হবে!

এবারে ঊর্মিলা ভেঙে পড়ল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মা, তুমি আমাদের টাকা দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছ।

এই প্রথম পরিপূর্ণ দু চোখ মেয়ের মুখের ওপর এঁটে বসতে লাগল। বাপীর মনে হল শুধু দেখবেই। জবাব দেবে না।

জবাব দিল। বলল, এখানে আমার কাছে পড়ে থাকার জন্য এমন দুড়দাড় করে বিয়েটা সেরে ফেলেছিস?

—না-না। তুমি তাড়িয়েই দিচ্ছ! আমি ঠিক জানি তুমি আমাকে আর কক্ষনো ডাকবে না।

চেয়ে আছে। একটু পরে খুব স্বাভাবিক অনুশাসনের সুর।—ছেলেটার সামনে কি পাগলামি করিস? চোখ মোছ! আমার শরীরেব হাল দেখছিস না...আমি না পারলেও সময়মতো বাপী ঠিক ডাকবে। তখন দেরি না করে বিজয়কে নিয়ে চলে আসিস।

ঊর্মিলা তবু কাঁদছে। মা কি যে বলল, এই বিচ্ছেদের আবেগে তা মাথা পর্যন্ত পৌঁছুলো না বোধ হয়। বিজয় মেহেরারও না।

এক আর্ত ত্রাসে বাপীই শুধু নিস্পন্দ হঠাৎ।

সময় হয়েছে। বাপীর গাড়ি নিয়ে বাদশা প্রস্তুত। মায়ের পা ছুঁয়ে ওরা বেরিয়ে এলো। গাড়িতে উঠল। বাপী পাশে দাঁড়িয়ে। ঊর্মিলা চেয়ে আছে তার দিকে। আশা করছে এই রওনা হবার মুহূর্তে ফ্রেন্ড কিছু বলবে। আর কিছু না হোক, মায়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে বলবে। শিগগীরই আবার দেখা হবার কথা বলবে।

বাদশাও ঘাড় ফিরিয়ে হুকুমের প্রতীক্ষায় আছে। বাপী হুকুম করল,—চলো!

সামনের বাঁকের মুখে গাড়িটা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত ঊর্মিলা জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে এদিকে চেয়ে রইল। বাপীও। কিন্তু সে ওকে দেখছে না। গাড়িটাও না। মাথার মধ্যে চিনচিন করে জ্বলছে কিছু। কতগুলো কথার কাটা-ছেঁড়া চলেছে। গায়ত্রী রাই শেষে মেয়েকে যা বলেছে সেই কটা কথা। মেয়েকে বলেনি, ওকে শুনিয়েছে, ওকেই কিছু বোঝাতে চেয়েছে। বুকের ভেতরটা আচমকা দুমড়ে মুচড়ে দি. যন্ত্রণাটা মগজের দিকে ধাওয়া করেছে। এখন সেটা চোখ বেয়ে নেমে আসতে চাইছে।

বাপী বাংলোয় উঠে এলো। সেখান থেকে আবার ঘরে। কোয়েলা তার মালকানের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে। কিছু বলতে হল না এই মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দু'চোখ আরো বেশি করকর করছে বাপীর। চেয়ে আছে।

চেয়ে আছে গায়ত্রী রাইও। ভাবলেশশূন্য, নির্লিপ্ত।—বলবে কিছু?

—হ্যাঁ! আপনার মেয়ের শাস্তি দেখলাম। আমার কি শাস্তি?

জবাব দেবার তাড়া কিছু নেই যেন। একটু সময় নিয়ে ফিরে প্রশ্ন করল, মেয়ের কি শাস্তি দেখলে?

—ক্ষমার শাস্তি। আমি আপনার ক্ষমা ই না।

মুখখানা যেন আরো একটু ভালো করে দেখে নেওয়ার কারণ ঘটল। অভিব্যক্তির রকমফের নেই, গলার স্বরে নির্লিপ্ত কৌতুকের ছোঁয়া লাগল একটু।—তুমি তো আমার

সার্জেন এখন...এ-সবের অনেক ওপরে উঠে গেছ। পরের কথাগুলো ধার-ধার।—তাছাড়া এসব কথা ওঠে কেন. নিজের মুখেই তো বলেছ. যা করেছ জীবনে কারো এত উপকার খুব কম করেছ।

—হ্যাঁ. বলেছি। তাই করেছি। কিন্তু তার বদলে আপনি কি করেছেন?

কি বলতে চায় গায়ত্রী রাই ঠাওর করে উঠতে পারল না। দেখছে।—আমি কি করেছি?

—আপনি মেয়েকে বলেছেন. সময়মতো বাপী ঠিক ডাকবে। সময়মতো বলতে কোন্ সময়? কিসের সময়? আর বলেছেন, তখন দেরি না করে চলে আসতে। তখন বলতে কখন?

দু' চোখ রাগে জ্বলছে বাপীর। কিন্তু গত রাতের পর থেকে এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম গায়ত্রী রাইয়ের মুখের নির্লিপ্ত কঠিন পরদাটা সরেছে একটু একটু করে। কোমল প্রলেপ পড়ছে। পাতলা সাদা ঠোঁটের ফাঁকে রং ধরেছে। একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে ঘরের হাওয়াও লঘু করে দিতে চাইল। পলকা মোলায়েম সুরে বলল, আমার ডাক আসতে আর বেশি দেরি নেই. তোমার বুঝতে খুব অসুবিধে হচ্ছে?

আগে হলে বাপী এই কমনীয় মাধুর্যটুকু দু চোখ ভরে দেখতে। কিন্তু এখন, বিশেষ করে এই কথা শোনার পর দ্বিগুণ ক্ষিপ্ত। বলে উঠল. ডাক আসুক না আসুক, আমাকে আক্কেল দেবার জন্য আপনি যে তৈরী হচ্ছেন সেটা বুঝতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু আমাকে অনেক চিনলেও আরো একটু চিনতে বাকি আপনার। নিজে সেধে ডাক শুনতে এগোলে তার আগে আমি আপনাকে নিজের মরা মুখ দেখিয়ে ছাড়ব। বানারজুলির জঙ্গলে তার সুযোগের অভাব কিছু নেই—

—বাপী!

বাতাস-চেরা তীক্ষ্ন চিৎকার শুনে ওদিক থেকে কোয়েলা ছুটে এলো। বাপীর ফুটন্ত মগজে হঠাৎ যেন বিপরীত হিমশীতল তরঙ্গ বয়ে গেল একটা। শয্যার দিকে একবার থমকে তাকিয়ে ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো।

এরপর থেকে বাপীর বাইরেটা অনেক ধীর অনেক শান্ত। নিভতে নিঃশব্দে এক ধরনের শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা। যে শক্তি জীবনের অমোঘ বরাদ্দও বরবাদ করে দিতে পারে। সেই অদৃশ্য শক্তিটা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পেতে চায়। পাশের বাংলোর ওই রমণীর প্রাণসত্তায় সেটা আরোপ করে দিতে চায়।

পাশের বাংলোয় নয়। এখন ওই বাংলোতেই রাত কাটে তারও। পাশের ঘরে অর্থাৎ ঊর্মিলার ঘরে নিজের শোবার জায়গা করে নিয়েছে। এজন্যে কারো অনুমতির দরকার হয়নি। মাঝের দরজা খোলা। নিজের শয্যায় বসেই দেখতে বা লক্ষ্য রাখতে সুবিধে হয়। গায়ত্রী রাইয়ের ঘরে সবুজ আলো জ্বলে।

সেই ঘটনার পর থেকে তারও আচরণ বদলেছে। কোনো কিছুতে নিজের জোর খাটায় না। এক অবুঝ গোঁয়ার ছেলের হাতে নিজের সব দায় সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত। যা বলে, শোনে। যা করতে বলে, করে। তবু শরীর সারার নাম নেই দেখে বেচারী-মুখ করে বাপীর দিকে চেয়ে থাকে।

ঊর্মিলার যাবার সাত-আট দিনের মধ্যে পৌঁছানোর সংবাদ এসেছে বাপীর কাছে। ঊর্মিলার তখনো মন খারাপ. তখনো অভিমান। ছোট চিঠিতে মায়ের খবর জানতে চেয়েছে। নিজেদের কথা বিশেষ লেখেনি।

আর দশ দিন পরের চিঠি অবশ্য বড়। লিখেছে, কলকাতা একটুও ভালো লাগছে না। আর একজনের কেবল কাজ তার কাজ। সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে ফুরসৎ নেই। আর

লিখছে, মা-কে যে এত ভালবাসে আগে জানত না। এখন বুঝছে। সব সময় মায়ের কাছে ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করে। মা রাগ করুক আর যাই করুক, আর বেশিদিন মাকে না দেখে ও এভাবে থাকতে পারবে না। বিজয়কে রেখে একলাই দিনকতকের জন্য চলে আসবে।

বাপী এ চিঠিও তার মাকে পড়ে শোনালো।

—না। স্বর না চড়লেও সুর কঠিন।

বাপী জিজ্ঞাসা করল, কি না?

—লিখে দাও একলা আসতে হবে না। আমি ভালো আছি, আমার জন্য কোনো চিন্তা নেই।

এই শুনেও বাপীর রাগ।—আমি লিখে দিচ্ছি, আপনি একটুও ভালো নেই, যত তাড়াতাড়ি পারে চলে আসুক।

আসলে বাপীর বুকের তলায় সেই এক ত্রাস থিতিয়েই আছে। সেটা কতটা অহেতুক জানে না। একটা হিম-ছবি থেকে থেকে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যে সময়ে তার মেয়েকে বাপীর ডাকতে হবে, সেই সময়ের ডাক শুনে দেরি না করে যখন মেয়েকে চলে আসতে হবে, সেই সময়ের। সম্ভাবনার এই ছবিটাই ছিঁড়েখুঁড়ে উপড়ে নির্মূল করে দিতে চায়। কিন্তু খুব ধীরে, প্রায় অগোচরের অমোঘ গতিতে এটা যেন এগিয়ে আসছে।

তাই আতঙ্কিত যেমন, আক্রোশও তেমনি।

মফঃস্বলে বেরুনো ছেড়েই দিয়েছে। সব কাজ ফোনে বা চিঠিতে এখানকার জন্য একে একে আরো দুজন বাছাই করা সহকারী বহাল করেছে। তারা অনুগত, বাপী তরফদারকেই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা জানে তারা! তাছাড়া মাইনে আরো বাড়িয়ে আবু রব্বানীর ঘাড়েও অনেক বাড়তি দায় চাপিয়েছে। বাপীর কাজ বলতে বাংলোর আপিস ঘরে। খুব দরকার পড়লে বানারজুলির গোডাউনে অথবা পাহাড়ের বাংলোয় যেতে হয়। তাও কাজ শেষ হওয়া মাত্র ঝড়ের গতিতে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে আসে।

ঘরে এসে দাঁড়ালেই গায়ত্রী রাই খুব সহজ আর স্বাভাবিক মুখ করে তাকায় তার দিকে। বোঝাতে চায় ভালো আছে। কিন্তু ভালো যে কেমন আছে এক নজর তাকিয়েই বাপী সেটা বুঝতে পারে। অন্তত বিশ্বাস করে যে বুঝতে পারে। আরো রেগে যায়। যেন লুকোচুরি খেলা হচ্ছে ওর সঙ্গে।

সেদিনও বাইরে থেকে ফিরে মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে বলল এখানকার ডাক্তার-দের বিদ্যা-বুদ্ধি বোঝা গেছে। আর না, বাইরে যাবার জন্য তৈরি হোন।

মুখের দিকে চেয়ে মেজাজ আঁচ করেও গায়ত্রী রাই বলল, পাগলামি কোরো না।

—আমি পাগলামি করছি? আর মুখ বুজে কষ্ট সহ্য করে আপনি খুব বুদ্ধির কাজ করছেন? তাহলে আমাকে আর কি দরকার, যেদিকে দু চোখ যায় চলে যাই?

গায়ত্রী রাইয়ের সাদা-সাপটা জবাব, ভয় দেখাচ্ছ কি, পারলে যাও। চেয়ে আছে, সামাল দেবার জন্যেই আবার বলল, হার্টের এই অবস্থায় আকাশে ওড়া সম্ভব কিনা ডাক্তারকে জিগ্যেস করেছ?

বাপী তক্ষুনি চলে এলো। ফোনে শিলিগুড়ির ডাক্তারকে ধরল। ইদানীং প্রতি সপ্তাহে তাকে বানারজুলি এসে রোগিণী দেখে যেতে হচ্ছে। তার সঙ্গে কথা বলে রিসিভার আছড়ে বাপী মুখ কালো করে ঘরে ফিরে এলো।

গায়ত্রী রাই সাদা ভাবেই জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তার যেতে বলল?

চোখের ধার ওই ফ্যাকাশে সাদা মুখে বিঁধিয়ে দিতে চাইল বাপী।—না। খুশী?

শিলিগুড়ি থেকে দুজন অভিজ্ঞ নার্স নিয়ে এসেছে এরপর। পালা করে রাতদিনের

ডিউটি তাদের। দরকার একেবারে ছিল না এমন নয়। বড় ডাক্তারের ব্যবস্থামতো মাঝে মাঝে অক্সিজেন চলছে এখন। অক্সিজেন দেওয়া মানেই ভয়ের কিছু নয় জানে। তবু এ জিনিসটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না বাপী। গা শিরশির করে। সেই হিমেল ছবিটা. সামনে এগিয়ে আসতে চায়। কিন্তু অক্সিজেন দিলে রোগীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়, আরাম হয়। অসুবিধে হচ্ছে মনে হলে গায়ত্রী রাই নিজেই ওটা চেয়ে নেয়। দরকার ফুরোলে ছেড়েও দেয়। কিন্তু দরকারের মেয়াদ যে খুব একটু একটু করে বাড়ছে তাও বাপীর হিসেব এড়ায় না। তাই কারণে অকারণে অসহিষ্ণুতা। একজন ছেড়ে দুজন নার্স আসতে দেখে গায়ত্রী রাই বলল, এক কাজ করো. জঙ্গলের একটা হাতি-বাঁধা শেকল এনে আমাকে বাঁধো, তারপর নিশ্চিন্তে একটু কাজে-কর্মে মন দাও।

সঙ্গে সঙ্গে বাপীর মনে হয়েছে, বনের হাতি বনমায়াকে শেকলে বেঁধে রাখা যায়নি. সে খোলস ফেলে পালিয়েছে। ফলে এই ঠাট্টাতেও রাগ।—তাহলে ছেড়ে দিই এদের?

নার্সদের সামনে গায়ত্রী রাই না পারে হাসতে, না পারে বকতে।

দিনে রাতে ঘণ্টা কতক কাজ দেখাশুনা করতেই হয় বাপীকে। মহিলা ইদানীং সেই ফাঁকে কিছু লেখা-পড়া করে চলেছে টের পেল। তার মাথার কাছের টেবিলে কিছু সাদা কাগজ আর কলম দেখে বাপীর সন্দেহ হয়েছিল। আড়ালে নার্সদের জিজ্ঞাসা করে জানল। কোয়েলাও বলল। চার-পাঁচ দিন বাদে টেবিলে আর কাগজ কলম দেখা গেল না। বাপীর থমথমে মুখ।—আপনার উইল-টুইল করা সারা তাহলে? সাক্ষী-সাবুদ ডাকতে হবে

কোয়েলা ঘরে। সামনে একজন নার্স বসে। গায়ত্রী রাইয়ের বিপাকে-পড়া মুখ।—উইল আবার কি? ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা লিখে রাখলাম তা ছাড়া—

অসহিষ্ণু ঝাঁঝে বাপী তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, আপনার ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় দুনিয়া চলছে ভাবেন? যা লিখেছেন ছিঁড়ে ফেলতে কতক্ষণ লাগে?

গায়ত্রী রাই গম্ভীর। ধমকের সুরে বলল, এবার ডাক্তার এলে আগে নিজের মাথাটা দেখিয়ে নিও।

ছায়া আগে চলে। বাপীর চিন্তায় সেটা অনেক আগে চলে। মন আগে থাকতে কিছু বলে দেয়। তেমনি অনাগত কিছুর সঙ্গে সারাক্ষণ যুঝছে এখন। সেটা নাকচ করে দেওয়ার আক্রোশ। অথচ আর কারো উতলা মুখ দেখলে রেগে যায়। অকারণে কোয়েলা ধমক খায়, নার্সদের বেশি যত্ন-আত্তিও সব সময় পছন্দ নয়. ঘণ্টাখানেকের জন্য সেদিন কি কাজে বেরিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে আবু রব্বানী আর দুলারি এসেছে। মেমসাহেবকে দেখতে।

বাপী নীরস মন্তব্য করে বসল. ঘটা করে দেখতে আসার মতো কি হয়েছে—তোমাদের মেমসায়েবের তাতে খুব কিছু হয়েছে ভাবার সুবিধে।

আবু অপ্রস্তুত। দুলারিও। সাদামাটা গাম্ভীর্যে গায়ত্রী রাই আগের বারের মতোই মন্তব্য করল. বাপী ঠিকই বলেছে. ওকে বরং ভালো করে দেখে যাও।

একে একে কটা মাস কাটল। এই অনাগত দিনের পদক্ষেপ এখন আরো স্পষ্ট। দিনে রাতে অনেকবার করে অক্সিজেন দরকার হয়। এক এক দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে। শিলিগুড়ির বড় ডাক্তারের একজন সহকারীকে বানারজুলিতে নিজের ছোট বাংলোয় এনে বসিয়ে রেখেছে বাপী। তার ক্ষিপ্ততা আরো বেড়েছে, এক অদৃশ্য বিধানের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করছে। সাহস করে ঊর্মিলাকে আসতে বলবে কিনা জিজ্ঞাসাও করতে পারে না। ও এসে ভেঙে পড়লে বাপী তার সমস্ত জোর খোয়াবে।

মাঘের গোড়া এটা। হাড়-কাঁপানো শীত। বানারজুলির জঙ্গলে শুকনো কঠিন রিক্ততার ছাপ। তার কঠোর বৈরাগ্যের তপস্বিনী মূর্তির সঙ্গে শয্যায় শয়ান ওই শান্ত

রমণীর নিষ্প্রভ মুখের কোথায় যেন মিল। এতটুকু চাঞ্চল্য নেই ক্ষোভ নেই।

রোগীর অবস্থা হঠাৎই সংকটের দিকে মোড় নিল। এমন হবে ডাক্তার পর্যন্ত বুঝতে পারেনি। কিন্তু বাপী যেন স্পষ্ট জানত এই গোছের কিছু হবে।

রাত্রি। অক্সিজেন চলছে। ডাক্তার পাশে দাঁড়িয়ে। ঘন ঘন ইনজেকশন দিচ্ছে। ঘরে দুজন নার্স, কোয়েলা...। বাপীর ঘোরালো চোখ একে একে সকলের ওপর ঘুরছে।

গায়ত্রী রাই চোখ মেলে তাকালো। আশ্চর্য পরিষ্কার চাউনি।

বাপী কাছে এসে দাঁড়াল। গায়ত্রী রাই কিছু বলল না। শুধু চেয়ে রইল।

বাপী বলল, টেলিগ্রাম করা হয়েছে। কাল সকালের মধ্যেই ওরা এসে পড়বে।

গায়ত্রী রাই আবার চোখ বুজল। যেন এটুকুই শুনতে চেয়েছিল।

বাপী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। আপিস ঘরে এসে চুপচাপ বসে রইল।

রাত বাড়ছে। দেওয়াল ঘড়ি টুং টুং শব্দে সময় জানান দিচ্ছে। ওটুকু শব্দেও বাপী বিষম চমকে উঠেছে। ঘড়িটা আছাড়ে ভাঙতে চাইছে।

তিনটে বাজল।

বাপী সোজা হয়ে দরজার দিকে তাকালো। কোয়েলা ছুটে এসেছে।—সাহেব! শিগগীর—শিগগীর!

আবার ছুটে চলে গেল।

বাপী উঠল। পায়ে পায়ে এঘরে এসে দাঁড়াল। সবুজ আলোর জায়গায় জোরালো বড় আলো জ্বলছে এখন। অক্সিজেনের নল সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নার্স দুজনের ছলছল চোখ। ডাক্তার নির্বাক দাঁড়িয়ে। কোয়েলা মুখে শাড়ি গুঁজে দিয়ে কাঁদছে।

বাপী শয্যা ঘেঁষে দাঁড়াল। বুকে হাত রাখল। আর কোনো সংশয় নেই। শান্ত। স্তব্ধ।

এখনো একটা চেষ্টা বাকি আছে বাপীর, যা অনেক—অনেক দিন গলা পর্যন্ত এসেও ফিরে ফিরে গেছে। এই শেষ একবার সেই চেষ্টা করবে?..এই বাতাস এই স্তব্ধতা খান-খান করে দিয়ে গলা ফাটিয়ে একবার মা বলে ডেকে দেখবে? তাহলে কানে যাবে? তাহলে ফিরবে? চোখ মেলে তাকাবে?

॥ নয় ॥

ছমাস বাদে বাপী আবার কলকাতার মাটিতে পা ফেলল।

এই আসাটা হঠাৎ কিছু ব্যাপার নয়। দু-তিন মাস যাবৎ আসার প্রস্তুতি চলছিল। গায়ত্রী রাই চোখ বোজার পর থেকে বানারজুলির সঙ্গে শিকড়ের যোগটা ঢিলে হয়ে গেছে। বানারজুলি ছেড়ে গেলে হয়তো আবার একদিন বানারজুলি ভালো লাগতে পারে। প্রথম কিছু দিন এখান থেকে একেবারে পালানোর ঝোঁক মাথায় চেপে বসেছিল। তার পিছনে আক্রোশ ছিল। অভিমান ছিল। বানারজুলি তাকে বেঁচে থাকার বিত্ত যুগিয়েছে। অকৃপণ হাতে জীবনের বোঝা টানার কড়ি ঢেলেছে। নিয়েছে তার ঢের বেশি। নিয়ে নিয়ে সেই ছেলেবেলা থেকে এ পর্যন্ত বুকের ভিতরে একটা মরুভূমি তৈরি করেছে।

কিন্তু কোথা থেকে কোথায় পালাবে? যেখানে যত দূরেই যাক, জীবনের এই বোঝাটাকে কোথাও ফেলে রাখা যাবে না। একই সঙ্গে আবার এক বিপরীত অনুভূতির তাড়না অবাক করেছে ওকে। মৃত্যুর ওধারে কি জানে না। কেউ জানে না। কিন্তু অলক্ষ্য থেকে কেউ কি দেখে? কে কি ভাবছে টের পায়? সব ছেড়েছুড়ে পালানোর চিন্তা যতবার মাথায় আসে, ততবার অদৃশ্য একখানা মুখ তার শান্ত ঠাণ্ডা দুটো চোখ যেন খুব কাছ থেকে ওকে দেখে, নিষেধ করে। আভিজাত্য গাম্ভীর্য ব্যক্তিত্ব ভরা এমন একখানা মুখ আর

দুটো চোখের সস্নেহ শাসন কেউ কখনো তুচ্ছ করতে পেরেছে! বাপীর ভেতরটা হাঁসফাঁস করে ওঠে। চারদিকে তাকায়। মনে হয় গায়ত্রী রাই খুব কাছে আছে। খুব কাছ থেকে দেখছে। খুব কাছ থেকে নিষেধ করছে।

পালানোর সংকল্প মাথা থেকে সরেছে। এবার তাহলে কি? খুব কাছের যাকে দেখতে পাচ্ছে না, অসহিষ্ণু সরোষ প্রশ্নটা যেন তাকেই। কি তাহলে? যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই বৃত্তটাকে আরো বড় করতে হবে? আরো অনেক বড় ঢের বড়? জঙ্গলের উদোম সন্ন্যাসী ওকে আগে বাড়তে বলেছিল—আগে বাড়লে পেয়ে যাবে। চোখ-কান বুজে এই পথেই সামনে এগোবে এখন? কিন্তু কি পাবে? অনেক টাকা, তারপর আরো অনেক টাকা? তারপর আরো অনেক অনেক অনেক টাকা? তারও পরে?

ঠিক তক্ষুণি সেই আশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটে গেল। বুকের তলার কালীবর্ণ আকাশটাকে এক ঝলক বিদ্যুৎ পলকের জন্য দুখানা করে চিরে দিয়ে গেল। ওই পলকের মধ্যেই বাপীর ঘেমে ওঠার দাখিল। দুর্যোগে ভরা অন্ধকারের আড়ালে এখনো কোনো সুদূর প্রত্যাশার আগুন জ্বলছে কিনা জানে না। সেটাই একপ্রস্থ ঝলসে গেল কিনা জানে না। কিন্তু আপাতত ওটা ওই অন্ধকারের ওধারেই থাকুক। পরে ভাববে। পরে বুঝতে চেষ্টা করবে। খুব কাছে যার অস্তিত্ব অনুভব করছে অথচ দেখতে পাচ্ছে না—সেও না কিছু বুঝতে পারে।

তার ইচ্ছে মেনে বৃত্ত বড় করার ঝোঁকটাকে বড় করে তুলতে গেল। আপাত পিছু টান কিছু নেই। ব্যবসার দিক থেকে ভাগ্যের পাশায় আবার নূতন যে দান পড়েছে তার দাক্ষিণ্যে বৃত্ত বিস্তারের কথা ভাবতে গিয়ে প্রথমেই কলকাতার দিকে চোখ বাপীর।

সংকল্পের কথা গোড়ায় ঊর্মিলাকে জানায় নি। ঊর্মিলা তখনো এখানে। বিজয়ও। টেলিগ্রামে মায়ের মামাবাড়ির খবর পেয়ে পরদিন সকালের প্লেনেই ওরা ছুটে এসেছিল। ঊর্মিলা মরা মায়ের বুকের ওপর আছড়ে পড়ে কেঁদেছে। কেঁদে কেঁদে কিছু ঠাণ্ডা হতে [illegible]। কিছু হালকা হতে পেরেছে। বাপীর সে সম্বলও নেই কোনো দিন। খরচোখে ওর আছাড়ি-বিছাড়ি কান্না দেখেছে। হিংসা করেছে।

সমস্ত ব্যবসা আর বিত্ত চুল-চেরা দু' ভাগ করে গায়ত্রী রাই এক ভাগ বাপী আর একভাগ মেয়ে-জামাইকে দিয়ে গেছে। দিয়ে গেছে বলতে এই মর্মে নির্দেশ রেখে গেছে। ঊর্মিলা একটু ঠাণ্ডা হাতে তার মায়ের শোবার ঘরের বড় সিন্দুক খোলা হয়েছিল। গায়ত্রী রাই মেয়ের সামনেও এটা বড় একটা খুলত না। ওই পেল্লায় সিন্দুকে থরে থরে সাজানো দশ আর একশ টাকার বাণ্ডিল দেখে বিজয় মেহেরার দু'চোখ ঠিকরে পড়ার দাখিল। কোন্ ঘরের মেয়ে নিয়েছে এ যেন নতুন করে অনুভব করেছে। এ ছাড়া ছোট-বড় সোনার বারও পঁচিশ-তিরিশটা হবে। হীরে জহরতও আছে কিছু।

সিন্দুক থেকে একটা মস্ত বড় আর একটা ছোট খাম বার করে বাপী ঊর্মিলার হাতে দিয়েছে। দুটোরই যত্ন করে মুখ আঁটা। বলেছে, কি লিখে গেছেন আমি জানি না, খুলে দেখো।

ছোট খামে মেয়ে-জামাইয়ের প্রতি গায়ত্রী রাইয়ের সংক্ষিপ্ত নির্দেশ। পড়ে ঊর্মিলা নিঃশব্দে সেটা আবার বাপীর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। পড়তে পড়তে গলার কাছে বাপীর কিছু বুঝি আবার দলা পাকিয়ে উঠেছে। ব্যবসার যাবতীয় দায়দায়িত্ব যেমন বাপীর হাতে আছে তেমনি থাকবে। জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে তার বরাদ্দ টাকা, চালু হারে কমিশন আর অন্যান্য সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে নিট লাভের আট আনা অংশ মেয়ে-জামাই পাবে। মালিকানা সম্পর্কে অন্য যে-কোনো সিদ্ধান্ত দু'তরফের বিবেচনাসাপেক্ষ। ঘরে এবং ব্যাঙ্কের সমস্ত নগদ টাকা, সোনা ইত্যাদিরও অর্ধেক বাপী তরফদার পাবে, বাকি অর্ধেক

মেয়ে-জামাইয়ের। কোয়েলা ঝগড়ু বা বাদশা ড্রাইভারকেও ভোলেনি। তাদের জন্যও কিছু থোক টাকা আলাদা সরানো আছে। ভুটান পাহাড়ের বাংলোটা একলা মেয়ে পাবে। ব্যবসায়ের জন্য যদি সে বাড়ির দরকার হয়, তার ন্যায্য ভাড়াও মেয়ের নামে জমা হবে।

বড় খামে উত্তরবাংলার আর তার বাইরে বহু ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা-কড়ির হদিস, ব্যাঙ্কের পাস-বই চেক-বই ইত্যাদি। এই টাকাও প্রায় অভাবিত পরিমাণ। প্রতিটি অ্যাকাউন্ট মেয়ে আর মায়ের নামে। তাই মেয়ের প্রতি মায়ের নির্দেশ, সে-যেন বাপীর প্রাপ্য অর্ধেক তাকে দিয়ে দেয়।

মোটামুটি হিসেব কষা হতে বিজয় মেহেরার মুখে কথা সরে না। ব্যাঙ্ক আর সিন্দুকের নগদ টাকা ভাগে চার লক্ষর ওপরে দাঁড়াচ্ছে। এর ওপর সোনা হীরে জহরতের ভাগ। কিন্তু তখনই সব কিছুর ফয়সালা করার মতো সময় নেই হাতে। নগদ টাকা আর সোনা ইত্যাদির অর্ধেক বুঝে নিয়ে সস্ত্রীক বিজয় কলকাতা চলে গেছে। বাকি সব কিছুর ব্যবস্থা পরের যাত্রায়। যাবার আগে ঊর্মিলা চুপি চুপি বাপীকে বলে গেছল, ওর কাছে সব একবারে ফাঁস করে দিয়ে ভালো কাজ করলে না বোধ হয়। কলকাতায় চাকরি ভালো লাগছে না, আবার বাইরে কাজের চেষ্টায় আছে। এত হাতে পেয়ে এখন মতিগতি কি হয় দেখো।

বলেছে বটে কিন্তু বাইরে পাড়ি দেবার ব্যাপারে ঊর্মিলারও তেমন বাধা কিছু আছে মনে হয়নি। পরের দু'তিনটে চিঠিতেও এই তোড়জোড়ের আভাস দিয়েছে ঊর্মিলা। লিখেছে তার ঘরের লোক এখন বেপরোয়া হয়ে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে, আর বলছে ক... হাতে না পেলেও চলেই যাবে। বিদেশে ওদের জন্য উল্টে কাজই নাকি হাঁ করে আছে।

তিন মাসের মাথায় ওরা বানারজুলি এসেছে আবার। বিজয়ের খুশি ধরে না। ওর কলকাতার চাকরির মেয়াদ আর দেড়-দু মাস মাত্র। আগামী জুলাইয়ের শেষে ওরা আমেরিকা চলল। সেখান থেকে বিজয়ের বড় চাকরির প্রতিশ্রুতি মিলেছে, শুধু নিজের খরচে সেখানে গিয়ে পৌঁছুনোর দায়। এবারে বাপীকে বিজয় সরাসরি একটা প্রস্তাব দিয়েছে। এখানকার ব্যবসায়ে অর্ধেক মালিকানার ব্যাপারে তার বা ডলির কিছুমাত্র আগ্রহ অথবা লোভ নেই। ব্যাঙ্কগুলোতে যে-টাকা মজুত আছে তার অর্ধেক বাপীর পাওনা। বাপী সে টাকাটা ছেড়ে দিলে তারাও অর্ধেক মালিকানার শর্ত ছেড়ে দেবে। কতকালের জন্য বাইরে চলে যাচ্ছে জানে না, আধা-আধি বাখরার হিসেবনিকেশের মধ্যে থাকতে চায় না।

এর থেকে বাঞ্ছিত আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু বাপীর মুখ দেখে মন বোঝা ভার। সে ঊর্মিলাকে জিগ্যেস করেছে, তোমারও এই মত তাহলে?

সে জবাব দিয়েছে, আপত্তির কিছু নেই, তবে ব্যাঙ্কগুলো থেকে ফ্রেণ্ডের দু'লক্ষ টাকার ওপর পাওনা—অর্ধেক মালিকানার বদলে অত দিতে হলে তার না ঠিকা হয়ে যায়।

বাপী হেসেই বলেছিল, ঠকলে আখেরে তোমরাই।

এমন সম্ভাবনার কথা ভেবেই হয়তো গায়ত্রী রাই লিখে রেখে গেছল, ব্যবসায় মালিকানা সম্পর্কে অন্য যে কোনো সিদ্ধান্ত দু'তরফের বিবেচনাসাপেক্ষ। অতএব বাপীর বিবেকও পরিষ্কার।

মালিকানা বদল হয়ে গেল। কিন্তু নামের বেলায় বাপী শুধু একটা রাই ছেঁটে দিল। নতুন নাম রাই অ্যান্ড তরফদার। ভক্ত যেমন সর্বদা তার আরাধ্য দেবদেবীর ছবি সঙ্গে রাখে, বাপীও ঠিক সেই মন নিয়ে ওই ইষ্টদেবীর নাম গোড়ায় বসিয়ে রাখল।

বাপীর লক্ষ্য এরপর কলকাতা। আপাতদৃষ্টিতে সাম্রাজ্য বিস্তারের ঝোঁকটাই বড়। কিন্তু এদিকের সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করার ফাঁকে আরো দুটো মাস কেটেছে। উত্তরাঞ্চলের সব থেকে বড় হার্ব-ডিলার এবারে জাঁকের সঙ্গে কলকাতার বাজারে নামতে চলেছে এই প্রচার আগে থাকতেই শুরু করেছে। প্রচারের চমক বাড়ানোর মতো একটি চৌকস লোকও ঠিক সময়ে জুটে গেছে।

জুটিয়েছে আবু রব্বানী। লোকটার নাম জিত মালহোত্রা। ইউ-পি'র ছেলে। বাপীর বয়সী হবে। স্মার্ট, সুশ্রী। যোগাযোগই বটে। আর কেউ হলে তার পরিচয় শুনেই হয়তো ছেঁটে দিত। কিন্তু আবুর সুপারিশের ফলে বাপীর আগ্রহ বাড়ল। চা-বাগানের সেই ছেলে, বাপীর আগে গায়ত্রী রাই যাকে কাজে বহাল করেছিল। কাজে-কর্মে চতুর ছিল। কিন্তু মেয়ের অর্থাৎ ঊর্মিলার দিকে চোখ যেতে যার আবার মুষিকদশা। আবু বলেছিল, মেয়ের দিকে ছোঁকছোঁক করতে দেখে মা ওকে তাড়িয়েছিল। পরে ঊর্মিলা বাপীকে বলেছিল, তার মতলব বুঝে সে-ই মাকে বলে ওকে তাড়িয়েছে।

বাপীকে এই বানারজুলিতে কে না চেনে। সকলের চোখের ওপর দিয়েই আজ ভাগ্যের এই জায়গাটিতে পৌঁছেছে। জিত মালহোত্রা আবুকে ধরেছে। নিজের ভাগ্য সে আর একবার যাচাই করে দেখতে চায়।

বাপী তাকে নিয়ে আসতে বলেছিল। দেখে আর দু'চার কথা বলে পছন্দ হয়েছে। তার এই দেখার চোখ আলাদা। সপ্রতিভ মুখে অভিবাদন জানাতে বাপী চুপচাপ মুখের দিকে খানিক চেয়ে ছিল। তারপর বলেছিল, নাম জিত, কিন্তু প্রথমেই তো হেরে পালিয়েছিলে—।

ও সবিনয়ে জবাব দিয়েছে, মহিলা মালিক, তাই একটু বেশি আত্মবিশ্বাস হয়ে পড়েছিলাম। ভুলের খেসারত দিয়েছি। আর এমন ভুল হবে না।

—আমার কাছে এলে অমন ভুলের সুযোগ কিছু নেই। আমার অন্য কিছু দরকার।

—বলুন।

—বিশ্বাস। এই প্রথম আর এই শেষ শর্ত!

বাপীর যা পছন্দ তাই করেছিল লোকটা। আর উৎরেও গেছল। বিনীত অথচ সপ্রতিভ আবেদন নিয়ে সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর নিরুচ্ছ্বাস গলায় বলেছিল, আমি বিয়ে করেছি, একটা বাচ্চা আছে। ওদের ভালবাসি। বিশ্বাস হারিয়ে ওদের পথে বসানোর হিম্মত আমার নেই। তাছাড়া বিশ্বাস কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিতে পারে সেটা ছ'বছর ধরে আপনাকে দেখে শিখেছি। এরপর আমারও এই একমাত্র পুঁজি জানব।

বাপী তাকে বহাল করেছে। খেতাব প্রাইভেট সেক্রেটারী। কাজ যোগাযোগ আর প্রচার। চা-বাগান থেকে সর্বসাকুল্যে মাইনে পেত পৌনে তিনশ' টাকা। বাপী সেটা পাঁচশ'য় তুলেছে। বাইরে থাকাকালে এর ওপর থাকা-খাওয়ার খরচ পাবে। এ ছাড়া ভালো পোশাক-আশাকের জন্যও গোড়ায় কিছু থোক টাকা দেওয়া হবে তাকে। আর যা বোঝানোর তাও সোজাসুজি বুঝিয়ে দিয়েছে।—এ টাকা কিছু না আমি জানি। তুমি কতটা বড় হবে সেটা তোমার ওপর নির্ভর করছে।

এক মাস আগে রাই অ্যান্ড তরফদারের মালিক জিত মালহোত্রাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে। গতবারে বড়বাজারের যে-সব মার্চেন্ট-এর সঙ্গে বাপী দেখা করে এসেছিল তাদের প্রত্যেকের নামে শুভেচ্ছাসহ চিঠি পাঠিয়েছে। বড় বড় ওষুধের কারখানার হোমরা-চোমরাদের কাছেও! সঙ্গে কোম্পানীর গাদা গাদা ঝকঝকে ক্যালেন্ডার আর ফ্যাশানের ডায়ারি। বনজ ওষুধের কারবারে প্রচারের এই গোছের চটক তখন পর্যন্ত কলকাতায়ও নতুন। কিছুদিনের মধ্যে জিত জানিয়েছে, কেউ তাদের হেলাফেলা করেনি, অনেকেই

সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

মন সব থেকে বেশি খারাপ আবু রব্বানীর। ব্যবসার মালিকানা বদলের ফলে বরাত ওরই সব থেকে বেশি খুলেছে। এখানকার সব কিছুর তদারকের ভার বাপী ওর কাঁধে চাপিয়েছে। জঙ্গলের হেড বীটম্যানের চাকরি ওকে ছাড়তেই হয়েছে শেষ পর্যন্ত। জঙ্গলের বড় সাহেব খুশি থাকার ফলে ওর ঘরসহ চারিদিকের খানিকটা জমি বাপী আবুর নামেই কিনে ফেলতে নিশ্চিন্ত। এরপর আর সরকারী জমিতে বসবাসের দায় থাকল না। এখানে সকলের মাথার ওপর ওকে বসিয়ে দেবার ব্যাপারে বাপীর মনে এতটুকু দ্বিধা ছিল না। লেখাপড়ার ঘাটতি পুষিয়ে দেবার লোক তিন-চারজন আছে।

আবুর তবু মন খারাপ, কারণ দোস্ত-এর মতিগতির ওপর তার খুব আস্থা নেই। কলকাতা কেমন জানে না। কিন্তু শুনেছে সে এক আজব শহর। সেখানে ব্যবসা ফেঁদে বসলে বানারজুলির সঙ্গে যোগটা শেষে ঢিলে হয়ে যাবে কিনা কে জানে। বাপী কথা দিয়েছে, দরকার হলে মাসের মধ্যে চারবার করেও এখানে এসে দেখাশুনা করে যাবে। আর দরকার না হলেও মাসে বার দুই আসবেই। হাওয়াই জাহাজে এক ঘণ্টার তো ব্যাপার। আর আবুরই বা যখন-তখন চলে যেতে বাধা কোথায়?

আবুর তবু খুঁতখুঁতুনির একটা কারণ দুলারি ফাঁস করছে। ছ'মাস হতে চলল মেমসায়েব বেহেস্তে পাড়ি দিয়েছে, তার মেয়েও বিয়ে-থা করে সরে পড়েছে—এত টাকা আর এত বড় ব্যবসা নিয়েও বাপীভাই একলা পড়ে আছে—এখনো বিয়েসাদির নাম নেই। দুলারিকে নাকি বলেছে, তোমার বাপীভাইয়ের রাজার ভাগ্য রাজার মেজাজ, কিন্তু তার মধ্যে একজন ফকির মানুষও লুকিয়ে আছে। কবে না সব বিলিয়ে দিয়ে মুসাফির হয়ে চলে যায়!

শুনে বাপী হেসেছিল। কিন্তু ভিতরে কোথায় কেটে কেটে বসেছে। ওর ভিতরে লোভের মূর্তিটা ওরা দেখেনি। সেই দানবকে ওরা জানে না। জীবনে যা ঘটে গেছে তাই শেষ বলে ওই দানব আজও মেনে নিতে পারেনি। যে মনের ওপর অগাধ বিশ্বাস সেই মন আজও বলছে, আরো কিছু ঘটতে বাকি। আরো অনেক বাকি। তা না হলে সমস্ত মন এখন কলকাতার দিকে কেন? এখনো আগে বাড়ছে কেন? আরো টাকা আরো টাকা আরো টাকা? আর কিছুই না?

তাই যদি হবে, তাহলে সংগোপনের কিছু লোলুপ চিন্তা মাথায় উঁকিঝুঁকি দেয় কেন? বাপী তরফদার ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করেছে, বিবেকের নুড়ি উঁচিয়ে ছুঁটে দিতেও চেয়েছে। কিন্তু ওরা ফিরে ফিরে এসেছে। আসছে।...প্রথম দিন কলকাতার সেই নামী হোটেলে মিষ্টি বলেছিল, দু'তিন ঘণ্টা পর পর সমস্ত মুখে জল দেওয়াটা বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে। বাথরুম থেকে ফিরে আসার পর কানে মাথায় জলের ছিটে দেখেছিল বাপী। ভেতর ঠাণ্ডা থাকলে এই বাতিক কেন?

ঊর্মিলা আর বিজয় মেহেরার প্রসঙ্গে নির্লিপ্ত সুরে মিষ্টি বলেছিল, অমন মা যখন সহায়, সংকট আবার কি—ইনজিনিয়ারকে হটিয়ে দাও। তার জবাবে বাপী বলেছিল, রাজত্ব বা রাজকন্যায় লোভ নেই—বারো বছর ধরে পৃথিবীর সব বাধা আর সকলকে হটিয়ে একজনের জন্যেই বসে আছে।...শুনে মিষ্টির চাউনি ওর মুখের ওপর খানিক স্থির হয়েছিল, চাপা ঝাঁঝে বলেছিল, তুমি মোস্ট আনপ্র্যাকটিকাল মানুষ। বলেছিল, একটা মেয়ের দশ বছরের সঙ্গে বারোটা বছর জুড়লে কি দাঁড়ায়, আর কত কি ঘটে যেতে পারে—ভেবেছিল? শুধু নিজের স্বপ্নে বিভোর হয়েই বারোটা বছর কাটিয়ে দিলে?

...কি ঘটে যেতে পারে বাপী পরে জেনেছে। কিন্তু মিষ্টির সেই অসহিষ্ণুতা আর ঝাঁঝের ফাঁকে কিছু চাপা যন্ত্রণাও ঠিকরে পড়ছিল নাকি?

...ছেলেপুলে হতে গিয়ে মিষ্টির প্রাণসংকট হয়েছিল। বড় ডাক্তার বলেছে, বাজে হাতে পড়ে মেয়েটার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। কিন্তু বাপী যখন দেখেছে সে-রকম ক্ষতির কোনো চিহ্ন চোখে পড়েনি। উল্টে আগের থেকেও তাজা সুন্দর লোভনীয় মনে হয়েছে। তাহলে ক্ষতিটা কি? আর ছেলেপুলে হবে কি হবে না সেই সংশয়? তাই যদি সত্যি হয়, সেই বড় ডাক্তারের হাত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে আপত্তি হবে না—এমন চিন্তাও যে করেছিল বাপী অস্বীকার করতে পারবে?

—সুদীপ নন্দী বলেছিল, বউ ঘরে নেওয়া দূরে থাক, তারা ছেলেকেই দূর দূর করে তাড়িয়েছে। অসিত চ্যাটার্জির মদের নেশা বাপী স্বচক্ষেই দেখেছে। জুয়ার নেশার কথাও শুনেছে। মিষ্টির মা মনোরমা নন্দী জামাইয়ের ওপর ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ। কতবার করে সে নাকি মেয়েকে বলেছে, কাগজের বিয়ে ছিঁড়ে ফেললেই ছেঁড়ে। এই ছেঁড়ার ব্যাপারে দীপুদাও বোনকে অনেক বুঝিয়েছে। সব কিছুর নিষ্পত্তি যদি হয়ে গিয়ে থাকে, নিভৃতের এই চিন্তার সলতেগুলো দপ করে জ্বলে জ্বলে ওঠে কেন, হাতছানি দেয় কেন? এক-এক ফুঁয়ে বাপী তো কতবার করে সেগুলো নিভিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। সব থেকে বেশি চোখে ভাসে শেষের দিনে মিষ্টির সেই মুখ। ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসির ছোঁয়া লেগে ছিল। যার নাম ঠিক হাসি নয়, হাসির মতো কিছু। দু চোখ তুলে ওকে শুধু কিছু বোঝাতে চেয়েছিল। কোনো অভিযোগ ছিল না, দু'চোখে শুধু মিনতি ছিল।

বাপী নামে কোনো পুরুষ ওই মেয়ের জীবন থেকে একেবারে মুছে গিয়ে থাকলে এমনটা হত না। হতে পারে না।

কিন্তু বাপী তবু এইসব লোভের বুদবুদগুলো সজাগ বিশ্লেষণের আয়নায় ফেলে বড় করে দেখতে চায় না। মিষ্টি ওকে মোস্ট আনপ্র্যাকটিকাল বলেছিল। মর্মান্তিক সত্যি কথাই বলেছিল। স্বপ্নের জালে বাস্তব কিছু ছেঁকে তোলা যায় না। মনের তলায় যা আছে—থাক। তাদের কানাকানিতে কান দেবার সময় বা সুযোগ যদি আসে কখনো, আজকের বাপী তরফদারকে তখন কেউ আনপ্র্যাকটিকাল বলবে না। স্বপ্নে বিভোর হয়ে কাটানোর খোঁটাও আর কেউ দেবে না। আপাতত ও শুধু সামনে এগোচ্ছে, আগে বাড়ছে। কি পাবে আগে থাকতে তার হিসেব কষে কাজ নেই।

জুনের শেষদিনে বাপী ঊর্মিলার চিঠি পেল। রাগারাগি করে লিখেছে, আসি-আসি করেও আসছে না কেন—জুলাইয়ের শেষে কলকাতা ছেড়ে ওরা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে, এরপর দেখা আর কবে হবে? আর লিখেছে, চটপট চলে না এলে এরপর গাড়িও ফসকে যাবে—ওটা নেবার জন্য ওখানে অনেকে হাঁ করে আছে, বিজয় ওটার গতি করার জন্যও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

প্রথম দফায় গায়ত্রী রাইয়ের সিন্দুকের মোটা টাকা হাতে পেয়েই কলকাতায় গিয়ে কোনো বিদায়ী সাহেবের কাছ থেকে প্রায় নতুন একটা ঝকঝকে বিলিতি গাড়ি কিনে ফেলার খবর ঊর্মিলা চিঠিতে লিখেছিল। সব কিছু পাকাপাকি ফয়সলার জন্য ওরা গেলবারে আসতে সেই গাড়ির প্রসঙ্গও বাপীই তুলেছিল। ঊর্মিলাকে বলে দিয়েছিল, বাইরে চলে যাবার আগে গাড়ি যেন না বেচে দেয়—তারই দরকার হবে।

এদিকের ব্যবস্থা সব পাকা করে বাপী মোটামুটি প্রস্তুত ছিল। কলকাতায় মাল চালানোর জন্য শিলিগুড়ির ডিলারের মারফৎ নতুন একটা বড় ট্রাক কেনা হয়েছে। সেটা এসে পেঁৗছুনোর অপেক্ষা। তাও এসে গেল।

জুলাইয়ের তৃতীয় দিন বিকেলে এরোপ্লেন থেকে নামে বাপী তরফদার আবার কলকাতার মাটিতে। এবারে আসার তফাতটুকু শুধু তার মাথার মধ্যে। আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে। বৃষ্টিও পড়ছে, তবে জোরে নয়। এই অভ্যর্থনাও বাপীর মেজাজের সঙ্গে

মিলছে।

বাপী তরফদার সামনে এগলো। আগে বাড়ল।

॥ দশ ॥

মনিব আজ আসছে জিত্ মালহোত্রা জানে। কিন্তু বাপী তাকে এয়ারপোর্টে আসতে বলেনি। সন্ধ্যার পর হোটেলে দেখা করতে লিখেছে। মনের তলায় কিছু হিসেব ছিল তাই এ-রকম নির্দেশ। তা না হলে ঘড়ির কাঁটা ধরে জিত্ মালহোত্রা এরোড্রোমে হাজির থাকতই।

বিশাল লাউঞ্জের মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়ে গেল। হিসেব গরমিল হয়েছে। এয়ার অফিসের সেই ইনফরমেশান কাউণ্টারে আর একটি অবাঙালী মেয়ে দাঁড়িয়ে।

—ছ'মাস আগে বিজয় মেহেরাকে নিয়ে যাবার জন্য যখন কলকাতায় এসেছিল, এই লাউঞ্জের এদিকে আসেই নি। যে-সঙ্কল্প নিয়ে আসা, তার বাইরে মাথায় আর কিছু ছিলও না। আর পরের ভোরে বিজয়কে বগলদাবা করে আবার যখন প্লেনে উঠেছে তখন আর কারো সংগে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। আজ কলকাতার মাটিতে পা দেবার আগে থেকে স্নায়ুগুলো সব নির্লিপ্ত সহজতার কৃত্রিম তারে বাঁধা ছিল। কিন্তু ঝকঝকে ইনফরমেশন কাউণ্টারের ওধারে একজনের বদলে আর একজনকে দেখে হিসেব বরবাদ হলে যেমন হয়, মুহূর্তের মধ্যে ভেতরটা তেমনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

...দাঁড়িয়ে যে আছে তাকেই জিগ্যেস করবে? খোঁজ নেবে? দু'পা এগিয়েও থামল। দিল্লির সেই ইণ্টারভিউর কথা মনে পড়ল। সেই চাকরি পেয়ে থাকলে তার এখনকার ঠিকানা কলকাতা না দিল্লি? সংগে সংগে ট্যাক্সি নিয়ে দক্ষিণ কলকাতার এক রাস্তায় সেই সাতাশি নম্বর বাড়িতে গিয়ে হাজির হবার তাড়না। বাপীর এক হাতে মস্ত সুটকেস, অন্য হাতে বড় শৌখিন ট্র্যাভেল এটাচি। লম্বা লম্বা পা ফেলে বাইরে এসে ট্যাক্সি ধরল।

ছুটন্ত গাড়ীতে বসে একটু বাদেই নিঃশব্দে এক বিপরীত কাজ করল। ছেলেবেলা থেকে চেনা নিজের ভিতরের সেই অবুঝ অসহিষ্ণু বাপী নামে ছেলেটাকে সামনে দাঁড় করিয়ে প্রবীণ শাসনের চোখে দেখল খানিক। তারপর ঠাস ঠাস করে দুগালে চড় কষালো গোটাকতক। অমন নির্বোধ তাড়নার মধ্যে ফেলে দেওয়ার শাস্তি। ধৈর্যের হিমঘরে বাস এখন। অনন্তকাল ধরেই যদি সেখানে থাকতে হয়—অত ছটফটানি কিসের?

—হয়তো আজই কোনো কারণে আসেনি। দেখা হয়নি ভ[illegible]া হয়েছে। মন বিক্ষিপ্ত হতই। কৃত্রিম মুখোশের আড়াল নিতে হত। ব্যবসার তাগিদে আসাটা বড় করে তুলতে হত। নিজের কানেই সেটা কৈফিয়তের মতো শোনাতো। দু'দশ দিন বা দুই এক মাসে কাজে-কর্মে কিছুটা স্থিতি হবার পরে দেখা হলে সব দিক থেকে সুবিধে। কাজের আসনে আত্মস্থ পুরুষের আর এক রূপ। সেটাই সব থেকে সহজ আর নির্ভরযোগ্য মুখোশ।

—চাকরি নিয়ে দিল্লিতেই যদি চলে গিয়ে থাকে তাও অবাঞ্ছিত নয়। বাপী চাইলে দিল্লী আর কতদূর? এক ঘণ্টার জায়গায় দু' ঘণ্টা। আসল ফারাক অসিত চ্যাটার্জীর সংগে। আরো বড় ফারাকের সূচনা হতে পারে এটা। মিষ্টি তার আওতার মধ্যে বসে নেই এ আরো বেশি কাম্য। সেই রকম দাঁড়িয়েছে কিনা জানার লোভ বাপীর। দক্ষিণ কলকাতার সাতাশি নম্বরের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেই জানা যেতে পারে। গেলে খাতির কদর আগের থেকেও বেশি হবে হয়তো। তার বর্তমান মর্যাদার খবর সুদীপ নন্দী আর ওর মা-ই খুঁচিয়ে বার করবে। তাদের টাকা যথা পিরীত তথা।

নাঃ, বাপীর তাড়া নেই। সময়ে সব হবে। সব বোঝা যাবে। সময়ের এক ফোঁড়

অসময়ের দশ ফোঁড়ের সামিল। স্নায়ু নিজের বশে এখন। আপাতত সে হোটেলে যাচ্ছে। আর কোথাও না। পাশের বড় অ্যাটাচি কেসটা বোঝাই টাকা। নিজের রোজগারের টাকা ছোঁবার দরকার হয়নি। সে-সব উত্তরবাংলার নানান ব্যাঙ্কে আর লকারে যেমন ছড়ানো ছিল তেমনি আছে। এই অ্যাটাচিতে গায়ত্রী রাইয়ের সিন্দুক থেকে পাওয়া নিজের ভাগের টাকা। দু' লক্ষর ওপরে আছে। সবটাই নিয়ে এসেছে। এত টাকা এ ভাবে আনতে বুকে কাঁপুনি ধরার কথা। কিন্তু বাপীর এ ব্যাপারে এক ফোঁটা উদ্বেগ নেই। যেমন নির্বিকার তেমনি স্বাভাবিক। এমন কি গায়ত্রী রাইয়ের নির্দেশ অনুযায়ী সোনা আর তার থেকেও দামী যা-কিছু হাতে এসেছে সে-সবও ওই পেল্লায় সিন্দুকের তলায় ফেলে এসেছে। অবশ্য কুড়ুলের ঘায়েও অমন সিন্দুক ভাঙা সহজ নয়। আর কোয়েলা আছে। তার মালকান নেই, কিন্তু তার কাছ থেকে নগদ যা পেয়েছে তাতে বাপীরও কেনা হয়ে আছে। না পেলেও বিশ্বাস খোয়ানোটা ইজ্জত খোয়ানোর সামিল ওর কাছে। ওদের এই ধাত বাপী চেনে। আর বাদশা ড্রাইভার আছে। প্রভুভক্ত সজাগ কুকুরের মতোই ওরা বাংলো পাহারা দেবে। তাছাড়া সিন্দুকে কিছু থাকতে পারে এমন ধারণাও কারো নেই। সোনা তবু সোনাই। ছায়া-ভয় পিছনে ধাওয়া করে। বাপীর করে না।

তা হলেও এত কাঁচা টাকা সঙ্গে নিয়ে ঘোরাঘুরি কোনো কাজের কথা নয়। তাই ঊর্মিলার ওখানে যাওয়ার ইচ্ছেও আজকের মতো বাতিল। কাল এখানকার ব্যাঙ্কের কাজ সেরে অন্য চিন্তা।

আগের সেই নামী হোটেলে মালহোত্রাকে ঘর বুক করে রাখতে বলা হয়েছিল। সে আগে থাকতে এসে বসে আছে। সপ্রতিভ অভ্যর্থনায় এগিয়ে এলো।

এই লোকের একটা গুণ বাপী বানারজুলির ক'দিনের মধ্যেই লক্ষ্য করেছে। কাজের ব্যাপারে চতুর, চটপটে। গায়ত্রী রাইয়ের কাছেও ছ' মাস ছিল। কাজ সম্পর্কে ভালোই ধারণা আছে। কিন্তু কি করল না করল প্রশংসার লোভে আগবাড়িয়ে সেটা জাহির করতে আসে না। হাল্কা চা-পর্বের পরে মালিককে বিশ্রামের অবকাশ দিয়ে পার্টিশনের ও ধারে চুপচাপ বসে আছে।

বেশভূষা বদলে বাপী গদিব নরম বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকল খানিকক্ষণ। গতবারে এই হোটেলের প্রথম দিনটা বার বার মনে আসছে। শেষের দিনটাও। বাপীর ওটাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে সরানোর চেষ্টা। প্রত্যাশার আতসবাজী রঙে রঙে ঝলসে উঠেছিল। ছাই হয়ে মেনেছে। ছাই ঝেঁটিয়ে দুটো দিনকেই বিদায় করল বাপী। নিশ্চল নিস্পন্দ পড়ে থেকে মাথাটাকে খানিকক্ষণের জন্য শূন্য করে দেওয়ার চেষ্টা। ভালো-মন্দ সমস্ত রকমের চিন্তা বাতিল। কোনো বইএ পড়া এই কসরত কিছুটা রপ্ত হয়েছে। পরে বেশ ঝরঝরে লাগে।

—জিত্‌!

—সার! জিত্‌ মালহোত্রা তক্ষুনি পার্টিশনের ও-ধার থেকে এগিয়ে এলো।

—একটা চেয়ার এনে বোসো। তারপর খবর কি বলো!

খবর মোটামুটি যেমন আশা করা গেছল তাই। নিজের পোর্টফোলিও ব্যাগ থেকে জিত্‌ আর্ট পেপারে ছাপা একটা প্যামফ্লেট তার হাতে দিল। বাপী শুয়ে শুয়েই উল্টে-পাল্টে দেখল সেটা। তার খসড়া মতোই এখানে ছাপা হয়েছে গ্রুপে ভাগ করা ফার্মের যাবতীয় ভেষজ মালের ক্যাট্যালগ। সমস্ত উত্তরবাংলা নেপাল ভুটান মধ্যপ্রদেশ আব বিহারের শাখা-প্রশাখার হদিস। সে-সব এলাকায় সরবরাহের বিনীত ফিরিস্তি। ট্রেনেব অনিশ্চয়তার ওপর নির্ভর না করে নিজেদের যানবাহনে সময়ে সর্বত্র মাল পেঁছে দেওয়াব প্রতিশ্রুতি। কলকাতার এ-মাথা ও মাথা পর্যন্ত এই প্যামফ্লেট ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বনজ ওষুধের পুরনো ব্যবসার প্রচার এ-যাবৎ তেমনি পুরনো ধাঁচের ছোট গণ্ডীর মধ্যে

আটকে ছিল। পাঁজির পাতায় বা ক্বচিৎ কখনো খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখা যেত। এ-সব জায়গায়ও পাতা-জোড়া প্রচারের সংকল্প বাপীর মাথায় আছে। তার আগে এইগোছের চটকদার প্রচার এ-লাইনে কমই দেখা গেছে। ফার্মের চকচকে ক্যালেন্ডার আর ফ্যাশানের ডায়েরি তাদের নজর কেড়েছিল। আর্ট পেপার ছাপা প্যামফ্লেট ছড়ানোর ফলে কলকাতার বাজারে রাই অ্যান্ড তরফদারের আসন্ন পদার্পণের ঘোষণা আরো জোরালো হয়ে উঠেছে। জিতের খবর, মালিক আসছে জেনে অনেকেই তার সঙ্গে যোগাযোগের আগ্রহ দেখিয়েছে। এখন শুধু বানারজুলি থেকে মাল চালান আর স্যাম্পল্ আসার অপেক্ষা।

—সে-সব তুমি সামনের সপ্তাহের মধ্যে পেয়ে যাবে। গোডাউন ঠিক করেছ?

জিত্ সায় দিয়ে জানালো, দুটো গোডাউন দেখে রাখা আর ল্যান্ডলর্ডের সঙ্গে কথা বলে সময় নেওয়া হয়েছে। এখন মালিকের যেটা পছন্দ। এ-ছাড়া চৌরঙ্গীর কাছাকাছি এলাকায় আর পার্ক স্ট্রীটের দিকে কিছু ফার্নিশড্ ফ্ল্যাটও দেখা হয়েছে। ভাড়া অনেক। পছন্দ হলে পেতে কোনো অসুবিধে হবে না।

ফ্ল্যাট খোঁজার কথাও বাপী তাকে লিখেছিল। বলল, কাল-পরশুর মধ্যে সব ঠিক করে ফেলব। ভাবল একটু। কাল সকালে—না কাল শনিবার, বারোটার মধ্যে ব্যাংকের কাজ সারতে হবে। দুপুরের দিকে তাকে আসতে বলে দিল। ভবানীপুরের দিকের কোনো মেসে একটা ঘরভাড়া নিয়ে আছে ও। মনে পড়তে হঠাৎ কৌতূহল একটু।—তোমার মেস ঠিক কোন্ জায়গায় বলো তো?

জিত্ হদিস দিতে মনে হল টালি এলাকার কাছাকাছিই হবে।—ব্রুকলিন পিওন রতন বণিক কপাল যাচাই করে প্রথম থেকে অন্ধ বিশ্বাসে তার রাজার ভাগ্য ঘোষণা করেছিল। আর চলে আসার দিনও বলেছিল, কপালের রং আগের থেকে ভালো হয়েছে, আর বলেছিল আমার কথা মিলিয়ে নেবেন, দিন ফিরলে ভুলবেন না যেন।

দিন ফিরেছে। বাপী ভোলেনি। সেই কৃতজ্ঞতায় ওরও কপাল ফেরানো, দিন ফেরানোর ইচ্ছে। আগের বারে এসেও এমনি তাগিদ অনুভব করেছিল। এবারও ছেঁটেই দিতে হল। ...ভুলবে তো নাই কোনদিন। প্রবৃত্তির শেকলের দাগ এখনো আষ্টেপৃষ্টে লেগে আছে, ভুলবে কেমন করে। পরে দেখা যাবে। পরে যা-হয় হবে।

—আচ্ছা আজ এসো।

একটু ইতস্তত করে জিত্ উঠে দাঁড়ালো। মনিবের দিকে আর একবার তাকিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

তক্ষুনি নিজের চোখ যাচাইয়ের ঝোঁক বাপীর। ডাকল, শোনো—

ফিরল।

—বোসো। কিছু বলবে? আরো কিছু যে বলতে চেয়েছিল মালিক বুঝল কি করে ভেবে পেল না। দ্বিধা কাটিয়ে জিত্ জানালো আবু সাহেব অন্য মালের ব্যাপারেও কিছু খোঁজখবর নিতে বলে দিয়েছিল। তাও নেওয়া হয়েছে—

বাপী তক্ষুনি বুঝে নিল অন্য মালটা কি। ভুটান সিকিম বা নেপালের মদ। ট্রাক যখন আসবেই, লাভ বুঝলে এ-দিকটাও চালু রাখতে অসুবিধে নেই। এই ব্যবসা এখন পুরোপুরি আবুর এখ্তিয়ারে। লাভের আধাআধি বখরার শর্তে বাপী শুধু পুঁজি অর্থাৎ টাকা যুগিয়ে খালাস। এ-ছাড়া আর কোনো দায়দায়িত্ব বা সংস্রব নেই।

নির্লিপ্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, বাজার কেমন?

শুনল, বাজার খুব ভালো। বানারজুলির থেকে ঢের ভালো। যতগুলো লিকার-শপের মালিকের সঙ্গে কথা হয়েছে, দামের আঁচ পেয়ে সকলেই এক কথায় রাজি। জিনিস কেবল তাদের ঘরে পৌঁছে দিতে হবে।

এ-কাজেও লোকটার এমন তৎপরতা দেখে বাপী ভিতরে ভিতরে থমকালো একটু। জিগ্যেস করল, তুমি ড্রিংক করো?

—না, সার।

—শিওর—নো?

এবারে একটু জোরের সঙ্গে জবাব দিল, আপনি একটু খোঁজ নিলে জানতে পারবেন, মিসেস গায়ত্রী রাইয়ের কাছে আমার সম্পর্কে চালিহা সাহেবের সেটাই বড় সার্টিফিকেট ছিল।

বাপী আর জেরা করল না। এত বলার দরকার ছিল না, সত্যি না হলে মুখ দেখে বুঝতে পারত। বলল, ঠিক আছে, এ সম্পর্কে পরে ভাবব, আবুকে চিঠিপত্রে কিছু লেখার দরকার নেই।

মালহোত্রা চলে গেল। যতটা আশা করেছিল লোকটা তার থেকেও ভালো উৎরোবে মনে হল বাপীর। আকাঙ্ক্ষা বড় বলেই দ্বিতীয় দফা চাকরি ছেড়ে এই ঘাটে নৌকো বেঁধেছে। নিজের দায়েই সেটা অক্ষত রাখতে চাইবে।

আরো অনেকক্ষণ শুয়েই কাটিয়ে দিল। বাইরের অন্ধকার ঘরে সেঁধিয়েছে। উঠে আলো জ্বালল। নোটবই খুলে একটা টেলিফোন নম্বর বার করে ঘরের রিসিভার তুলে কানেকশন দিতে বলল।

একটু বাদে ও-প্রান্ত থেকে চেনা গলা ভেসে এলো।

—ছোট কোবরেজ মশাই?

—বলছি—আপনি?

এধারে বাপীর গলা আরো গুরুগম্ভীর।—প্রেয়সীর খবর কি—ঘরে ডেকে গান-টান শোনাচ্ছে আজকাল, না এখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুনতে হচ্ছে?

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্তের পর ও-দিক থেকে নিশীথ সেনের গলা আছড়ে পড়ল।—বাপী তুই! আচ্ছা চমকে দিয়েছিলি মাইরি। তারপরেই খাটো গলা।—ও-সব কথা আর মুখেও আনিস না ভাই, আমি ফেঁসে গেছি, এই গলায় যে ঝোলার সে ঝুলে পড়েছে—

বাপী যেন ধাক্কাই খেল একটু।—কে ঝুলল, তোর বাবার পছন্দের সেই টাকাঅলা মুদির পুঁটলি?

—আর বলিস না ভাই। লজ্জায় তোকে একটা খবরও দিতে পারিনি।—ভদ্রলোক মানে বউয়ের বাবা হঠাৎ শক্ত অসুখে পড়ে যেতে নিজের বাবাটি একেবারে মাথায় চেপে বসল। কি আর করব, দুগ্‌গা বলে ঝাঁপিয়েই পড়লাম। ভদ্রলোকের ছেলে তো নেই, তিনটেই মেয়ে—অসুস্থ শ্বশুরের সঙ্গে সকালের দিকে এখন দোকানেও বসতে হচ্ছে। যাকগে, হুট-হুট করে কখন আসিস কখন যাস জানতেই পারি না—তোর খবর কি?

—ভালো।

নিশীথের গলার স্বর উৎসুক একটু।—এখানে তোদের রিজিয়ন্যাল অফিস হচ্ছে এবার?

—ঠিক নেই। ছাড়ি, খুব ব্যস্ত এখন।

—শোন, সেই হোটেলেই উঠেছিস নাকি? কবে দেখা হবে?

—আমি তোকে ফোন করব'খন, এখন বেজায় তাড়া, ছাড়ি—

রিসিভার নামিয়ে আবার বিছানায় চিৎপাত। ফোন করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এখানকার ম্যানেজারের চেয়ারে নিশীথ সেনকে বসানো স্থির ছিল। ওদের সামনের বাড়ির সেই বি. এ. পাশ-করা মিষ্টি গান করা আধুনিকা সুশ্রী মেয়েই যদি নাকসিঁটকে কবিরাজের ছেলেকে বাতিল করে দিত, বাপী এমন অকরুণ হত না। ফোনে এই শোনার পর

নিশীথ সেনের অস্তিত্বসম্বন্ধ বাতিল।

কলকাতার বাতাস ঠিক এই সময়ে কতটা উত্তপ্ত বাপীর ধারণা ছিল না। পরদিনই টের পেল। দিন বারো আগে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর হঠাৎ মৃত্যুর খবর কাগজে দেখেছিল। ছ' সপ্তাহ যাবৎ শ্রীনগরে আটক ছিলেন। সেখানেই অঘটন। পশ্চিম বাংলার মানুষ এই মৃত্যুকে সাদা চোখে দেখেনি। অসন্তোষের আগুন তখন থেকেই ধিকি ধিকি জ্বলছে। দিল্লিতে বসে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু আটক অবস্থায় এই সংগ্রামী নেতার জীবনান্তের কারণে তাঁর বেদনাবোধের কথা বলেছেন। কিন্তু এই মৃত্যু নিয়ে হাজার হাজার বাঙালীর তদন্তের দাবি সম্পর্কে তিনি নিরুত্তর। অসন্তোষ বাড়ছে। সাধারণ মানুষ ক্রোধে গজরাচ্ছে। ঠিক এই সময়, অর্থাৎ বাপী আসার পরদিনই সমস্ত কলকাতা দপ করে জ্বলে উঠল আর এক উপলক্ষে। ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসের এক পয়সা ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। এখানকার সরকারের তাতে অনুমোদন ছিল। ফলে ক'দিন যাবৎ একটা প্রতিরোধের আন্দোলন শুরু হয়েছিল। স্নায়ু এমনি তপ্ত সকলের যে অতি নিরীহ যাত্রীও এক পয়সা বেশি দিতে নারাজ।

কলকাতায় আসার তাড়ায় আগের দু'দিনের কাগজ উল্টে দেখারও সময় হয়নি বাপীর। গতরাতে রেডিওর খবরও শোনার মেজাজ ছিল না। সকালের কাগজ খুলে দেখে, কলকাতায় সেদিন ওই এক পয়সা ট্রামভাড়া বাড়ানোর প্রতিবাদে হরতালের ডাক দেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বামপন্থীদের স্বার্থের কথা বলে পাল্টা ঘা হেনেছেন। জনসাধারণের কাছেই এই হরতাল বানচাল করার আবেদন পেশ করেছেন।

কলকাতার এই বাতাস বাপী চেনে না। ক্ষ্যাপা কলকাতার এই চেহারা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোনো ধারণা ছিল না। শুধু এইদিন নয়, পর পর আরো ক'টা দিন বাপী হোটেল-বন্দী হয়ে থাকল। চারদিকে আগুন জ্বলে উঠেছে, রক্ত ঝরছে। ট্রাম পুড়ছে, সরকারী বাস পুড়ছে। নগর জীবন স্তব্ধ, অচল। হরতালের পরদিনই বিধান রায় য়ুরোপ চলে গেছেন। তাঁর সেখানে চোখের অপারেশন। এই অনুপস্থিতিতে হাল যাঁরা ধরেছেন, জন-মতের দিকে না চেয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনার তাগিদে তাঁরা পুলিশের পৌরুষের ওপর নির্ভর করেছেন। এই ভুলের মাশুল বেড়েই চলল। এক পয়সার যুদ্ধের সমস্ত নেতার সঙ্গে হাজারের ওপর বিক্ষুব্ধ মানুষ জেলে। কিন্তু মানুষ ক্ষেপলে জেলই বা কত বড়? ফলে লাঠি টিয়ারগ্যাস গুলি—খুন-জখমের তাণ্ডব।

বাপী আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করে আবুকে মালের ট্রাক ছাড়তে নিষেধ করেছে। এই বিপাকে গোডাউনই ঠিক করা হয়নি, মাল এনে করবে কি। ব্যাঙ্কের কাজ অবশ্য সেরে রাখতে পেরেছে। চৌরঙ্গী এলাকার কয়েকটা ব্যাঙ্কে নগদ টাকার কাঁড়ি জমা করে দিয়েছে। জিত্‌ মালহোত্রা হেঁটে হলেও একবার করে আসে। তার তৎপরতায় এরই মধ্যেই ভালো একটা ফ্ল্যাটও বুক করা গেছে। চৌরঙ্গীর কাছাকাছি অভিজাত এলাকা। এখন পর্যন্ত বাঙালীর বাস কম। মস্ত ম্যানশানের রাস্তামুখো তিনতলার ফ্ল্যাট। লিফট আছে। একতলায় গ্যারাজ। সামনে প্রকাণ্ড ফারনিশড হল। ও-ধারে দুটো বড় বেডরুম। পরিপাটী ব্যবস্থার কিচেন আর ঝকঝকে বাথরুম।

মাস কয়েকের মোটা ভাড়ার আগাম দাবি মিটিয়ে বাপী চোখকান বুজে চুক্তিপত্রে সই করে দিয়েছে। গণ্ডগোলের দিন না হলে, চার-পাঁচ দিনের মধ্যে উঠে আসা যেত। বাপীর তাড়ায় ফ্ল্যাটের মালিক আশ্বাস দিয়েছে, মাসের মাঝামাঝি সময়ে যে করে হোক হোয়াইটওয়াশ আর ঝাড়ামোছা সেরে ফ্ল্যাট তার বাসযোগ্য করে দেবে।

ঊর্মিলার সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি। বিজয়ের সঙ্গে ফোনে দু'দিন কথা হয়েছে।

ওর অফিসে এসে ঊর্মিলাও গতকাল ফোনে কথা বলেছে। তাদের ওখানে চলে আসার জোর তাগিদ ওর। এই গণ্ডগোলের মধ্যে হোটেলে বসে কি করছে? তাদের ওখানে চলে আসছে না কেন? ফ্যাকটরির কোয়ার্টার্স এলাকার মধ্যে ঢুকে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত। দুখানা ঘরের একটা খালি পড়ে আছে জেনেও ফ্রেন্ড হোটেলেই উঠতে গেল কেন?

সম্ভব হলে বাপী আজ যাবে ঠিক করেছে। আর কিছু না হোক, ওদের গাড়িটা এখনি দরকার। নিজের দখলে একটা গাড়ি থাকলে এতটা পঙ্গু মনে হত না। ট্যাক্সি পাওয়াও দুর্ঘট এখন। বেলা থাকতে যাবে ঠিক করেছিল। বিকেলের দিকেই গণ্ডগোলটা বেশি হচ্ছে। সকালে গিয়ে লাভ নেই। বিজয় মেহেরাকে অফিস থেকে টেনে বার করা যাবে না। সব ঠাণ্ডা থাকলে চলেই আসবে। বাপীর রাতে কোথাও থাকার ইচ্ছে নেই।

আড়াইটে নাগাদ বেরুনোর জন্য তৈরি হয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। এখান থেকে সামনের ময়দান আর চৌরঙ্গী এলাকার খানিকটা দেখা যায়। এই ক'টা দিনের মধ্যে অস্থির কলকাতা সম্পর্কে বাপীর কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই জানালায় দাঁড়িয়েই দিনের হাওয়া টের পায়। ট্রাম চলাচল সেই শুরু থেকেই বন্ধ। শান্তি-শৃঙ্খলায় ঘা পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যে বাস ট্যাক্সি এমন কি রিকশও রাস্তা থেকে উধাও হয়ে যায়।

ভারী পর্দাটা ঠেলে সরানোর সঙ্গে সঙ্গে বাপীর গলা দিয়ে একটা বিরক্তির শব্দ বেরিয়ে এলো। যাওয়ার বারোটা বেজে গেল। কোথাও ঘটছে কিছু। নিচের ফুটপাতে আর সামনের ময়দান ভেঙে কাতারে কাতারে মানুষ চলছে। লোকগুলো কিছু তাড়া খেয়ে নিরাপদে ঘরে ফেরার জন্য ব্যস্ত। বাস চলছে এখনো, কিন্তু তার ছাদে পর্যন্ত মানুষ।

ঘরের দরজা বন্ধ করে বাপী নেমেই এলো তবু। হোটেলের বাইরের সামনের গাড়ি-বারান্দার নিচে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষের পায়ে হেঁটে ঘরে ফেরার মিছিল দেখতে লাগল। ঘটনা কি তাও কানে এলো। ডালহৌসি স্কোয়ারে এক পয়সার বিক্ষোভ-কারীদের ওপর পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চালিয়েছে। কত লোককে শুইয়ে দিয়েছে ঠিক নেই। কারো কারো অবস্থা আশঙ্কাজনক।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে মানুষগুলোর মুখ দেখছে বাপী। কোথায় কোন মুহূর্তে আবার আগুন জ্বলে সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার তাড়া তাদের। কিন্তু তার মধ্যেও চোখে-মুখে জমাট-বাঁধা ক্রোধ। হয়তো বা ঘৃণাও। সামিল হবার সাহস হয়তো নেই। কিন্তু ক্ষমতার মত্ত আঘাত তাদেরও বুকে বাজছে।

ভিতরে কোথায় মোচড় পড়ছে বাপীরও। এই মানুষগুলোর থেকে, আর প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়ে যার শাসনের আঘাতে মাটিতে মুখথুবড়ে পড়ছে তাদের থেকে ও যেন বিচ্ছিন্ন ; এই বিচ্ছেদের একটা অচেনা যন্ত্রণা ওকেও ছুঁয়ে যাচ্ছে। একটা পয়সা—শুধু একটা পয়সার জন্য এমন ঝড় এমন তাণ্ডব? তা কক্ষনো হতে পারে না। এই একটা পয়সা হয়তো অনেক বঞ্চনা অনেক অবিচারের প্রতীক তাই যদি হয়, যত ঐশ্বর্যই থাকুক বাপীর অন্তরাত্মা এদের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

—কি ব্যাপার? এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছ?

হাত ধরে একটু বড় রকমের ঝাঁকুনি দিল ঊর্মিলা। ফুটপাতের ধারে ক্রিম রঙের চকচকে একটা মরিস মাইনর গাড়ির দরজা বন্ধ করে বিজয় মেহেরাও এদিকে আসছে।

ঊর্মিলা অত মানুষকে পথ চলতে দেখে সভয়ে আবার জিগ্যেস করল, গণ্ডগোলের ব্যাপার নাকি কিছু?

—হ্যাঁ, ডালহৌসিতে জোর লাঠি-চার্জ হচ্ছে শুনলাম। তোমাদের কাছে যাব বলে তৈরী হয়ে আজও আটকে গেছি...এর মধ্যে আবার তোমরা এসে হাজির হলে।

কথায় সময় নষ্ট না করে ঊর্মিলা তাকে গাড়িতে ঠেলে নিয়ে সামনের সীটে তুলল। পরে নিজেও তার পাশে বসে পড়ে ঠাস করে দরজা বন্ধ করে বিজয়কে তাড়া দিল, হাঁ করে দেখছ কি—জলদি চালাও!

সামনে তিনজন সহজভাবে বসার মতো বড় নয় গাড়িটা। ওদের দু'জনকে সামনে বসতে দেখেই বিজয় হয়তো থমকে ছিল একটু। তাড়াতাড়ি ঘুরে এসে নিজের আসনে বসে গাড়ি ছোটাল। ঊর্মিলা বলে উঠল, আর ভালো লাগে না বাপু, রোজ এই এক কাণ্ড লেগে আছে—হাড়পিত্তি জ্বলে গেল।

গাড়ির স্পিড আরো বাড়িয়ে দিয়ে গম্ভীর মুখে বিজয় বলল, হাড়পিত্তি আমারও জ্বলে যাচ্ছে তুমি দুজনের মাঝখানে বসলে আধাআধি ভাগ পেতাম।

ছদ্ম কোপে ঊর্মিলা বলল, দেব ধরে গাঁট্টা।

বাপী হাসল মনে মনে। যখন যার যেমন জগৎ। বিজয়কে বলল, বেশি হাড়পিত্তি জ্বললে গাড়ি থামাও, আমি পিছনে গিয়ে বসছি।

ঊর্মিলাও এবার হেসেই সায় দিল, তাহলে দুজনেই পিছনে যাই চলো। এই যাঃ! জিব কাটল।- ভেবেছিলাম হাসব না, কম করে ঘণ্টাখানেক তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব।

বিজয় ফোড়ন কাটল, আমার সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টাই করছে তাই অরুচি ধরে গেছে।

জবাবে ঊর্মিলা বাপীর পিছন দিয়ে হাত বাড়িয়ে বিজয়ের চুলের গোছা টেনে ধরল।

পথে আর কোয়ার্টার্সে পৌঁছনোর পরেও বাপী অনেকবার ওদের ঝগড়া দেখল। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলতে রাজি নয়। যেমন, ঊর্মিলা বাপীকে বলল, আমার খপ্পরে পড়েছ, এখন সাতদিনের মধ্যে তোমাকে ছাড়ছি না'

বাপী বাধা দেবার আগে বিজয় বলল, বাইরে যাবার মুখে আমি এখন অত ছুটি পাচ্ছি কোথায়?

—তোমাকে ছুটি নিতে কে বলেছে? সঙ্গে সঙ্গে ঊর্মিলার জবাব।

—দেখলে, দেখলে? বাপীকেই সালিশ মানল বিজয়। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, তোমার তেমন তাড়া থাকে তো আজই চলে যেতে পারো—আমিই না হয় পৌঁছে দিয়ে আসব।

ওদের গাড়িটা বাপীর সত্যি খুব পছন্দ হয়েছে। দেখতে যেমন, চলেও জলের মতো। বাপীর মুখে প্রশংসা শুনে ঊর্মিলা চা খেতে খেতে বিজয়কে বলল, এত যখন পছন্দ হয়েছে, গাড়িটা এমনি দিয়ে দাও না ওকে, তবু মনে থাকবে—

কথা শেষ হবার আগেই গম্ভীর ঝাঁঝের সুরে বিজয় বলল, যে দরে কিনেছি তার থেকে দেড় হাজার টাকা বেশি লাগবে।

এই ঝগড়ার তলায় তলায় যা সেইটুকু আস্বাদের বস্তু। বাপীর ভাবতে ভালো লাগছে, গায়ত্রী রাইও কোথাও থেকে ওদের এই খুনসুটি দেখছে আর মুখ টিপে হাসছে।

ঊর্মিলার রাগারাগিতে কান না দিয়ে পরদিন চা-পর্বের পরেই বাপী চলে এলো। বিকেলের মধ্যেই আবার ফিরবে কথা দিল। গাড়িটা তার এক্ষুনি চাই। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে এনে কিছু বোঝার আগেই বিজয়ের পকেটে গুঁজে দিয়েছে। দু'জনের কারো আপত্তি কানে তোলেনি। বিজয়কে বলেছে, তুমি কেনা বেচা সইসাবুদের ব্যাপার করো বসে বসে, আমি গাড়ি নিয়ে আজই চললাম।

ঊর্মিলা এই রাতেও ছাড়েনি ওকে। খাবার টেবিলে ঊর্মিলার মুখেই টগবগ করে বেশি কথা ফুটছিল। হঠাৎ থেমে গিয়ে আড়ে আড়ে বাপীকে দেখতে লাগল।

—কি হল?

—একটা কথা মনে পড়ল। গোটা ব্যবসাটাই এখন তোমার। যা আছে তাই নিয়ে

বানারজুলিতে বসেই রাজার হালে কাটিয়ে দিতে পারতে। হঠাৎ কলকাতায় জাঁকিয়ে বসার ইচ্ছে কেন?

বাপী হাল্কা সুরেই ফিরে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি ধারণা?

—আমার ধারণা, এখনো তোমার মাথায় মতলব কিছু আছে।...এবারে এসে দেখা হয়েছে?

বাপী ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হঠাৎ। গেলবারে বানারজুলিতে এসে জেরার মধ্যে ফেলে ঊর্মিলা মিষ্টির বিয়ের খবর শুনেছে। তখন বেশ দুঃখও হয়েছিল ওর।

—কি বাজে বকছ!

—বাজে বকছি? তুমি শুধু আরো বেশি রোজগারের নেশায় এখানে জাঁকিয়ে বসছ?

আলতো করে বিজয় বলল, বসলেই বা। যে মতলবই থাক, আমি তো তোমাকে নিয়ে এ-মাসের মধ্যেই হাওয়া হয়ে যাচ্ছি! তোমার নাগাল পাচ্ছে কোথায়?

রাগতে গিয়েও ঊর্মিলা থমকালো। ঠোঁটের ফাঁকে দুষ্টু-দুষ্টু হাসি। ওর দিকে চেয়েই জবাব দিল, প্রেমে ঘা পড়লে কেউ কেউ কোন্ মূর্তি ধরতে পারে জানলে তুমি হার্টফেল করতে। বাপীর দিকে ফিরে চোখ পাকালো, বলে দেব?

পরক্ষণে সামলে নিল। একটা যন্ত্রণার আঁচড় পড়েছে বুঝতে সময় লাগল না। বলল, থাক বাপু ঘাট হয়েছে, এই কানে হাত দিচ্ছি, আর বলব না।...আসলে তোমাকে আমি একটু একটু ভয়ও করি, তাই তোমার জন্যে ভাবনা—বুঝলে?

বোঝেনি কিছুই শুধু বিজয়। তবু সে-ই চেঁচিয়ে উঠল, আমি কিন্তু এবার হার্টফেল করছি!

ওরা যাবার আগে ঘন ঘন আসবে কথা দিয়ে পরদিন বিকেলে ঝকঝকে মরিস মাইনর গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সকালে বিজয়ের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক মহড়া দিয়েছে। হাত অভ্যস্ত এখন। এমন একটা গাড়ি নিজস্ব হবার ফলে মেজাজ খুশি। খানিকটা পথ এগোতে সেই খুশিতে হঠাৎই কিছু সঙ্কল্পের ফল ধরল।

দক্ষিণের পথ ধরে ফিরতে লাগল। মিনিট পঁচিশের মধ্যে সেই পরিচিত রাস্তায়। সাতাশি নম্বর বাড়িটা লক্ষ্য। ঘড়ি দেখল। ছ'টা বাজে। সুদীপ নন্দী অনেক আগেই কোর্ট থেকে ফিরেছে নিশ্চয়। আশা করছে তাকে বাড়িতে পাবে। তার মা-কেও পাবে। আজই যেন তাদের সঙ্গে দেখা করার ঠিক দিন। ঠিক সময়।

খানিক দূরে থেকে গাড়ির স্পিড কমালো। বিকেলের আলোয় টান ধরেছে। তাহলেও তেমন অস্পষ্ট নয় এখন পর্যন্ত। বাপীর আশা দীপুদাকে বা তার মা-কে বা দুজনকেই দোতলার বারান্দায় দেখবে।...ও দেখবে না, তারা ওকে এই গাড়ি থেকে নামতে দেখবে।

নেই।

খানিক আগে আপনা থেকেই ব্রেকে চাপ পড়তে গাড়িটা প্রায় থেমে গেল। প্যান্ট কোর্ট পরা যে মানুষটা ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনো দিকে না তাকিয়ে হনহন করে সামনে এগিয়ে চলল, ব্রেকে চাপ পড়েছে তাকে দেখে।

...ফর্সা মুখ। সোনালী চশমা। আরো অনেক দূরে থেকে দেখলেও ভুল হবার নয়। অসিত চ্যাটার্জি। যার সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে মিষ্টি এখন মালবিকা চ্যাটার্জি। বাপী গাড়িটা থামিয়েই দিল। লোকটা যে মুখ করে ওই সাতাশি নম্বর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো আর যে-ভাবে দু'পায়ে মাটি দাপিয়ে চলেছে তাই থেকে মেজাজ আঁচ করা যায়। জামাই-অভ্যর্থনা নিয়ে যে বেরোয়নি সেটুকু স্পষ্ট।

দু'মিনিটের মধ্যে সামনের বাঁক ধরে চোখের আড়াল হতে বাপীর গাড়িও নড়ল। কিন্তু সাতাশি নম্বর বাড়ির দোরে আর থামল না বা সেদিকে তাকালোও না। সোজা বেরিয়ে

এসে সে-ও বাঁক নিল। এই হঠাৎ-দর্শনে মগজের প্ল্যানও বাঁক ঘুরেছে।

গাড়িটা যে-ভাবে একেবারে পাশ ঘেঁষে ঘ্যাঁচ করে থামল, লোকটা চমকে দাঁড়িয়ে গেল। রাগ উপচে ওঠার আগেই বিস্ময়ের ধাক্কা। বাপী হাসছে অল্প অল্প। পাশের দরজা খুলে দিয়ে বলল, খুব অচেনা মনে না হলে উঠে পড়ো!

চকচকে গাড়িটা এক নজরে দেখে নিয়ে অসিত চ্যাটার্জী খোলা দরজায় এক হাত রেখে ঝুঁকল একটু। সোনালি ফ্রেমে আঁটা কাঁচের ওধারে চোখ দুটো চিকাচক করে উঠল। বাপীর মুখ হাতড়ে অপ্রীতিকর কোনো ব্যাপারের হদিস পাচ্ছে যেন। গলার স্বরেও তেমনি আঁচ-লাগা বিস্ময়।—তুমি এখানে তাহলে?

বাপী সত্যি অবাক।—তাহলে মানে?

চোখের তাপ মুখে ছড়াচ্ছে।—বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে? কবে আসা হয়েছে?

বাপী মিথ্যে কথা সচরাচর বলে না। কিন্তু জবাব যা দেবে তা আরো কারো কানে ওঠার সম্ভাবনা। কলকাতায় এসেছে আজ হাতে গুণে ন'দিন। অম্লান বদনে বলে ফেলল, তা মাস দেড়েকের ওপর হবে। কিন্তু ব্যাপার কি...তোমরা সব আছ কেমন?

দেড় মাসের ওপর এসেছে শুনে হোক বা সাদা বিস্ময়ে খবর জিজ্ঞাসা করার দরুন হোক, লোকটা থমকালো একটু। কিন্তু চাউনি সন্দিগ্ধ তার পরেও।—এতদিন এসেছে, মিলুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি?

মিলু শুনে কানের পর্দা আজও চিড়চিড় করে ওঠল। কিন্তু মিলু ছেড়ে মিষ্টি শুনলে আরো অসহ্য মনে হত। ভেবাচাকা খাওয়া নিরীহ মুখ বাপীর। দেখা হলে তোমার না জানার কথা নাকি। আসার দিনে ইনফরমেশান কাউণ্টারে তাকে না দেখে আমি তো ধরে নিয়েছি দিল্লির সেই চাকরি পেয়ে সেখানে চলে গেছে।

কি কারণে ওকে দেখামাত্র লোকটার এমন সন্দিগ্ধ আচরণ বাপী ঠাওর করতে পারছে না। এই জবাবের পর খানিকটা ঠাণ্ডা। তবু আরো কিছু সংশয়ের অবকাশ আছে যেন। আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি এখানে আছ, এখানকার এরাও জানে না?

—এরা কারা?

—মিলুর দাদা আর মা?

এবারের জবাবে স্পষ্ট বিরক্তি।—কি বাজে বকছ, তাদের নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর সময় হয়নি, কাজের চাপে নাওয়া-খাওয়ারও ফুরসৎ মেলে না। রাস্তার মাঝে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তোমার অত জেরা শোনারও ধৈর্য নেই আমার, উঠবে তো ওঠো, নয়তো সরো।

দাবড়ানি খেয়ে ধাতে ফিরল। বাপীর মনে হল, সেই সঙ্গে একটা আশঙ্কাও দূরে সরল। তাড়াতাড়ি পাশের আসনে বসে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিল।

বাপী এনজিন বন্ধ করেনি। সামনের দ্বিতীয় বাঁক ঘুরে বড় রাস্তায় পড়তে গাড়ির ভিতরটা এক নজর দেখে নিয়ে অসিত চ্যাটার্জী জিগ্যেস করল, বিলিতি গাড়ি নিজে চালাচ্ছ...কিনলে নাকি?

জবাবে মাথা নেড়ে সায় দিল।

এমন ভাগ্যও ঈর্ষার বস্তু।—তুমি তাহলে কলকাতাতেই থাকছ এখন...ব্যবসার নতুন কিছু চার্জ নিয়েছ নাকি?

—চার্জ আর কার থেকে নেব...সমস্ত ব্যবসাটাই আমার এখন। এখানে নতুন সেণ্টার খুলেছি। তুমি এখন আর কোথাও যাবে, না আমার ওখানে বসবে একটু?

—তোমার ওখানে মানে সেই হোটেলে?

—আপাতত তাই। ফ্ল্যাটও পেয়েছি একটা, শিগগীরই উঠে যাব।

—কোথায়?

বলল।

—ওসব জায়গার ফ্ল্যাটের তো অনেক ভাড়া!

—খুব না, মাসে আটশ। সুবিধে হলে কিনে ফেলার ইচ্ছেও আছে।

বলার উদ্দেশ্য সফল। এমন পর্যায়ের মানুষকে হিংসে আর কত করবে। হৃদ্যতা বরং কাম্য। চোখে লোভ, ঠোঁটে হাসি।—সেখানের মতো ভালো জিনিস ঘরে আছে?

বাপী গাড়ি চালাচ্ছে তাই সামনে চোখ। হেসেই জবাব দিল, তুমি হলে গিয়ে আমার হীরো, চাইলে এসে যেতে কতক্ষণ।...আচ্ছা অসিতদা, আমাকে দেখেই তোমার মেজাজ-খানা অমন খিঁচড়ে গেল কেন?

লজ্জা পেল।—মন-মেজাজ সত্যি একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে আছে। তুমি কিছু মনে কোরো না ভাই, এরা দিনকে দিন মাথায় চেপে বসছে।

—এরা বলতে?

—আর কে, মিলুর দাদা আর মা।

জেনেও অবাক হওয়ার ভান করল বাপী।—তুমি এখন ওঁদের ওখান থেকে নাকি?

—হ্যাঁ। আজ এক হাত হয়ে গেল।

এক হাত হয়ে গেল বলে ওকে দেখে অমন তিরিক্ষি আর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল কেন, বাপী ফিরে আর তা জিগ্যেস করল না। তার তাড়া নেই। হোটেলে নিয়ে গিয়ে ফেলার পর খোলস থেকে ভিতরের মানুষটাকে টেনে বার করতে সময় লাগবে না। বলল, গুলি মেরে দাও, তোমার মাথায় চেপে বসতে চাইলে আবার জন্মাতে হবে। কাজ-কর্ম কেমন চলছে বলো।

ফর্সা মুখে খুশির ঢল নামল। যত টাকাই করুক ছেলেটা সত্যিকারের সমজদার বটে। চাকরিতেও লোককে বলার মতো মোটামুটি পদস্থ এখন। এক নামী তেল কোম্পানীর চীফ অ্যাকাউন্টেন্ট হয়ে বসেছে। বিলিতি কোম্পানী। মালিকানার বেশির ভাগ এখনো সাহেবদেরই হাতে। সুপারিশের জোর ছিল না, তিন-তিনটে ইন্টারভিউর বেড়া টপকে নিজের বিদ্যেবুদ্ধির জোরে কাজটা পেয়েছে। ফর্সা মুখ আত্মতুষ্টিতে অমায়িক আরো। —সাহেবদের ইন্টারভিউ বোর্ডে এই চেহারাও কিছু কাজ করেছে অবশ্য, তাহলেও ও-দেশের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট থেকে আমাদের রেজিস্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট যে কম কিছু নয় এটা তাদের বুঝতে হয়েছে।

বাপীর চোখেমুখে প্রশংসার বন্যা। গাড়ি চালানোর ফাঁকে দুই-একবার না তাকিয়ে পারল না। বলল, তুমি ঢের বড় হবে অসিতদা, আমি খুব ভালো করেই জানতাম। এসব ব্যাপারে আমার একটা সিক্সথ সেন্স আছে।...মাইনে এখন তাহলে অনেক পাও?

খুশিতে বিগলিত হতে গিয়েও থমকালো। হাজার টাকার মত পাচ্ছে আপাতত। চাকরি রবাজার যা, সাধারণ দশজনের চোখে অনেকই বটে। কিন্তু এই লোক ফ্ল্যাট ভাড়াই দেয় মাসে আটশ টাকা। তার এই গাড়ি আর এত বড় ব্যবসার মালিক। জবাব দিল, মন্দ নয়, উন্নতিও আছে...তা হলেও তোমার কাছে আর অনেক কি!

—ছাড়ো তো। ক-অক্ষর গো-মাংস অনেক আলু-পটোলের কারবারীও ঢের টাকা রোজগার করে, তা বলে তারা অসিতদা হয় না। বাবার টাকায় বিলেতে গিয়ে পার্টি-গুণে ব্যারিস্টার হয়ে আসা থেকে তো ঢের ভালো।

এমন জায়গায় সুড়সুড়ি পড়ল যে অসিতদাটি আধাআধি তার দিকে ঘুরে না বসে পারল না। শুধু কান আর বুক দিয়ে নয়, দুটো চোখ দিয়েও স্বাদ নেবার মতো কথা। ফর্সা মুখে হাসি চুঁয়ে পড়ছে।

হোটেলে এসে বাপী এবারও আস্ত বিলিতি বোতল আনালো একটা। সংগে জিভ টসটস করার মতো বাছাই খাবার। মাখন গলা আব্দারের সুরে অসিতদা বলল, আজ কিন্তু তোমাকে আমার সংগে একটু খেতে হবে।

—খাব যখন তোমার কাছেই হাতেখড়ি দেব, আজ না—মহাগুরু নিপাত দশার এক বছর না কাটলে ওসব হাত দেবার উপায় নেই।

—থাক তাহলে, থাক। অসিতদার গলায় অন্তরংগ সহানুভূতি।—মহাগুরু মানে তোমার বাবা-মায়ের কেউ?

—না, আমার ভাগ্যের ইষ্টদেবী। মনে মনে বলল, মা গায়ত্রী রাই দোষ নিও না। ওই ইষ্টদেবীটিকে স্মরণ করার সময় আগে বা পরে মা জুড়ে দিতে বাপীর বেশ লাগে।

পানহার দ্রুততালে জমে উঠতে লাগল। ঘরের সবুজ আলো জেবলে বাপী সাদা আলো নিভিয়ে দিল। যে সময়ের যে পরিবেশ। অসিতদা এই বিবেচনাটুকুরও তারিফ করল। দ্বিতীয় গেলাসও আধা-আধি শেষ হতে সময় লাগল না। একটু বাড়তি মর্যাদা দেবার সুরে বাপী বলল, তুমি তো তাহলে দিব্বি ভালো আছ এখন অসিতদা—

কাবাবে কামড় দিয়ে হেসেই তাকালো। চোখের তারা সবে বড় হতে শুরু করেছে।—কেন বল তো?

—নিজে এমন একখানা চাকরি করছ, মি—মা-মানে তোমার মিলুও ভালো কাজ করছে, তোমার আর ভাবনা কি!

মিষ্টি বলতে গিয়েও শুধরে মিলু বলল। ওই মুখে এই নাম হামলার মতো শোনাবে। গেলাসে একটা বড় চুমুক দিয়ে তরলানন্দে অসিতদা বলল, মিলুরও একটা প্রমোশন হয়েছে জানো তো?

বাপী ভিতরে ভিতরে থমকালো একটু।—না তো কি প্রমোশন?

—জুনিয়ার এক্সিকিউটিভ হয়েছে। এখন আর এয়ারপোর্টে নেই, সেন্ট্রাল এভিনিউর আপিসে বসছে।

—গেলবারের সেই ইণ্টারভিউতে ভালো করেছিল বুঝি?

—সেটা তো দিল্লির চাকরি। এখানেও চেষ্টাচরিত্র করছিল—হয়ে গেল। আবার এক চুমুক তল করে লালচে মুখে রসিকতার সুরে বলল, মেয়েদের চেহারাপত্রের জোর থাকলে সুবিধে যেচে আসে ভাই...তুমি স্বীকার করো কি করো না?

বাপী তৃতীয় দফা তার গেলাস ভরে দিতে দিতে অম্লানবদনে মাথা নেড়ে সায় দিল। ফলে ওই ফর্সা মুখের লাগাম আরো একটু ঢিলে।—আমি এ-কথা বললে মিলু আবার রেগে যায়, ওর ধারণা কাজ দেখাতে পারলেই উন্নতি হয়। আমার ভাই সাফসুফ কথা, কাজের আদ্ধেক তো যে অফিসারগুলো ছোঁকছোঁক করে ঘিরে থাকে তাদের সংগে আড্ডা দেওয়া। কিন্তু বলতে গেলেই ফোঁস! তা হলেও মেজাজ বিগড়োলে আমি ছেড়ে কথা কই না।

শেষের ঝাঁঝালো অভিব্যক্তিটুকু থেকেই বোঝা গেল ওই কারণে অসিতদার মেজাজ বিলক্ষণ বিগড়োয়। এ-প্রসংগ বাতিল করে খুশি গলায় বাপী বলল, যাক এমন যুগল উন্নতির খবর আমি কিছুই জানতাম না—কংগ্র্যাচুলেশনস!

রং-ধরা আবেগে অসিতদা অনুযোগ করল, তুমিই তো আমাদের ছেঁটে দিয়েছ, এতদিন হল কলকাতায় আছ একটা খবর পর্যন্ত দাওনি।

সময় বুঝে হালকা ঠাট্টার সুরে বাপী ঠেস দিয়ে বলল, আজ আমাকে দেখেই রাস্তায় তোমার যে মূর্তি দেখলাম, সেধে খবর দিতে গেলে ডাণ্ডা নিয়ে তেড়ে আসতে বোধ হয়।

—আরে না না। অন্তরঙ্গ দোসরের সংশয় মোচনের চেষ্টা। মিলুর ওই মা আর দাদার সামনে গিয়ে পড়লেই মাথায় আগুন জ্বলে আমার। সঙ্গে সঙ্গে অসিতদার বিরস বদন, ধরা গলা।—তারা আমার লাইফ হেল্ করে দেবার চেষ্টায় আছে ভাই, আর মিলুর কানে অনবরত বিষ ঢোকাচ্ছে।

বাপীর কান জুড়োচ্ছে।—খুব দুঃখের কথা। কিন্তু তা বলে রাস্তায় আমাকে দেখে তোমার অত রাগ কেন?

—তুমি আপনার জন, তোমাকে সব বলব ভাই—কিচ্ছু লুকোবো না।—ওখানে তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, ওরা যা চায় তুমি হাতে আছ বলেই চায়—

মৌক দাপটে কথার মাঝেই বাপী গলা চড়ালো।—আমি কোনো দিন কারো হাতে নেই—এই বান্দাকে চিনতে তাদের ঢের দেরি।

—জানি ভাই জানি। ভুলের জন্য তুমি এখন আমার গালে একটা চড় কষালেও রাগ করব না—তোমাকে সব বলব।

চতুর্থ গেলাস জঠরস্থ হতে গলগল করে অনেক দুঃখ আর অনেক রাগের কথা বলে গেল লোকটা।—মিলুর সঙ্গে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে খিটিরমিটির লেগেই আছে আজকাল। দোষের মধ্যে সে নেশা-টেশা করে আর একটু রেস বা জুয়াটুয়া খেলে। এ অভ্যেস বিয়ের আগে থেকেই ছিল, আর মিলু তা যে একেবারে জানত না তাও নয়। কিন্তু মা আর দাদা সর্ব্বক্ষণ কান বিষোলে কাঁহাতক মাথা ঠিক থাকে? নইলে সব দোষ-গুণ মেনে নিয়েই ও কি তার কাছে আসেনি?—পাড়ার দামাল ছেলেরাও অসিতদার কথায় কেমন ওঠে-বসে, তার প্রতাপ কত মিলু সে-সব নিজেদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখত। সেই লোক যখন ফাঁক পেলে রাস্তায় লেকে বা কলেজে ওর ওপর চড়াও হত তখনো পছন্দ করত বলেই ছেঁটে দিত না। আর ওর আই-এ পড়ার সময় সেই লোকই যখন চিঠি লিখল তাকে বিয়ে না করলে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনো পথ থাকবে না, ও-মেয়ে তখন নিজে পার্কে ডেকে নিয়ে বলেছিল, আত্মহত্যা করতে হবে না, ভালো করে পড়াশুনা করো।—তারপর দুবাড়িরই অত বাধা সত্ত্বেও মিলু কি তার জীবনে আসেনি? এখন অত বিগড়ে যাচ্ছে কেন?

সব ওই মা-টির দোষ। ছেলে হবার সময় জামাই নাকি অভাবে আর অনাদরে তার মেয়েকে মেরেই ফেলার মতলবে ছিল। আরে বাবা, নিজের বউকে মেরে ফেলে তার কি লাভ? মেয়ের শ্বশুর-শাশুড়ী অপমান করে বাড়িতে ঠাঁই দেয়নি তাও জামাইয়ের দোষ। আর একটু নেশা-টেশা করে বলে যেন মেয়ে-খুনের আসামী সে। কিন্তু তাদের মেয়ে যে আপিসের পাঁচজন পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দেয়, মাঝেমধ্যে রাত করে বাড়ি ফেরে, তা নিয়ে কিছু বলতে গেলেই গোটা মহাভারতখানাই অশুদ্ধ হয়ে গেল একেবারে!

...মওকা বুঝে ব্যারিস্টার দাদাটিও সর্বদাই মায়ের কানে মন্ত্র জপছে। এমন অমানুষ জামাই আর হয় না। আসলে দাদুর কাছ থেকে পাওয়া মায়ের নামের অমন বাড়িখানা একলা গেলার মতলব তার। সর্বদাই মায়ের কানে ভাঙানি দিচ্ছে, বোনের নামে বাড়ির আদ্ধেক লিখে দিলে সেটা শেষ পর্যন্ত জামাইয়ের খপ্পরে গিয়ে পড়বে—বাড়িটাই তখন বেচে দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ থাকবে না। এমন সেয়ানা যে ঠিক জানে ডিভোর্সের ব্যাপারে বোন কান দেবে না—তাই মাকে বোঝায় এ বিয়ে ভেঙে দিয়ে বোনের নামে আদ্ধেক লিখে দিলে তার কোনো আপত্তি নেই।

—আজকের সমস্ত দিনটাই বড় খারাপ গেছে ভাই। পঞ্চম গেলাসে অসিতদার ধরা গলা।

কেন খারাপ গেছে তাও গলগল করে বলে গেল।...গত সন্ধ্যায় আপিস থেকে ফিরে

মিলুকে বাড়িতে না দেখে বড় একলা লাগছিল। আর রাগও একটু হয়েছিল। তাই আড্ডায় চলে গেছল।

হাতে টাকা-কড়ি তেমন ছিল না। একেবারে শূন্য পকেটে জুয়ার আসরে গিয়ে বসে কি করে। ওদের আলমারির দুটো চাবি, একটা তার কাছে থাকে, অন্যটা মিলুর কাছে। সেই আলমারি খুলে মিলুর টাকার খাম থেকে মাত্র পঁচাত্তরটি টাকা তুলে নিয়ে সে বেরিয়ে গেছিল। আর রাতে বাড়ি ফিরতেও দেরি হয়ে গেছিল একটু।

ব্যস তাই নিয়ে সকালে যাচ্ছেতাই করল মিলু। এমন লোকের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়াই উচিত এ-কথা পর্যন্ত বলল। ফলে এই শর্মারিও ভয়ানক রাগ হয়ে গেল। পাল্টা ঠেস দিয়ে সে-ও চারদিকের এই গণ্ডগোলের দিনে রাত পর্যন্ত ঘরে না ফেরার কৈফিয়ৎ চাইল। ব্যস, তারপরেই কথা বন্ধ। মিলুর এটাই এখন বড় দোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঝগড়ার সময় ঝগড়া করলেই ফুরিয়ে যায়। না, তার বদলে কথা বন্ধ করে বসে থাকে। স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে চায় সে অনেক সুশালীন মেয়ে, ঝগড়া করতে রুচিতে বাধে। তার ফলে অসিতদা যদি আরো বেশি রেগে যায় আর বকাঝকা করে, সেটা কি খুব দোষের? সে কি কম লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোক?

আজ আপিসে গিয়ে অসিত চ্যাটার্জীর মাথা ঠাণ্ডা হয়েছিল। খানিক আগে ছুটি নিয়ে মিলুর আপিসে চলে এসেছিল। আগেও এ-রকম আপোস করেছে। দুজনে এক-সঙ্গে সকাল-সকাল বাড়ি ফিরেছে। কিন্তু আজ ওর আপিসে গিয়ে শুনল মিলু আসেইনি মোটে। ভাবল বাড়িতে পাবে। বাড়িতেও নেই। তাহলে আর বাপেরবাড়ি ছাড়া কোথায়? রাগ ধামাচাপা দিয়ে ওকে নিয়ে যাবার জন্য শ্বশুরবাড়িতে গেল। সেখানে তেলের কড়ায় মাছ ছাড়ার মতো তপতপে গলায় শাশুড়ী জানালো, মেয়ে খানিক আগে অমানুষ জামাইয়ের ওখানেই চলে গেছে।

...শাশুড়ী আর সম্বন্ধী এমন ব্যবহার করল যেন হাড়িকাঠে গলা দিয়ে আছে সে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আলটিমেটামই দিল তারা। বুঝেশুনে না চললে তাদের মেয়ে বা বোনও আর বেশিদিন বরদাস্ত করবে না। অসিতদাও তখন পাল্টা জবাবে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে, ছেলে সে-ও খুব সহজ নয়—বুঝেশুনে চলার দায় তাদের মেয়ে বা বোনেরও আছে। ব্যস. তাই শুনে শাশুড়ী আরও খাপ্পা...ওই খিঁচড়নো মেজাজ নিয়ে বেরিয়ে এসেই বাপীর সঙ্গে তার দেখা। তাই তক্ষুনি সন্দেহ হল নাগালের মধ্যে একজন আছে বলেই শাশুড়ী আর শ্যালকের কথায় কথায় আজকাল এমন শাসানি—[illegible] মিষ্টিরও তুচ্ছ কারণে এত মেজাজ।

—এ রকম সন্দেহ হতে পারে কিনা তুমিই বলো ভাই। অনুশোচনায় গলা বুজে আসার দাখিল অসিত চ্যাটার্জীর।—তুমি এতদিন ধরে কলকাতায় আছ আর এদের মতো স্বার্থপর লোক তা মোটে জানেই না ভাবব কি করে? ওই মা আর দাদাটির মতো প্যাঁচালো লোক নই আমি, তোমাকে দেখামাত্র সন্দেহ আমার হয়েছিল খোলাখুলি স্বীকার করেছি—ভুল স্বীকার করারও হিম্মৎ চাই, এরপর তোমার মনে আর কোনো দাগ থাকতে পারে, না রাগ থাকতে পারে তুমিই বলো—পারে?

মুখখানা সীরিয়াস করে বেশ ঘটা করে মাথা নাড়ল বাপী। পারে না। তারপর মুখেও বলল, সব শোনার পর এখন বরং তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে—যে-সে লোক তো নও যে এভাবে হেনস্থা করবে ওরা।

সহানুভূতির আঁচ পেয়ে আহত পুরুষকার মাথা তুলল।—তুমি হলে গিয়ে একটা সমজদার দিলের মানুষ, তুমি বুঝবে না কেন। মদ-গেলা ফর্সা তেলতেলে মুখ রাগে লাল আরো।—ওদেরও বুঝতে হবে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে এই শর্মাই বুঝিয়ে ছাড়বে। আমাকে

হেনস্থা করে কেউ পার পাবে ভেবেছে—সেই মেজাজ দেখলে ওদের মেয়েসুদ্ধ ভয়ে কাঁপবে—আমি কারো ধার ধারি, না, কারো পরোয়া করি?

নিরীহ মুখে বাপী বিক্রমের কথা শুনল, মাথা নেড়ে সায়ও দিল। কিন্তু আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হচ্ছে বুঝলে জঙ্গলের পশু যেমন করে, এই প্রতাপও অনেকটা সেই গোছের লাগল বাপীর।

পঞ্চম দফা গেলাস খালি হতে বাপীই বলল, আর না, আমার ড্রাইভার নেই, তোমাকে একলা যেতে হবে।

আর দরকারও নেই। আশ মিটিয়ে খাওয়া হয়েছে। দাঁড়াতে গিয়ে এখনই দু-পায়ের ওপর তেমন ভর থাকছে না। আতিথ্যে পরিতুষ্ট অসিতদা এখন যেম . অন্তরঙ্গ তেমনি দরাজ। টেনে টেনে বলল, নিজের গাড়ি আছে, কি আর এমন রাত, তুমিও চলো না আমার সঙ্গে- মিলুও খুশি হবে নিশ্চয়, হাজার হোক ছেলেবেলার বন্ধু তো তোমরা।

এবারে লোকটাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিতে ইচ্ছে করল বাপীর। মাথা নেড়ে মোলায়েম সুরেই বলল, আজ না, আর একদিন হবে—বাড়িতে টেলিফোন আছে?

—না ভাই, আপিস থেকে শিগগিরই পাবার কথা আছে। আপিসে আমার টেবিলেই ফোন, সেই নম্বরটা রাখো। দুলে দুলে টেবিলের সামনে গিয়ে পকেট থেকে কলম বার করে খসখস করে ফোন নম্বর লিখে দিয়ে বলল, তোমার নম্বরটাও আমাকে দাও।

এতক্ষণ বাদে আর যেন এক মুহূর্তও বরদাস্ত করা যাচ্ছে না লোকটাকে। হাল্কা তাড়ার সুরে বলল, কাল-পরশুর মধ্যেই ফ্ল্যাটে চলে যাচ্ছি হয়তো, এখানকার নম্বর নিয়ে কি হবে। পরে বাড়ির নম্বর নিও'খন।

লিফটে নিচে নামালো। বাইরে এসে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিল।

একটু আগে অল্পস্বল্প বৃষ্টি হয়ে গেছে মনে হয়। ফুটপাথ আর রাস্তা ভেজা। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। বাপী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। হাওয়াটা ভালো লাগছে।

হাওয়াটা না আর কিছু?...জীবনের এই বাঁকে একটা অনুকূল পটভূমি তার অগোচরে আপনা থেকেই প্রস্তুতির পথে কি?

॥ এগারো ॥

রাত দশটার কাছাকাছি। একটা লোভ টেলিফোনটার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সুদীপ নন্দী বা তার মা এখনো ঘুমিয়ে পড়েনি নিশ্চয়। অসময়ের ডাকে তারা সাড়াও দেবে, খুশিও হবে। অনিশ্চয়তার গহ্বরে সহজে কেউ ঝাঁপ দিতে চায় না। নাগালের মধ্যে নিশ্চিত কোনো আশ্বাস পেলে তবে জোর বাড়ে। রাতের এই টেলিফোন সেই আশ্বাসের মতো হতে পারে। আর কিছু না বলে শুধু অন্তরঙ্গ কুশল খবর নিলেও হাতের কাছে তারা নাগালের মানুষ দেখতে পাবে।

লোভের হাতছানি বাপী জোর করেই বাতিল করে দিল। মত্ত অবস্থায় ঘরে ফিরে অসিত চ্যাটার্জি মুখ সেলাই করে বসে থাকবে না। এই রাতের ঘোরে অন্তত বাপীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেই। মিষ্টি কি ভাববে বা কি বুঝবে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। সেখান থেকেই তার কলকাতায় অবস্থানের খবরটা মা আর দাদার কানে পৌঁছুবে আশা করা যায়। মিষ্টির মন তার মা বা দাদার মতো এখনো খুব অস্থির মনে হয় না। কিন্তু যত স্থিরই হোক, অসিত চ্যাটার্জি ঘরে ফিরলে তাতে ঢিল একটা পড়বেই। সেই বৃত্ত আপনা থেকে কতটা ছড়ায় দেখা যাক।

এর থেকেও বড় লোভ সংবরণ করতে হল পরদিন। এক পয়সার যুদ্ধের ফয়সলা এখনো হয়নি। ছোটখাটো গণ্ডগোল রোজই চলছে। তবু লোকে কাজকর্ম একেবারে সিকেয় তুলে বসে নেই। নিজের দখলে গাড়ি থাকায় বাপীরও নড়াচড়ার সুবিধে হয়েছে। বিপাকে পড়ে কোথাও আটকে যাবার ভয় নেই। সকালে জিত্ মালহোত্রাকে সঙ্গে নিয়ে উল্টোডাঙ্গার গুদাম ঠিক করতে গেছিল।

ফেরার সময় সেন্ট্রাল এভিনিউর পথ ধরল। রাস্তার ধারে এক জায়গায় ছোট একটা চকচকে বাড়ির দোতলায় পরিচিত নামের এয়ার অফিসের সাইনবোর্ড চোখে পড়া মাত্র বাপীর ডান পা আপনা থেকেই ব্রেকের ওপর। ঘড়িতে সাড়ে বারোটা।

গাড়ি থেকে নেমে সোজা রাস্তাটা পার হলে উল্টোদিকে অপিসের দরজা। ঘাড় বেঁকিয়ে বাপী দেখছে। পাশ থেকে মালহোত্রা লক্ষ্য করছে সে-খেয়ালও নেই। ওখানে একতলা বা দোতলার কোনো একটা ঘরে বসে কাজ করছে জুনিয়র অফিসার মালবিকা চ্যাটার্জি! অসিত চ্যাটার্জির মতে যে অফিসারগুলো ছোঁকছোঁক করে ওকে ঘিরে থাকে, তাদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়াই কাজের অর্ধেক। জানান না দিয়ে বাপী যদি সোজা তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, মুখখানা দেখতে কেমন হবে? মিষ্টির সঙ্গে তখন এই মালবিকা চ্যাটার্জির একটুও যুঝতে হবে কি হবে না? এক নজর তাকিয়েই বাপী সেটুকু বুঝতে পারবে।

—কোন টিকিট কাটার দরকার থাকলে আমাকে বলে দিন সার, আমি কেটে রাখব।

জিত্ মালহোত্রা। একটা অদম্য লোভের তাড়না দমন করে বাপী আবার, গাড়ি চালিয়ে দিল। জবাবে সামান্য মাথা নাড়ল কি নাড়ল না।

হোটেলের মুখে জিত্ নেমে গেল। আবার সে তিনটেয় আসবে। মনিবের সঙ্গে আজ বড়বাজারে বড় কয়েকটা পার্টির সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের প্রোগ্রাম।

স্নান সেরেই বেরিয়েছিল। হুকুমমতো হোটেলের বয় ঘরে খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। খাওয়া সবে শুরু করেছিল, টেলিফোন বেজে উঠল। ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকালো বাপী। কে হতে পারে? নিশীথ?...অসিত চ্যাটার্জিও হতে পারে। পরেরজন হলে ততো অবাঞ্ছিত নয়। গতরাতের খবর বা আজকের সকালের খবর কিছু পাওয়া যেতে পারে। বোতলে যে অর্ধেক এখনো পড়ে আছে তার টানে আজও আসতে চাইবে হয়তো। ডাকবে না ছেঁটে দেবে?

...হ্যালো?

—বাপী নাকি?

ও-ধারের গলা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সহজ হবার চেষ্টায় একটা উদ্গত অনুভূতির গলা টিপতে হল। ধৈর্যের ফল ধরেছে। সবুরে মেওয়া ফলেছে।

—হ্যাঁ, দীপুদার গলা মনে হচ্ছে?

—ঠিক ধরেছে। অন্তরঙ্গ হাসি। তারপর অন্তরঙ্গ অনুযোগ।—দেড় মাসের ওপর কলকাতায় আছ শুনলাম অথচ একটা খবর পর্যন্ত নাওনি!...শুনে মা-ও দুঃখ করছিলেন।

বাপীর গলা চিনি-গলা।—কাজের চাপে নাওয়া-খাওয়ার সময় পাচ্ছিলাম না দীপুদা, তার ওপর যে গণ্ডগোল তোমাদের রাজ্যে, সব গুটিয়ে আবার না ফিরেই যেতে হয়। যখন-তখন বেরুনোর জো আছে? মাসীমাকে বোলো দেখা হলেই আমি তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেব। তুমি কোত্থেকে?

—কোর্ট থেকে। তোমার সঙ্গে একটু দেখা হওয়ার দরকার ছিল। বিকেলে হোটেলে থাকবে?

—বিকেলে কখন?

—এই ধরো সাড়ে চারটে পাঁচটা?

—পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা করো, আমার ওদিকেই একটু কাজ আছে, পাঁচটা দশ-পনেরর মধ্যে কোর্ট থেকে আমি ফেরার সময় তোমাকে তুলে নেব। বিকেলের জলযোগের ব্যবস্থা ভালই হবে কথা দিচ্ছি।

ওদিক থেকে সুদীপ নন্দীর জোরালো হাসি। পরে একটু সমঝে দেবারও চেষ্টা। তোমার গতকালের দরাজ জলযোগের ব্যবস্থার জন্য মিষ্টি কিন্তু রেগে আছে।

বাপীরও হাসির কামাই নেই।—সেই ছেলেবেলায় মিষ্টির রাগও আমার খুব মিষ্টি লাগত দীপুদা। কিন্তু গতকাল আমার সত্যি কোনো দোষ ছিল না...

কথার মাঝেই বাধা পড়ল।—ঠিক আছে ঠিক আছে, এই অপদার্থটাকে আর না চেনে কে, যা বোঝার মিষ্টিও ঠিকই বুঝেছে। পাঁচটা থেকেই আমি কোর্টের ইস্ট গেটে থাকব'খন, তুমি এসো।

ফোন রেখে বাপী আবার খেতে বসল। কি খাচ্ছে, সেদিকে আর চোখ মন কিছুই নেই। হাসছে নিঃশব্দে। মিষ্টি রেগে আছে। সেটাই স্বাভাবিক। বাপীর ঘর থেকে তার ঘরের লোক মাতাল হয়ে ফিরেছে সেটা বরদাস্ত করা সহজ নয়। নেশার ঘোরে এই লোক বেফাঁস কি বলেছে না বলেছে ভেবেও তার রাগ হতে পারে। ঘরের মানুষ অমানুষ হলে মেয়েদের আসল পুঁজি ঝাঁঝরা। মিষ্টি সেটা বাপীর কাছেই সব থেকে বেশি গোপন করতে চাইবে। তার রাগ হবে না তো কি? কিন্তু তার মা আর দাদার ভিন্ন লক্ষ্য, ভিন্ন চিন্তা। গেলবারেও বাপীর লক্ষ্য বা চিন্তার আভাস পেয়েছিল। ওকে দেখামাত্র অসিত চ্যাটার্জির সন্দেহ বা তিরিক্ষি মেজাজ অহেতুক নয়। মিষ্টিকে সে এখনো অত ভয় করে বলে মনে হয় না। কিন্তু তার মা বা দাদা যে তাকে ছেঁটে দেবার মতলবে নির্ভরযোগ্য নাগালের মানুষ খুঁজছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মালহোত্রার সঙ্গে কথা বলে ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী বাপী পার্টি বাছাই করে নিল। হাতে যেটুকু সময়, সকলের সঙ্গে আজ দেখা করা সম্ভব নয়। ঠিক পাঁচটা দশে কোর্টের পুব গেটে গাড়িটা এসে দাঁড়াল। দীপুদা অপেক্ষা করছিল। ক্রিম-রঙের ঝকঝকে গাড়ি দেখে তারও দু'চোখ অসিত চ্যাটার্জির মতোই গোল হল।

রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে আসছে।

বাপীর পাশের আসনে জিত্ মালহোত্রা। তাকে বলাই ছিল, বাপীর চোখের ইশারায় সে শশব্যস্ত দরজা খুলে নামল। মানী অতিথির উদ্দেশে বিনীত তৎপর অভিবাদন জানিয়ে তাকে নিজের আসন ছেড়ে দিল। সে মালিকের পাশে বসতে দরজা খুলে ও পিছনের সীটে বসল।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বাপী হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ নাকি?

—না, মিনিট পাঁচেক। গাড়ির ভেতরটাতেও চোখ বুলিয়ে নিল। জিগ্যেস করল, এ গাড়ি এখানে কিনলে, না ওখান থেকে নিয়ে এসেছ?

—আনা নেওয়ার অনেক হাঙ্গামা। তাছাড়া বানারজুলিতে থাকলে সেখানে গাড়ি ছাড়া আরো অচল। যাতায়াত তো করতেই হবে, এখানেও কিনে নিলাম আর একটা।

গাড়ি আরো একটা আছে বুঝিয়ে দেওয়া গেল। জিপও একটা আছে ফাঁক পেলে তাও জানিয়ে দিত। ব্যারিস্টার সাহেবের যাতায়াত এখনো ট্রামে বা বাসে। স্কুলে পড়তে জঙ্গল সাহেবের ছেলে জঙ্গল-আপিসের জিপে আসত যেত। বাপী পিসিমার তৈরি আমসত্ব, পাকা কামরাঙা, বন-মোরগ ঘুষ দিয়ে সেই জিপে তার সঙ্গে যাতায়াতের আরজি পেশ করতে মনে লেগেছিল। প্রথমে ধমকে উঠে পরে সদয় হয়ে বলেছিল, বাড়ি থেকে এক মাইল রাস্তা হেঁটে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে আর স্কুলের আধ-মাইল আগে নেমে

যেতে। কেরানীর ছেলের সঙ্গে এক জিপে কেউ তাকে দেখে ফেললে মান খোয়া যাবে। আর আসার সময় হেঁটেই আসতে হবে কারণ উঁচু ক্লাসের ছেলেদের সামনে তাকে সঙ্গে নেওয়া সম্ভব নয়। রাগে আর অপমানে বাপী এই জিপের দিকে আর ফিরেও তাকাতে চায়নি। বাপী ভোলেনি। কিন্তু দীপুদার কি মনে আছে?

সুদীপ নন্দী ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের স্মার্ট লোকটাকে দেখে নিল একবার।—ইনি?

—ইনি আমার সেক্রেটারি মিস্টার জিত্ মালহোত্রা।

মালহোত্রা আর একবার কপালে হাত তুলে সৌজন্য জানালো। দীপুদাও। বানারজুলির সেই কথায় কথায় গাঁট্টা-খাওয়া ছেলেটার আজ এই বরাত দেখে বুক একটুও চড়চড় না করে পারে কি? গাড়ি চালানোর ফাঁকে খোশ-মেজাজে বাপী আড়চোখে মুখখানা দেখার চেষ্টা করছে।

—কলকাতায় একটা বড় সেণ্টার খুলে ফেললাম দীপুদা। জিত্, তুমি কি করলে না করলে দীপুদাকে একটু দেখাও না। আমাকে খুব কাজ দেখাচ্ছ, কিন্তু এঁর চোখ সহজে ফাঁকি দিতে পারবে না—নামজাদা ব্যারিস্টার।

দীপুদার বিব্রত মুখ! পিছন থেকে জিত্ সাগ্রহে আর্ট পেপারে ছাপা চকচকে প্যামফ্লেট তার হাতে দিল। সেটা ওলটাবার আগে ফার্মের একচ্ছত্র মালিকের নাম চোখে পড়বেই। ভারতের নানা জায়গায় শাখা-প্রশাখার বিস্তারও নজর এড়াবে না। জিত্ এরপর ফার্মের ক্যালেণ্ডার আর ভেলভেট কভারে মোড়া ডায়েরিও তাকে উপহার দিয়ে ফেলল। ওতেও বর্তমান মালিকের নাম অনুপস্থিত নয়।

খুশিতে মুখখানা ভরাট করার চেষ্টা সুদীপ নন্দীর।—চমৎকার! আপাতত তুমি তাহলে কলকাতাতেই থাকছ?

—ইচ্ছে তাই, তবে ফাঁকে ফাঁকে বাইরে ছোটাছুটি তো আছেই। মাসে এক-আধবার বানারজুলিও যেতে হবে। হাসল।—তুমি বিলেত-ফেরত সাহেব মানুষ এখন, বানারজুলির জঙ্গল বোধ হয় ভুলেই গেছ।

দীপুদা স্বীকার করল না। উল্টে রং চড়ালো।—বানারজুলির জঙ্গলের সেইসব দিনগুলি কি ভোলবার। তোমার সেই বনমোরগের স্বাদ এখনো জিভে লেগে আছে।

বিনিময়ে বাপী কি পেয়েছে তাও মনে আছে কিনা জিগ্যেস করার লোভ সামলাতেই হল। হোটেলে পৌঁছনোর ফাঁকে ফ্ল্যাট ভাড়া নেবার খবরটাও জানিয়ে রাখল। শিগগীরই উঠে যাবে, মাসিমাকে এনে তখন একটু দেখেশুনে যাবার আবেদনও জানিয়ে রাখল। সুদীপ নন্দীও সানন্দে প্রতিশ্রুতি দিল।

জিত্ মালহোত্রাকে বিদায় করে বাপী গাড়িটা তকমা-পরা দারোয়ানের জিম্মায় ছেড়ে দিল। লোক ডেকে পিছনের গ্যারাজে গাড়ি তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা সে-ই করবে। দীপুদাকে নিয়ে নিজের সুইটে এলো। ফোনে দুজনের মতো খাবারের হুকুম দিয়ে সামনে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল।—এবারে বলো কি খবর।

—না, খবর তেমন কিছু না, তুমি কলকাতায় আছ আর এতদিনের মধ্যে দেখা হল না, মা তাই বার বার বলছিল। মিষ্টির সঙ্গেও তোমার দেখা হয়নি শুনলাম।

—না। কৈফিয়ৎ দাখিল করার মুখ বাপীর।—এয়ারপোর্টের ইনফরমেশন কাউণ্টারে ওকে না দেখে ভাবলাম দিল্লির চাকরিটা হয়ে গেছে, ইণ্টারভিউ দিতে গেছল জানতাম তো।

ব্যারিস্টার সুদীপ নন্দীর ক্ষোভপ্রকাশের ধরন আলাদা। মুখ মচকে বলল, সে-চাকরিও ও-ই পেয়েছিল, আর সেটা এর থেকে ঢের ভালো চাকরিই ছিল। নিতে পারল না। দ্যাট স্কাউনড্রেল ওয়ান্—আমি আর মা বার বার করে বলেছিলাম, কি করবে ও, নে যা। গেল না, এখন পস্তাচ্ছে।

শুনে ভেতরটা চিনচিন করছে বাপীর। এখন পস্তাচ্ছে শুনেও তেমন খুশি হতে পারল না। বড় চাকরি পেয়েও নিতে না পারার একটাই অর্থ। আর একজনের জোর খেটেছে। নিছক অত্যাচারের জোর হলে মিষ্টি পরোয়া করত কি...?

একটু চুপ করে থেকে দীপুদা বলল, এত বড় ব্যবসার তুমি একলা মালিক এখন মা তাও জানে দেখলাম। ফোনে মিষ্টি হয়তো বলেছে। আচ্ছা, এর আসল মালিক তো একজন মহিলা শুনেছি, তাঁর কি হল?

—নেই। সাত-আট মাস হল মারা গেছেন।

—তাঁর ছেলেপুলে নেই?

—একটি মেয়ে।

দীপুদা নড়েচড়ে বসল।...সমস্ত ব্যবসাটাই তুমি পেয়ে গেলে, তার কি হল?

বাপী থমকালো একটু। ফোনে দীপুদা বলেছিল, তার সঙ্গে দেখা হওয়া একটু দরকার। দরকারটা কি তার আভাস একটু একটু পাচ্ছে মনে হয়। সত্যি যদি হয় বাপী নিজেই তাহলে নিজের মগজের তারিফ করবে না তো কি? হেসেই জবাব দিল, তার বিয়ে হয়ে গেল বলেই তো আমি সব পেলাম।

ব্যারিস্টার সাহেবের সপ্রতিভ ভাবটুকু কেউ বুঝি সুইচ টিপে নিভিয়ে দিল। ঢোঁক গিলে জিগ্যেস করল, ও...তোমার সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে তাহলে?

—আমার সঙ্গে! ভিতরে উৎফুল্ল, বাইরে আকাশ থেকে পড়া মুখ।—কি যে বলো ঠিক নেই। তার বিয়ে হয়েছে এক বিলেত-ফেরত পাঞ্জাবী এনজিনিয়ারের সঙ্গে—এখন কলকাতায় আছে ওরা, এ-মাসের শেষেই আমেরিকা চলে যাবে।

ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখ সুদীপ নন্দীর।—তাহলে তুমি সবটা পেলে কি করে?

বাপী হাসছে। দীপুদা আর তার মাকে অন্তত নিশ্চিত করার তাগিদ এখন। বলল, সেই মহিলা আমাকে খুব ভালবাসতেন, নিজের ছেলেকেও কেউ এত ভালবাসে কিনা জানি না। ব্যবসা ছাড়াও তার অগাধ টাকা আর সোনা ছিল। ব্যবসার সঙ্গে সে-সবও আমাকে আর ঊর্মিলাকে সমান দু-ভাগ করে দিয়ে গেছেন। ওর বা স্বামীর আর ব্যবসায় ইনটারেস্ট নেই—তাই ওদের অংশ আমিই কিনে নিয়েছি! কিন্তু আমি তাকে বিয়ে করেছি তোমাদের এ ধারণা হল কি করে দীপুদা?

বিব্রত দেখালেও মানুষটার ভিতর থেকে একটা গুরুভার নেমে গেছে। হেসেই জবাব দিল, আর বলো কেন, রাগ হলে মেয়েদের আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। অসিতকে মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরতে দেখেই ওর মেজাজ বিগড়ে গেছিল। তোমার কাছে ছিল আর তুমি এখন কত বড় হয়েছ তাও বোধ হয় তার মুখেই শুনেছে। আর, মা যা বলল, তোমার মালিকের মেয়ের গল্প গেলবারে তুমিই হয়তো মিষ্টির কাছে করেছিল। তাই গোটা ব্যবসাটা এখন তোমার শুনেই ও ধরে নিয়েছে মালিকের সেই মেয়েকে বিয়ে করেই সব পেয়েছ। আসলে মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরে ওই অপদার্থটা আরো কি বলেছে না বলেছে ঠিক নেই। রাগের মাথায় রাত এগারোটায় মিষ্টি পাশের ওষুধের দোকান থেকে মাকে ফোন করেছে। ওর ধারণা, মালিকের সেই মেয়েকে বিয়ে করেই এখন মস্তলোক হয়েছ তুমি আর তার হ্যাজব্যাণ্ডকে দেদার মদ খাইয়ে মজা দেখেছ। বোনটার দোষ নেই বুঝলে, একেবারে তিক্তবিরক্ত হয়ে গেল।

শিরায় শিরায় বাপীরও উষ্ণ তাপ ছড়াচ্ছে। এখন পর্যন্ত কি আর হয়েছে, কতটুকু হয়েছে। তার আগে অনেক এগনোর ইচ্ছে, অনেক দেখার ইচ্ছে। ওই মেয়ে যেন সেই ইচ্ছের বিরুদ্ধে ছড়ি উঁচিয়েছে।

কিন্তু সুদীপ নন্দী নিশ্চিন্ত এখন, খুশিও। এই রাতের মধ্যে তার মা-ও নিশ্চিন্ত

হবে। খুশি হবে। তাদের ভিন্ন স্বার্থ। ভিন্ন প্ল্যান। নিজের মুখ কৌতুকের মুখোশে ঢাকল বাপী। হাসতে লাগল।—তোমাদের কাছে আমিই কালপ্রিট তাহলে।

—কি যে বলো, আমরা তোমাকে চিনি না! মিষ্টিও যা বলেছে রাগের মাথায়ই বলেছে, নইলে তার চিজটিকেও সে খুব ভালোই জানে।

বয় খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। বাপী উঠে দেয়ালের দেরাজ থেকে হুইস্কির বোতল এনে টেবিলে রাখল। আধাআধি অবশিষ্ট আছে এখনো। কিন্তু ওটা দেখামাত্র খুশি হবার বদলে দীপুদা তেতেই উঠল একটু।—তুমি তো খাও না, ওই রাসকেল একলাই এতটা সাবড়ে দিয়ে গেছে নাকি?

বাপীই যেন অপরাধী—কি করব বলো, খেতে থাকলে তো আর কেড়ে রাখতে পারি না। তাও তো শেষ পর্যন্ত জোর করেই তুলে দিলাম।

—ও তোমার কাঁধে চাপল কি করে, তোমাকে পেল কোথায়?

—গাড়িতে আসছিলাম, রাস্তায় দেখা। কোন্ রাস্তা সেটা বলল না।

দীপুদার মুখ চলছে। গেলাসও। প্রথম গেলাস একটু দ্রুতই শেষ। ফলে আরো একটু অন্তরঙ্গ। বাপী আবার গেলাস ভরে দিতে বলল, কিছু না মনে করো তো একটা কথা বলি, ওই ওকে তুমি অত আসকারা দিও না।

—অসিতবাবুকে? এলে তাড়িয়ে দেব?

—তা বলছি না, অন্তত বুঝিয়ে দেবে তুমি খুব সহজ লোক নও আর ওর কাছের লোক নও।

খেতে খেতে নির্লিপ্ত মুখে বাপী বলল, কিন্তু তার তো নিজের সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা—রেজিস্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট—এখন বড় চাকরিও পেয়েছে...

—স-সবও গেয়ে গেল—না? রাগত মুখে খাওয়া থামিয়ে গেলাসে বড় চুমুক দিল একটা। ন্যাপকিনে মুখ মুছতে মুছতে বলল, কপালজোরে বড় চাকরি তো পেয়েছে, কিন্তু তার কটা পয়সা [illegible]রে আনে সে-কথা বলেছে? সব রেসে ঢেলে দিয়ে আসে, নয়তো জুয়ায়—বুঝলে? মিষ্টি[illegible] টাকা চুরি করেও জুয়া খেলে এসেছে—উনি আবার বড় চাকরি করেন!

আলতো করে বাপী জানান দিল, কাল নিজেই সেকথা বলেছিল। তোমাদের সঙ্গে নাকি এ-নিয়ে এক হাত হয়েও গেছে।

—না হয়ে উপায় কি বলো। আমরা তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি, রেস জুয়া মদ এসব না ছাড়লে আমাদের তাকে ছাড়তে হবে—মিষ্টিকেও।

যা জানানো হয়েছে মা আর দাদাটি তাই হবে আশা করছে বলেই যে আজ এত খাতির কদর বাপী তরফদারের তাও দিনের মতোই স্পষ্ট। অপ্রিয় প্রসঙ্গ বদলে বাপী আপনার জনের মতো মাসীমার স্বাস্থ্যের খবর নিল। মেয়ের ভাবনায় তার রাতের ঘুম গেছে শুনে বাপীর মুখেও উদ্বেগের ছায়া। বউদি অর্থাৎ দীপুদার স্ত্রী আর ছেলের খবরও নিতে ভুলল না। বউদিকে আগের বারে রোগাই দেখে গেছিল, এখন তেমনি আছে শুনল। স্বাস্থ্যটা তেমন ভালো যাচ্ছে না, অল্প-স্বল্প রোগ লেগেই আছে।

—ছেলে আর বউদিকে নিয়ে মাসখানেকের জন্য আমার বানারজুলির বাংলোয় থেকে এসো, স্বাস্থ্য চেহারা সব ফিরে যাবে। সেখানে সব ব্যবস্থা আছে, কুটোটি নাড়তে হবে না—খাবে-দাবে আর বেড়িয়ে বেড়াবে।

যাবে কি যাবে না সেটা স্বতন্ত্র কথা, এ-রকম আপ্যায়ন শুনলে সকলেই খুশি হয়। দীপুদা খুবই খুশি।

ততক্ষণে খাওয়া শেষ। দীপুদার দ্বিতীয় গেলাসও। বাপী আবার বোতল তুলে

নিতে সে আধো-আধো বাধা দিল, আবার কেন...

—ওয়ান ফর দি রোড। হুইস্কি ঢেলে বাপী নিজেই সোডাও মিশিয়ে দিল।

এই গেলাসও আধাআধি শেষ হতে বাপী আলতো করে আবার মোক্ষম জায়গাটিতে ঘা বসালো। বলল, অসিতবাবুরও তোমাদের ওপর বেজায় রাগ দেখলাম কাল—

ওই জিনিসটা পেটে পড়লে আর একটু জমে উঠলে গলতেও সময় লাগে না, জ্বলতেও না। দীপুদাও দপ করে ঝলসে উঠল।—হবে না! গুণের শেষ আছে ওর? যা-তা বলে গেছে বুঝি?

—বলছিল, মাসিমাই তার মেয়ের কান বিষিয়ে দিচ্ছে, আর বাড়িটার লোভে তুমিও মাসিমাকে তাতিয়ে রাখছ।

—এসব কথাও বলেছে! বাড়িটা মানে আমাদের ওই বাড়িটা?

হ্যাঁ, তুমি নাকি বলেছ মেয়েকে ভাগ দিলে বাড়ি আর রক্ষা করা যাবে না, সে বেচে খাবে—এ-সব বলে মাসিমাকে বিগড়ে দিয়ে ওটা তুমি একলাই হাতড়াবার মতলবে আছ।

—স্কাউনড্রেল! মদ গিলেও মুখ এতক্ষণ এত লাল হয়নি দীপুদার।—একলা হাতাতে হলে মিষ্টিকে ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছেঁটে দেওয়ার জন্য এত ঝোলাঝুলি করব কেন? ওই স্কাউনড্রেলের খপ্পরে গিয়ে পড়লে যা বলেছি তাই হবে না তো কি? জুয়ার নেশায় যে স্ত্রীর গহনা আর টাকা চুরি করতে পারে সে না পারে কি?

টাকা চুরির সঙ্গে এবারে গয়না চুরিটাও যোগ হল। কান পেতে শোনার মতোই। চার মাস আগে ভালো একটা হার খোয়া গেছে মিষ্টির। টাকা চুরি ধরা পড়ার পর মা আর তার অন্তত ধারণা ওই শয়তানই সেটা খেয়েছে। দিনে দিনে আরো অনেক গুণ ধরা পড়ছে ছেলের। মিষ্টিকে ইদানীং সন্দেহ করে। দিল্লিতে অমন ভালো চাকরিটা পাওয়ার পিছনে খারাপ কোনো খাতিরের হাত আছে ধরে নিয়ে এমন যাচ্ছেতাই ব্যাপার করল যে মিষ্টির যাওয়াই হল না শেষ পর্যন্ত। তার এই প্রমোশনটাও একই সন্দেহের চোখে দেখে। যখন তখন আপিসে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প করতে দেখলে ঘরে এসে বিচ্ছিরি রকমের খোঁচা দিয়ে কথা বলে আর যাচ্ছেতাই রসিকতা করে।

জ্বলজ্বলে চাউনি দীপুদার।—ঘরের কেচ্ছার কথা কত আর বলব তোমাকে?

আর বেশি শোনার তাগিদ নেই বাপীর। গতকাল আর আজকের মধ্যে তুরুপের অনেকগুলো তাস হাতে পেয়ে গেছে। ধীরেসুস্থে কি ভাবে খেলবে এখন সেই বিবেচনা সেই হিসেব।

॥ বারো ॥

পরের দিনটা আবার হরতাল। ট্রাম ভাড়ার সেই এক পয়সার যুদ্ধ। তার পরের দিন জায়গায় জায়গায় একশ চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করার ধুম, জনতা পুলিশে খণ্ডযুদ্ধ। গুলি টিয়ারগ্যাস লাঠি। সৈন্যদের টহলদারি।

এরই মধ্যে বাপী হোটেল ছেড়ে নিজের ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠেছে। ফ্ল্যাটের মালিক কথার খেলাপ করেনি। অল্প কটা দিনের মধ্যে ছিমছাম সাজিয়ে দিয়েছে। হট্টগোল থেকে সরে এসে বাপী প্রায় চব্বিশটা ঘণ্টা ঠাণ্ডা নিরিবিলির মধ্যে সেঁধিয়ে থাকল।

আরও একটা দিন গড়িয়ে গেল। দুপুরের দিকে গাড়ি হাঁকিয়ে বাপী উল্টোডাঙার সেই গুদাম ঘর দেখতে গেছল। ইতিমধ্যে সেটারও কিছু সংস্কার হবার কথা। মিস্ত্রীর কাজও অনেক। ভিতরে পার্টিশন দিয়ে গোটাকতক খুপরি করতে হবে। এদিকের কাজ

সবই এগোচ্ছে। জিত্ মালহোত্রা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করাচ্ছে। কিন্তু হাঙ্গামার চেহারা যা দাঁড়াচ্ছে, আসল কাজ কবে থেকে যে শুরু হবে বাপী ভেবে পাচ্ছে না বলে ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে।

সেন্ট্রাল এভিনিউ ধরে ফিরছিল। হাতঘড়িতে বিকেল চারটে। রাস্তাটা কেমন ফাঁকা আর থমথমে মনে হল। দূরে দূরে গলির মুখে ছোট ছোট জটলা। কিছু মিলিটারি ট্রাকেরও আনাগোনা চোখে পড়ল। গলির মুখে যারা দাঁড়িয়ে, মিলিটারি গাড়ি দেখে তারা ছুটছাট সরে যাচ্ছে। একশ চুয়াল্লিশ ধারা চলছে তখনও। হাওয়াটা তেমন সুবিধের ঠেকল না বাপীর।

সেই এয়ার অফিসের কাছাকাছি এসে গাড়ি আরও জোরে ছোটাল। কোন দুর্বলতার প্রশ্রয় দেবে না। তার অগোচরে আপনা থেকে যে অনুকূল পটভূমি গড়ে উঠেছে, খুব বুঝে-শুনে পা ফেলতে হবে সেখানে। সময় আসবে। আসবেই।

কিন্তু সময় আসারও রকমফের আছে, দশ মিনিট আগেও তা ভাবে নি। সামনে থেকে একদঙ্গল লোক হুড়মুড় করে ছুটে আসছে। অদূরে টিয়ার গ্যাসের শব্দ। ধোঁয়া। ঘন ঘন গোটাকতক বোমার আওয়াজ। হতচকিত বাপী গাড়িটা ফুটপাথের ধার ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে দিল। পুলিশের তাড়া-খাওয়া লোকগুলো অনেক দূরে দূরে গিয়ে থামল।

বাপী গাড়ি থেকে নেমে খবর সংগ্রহ করল। দক্ষিণ কলকাতায় সেই দুপুর থেকেই আগুন জ্বলছে। গুলি চলেছে। লোক মরেছে। দু-দুটো সরকারী বাস জ্বালানো হয়েছে। সেই উত্তাপ এদিকেও ছড়িয়েছে। খানিক আগেও লাঠিচার্জ হয়ে গেছে, এখন টিয়ারগ্যাস চলছে। অন্যদিক থেকে বোমাবাজী শুরু হয়েছে।

বাপী গাড়িতে এসে বসল। দু-দুটো বাস পোড়ানো হয়েছে, বাস আর চলবে না। এতটা পথ আসতে একটাও বাস চোখে পড়েছে মনে হল না। রাস্তায় এখন ট্যাক্সিও দেখছে না।

ইউ-টার্ন করে গাড়িটা ঘুরিয়ে দিল। চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে এয়ার অফিসের ফুট-পাথের গা ঘেঁষে গাড়িটা দাঁড় করালো। কাচ তুলে দিয়ে দরজা লক করে লম্বা লম্বা পা ফেলে ভিতরে ঢুকল।

বোর্ডে নাম দেখল। মালবিকা চ্যাটার্জির ঘর দোতলায়। ওপরে উঠে গেল। একজন বেয়ারাকে জিগ্যেস করতে ঘরের হদিস মিলল। অপেক্ষা করতে হল একটু। ভিতরে দ্বিতীয় কেউ আছে। মিনিট তিন-চারের মধ্যে বছর চল্লিশের একজন ফিটফাট ভদ্রলোক বেরিয়ে এলো।

সুইং ডোর ঠেলে বাপী ভিতরে ঢুকল।

মস্ত টেবিলের ওধারে কলম হাতে মিহি টাইপ করা একটা কাগজের দিকে চোখ নামিয়েছিল। মুখ তুলল।

একটা চকিত অভিব্যক্তির ঢেউ চোখের তারায় এসে স্থির হল। তারপর ঠোঁটের ফাঁকে হাসি দেখা দিল একটু। গেলবারে অসিত চ্যাটার্জিকে সঙ্গে করে হোটেলে আসার পর যে হাসি আর চাউনি দেখেছিল বাপীর মনে আছে। সেই হাসি আর চাউনিতে ওকে কিছু বোঝানোর আকূতি ছিল। এ চাউনি বা হাসি সে-রকম নয়। অনেকখানি আত্মস্থ, ব্যক্তিত্বে বাঁধা।

—বসো। সমস্ত মানুষটাকেই দেখে নিল একবার।

বাপীর পুরুষের পদক্ষেপ। এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে বসল। বলল, এই রাস্তা ধরেই আমার যাতায়াত। আজই চলেই যাচ্ছিলাম, সামনে গণ্ডগোল দেখে ফিরে এলাম। বাস পোড়ানো হয়েছে, গুলিটুলি চলছে, ট্যাক্সিও চলছে না।

শুধু ঠোঁটে নয়, চোখেও একটু হাসির ছোঁয়া লেগে আছে। মিষ্টি বলল, জানি। খবর শুনেই অনেক তাড়াতাড়ি চলে গেলেন—

বাপী জিজ্ঞাসা করল, তোমার তাড়া নেই?

ঠোঁটের আর চোখের হাসি আর একটু প্রশস্ত হল। জবাব দিল, লেগেই তো আছে, কত আর আগে আগে পালানো যায়।

বাপীও চেয়ে আছে। আলগা সহজতা নেই। বাড়তি গাম্ভীর্যও না। এই মেয়েকে দেখে কেউ বলবে না ঘরের লোকের কারণে বুকের তলায় বড় রকমের যন্ত্রণা পুষছে। বাপির ভিতরেই বরং একটা চিনচিন যন্ত্রণার অনুভূতি।...গেলবারে যা দেখেছিল তার থেকেও তরতাজা লাগছে। বয়েস যেন আরো কমেছে। সহজ ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ায় বেশ স্বাতন্ত্র্যের ছাঁদ এসেছে। পরনে ঘন ছাইরঙের সিল্কের ওপর সাদা বুটির শাড়ি, গায়ে ধপধপে সাদা ব্লাউস। ঈষৎ ঝোলানো খোঁপা।...যৌবন আপন মাধুর্যে সুস্থির। যত দিন দেখেনি, বাপী একরকম ছিল। আজ এইটুকু দেখার মধ্যেই ভিতরে একটা তোলপাড় কাণ্ড হতে থাকল। কেউ তার একেবারে নিজস্ব কাউকে ছিনিয়ে নিয়েছে। কেড়ে নিয়েছে যার ওপর আর কারো অধিকার নেই। থাকতে পারে না। কিন্তু আজ বাপী শান্ত সংযত সতর্ক। স্নায়ুগুলো সব নিজের বশে টেনে ধরে আছে। মুখ দেখে ভিতরের চেহারার আভাসও কেউ পাবে না। মাথায় যে সংকল্প এঁটে বসছে এই মুখের দিকে চেয়ে কেউ তা কল্পনা করতে পারবে না।...শেষ দেখবেই। রণে-প্রণয়ে নীতির ধার কে ধারে?

মিষ্টিই স্বল্প নীরবতার ছেদ টানল।—চা খাবে?

—খেতে পারি।

—আর কিছু?

—আর কি?

মিষ্টি হাসল।—হোটেলে লোক ধরে নিয়ে গিয়ে যে-রকম খাওয়াচ্ছ শুনলাম, সে-রকম আর এখানে কোথায় পাব?

বাপী শুনল। দেখল। খোঁচা বটে, কিন্তু বেঁধার মতো উগ্র নয়।—শুধু চা-ই বলো।

—ভাল প্যাটিস আর পেস্ট্রি খাওয়াতে পারি।

—তুমি খাবে?

—আমার দুটোর মধ্যেই হয়ে গেছে। চা খাব'খন। বেল টিপল।

—শুধু চা-ই হোক।

মিষ্টি তাকালো একবার। জোর করে আগ্রহ দেখাল না। বেয়ারা আসতে দু পেয়ালা চায়ের হুকুম করল।

বাপী নড়েচড়ে বসল একটু।—দীপুদার সঙ্গে এর মধ্যে তোমার দেখা হয়েছে বা-কথা হয়েছে তাহলে?

প্রশ্নের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা।—তাহলে কি রকম?

—দীপুদা বলেছিল, তার আগে যে লোককে হোটেলে ধরে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছি তার জন্য তুমি আমার ওপর খুব রেগে আছ আর আমার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছ। ...কিন্তু এখন এতটা রেগে আছ বলে মনে হচ্ছে না।

মিষ্টি হাসিমুখেই স্বীকার করল, এখন আর অত রাগ নেই। বলল, রাত এগারোটায় অমন অবস্থায় বাড়ি ফিরে যা-তা বকতে থাকলে কার মেজাজ ঠিক থাকে?

চোখে চোখ রেখে বাপী ঠাণ্ডা গলায় বলল, মেজাজ ঠিক না থাকলেও মালিকের মেয়েকে বিয়ে করে আমি মস্ত লোক হয়েছি আর তোমার হাজব্যাণ্ডকে মদ খাইয়ে মজা দেখছি—এমন কথা তুমি বলতে পারো ভাবিনি—এর পর এলে আমার কি করা

উচিত?

একটু থমকে খুব চাপা ঝাঁঝের সুরে মিষ্টি বলল, সে তোমার কাছে অত আসবেই বা কেন?

—সেটা তাহলে তুমিই তাকে বলে দিও।

বেয়ারা চায়ের ট্রে রেখে গেল। মিষ্টি দু পেয়ালা চা ঢেলে একটা তার দিকে এগিয়ে দিল। প্রায় তখনই চকচকে কোট প্যাণ্ট টাই পরা অল্পবয়সী একজন লোক দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। ঘরে দ্বিতীয় লোক দেখে সপ্রতিভ তৎপরতায় বলল, একস্কিউজ মি—ডিস্টারব্যান্স ভাল রকম শুরু হয়ে গেছে, মিসেস চ্যাটার্জি নো কনভেয়ান্স, একটা গাড়ি যোগাড় হয়েছে—অনেক খদ্দের, যেতে চান তো চটপট উঠতে হবে।

মুখ থেকে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে বাপী মিষ্টির দিকে চেয়ে বলল, আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।

ঈষৎ বিব্রত হাসিমুখে মিষ্টি লোকটার দিকে তাকালো।

—ও. কে। যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

চায়ের পেয়ালা শেষ হতেই বাপী বলল, চলো—

চোখে আর হাসি-ছোঁয়া-ঠোঁটে সামান্য বিড়ম্বনার অভিব্যক্তি।—গণ্ডগোলের মধ্যে তুমি আবার বাড়ি পৌঁছে দিতে যাবে...এঁদের সঙ্গে আপিসের গাড়িতেই চলে যেতে পারতাম।

তার মুখের ওপর দু চোখ আরো একটু এঁটে বসল।—ভয় পাচ্ছ?

সঙ্গে সঙ্গে বেশ স্পষ্ট প্রতিবাদ।—ভয় পেতে যাব কেন!

—গেলবারে তোমার ভদ্রলোককে নিয়ে যেদিন হোটেলে এসেছিলে, সেদিন একটু ভয়ই পেয়েছিলে মনে হয়েছিল...।

টেবিলে দু হাত, কৌতুক ছুঁয়ে আছে। চেয়েই রইল একটু। তারপর জবাব দিল. তোমার মধ্যে সারাক্ষণ সেদিন বানারজুলির চোদ্দ বছরের এক ক্ষ্যাপা ছেলেকেও দেখছিলাম...। মুখ লাল হঠাৎ। তাড়াতাড়ি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের কাগজপত্র একদিকে সরিয়ে রাখল।—চলো।

একরাশ হিংস্র লোভ গুঁড়িয়ে দিয়ে বাপীও উঠল। ঘর থেকে বেরিয়ে পাশাপাশি সিঁড়ি ধরে নামল। রাস্তায় এসে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে বাপী চাব [illegible]গিয়ে নিজের দিকে সামনের দরজা খুলে বসল। ও-ধারের দরজার লক খুলে তাকালো।

মিষ্টি গাড়িটা লক্ষ্য করেছে। উঠে পাশে বসল। নিজেই দরজাটা বন্ধ করল। গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে বাপী আবার পাশের দিকে তাকালো। ওদিকের দরজার কাঁচ তোলা। ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে কাঁচ নামিয়ে দিতে পারে। সম্ভাব্য স্পর্শমুকুর লোভ থেকেও নিজেকে ছিঁড়ে এনে বলল, কাঁচটা নামিয়ে দাও, নইলে গরম হবে।

মিষ্টি কাঁচ নামালো।

গাড়ি আবার টার্ন নিয়ে চৌরঙ্গীর দিকে ছুটল। দুজনের মাঝে আধ হাতটাক ফারাক। অনেক দিনের একটা ভুলে-যাওয়া স্পর্শ বাপীকে ছেঁকে ধরছে! ফাঁক পেলেই গায়ে হাত দিত আর হামলা করত বলে ন-দশ বছরের এই মেয়ের মুখঝামটা আর তাই নিয়ে তার অনেক ঝাঁঝের কথাগুলো মগজে আছড়ে পড়ছে। ফাঁকা রাস্তা। স্পিডও বাড়ছেই। পাশে যে বসে আছে তাকে নিয়ে এর সহস্রগুণ বেগে সমস্ত বাধা-বন্ধনের ওধারে উধাও হয়ে যাবার তাড়না। একই সঙ্গে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা। সবুর! রণে-প্রণয়ে নীতি ধার কেউ ধারে না। শেষ দেখবেই।

চৌরঙ্গীর খানিক বাদে গাড়িটা বাঁয়ের রাস্তায় ঢুকে যেতে মিষ্টি সামান্য ঘুরে

তাকালো।—এদিকে কোথায়?

—আমার ফ্ল্যাটে।

—তুমি হোটেলে নেই?

—ছিলাম। এখন নেই। একবার দেখে যাও, তোমার খুব তাড়া নেই তো?

অস্বস্তি বোধ করছে কিনা বোঝা গেল না। ছোট জবাব কানে এলো, না...।

গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে গাড়িবারান্দার নিচে গাড়িটা দাঁড় করালো। সামনেই লিফট। দুজনে উঠল।

বাপী চাবি লাগিয়ে সামনের মস্ত দরজাটা খুলে ডাকল, এসো—

গালচে বিছানো মস্ত হল। দামী সোফা-সেটি পাতা। মিষ্টি ভিতরে ঢুকতে বাইরের দরজাটা টেনে দিল। বিকেলের আলোয় সবে টান ধরেছে। বাপী তবু সুইচ টিপে লাইট জ্বালল। এত বড় ফ্ল্যাটে এখন তৃতীয় আর কেউ নেই মিষ্টি সেটা বুঝেছে। তবু তার মুখে অস্বস্তি বা উদ্বেগের ছায়া চোখে পড়ছে না। না, বাপী শয়তানকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেবে না। ক্রূর লোভে ভিতরে কেউ আছাড়িপাছাড়ি করছে টের পাচ্ছে। তবু সবুর। এটা সময় নয়। সময় আসবে। আসতেই হবে।

—বোসো।

মিষ্টি বসল না। হলের চারদিক দেখে নিল। ফ্ল্যাটের মালিক বড় বড় দেয়ালে কিছু শৌখিন ছবি টাঙিয়েছে। শিথিল পায়ে এগিয়ে গিয়ে সেগুলিও দেখল। বাপী এগিয়ে এলো। বেডরুম দুটো, ডাইনিং স্পেস কিচেন বাথও দেখালো। তারপর আবার হলের সোফায় এসে বসল। তিন হাত দূরের সোফায় মিষ্টি।

—মোটামুটি মন্দ নয়, কি বলো?

মিষ্টি হাসছে।—তোমার এখন অঢেল টাকা, তাই তোমার কাছে মোটামুটি।

সোফায় আরও একটু গা ছেড়ে দিয়ে বাপী জবাব দিল, অঢেল টাকা যে হবে সে তো তোমাকে অনেক বছর আগেই বলেছিলাম...সেই যে-বারে তুমি ভাবী বরকে ডেকে এনে আমাকে অপমান করে তাড়ালে।

মিষ্টি সোজাসুজি চেয়ে রইল খানিক। স্পষ্ট করেই বলল, অপমান করতে চাইনি, তোমাকে কিছু বোঝাতে চেয়েছিলাম। তুমি কোনদিন কিছু বোঝবার লোক নও।

বাপী আবার সোজা হয়ে বসল। দু চোখ তার মুখের ওপর। সামান্য মাথা নাড়ল।—ঠিকই বলেছ—কো-নো দিন নয়।

মিষ্টি তেমনি চেয়ে রইল। গলার ঠাণ্ডা অথচ বাড়তি জোরটুকু কান এড়াবার নয়। বাপী তক্ষুনি নিজের নাক-মুখ বেড়িয়ে কল্পিত চাবুক বসাল একটা। রণে বা প্রণয়ে কাউকে আগে থকতে সতর্ক করাও রীতি নয়। চাবুকের ঘায়ে মুখে হাসি ছড়াল।—যাক, আমার বোঝাবুঝি নিয়ে তোমার আর কি মাথাব্যথা।

মিষ্টিও হাসল।—মাথাব্যথা একটু আছে। সেই যেবারে তোমাকে অপমান করে তাড়ালাম বললে, তখন থেকে।...গেলবারে তোমাকে দেখে সেটা আরও বেড়েছিল। আমি খুব আশা করেছিলাম শেষ পর্যন্ত তোমার সেই মালিকের মেয়েই ঘরে আসবে আর তোমার পাগলামিও ছাড়বে।

জমা বারুদের গায়ে আঁচ লাগছে। সেই আঁচ তফাতে রাখার চেষ্টায় বাপী নিঃশব্দে যুঝল খানিক। ভিতরের দৈন্যদশা বুঝতে বাকি নেই, মিষ্টি তা বেশ মিষ্টি করেই জানিয়ে দিল। ঠোঁটের ফাঁকে তির্যক হাসি ছড়িয়ে বাপী মোলায়েম সুরে জিগ্যেস করল, তা হল না বলে হতাশ হয়েছ?

মাথা নেড়ে হাল্কা জোরের সঙ্গেই জবাব দিল, হবো না! সেই ছেলেবেলা থেকে তুমিই

আমার হাড় জ্বালিয়েছ—আমি কবে না তোমার ভাল চেয়েছি?

সুচারু ব্যক্তিত্বে আত্মস্থ হলেও এখন আপোসের দিক ধরেই সম্পর্কটা সহজ করে তোলার আগ্রহ স্পষ্ট। লুব্ধ দু চোখ পলকা কৌতুকে ঢেকে বাপী জিজ্ঞাসা করল, ভালো দেখছ না?

—কি ভালো—মস্ত ব্যবসা অনেক টাকা বাড়ি গাড়ি?

—আর কি চাই। একটা পয়সা ট্রামভাড়া বাড়ানো হয়েছে বলে কলকাতা রক্তে ভাসছে। যাক গে, তোমার মতে তাহলে আমার এখন কি করা উচিত?

মিষ্টির দু চোখে হাসি ছুঁয়ে আছে, কিন্তু তরল নয় আদৌ। যা বলতে চায় তার সাদা অর্থ, যা হবার হয়েই যখন গেছে তার জের টেনে আর লাভ কি বাপু—সুস্থির হও, ভালো থাকো—আর কি চাই তা নিজেই বেশ জানো। বলল না। হাত উল্টে ঘড়ি দেখল।—এখন ওঠা উচিত। ফ্ল্যাটে তো এখন পর্যন্ত লোকজন দেখলাম না, তোমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি?

—যখন যেখানে যা জোটে।

মিষ্টি তক্ষুনি হেসেই আমন্ত্রণ জানালো তাহলে আমার ওখানেই চলো, এ রাতটার মতো কি জোটে দেখা যাক—

রমণী-মুখের ওই কমনীয় ব্যক্তিত্বের উপর একটা আঁচড় বসানোর সুযোগ পেল বাপী। জবাব না দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে মিটি-মিটি হাসতে লাগল।

—কি হল?

—লোভ হচ্ছে.. সাহসে কুলোবে না'

—কেন? আর একজনের মুখে তো তোমার প্রশংসা ধরে না এখন।

কিছু বলার আগেই দুর্বল দিকটা আগলানোর চেষ্টা দেখে বাপীর মজা লাগছে। তার তাড়া নেই। টোপ আর একটু বসানো হোক। হৃষ্ট মন্তব্য করল, এখন আমার এই ভাগ্যটাও খুব ভালো, শুধু তোমার একজন কেন, দীপুদার সঙ্গে দেখা হলে তার মুখেও আমার খুব প্রশংসা শুনবে...কারণ দুজনের কাছেই আমি এখন একজন নিরীহ অথচ ধৈর্যশীল শ্রোতা।

মিষ্টির ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে যেতে লাগল। নিরীহ যে কত সেটা খুব ভালো জানে।...দাদার ছেলেবেলার আচরণের খোঁচা হলে দুজনকে টানত না। সতর্ক চাউনি তার মুখের ওপর স্থির কয়েক পলক।—দেখা হয়েছে, অনেক প্রশংসাও শুনেছি...কিন্তু হঠাৎ এ-কথা কেন, ড্রিংক করে এই একজন দাদার নামে যা-তা বলেছে বলে?

বাপী একটু শব্দ করেই হেসে উঠল।—বলাবলির কথা ছাড়ো, এ ব্যাপারে দুজনা দুজনার ওপব সমান টান—একেবারে কর্ণার্জুনের টান যাকে বলে।

ছাড়তে বললেও বলাবলিটা যে একতরফা হয়নি সেইটুকুই বুঝিয়ে দিল। মিষ্টি বুঝল। সুন্দর মুখের এই ব্যক্তিত্ব কমনীয় হলেও একটু আগেব মতো সরল নয়।—আমার ওখানে যেতে তোমার সাহসে কুলোচ্ছে না কেন...দাদা কি বলেছে?

—তোমার ভদ্রলোকের কিছু রোগের কথা।...

চাপা ঝাঁঝালো গলায় মিষ্টি জানতে চাইল, কি রোগ? জুয়া খেলে, নেশা করে?

—দিল্লির অমন ভাল চাকরিটা নিতে পারলে না বলেও তোমার দাদা খুব দুঃখ করছিল।

সব থেকে দুর্বল জায়গাটি ধরে নিঙড়ে দেওয়ার কাজ সারা। ফর্সা মুখে তপ্ত লালের আভাস ছড়িয়ে পড়েছে। অপলক দু চোখ বাপীর চোখে আটকে আছে। ঠোঁকের ফাঁকে ধারালো হাসির রেখা স্পষ্ট হতে থাকল। বলল, সবই বুঝলাম।...আমার মা বা দাদা

কখন কোন্ রাস্তায় চলে ছেলেবেলা থেকে জেনেও তাদের কথায় তোমার এখন এত ভক্তিশ্রদ্ধা কেন সেটুকু শুধু বুঝলাম না।...যে সহজ কথাটা তাদের বুঝতে অসুবিধে তা নিয়ে আমি খুব মাথা ঘামাই না বা তাদের কিছু বলিও না। কিন্তু তুমি এমন এক ধৈর্যশীল শ্রোতা বলেই তোমাকে বলতে পারি। তারা শুধু রোগ দেখছে, কিন্তু তার জোরের আসল পুঁজিটুকু তাদের চোখে পড়ছে না। সেটা মিথ্যে হলে আর কাউকে কিছু বলতে হত না, আমি নিজেই ছুটে দিতাম। জোরের এই পুঁজিটুকুতে ভেজাল নেই বলেই রোগ বরদাস্ত করতে আমার খুব অসুবিধে হচ্ছে না এটুকু তুমি অন্তত জেনে রাখতে পার।

ধীরে-সুস্থে কথাগুলো শেষ করে মিষ্টি আবার ঘড়ি দেখল। মুখ তুলে সোজাই তাকালো আবার। কঠিন আঁচড়টুকু ঠোঁটের ফাঁকে লেগে আছে এখনও।—এবারে উঠতে হচ্ছে।

জবাবটা বাপীর মগজের মধ্যে কেটে কেটে বসতে লাগল। দুর্বলতায় মোচড় পড়া সত্ত্বেও যা বলল বাপীর বুঝতে একটুও সময় লাগল না। জোরের আসল পুঁজি বলতে তার ঘরের ওই একজনের ভালবাসার পুঁজি, ভালবাসার জোর। মিষ্টির ধারণা এতে কোন ভেজাল নেই। আর, এ সম্বল যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওই রোগ বরদাস্ত করতেও অসুবিধে হবে না। অর্থাৎ ভালবাসা আছে বলেই অবস্থাগতিকে সেটুকু হারাবাব ভয়ে এই আঁকড়ে ধরে থাকার রোগ।...এও বুঝিয়ে দিল, দাদা বা মা যা-ই বলুক, এ-জন্যে আর কারও প্রত্যাশারও কিছু নেই।

সহজ সংযমের মুখোস ধরে রাখার চেষ্টায় বাপীকে যুঝতে হচ্ছে এখনো। বুকের পাতালে ফুঁসছে কেউ। গজরাচ্ছে।...সামনের দরজা বন্ধ। ফ্ল্যাটে তৃতীয় কেউ নেই। ওটা শেকল ছেঁড়ার আগে বাপী উঠে পড়ল। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল। ছিটকিনি টেনে দরজা দুটো খুলে দিয়ে ডাকল, এসো—

লিফটে নিচে নামল পাশাপাশি গাড়িতে উঠে বসল। চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে গাড়ি আবার বড় রাস্তায় পড়ে বেগে ছুটল। গণ্ডগোলের দরুণ ফুটপাথে লোক চলাচল কম। ফাঁকা রাস্তা।

মিষ্টি কোন কথা বলছে না। বাপীও চুপ। গাড়ি ছুটেছে। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার মগজও থেমে নেই। মিষ্টির কথাগুলো হিসেব করছে। আর ওজন করছে। হিসেব করছে আর ওজন করছে আর নাকচ করছে।

...ভালবাসার পুঁজি বাপী চেনে। তার জোর কত জানে। এই পুঁজি, এই জোরেব ওপর তার চিরকালের দুর্বলতা। বনমায়ার মরদ হাতির কবলে পড়ে করতে বসেছিল, তবু ওই আহত পাগলা হাতিটার প্রতি অগাধ দরদ তার। ভালবাসার বুকে দাগ বসিয়ে-ছিল বলে বনমায়ার এককালের মাহুত ভীম বাহাদুর চা-বাগানের লম্পট সাহেবের বুকে ছোরা বসিয়ে পালিয়েছিল—বাপী তখন মনে প্রাণে প্রার্থনা করেছে, ভীম বাহাদুর ধরা যেন না পড়ে।...বুকলিন পিওন রতন বনিকের মুখে সেই ভালবাসার নির্ভরতা দেখে-ছিল—বাপী নিজেকে আজও ক্ষমা করতে পারে না।...নিজের বুকের তলায় এই পুঁজি পুষেছিল বলেই প্রাণ বাঁচানো সত্ত্বেও রেশমাকে অত বড় আঘাত দিয়ে সেই চরম বিপর্যয়ের মুখ থেকে নিজেকে টেনে তুলতে পেরেছিল!...ভালবাসার নিঃশব্দ অথচ বিপুল স্রোত জঙ্গলের সাপধরা মানুষ হারমার মধ্যে দেখেছে। এই পুঁজি আর এই জোরের ওপর নির্ভর করে ঊর্মিলা বেঁচে গেল।...কোবরেজের ছেলে ছোট কবিরাজ নিশীথ সেনের মুখেও এই ভালবাসায় ছোঁয়াটুকু দেখেছিল বলেই অনায়াসে তাকে এখানকার ম্যানেজারের চেয়ারে বসিয়ে দেবার কথা ভাবতে পেরেছিল। সেই ছোঁয়া মুছে গেছে জানা মাত্র তাকে

মন থেকেই ছে'টে দিতে দ্বিধা করেনি।

...অসিত চ্যাটার্জির হাসিতে খুশিতে রাগে ক্ষোভে বা আচরণে এই পুঁজি। আর এই জোরের ছিটে-ফোঁটাও দেখতে পেলে বাপী সেটুকু অনুভব করত। বুঝতে পারত। নিজের বুকের ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে গেলেও জানতে বা চিনতে ভুল হত না।

বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া। কিন্তু শিরায় শিরায় রক্তের তাপ বাড়ছে। মিষ্টির কথাগুলো একটা চ্যালেঞ্জের মতো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে আর যন্ত্রণা ছড়াচ্ছে।

অপেক্ষাকৃত ঘন বসতির কাছাকাছি এসে পড়তে বাপী গাড়িটা হঠাৎ সামনের রাস্তার ডাইনের বাঁকে ঘুরিয়ে দিল। ওই রাস্তাটা ফাঁকা পাবে।...ঘোরার মুখে স্পিড এমনিতেই কমাতে হয়েছে। হঠাৎ রাস্তার ও-ধারে ল্যাম্প-পোস্টের দিকে চোখ যেতেই ব্রেকে চাপ পড়ল। বাপী বিমূঢ়, নিস্পন্দ হঠাৎ।

ল্যাম্প-পোস্টের একটু তফাতে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। গাড়িটা প্রায় থেমে যেতে সপ্রতিভ তৎপরতায় রাস্তায় নেমে দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে এলো। তার পরেই আচমকা ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো বিষম একটা ঝাঁকুনি খেয়ে মেয়েটা ছিটকে ঘুরে আবার ফুটপাথে উঠে সামনের অন্ধকারের দিকে হনহন করে হে'টে চলল।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটল পনের সেকেণ্ডের মধ্যে। গাড়িটা এভাবে থামতে মিষ্টি প্রথম মুখ ঘুরিয়ে বাপীর দিকে তাকালো। তারপর তার হতচকিত দৃষ্টি অনুসরণ করে রাস্তার দিকে। মুখ দেখা গেল না, মেয়েটির ততক্ষণে ও-দিক ফিরে পালানোর তাড়া। কিন্তু মিষ্টির পাশের লোক গাড়ি চালানো ভুলে সেদিকে চেয়েই আছে।

—কি ব্যাপার, মহিলাকে চেনো নাকি?

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। বাপী মাথা নাড়ল। চেনে।

—ওভাবে পালিয়ে গেল কেন...আমাকে দেখে?

—হয়ত আমাকে দেখেই। তোমাকে দেখলে এগোতই না।

যাকে চেনে তাকে দেখেই অমন ত্রস্তে পালিয়ে গেল শুনে মিষ্টি অবাকই একটু। বলল, কিছু না পেয়ে লিফটের আশায় দাঁড়িয়ে ছিল হয়ত, ডেকে তুলে নিলে না কেন?

বাপীর দু চোখ সামনের দিকে। জবাব দিল, লিফটের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল না।

—তাহলে কি জন্য?

—আমার জন্য...যে কোন একটি পুরুষের জন্য...।

জবাবটা দিয়ে বাপী এবারে আড়চোখে তার মুখখানা লক্ষ্য করল। মিষ্টি স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকেই দেখছে। ওদের মনোহরপুকুরের বাড়ী বাপী চেনে না। সেই রাস্তায় এসে মিষ্টি একবার বাঁয়ে যেতে বলল একবার ডাইনে। তারপর আঙুল তুলে ছোট একটা একতলা দালান দেখিয়ে দিল।

গাড়ি থামতে মিষ্টি একাই নামল। তারপর দ্বিধা কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আসবে না?

—আজ না।

বেগে গাড়ি চালিয়ে পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে বাপী আবার সেই রাস্তায় চলে এলো। যেখানে তাকে দেখে এক মেয়ে ত্রস্ত হরিণীর মতো অন্ধকারে সেঁধিয়ে গেছে। বাপী আশপাশের রাস্তাগুলোতে চক্কর খেল খানিক। অন্ধকার ফুঁড়ে দেখতে চেষ্টা করল।

নেই।

মাস্টারমশাই ললিত ভড়ের মেয়ে কুমু। কুমকুম। কলকাতায় আসার বড় সাধ ছিল। আসতে পেরেছে।

কিন্তু কলকাতায় আসার সাধ কেমন মিটেছে নিজের চোখে দেখেও বাপী তাকে

খুঁজছে কেন? অস্ফুট একটা ইতর গালাগালে নিজেকে বিদ্ধ করে ফেরার রাস্তায় গাড়ি ছোটাল।

॥ তেরো ॥

মাঠের ধার ঘেঁষে ফাঁকা রাস্তা ধরে আসছিল। মাইলখানেকের মধ্যে ব্রেকে আপনা থেকে চাপ পড়ল আবার। রাস্তার পাশে মাঠের আবছা অন্ধকার ধরে একজন হনহন করে হেঁটে চলেছে।...মেয়ে।

বাপী হেড লাইট জ্বালল। সেই মেয়ে।

মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে কুমকুম।

জোরালো হেড লাইটের ধাক্কায় দাঁড়িয়ে গেল। চোখে মুখে কয়েক মুহূর্তের চকিত প্রত্যাশা। তার পরেই কাঠ একেবারে।

গাড়িটা নিঃশব্দে পাশে এসে থামল। হেড লাইট নিভিয়ে বাপী নেমে এলো। মুখো-মুখি দাঁড়াল। পরনে ক্যাটকেটে গোলাপী শাড়ি। গায়ে সস্তা সিল্কের সাদা ব্লাউস। পায়ে লাল স্ট্রাইপ স্যাণ্ডাল। ঠোঁট লাল, গাল লাল। নাকে ঝকঝকে সাদা পাথরের ফুল। বানারজুলিতে চা-বাগানের ক্লাবে জেল্লা ঠিকরনো এই সাদা ফুলটা দেখেছিল। কপালে কালো টিপ।

বাপী বেশ ধীরেসুস্থে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল। রাতের কলকাতায় শিকারে বেরিয়েছিল যে মেয়ে সে নিজেই হঠাৎ এক নির্মম শিকারীর জালে আটকে গেছে। সম্ভব হলে এখনো সত্রাসে ছুটে পালানোর ইচ্ছে, কিন্তু পা দুটো যেন মাটিতে গেঁথে গেছে। অসহায় বড় বড় দু' চোখ মেলে সে চেয়ে আছে।

অকরুণ গাম্ভীর্যে বাপী দেখেছেই। ওই চোখ-তাতানো প্রসাধন ধুয়ে মুছে ফেললে মুখখানা এখনো মন্দ সুশ্রী নয়। লম্বা আর ফর্সা বলে আগে বেশ স্মার্টই দেখাতো। ডাটাবাবুর ক্লাবে ব্রিজমোহনের সঙ্গিনী হিসেবে যেমন দেখেছিল, চার বছর বাদে বাগডোগরার এয়ার পোর্টের লাউঞ্জে তার থেকেও বেশি সুন্দর দেখেছিল। সেই চেকনাইয়ে টান ধরেছে। শুকনো মুখ, চোখের কোলে কালি। তবু কলকাতার রাস্তায় এই যৌবনের পসরা নিয়ে দাঁড়ালে খদ্দের না জোটার কথা নয়। আজ চারিদিকের গণ্ডগোলের দরুন রসিক হায়নারা সব গর্তে বোধ হয়।

কিন্তু বাপী এখন কি করবে? মিষ্টিকে ছেড়ে এসে আবার এই পথে এসেছিল কেন? খুঁজছিল কেন? এখন...? ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে যে পশুটা এতক্ষণ ধরে ফুঁসছিল আর গজরাচ্ছিল তাকে ছেড়ে দেবে?...একবার ছেড়ে দিয়েছিল। এই দিনের মতোই এক সব-খোয়ানো আক্রোশের মুখে রাতের অন্ধকারে কমলা বনিক সেধে তার খুপরি ঘরে এসেছিল। ...পরপর তিন রাত এসেছিল। কিন্তু সেই অকরুণ উল্লাসের মুহূর্তে কমলা বনিকের অস্তিত্বও ছিল না। চেতনার মুগুর মাথায় এসে না পড়া পর্যন্ত আর একজন সেই জায়গায় জুড়ে ছিল। খানিক আগে তার লোলুপ গ্রাস থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে যে গাড়ি থেকে নেমে গেল—সেই মেয়ে। আজও এই একজনকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারে। তারপর কামনার অন্ধকার গহ্বরে আছড়ে ফেলে তারও অস্তিত্ব মুছে দিয়ে সে জায়গায় অনায়াসে সেই মেয়েকেই বাসনার নরকে টেনে আনতে পারে। বিস্মৃতির শেষে কদর্য বাস্তবে ফেরার পরেও এবারে কোনো বিবেকের মুগুর মাথায় এসে পড়বে না।

চাপা আগুনের হলকা বেরুলো গলা দিয়ে।—কেমন কলকাতা দেখছ?

কুমকুম জবাব দিল না। কাতর চোখে চেয়ে রইল। মুখে ভয়ের ছায়া ঘন হয়ে উঠছে আরো। সামনে যে দাঁড়িয়ে সে বুঝি মেরেই বসবে তাকে।

গলা দিয়ে আর এক প্রস্থ আগুন ঝরল বাপীর।—অত ভয় পাচ্ছ কেন...এ-রকম খদ্দের পছন্দ হচ্ছে না?

ভীত ত্রস্ত চাউনিটা এবারে মুখের ওপর স্থির হল একটু। বাপী অভিনয় দেখছে হয়তো। মুখে কিছু যন্ত্রণার রেখা টেনে আনার চেষ্টা দেখছে। গলার স্বরও ফুটল এবার।—বাপীদা বিশ্বাস করো, ওটা তোমার গাড়ি ভাবতে পারি নি, তাহলে এগোতাম না।...তোমার সঙ্গে যে ছিল তার কাছে হয়তো তুমি অপ্রস্তুত হয়েছ, কিছু রোজগারের তাগিদে মাথা এত খারাপ হয়েছিল যে তাকেও আমি লক্ষ্য করি নি। আমাকে ধরে মারো বাপীদা, তুমি আমাকে বাঁচার রাস্তায় টেনে নিতে চেয়েছিলে, বাবার জন্য পাগল হয়ে আমি তাও—

—চোপ! কথা শেষ হবার আগেই বাপীর মাথায় বিপরীত আগুন জ্বলে উঠল। দুটো হাতের থাবা তার দুই কাঁধে উঠে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে গোটা কতক প্রবল ঝাঁকুনি। —বাবার জন্যে? বাবার জন্য পাগল হয়ে তুমি এই নরকে চলে এসেছ? এখনো এই নাম মুখে?

মেয়েটার চোখে মুখে আর্ত বিস্ময়। তারপর মুক্তি।—তুমি বিশ্বাস করো বাপীদা— শুধু বাবার জন্য, আমি জানতাম বাবা কলকাতায় আছে, সেই এয়ার পোর্টে তোমাকে বলেছিলাম, তুমি তখনো বিশ্বাস করো নি—আমি এসে পড়তে পেরেছিলাম বলেই বাবা এখনো বেঁচে আছে—

বাপীর হাতের থাবা দুটো আপনা থেকেই শিথিল হল। নেমে এলো। কিন্তু দু' চোখের অবিশ্বাস তারপরেও ওই মুখে বিঁধে আছে।—তোমার বাবা এখন কোথায়?

—আমার কাছে...ঘরে...

—কার ঘর? কোথায় ঘর?

—এণ্টালির কাছাকাছি...ঘর বলতে ভাঙা টালির ঘর। ভয় গিয়ে দু'চোখে হঠাৎ বুভুক্ষ আশার আলো জ্বলে উঠল।—বাবা আর বেশি দিন বাঁচবে না বাপীদা, তুমি একবারটি এসে তাকে দেখে যাবে? গেলে দেখবে, আমি ফিরলে কিছু খেতে পাবে এই আশায় বসে আছে আর ছটফট করছে। তোমাকে দেখলে চিনতে পারবে না, কাউকে চিনতে পারে না...তবু আসবে একবারটি?

আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বাপী ওই মুখ ফালা ফালা করে দেখে নিচ্ছে। প্রাণের দায়ে এমন অভিনয়ও কারো দ্বারা সম্ভব? এ-রকম গাড়ির মালিক যাবে না বা যেতে পারে না ধরে নিয়ে করুণা উদ্রেক করে কিছু পাওয়ার চেষ্টা? কিন্তু এই দুটো চোখকে এত বড় ফাঁকিও কেউ দিতে পারে ভাবা যাচ্ছে না বলেই অস্বস্তি।

—এসো।

বাঁ-দিকের সামনের দরজাটা খুলে দিতে গিয়েও থমকালো। নিজের ভিতর থেকেই বাধা পড়ল। তার পাশে এই সীটে এতক্ষণ মিষ্টি বসে ছিল। পিছনের দরজাটা খুলে দিল।

কুমকুম তক্ষুনি উঠে বসল। বাপীর অস্বস্তি আরো বাড়ল। ওই মুখে এখনো ছলনা দেখছে না। ভয় দেখছে না। ক্ষুধার্ত আশা দেখছে আকুতি দেখছে। বাপীর অস্বস্তি বাড়ছেই।

নির্জন রাস্তায় গাড়ি ছুটছে। বাপী সামনে। পিছনে কুমকুম। বাপী এখনো আশা করছে কোনো অজুহাতে কুমকুম গাড়ি থামাতে বলবে। নেমে যেতে চাইবে। ভিতরে যে

কাটা-ছেঁড়া শুরু হয়েছে সেটা থামবে তাহলে। গাড়ি থামিয়ে বাপী তক্ষুনি ওকে নেমে যাওয়ার সুযোগ দেবে। এমন কি পকেটে যা আছে তাও ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। এমন নিষ্ঠুর বাস্তব থেকে ছলনা বরদাস্ত করাও সহজ।

দু' মাইল রাস্তা পেরিয়ে গাড়ি ধর্মতলায় এসে পড়ল। পিছনে কেউ আছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। ঘাড় সরিয়ে রিয়ারভিউ গ্লাসে দেখতে চেষ্টা করল। তেমনি আশা ঠিকরনো অপলক দুটো চোখের ধাক্কায় বাপী মাথা সরিয়ে নিল। সামনে চোখ রেখে জিগ্যেস করল, মাস্টারমশাই কলকাতায় আছেন তুমি জানলে কি করে?

পিছনে যে বসে তার গলার স্বরে এতটুকু উচ্ছ্বাস নেই। কি করে জেনেছে বাপী শুনল। শিলিগুড়িতে একটি বাঙালী ছেলের সঙ্গে খাতির হয়েছিল। সরকারী কাজে মাঝে মাঝে তাকে কলকাতা যাতায়াত করতে হত। কুমকুমকে সে চা-বাগানের এক নেশাখোর অত্যাচারী অফিসারের শিক্ষিতা বউ বলে জানত। খাতির কদর পেতে হলে এ-রকম মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হয়। কথায় কথায় কুমকুম একদিন তার আর্টিস্ট বাবার কিছু গল্প করেছিল। তার দু'দিন আগে সেই লোক কলকাতা থেকে ফিরেছে। বাবা আর্টিস্ট শুনে সে-ও কলকাতায় সদ্য দেখা ফুটপাথের এক তাজ্জব আর্টিস্টের কথা বলল। লোকটা বোধ হয় বদ্ধ পাগল। চুল-দাড়ির জঙ্গলের ভিতরে মুখের সামান্যই দেখা যায়, তবু দেখলে ভয় করে। ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক-আশাকও তেমনি। খোলা ফুটপাথে বসে থাকে, আর যখন খেয়াল হয়, মস্ত একটা খড়ির ডেলা নিয়ে ফুটপাথে নানা রকমের ছবি আঁকতে থাকে। ফুটপাথের দশ-পনের হাত জুড়ে বড় বড় ছবি। সে-সব এত সুন্দর আর এত পরিষ্কার যে রাস্তার লোক ভিড় করে দেখতে দাঁড়িয়ে যায়। সেই সব তকতকে খাবারের ছবি দেখে লোকটার খিদে পেয়েছে ভেবে কেউ কেউ পয়সাও ছুঁড়ে দেয়। কিন্তু লোকটা যখন মুখের দিকে তাকায় তখন ভয়ে ভয়ে তাকে সরে দাঁড়াতে হয়।

শোনামাত্র কুমকুম বুঝেছিল তার বাবা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। সেই থেকে তার কলকাতায় আসার তাড়না। সেই বাঙালী ছেলেকেই কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্য ধরেছিল। সে কথাও দিয়েছিল পরের বারে যখন যাবে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার আগেই সে জেনে ফেলল ও চা-বাগানের কোনো অফিসারের শিক্ষিতা বউ-টউ কিছু নয়। যাদের ভোগের দাসী ছিল তাঁদেরই কেউ বলে দিয়ে থাকবে। তাই তার নেশা ছুটে গেল আর তাড়িয়েও দিল। তার পরেও কলকাতায় আসার জন্য পাগলের মতো হয়ে উঠেছিল। ট্রেনে চেপে একলাই কলকাতায় চলে আসতে পারত, কিন্তু সাহসে কুলোয় নি। এ-সব জায়গার মানুষই হাঙর এক-একটা, অসহায় একলা মেয়ে দেখলে কলকাতার মানুষ ওকে জ্যান্ত ছিঁড়ে খাবে, তারপর রাস্তায় ফেলে দেবে সেই ভয়। কলকাতা থেকে পালিয়ে আসা দুই একটা মেয়ের মুখে কলকাতার মানুষদের যে গল্প শুনেছে, তাতে বুকের রক্ত আগেই হিম হয়ে ছিল। কিন্তু অনেকে আশা দেওয়া সত্ত্বেও লোক আর শেষ পর্যন্ত জুটলই না। মরীয়া হয়ে শেষে একলাই কলকাতায় চলে এলো। কলকাতার হায়নারা যে দিনে-দুপুরে স্টেশনে রাস্তায় ওঁৎ পেতে থাকে জানত না। বাইরের গৃহস্থঘরের বউ অজানা অচেনা জায়গায় এসে পড়েছে বুঝে নিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যেই একজন তাকে আশ্রয়ের আশ্বাস দিয়ে তুলে নিয়ে গেল—

বাপীর এই বিবরণ শোনার ইচ্ছে আর নেই। বলল, এ-সব কথা থাক, কলকাতায় এসেই তুমি মাস্টারমশায়ের দেখা পেয়ে গেলে?

—যেখানে গিয়ে পড়েছিলুম, এক মাসের মধ্যে সেখান থেকে বেরুতে পারি নি। শেষে সেখানকার সর্বেসর্বা মাসি যখন বুঝল কোথাও পালাবার মতো আশ্রয় আর নেই, তখন কড়াকড়ি গেল। সেই বাঙালী লোকটা বাবাকে কোন্ রাস্তার ফুটপাথে দেখেছিল

জানতাম। সেই এলাকা ধরে খোঁজাখুঁজি করতে এক জায়গায় পেয়ে গেলাম। কি যে দেখলাম, আর দেখা না হলেই ভালো ছিল বাপীদা।

আশ্চর্য! এই মেয়ের এখনো চোখে জল আসে, কান্নায় গলা বুজে যায়। সেই পাওয়ার চিত্রটাও বাপী শুনল। এক জায়গায় অনেক লোক ভিড় করে আছে। তাদের মুখ দেখেই বোঝা গেছে সেখানে অশুভ কিছু হয়েছে। কাছে গিয়ে কুমু যা দেখল, বুক শুকিয়ে কাঠ। ফুটপাথে সারি সারি আঁকা খাবারের ওপর মুখ থুবড়ে পাগলের মতো একটা লোক পড়ে আছে। প্রাণ আছে কি নেই বোঝা যায় না। মুখের ওপর মাছি ভন ভন করছে। রাস্তার লোকেরাই কর্পোরেশানের গাড়ি ডেকেছিল। একটু বাদে সেই গাড়ি ফুটপাথের আর্টিস্টকে তুলে নিয়ে গেল। তাদের হাতে পায়ে ধরে কুমকুমও সঙ্গে গেল। চার-পাঁচ দিন বাদে বাবাকে তারা ছেড়ে ছিল। কুমকুমকে বলল, করার কিছুই নেই, শিগগীরই মরে যাবে—যে ক'দিন টেঁকে ভালো মন্দ খেতে দাও।

এই বোঝা দেখে ওদের মুরুব্বী মাসি শুধু ওকে ছেড়ে দিল না দয়া করে মাসে চার টাকা ভাড়ায় একটা ঘরও যোগাড় করে দিল। আজ দেড় মাসের ওপর হয়ে গেল, বাবা এখনো বেঁচেই আছে। ওকেও সব সময় চিনতে পারে না—খুব যখন খিদে পায় তখন চিনতে পারে।

বাপী এবার কি করবে। গাড়ি থামিয়ে কুমকুমকে টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় নামিয়ে দেবে? তারপর পকেটে যা আছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজে পালিয়ে বাঁচবে?

কুমকুমের নিশানা মতো গাড়ি বড়রাস্তা ছেড়ে দু তিনটে আঁকা বাঁকা গলি পেরিয়ে একেবারে এ টি ঘুটঘুটি অন্ধকার সরু গলির মুখে এসে দাঁড়াল। ওখানে গাড়ি ঢুকবে না। ওই গলির মধ্যে ঘর।

গাড়ি লক করে, অন্ধকারে পায়ে পায়ে ঠোক্কর খেতে খেতে কুমকুমের পিছনে একটা টালির খুপরির সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরে টিমটিম হারিকেন জ্বলছে। মেঝেতে হাড় চামড়া সার একটা বুড়ী বসে। তার সামনে দড়ির খাটিয়ায় আর একটা লোক আধ বসা। পায়ে মোটা শতেক ফুটোর কম্বল, শনের মতো চুল দাড়ির বোঝা পিঠ আর বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। কাঠামো দেখে এখনো বোঝা যায় এককালে বেশ লম্বা চওড়া ছিল মানুষটা। হারিকেনের অল্প আলোয় ঘরে তাকাতে সমস্ত শরীর শির্‌শির্ করে উঠল বাপীর।

কুমকুমের অনুপস্থিতিতে বুড়ীটার হয়তো তাকে আগলানোর ভার। হাতে ভর করে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ালো। মাছের মতো ঘোলাটে দুই চোখ একবার বাপীর মুখের ওপর বুলিয়ে কুমকুমের দিকে চেয়ে খনখনে চাপা গলায় বলে উঠল একটামাত্র ঘরে আবার কাকে এনে হাজির করলি আমি এখন আমার ঘরে একটু না শুয়ে পারব না—

বাপীর দু'কান গরম। আরো চাপা গলায় কুমকুম তাকে ধমকে উঠল আঃ! তুমি তোমার ঘরে চলে যাও!

খাটিয়ার দিকে এগিয়ে স্বর চড়িয়ে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল বাবা—কে এসেছে তোমাকে দেখতে, চিনতে পারছ? তোমার সেই আদরের ছাত্র বাপীদা—জলপাইগুড়িতে আমাদের বাড়িতে আসত—পরে অনেক দিন তোমরা একসঙ্গে সেই বাড়িতে ছিলে—মনে আছে? চিনতে পারছ?

গর্তের ভেতর থেকে দুটো চোখ বাপীর দিকে ঘুরল। দৃষ্টি নয় মুখের ওপর একটা অস্বাভাবিক ক্ষুধার্ত ঝাপটা এসে লাগল। বেশিক্ষণ চেয়ে থাকলে বাপীকেই মুখ ফেরাতে হত। একটু বাদেই সেই দৃষ্টি মেয়ের দিকে ঘুরল। ক্রুদ্ধ ফ্যাসফেসে গলায় ধমকে উঠলেন, কাকে চিনব—তুই কে?

মেয়ে নির্ভয়ে আরো কাছে গিয়ে জট-বোঝাই মাথায় হাত রাখল।—এই দেখো, এর মধ্যে নিজের মেয়েকেও ভুলে গেলে? আমি কুমু! চিনেছ?

চিনলেন হয়তো। কারণ রাগে আরো বেশি গরগর করতে করতে বললেন, খিদের নাড়ি জ্বলছে ও এলো এখন আমাকে লোক চেনাতে—কি খেতে দিবি?

বাবার মাথার ওপর থেকে হাতটা খসে পড়ল। বিব্রত, বিবর্ণ মুখ। এই যোগাযোগের উত্তেজনায় ঘরে ফেরার আসল সমস্যা ভুলে গেছিল। হালছাড়া অসহায় চোখে বাপীর দিকে তাকালো।

চোখের কোণ দুটো অদ্ভুত দাপাদাপি করছে বাপীর। সামান্য মাথা নড়ে ওকে কাছে ডাকল। পকেট থেকে পার্স বার করে তিনটে দশ টাকার নোট তার হাতে দিল। বিড়বিড় করে বলল, আমি এদিকের কিছু চিনি না, তুমি নিয়ে এসো...আমি অপেক্ষা করছি।

তিরিশ টাকা হাতে পেয়ে কুমকুমের দ্বিধা। অস্ফুট স্বরে বলল, এত কি হবে...

এবারে বাপীরও ধমকে উঠতে ইচ্ছে করল তাকে। তাড়াতাড়ি খাটিয়ার দিকে ফিরে কুমকুম বলল, এক্ষুনি তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করছি বাবা—তুমি ঠাণ্ডা হয়ে থাকো—

চোখের পলকে বাইরের অন্ধকারে মিশে গেল। ললিত ভড় গায়ের কম্বলটা ভালো করে টেনে সোজা সামনের দিকে চেয়ে আবার আধ শোয়া হলেন। হয়তো কথা বলার মেজাজ বা অভিরুচি নেই। হয়তো বা ঘরে আর কেউ আছে ভুলেই গেছেন।

ভদ্রলোক গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে আছেন, বাপী দোরগড়ায় দাঁড়িয়ে দরদর করে ঘামছে। শার্টের তলায় গেঞ্জিটা সপসপে ভিজে। গুমোটে দম বন্ধ হয়ে আসছে। ঘরের এই বাতাস শ্বাস-যন্ত্রটা টানতে পারছে না। বুকের ভিতরেও একটা চাপা যন্ত্রণা। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওই খাটিয়ার দিকে চেয়ে আছে। মানুষের বেঁচে থাকার ও কি দুর্জয় শক্তি—দেখছে। নিজেদের খাওয়া জোটে না, তবু এই লোক স্ত্রীর বাক্স থেকে দশ টাকা চুরি করে দুর্ভিক্ষের ফাণ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিল।...জেল থেকে ফিরে আসার পর বাপী তাঁর সঙ্গে তাঁরই ঘরে দেড় মাস কাটিয়েছিল। তখন নিজে হাতে ওকে রান্না শিখিয়েছে, যোগব্যায়াম শিখিয়েছে। তিলে তিলে ক্ষয় হয়েছে তবু কারো বিরুদ্ধে একটা অভিযোগের কথা শোনে নি। একমাত্র অভিযোগ ছিল শাসন-যন্ত্রের বিরুদ্ধে, আর মানুষের বে-সামাল লোভের বিরুদ্ধে।

বাপীর এখনো ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে এখান থেকে। সব-কিছু দুঃস্বপ্ন ভাবার মতো অনেক দূরে কোথাও। পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে আছে তাই পারছে না। সারি সারি সেই সব স্মৃতির মিছিলে আগুন ধরিয়ে ছাই করে দিতেও পারছে না।

কুমু ফিরে এলো। হাতে বড় একটা শালপাতার ঠোঙা আর একটা মাঝারি সাইজের ভাঁড়। দরজার কাছে আবছা অন্ধকারে বাপীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকালো একটু। তারপর ত্রস্তে ঘরে ঢুকে গেল। ঘরের কোণে ঠোঙা আর ভাঁড় রেখে বাবার খাটিয়ার পায়ের দিক থেকে বিবর্ণ তেলচিটে একটা মোড়া এনে বাপীর সামনে পেতে দিল। এ-রকম ভুলের অপরাধটুকু শুধু চোখেই ব্যক্ত করল, মুখে কিছু বলল না।

বাপী আপাতত স্থানকাল ভুলেছে। ওকেই একটু খুশি করার তাগিদে মোড়াটা দরজার কাছে টেনে নিয়ে বসল। একটা কলাই-করা বাসনে কুমু বাবার খাবার সাজালো। কচুরি তরকারি ডাল। থালাটা বাবার সামনে ধরে বলল, খেয়ে নাও।

খাওয়ার নামে শোয়া থেকে তড়াক করে উঠে বসলেন মানুষটা। গায়ের কম্বল খসে পড়ল। ব্যগ্র দু'হাত বাড়িয়ে মেয়ের হাত থেকে থালাটা ছিনিয়ে নিলেন। ঝুঁকে দেখলেন কি দেওয়া হয়েছে। দাড়ির খানিকটা খাবারের ওপর এসে পড়ল।

সেই খাওয়া দেখেও মাথাটা ঝিমঝিম করছে বাপীর। আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে কুমকুম

ইচ্ছে করেই ও-দিক ফিরে আছে। খেতে খেতে ললিত ভড় একবার মুখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালেন, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বাপীর দিকে। খাওয়ার আনন্দে গর্তের দু'চোখ জবলজবল করছে।

বাপী পাথরের মূর্তির মতো বসে।...শহরের হাঙ্গামার রাতেও মেয়ে এই বাপকে ফেলে চার-পাঁচ পথ হেঁটে খদ্দের ধরতে গেছিল। কারো মত্ত ভোগের মাশুল আদায় হলে তবে বাবার খাবার আসবে। সেই খদ্দেরও আজ জোটে নি। বাপীর সঙ্গে আজ দেখা না হলে জঠরের এই খিদে নিয়ে মানুষটার রাত ভোর হত।

থালা খালি। কুমু জিজ্ঞাসা করল, আর দেব?

ব্যগ্র দু'চোখ মেয়ের মুখের ওপর। কিন্তু একটু বাদে তাঁর গলার স্বরে হঠাৎ জল-পাইগুড়ির সেই মানুষটাকেই সামনে দেখল বাপী।—তোমাদের আছে?

—অনেক আছে। কুমু আর দুটো কচুরি আর একটু তরকারী তাঁর থালায় এনে দিল। বলল, বেশি সহ্য হবে না, এর পর মিষ্টি আছে।

'মিষ্টি' শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাপীর চোখের সামনে হঠাৎ মিষ্টির মুখ। কিন্তু ও চেয়ে আছে ললিত ভড়ের দিকে। 'মিষ্টি' শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের ভাষাও অবর্ণনীয়। দুই-ই লোভ। কত তফাৎ অথচ কত অমোঘ।

খাওয়া হতে কুমু নিজের হাতে তাকে জল খাওয়ালো। দাড়ি-ভর্তি মুখ মুছিয়ে দিল। একটা গুমরনো যন্ত্রণায় বাপীর শব্দ করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। দুনিয়ার লোককে চিৎকার করে ডেকে বলতে ইচ্ছে করল, একটা ঘৃণ্য অসতী মেয়ে দেখে যাও তোমরা।

জলের গেলাস হাতে ভিতরের একটা চাপা তাগিদে কুমকুম বলে উঠল, এবারে বাপীদাকে একটু ভালো করে দেখো বাবা—চিনতে চেষ্টা করো—জলপাইগুড়ি থাকতে কত ভাল-বাসতে বাপীদাকে তুমি—বাপীদাই তো আজ তোমাকে খাওয়ালো।

জবাবে ঘাড় ফিরিয়ে ললিত ভড় একবার দেখলেন। কোটরগত দু'চোখের একটা ঝাপটা মেরে ঘর থেকে বিদায় করতে চাইলেন ওকে। তারপর আবার মেয়ের দিকে ফিরে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, দূর হ', দূর হ', এখান থেকে—আমি কাউকে চিনি না, কাউকে চিনতে চাই না—তুই আসিস কেন এখানে? কি চাস? আমাকে খাবি? খাবি? খাবি?

মোড়া ছেড়ে বাপী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। গাড়িতে কুমকুম বাড়িয়ে বলেনি। পেট ভরেছে। এখন তাঁর চোখে নিজের মেয়েও অচেনা।

চোখের ইশারায় ওকে ডেকে বাপী বাইরে চলে এলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের টিমটিমে হারিকেনটা তুলে নিয়ে কুমু তক্ষুনি এগিয়ে এলো। ঘর এখন অন্ধকার কিন্তু সেজন্য ভিতরের মানুষের কোন রকম আপত্তির আভাস পেল না বাপী।

নিজের পকেটে হাত ঢোকালো। কিন্তু আশপাশের খুপরিগুলো থেকে কারো উঁকি-ঝুঁকি দেবার সম্ভাবনা মনে আসতে তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিল। আগে গলির বাইরে আসার তাড়া। অস্ফুট স্বরে বলল, এসো আমার সঙ্গে—

গলির মুখে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পার্স থেকে দু'টো একশ' টাকার নোট বার করে বলল, এই টাকা এখন তোমার কাছে রাখো—

একসঙ্গে দু'শ টাকা মেয়েটার কাছে অভাবনীয় ব্যাপার কিছু। হাত বাড়ালো না। শুধু চেয়ে রইল। ঠোঁট দুটো কাঁপছে অল্প অল্প।

অসহিষ্ণু বিরক্তিতে বাপী ধমকের সুরে বলল, ধরো। ওর এক হাতে হারিকেন। অন্য হাত তুলে বাপী নিজেই টাকাটা ধরিয়ে দিল। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে শাসনের সুরে হুকুম করল, বাবাকে ফেলে আর তুমি ঘর ছেড়ে বেরুবে না...আমি কাল ঠিক কখন

আসতে পারব বলতে পারছি না।

গাড়িতে উঠল। স্টার্ট দিয়ে চোখের পলকে বেরিয়ে গেল। মাথার মধ্যে একটা চিন্তাই খচখচ করছে। সে না হয় ফ্ল্যাটে গিয়েই মাথার ওপর শাওয়ার খুলে দিয়ে গা জুড়বে। এখানে যাদের দেখে গেল তারা কি করবে।

পরদিন জিত্ মালহোত্রা একটু সকাল-সকাল এসে হাজির। সহরে কখন আবার হাঙ্গামা বেধে যায় ঠিক নেই। আগে এসে যতটা সম্ভব কাজ সারার তাগিদ। বাপীও তার প্রতীক্ষায় ছিল। দেরাজ খুলে একগোছা টাকা বার করে পকেটে পুরল। তারপর ওকে সঙ্গে করে নিচে নেমে গাড়িতে উঠল।

এণ্টালি এলাকারই ভদ্র জায়গায় মোটামুটি পছন্দসই একটা ফ্ল্যাট ঠিক করতে ঘণ্টা আড়াই সময় লেগে গেল। একতলায় ছোট-বড় ছিমছাম দুটো ঘর। বাড়িঅলা দোতলায় থাকে। আলাদা ব্যবস্থা। মাসে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া, ছ'মাসের ভাড়া আগাম। টাকা গুনে দিয়ে আর রসিদ নিয়ে বাপী বাড়িঅলাকে জানালো, আজই ঘণ্টা-কতকের মধ্যে থাকার লোক এসে যাবে, এর মধ্যে একটু ঝাড়ামোছা করিয়ে রাখতে পারলে ভালো হয়।

জিত্‌তে সেখানে রেখে এর পর কাছাকাছির একটা ফার্নিচারের দোকানে ঢুকল। ম্যাট্রেসসুদ্ধ রেডি-মেড ছোট ছোট দুটো খাট কিনল। একটা ড্রেসিং টেবিল আর আলনাও। ঠিকানা লিখে কুলি দিয়ে সেগুলো পাঠানোর ব্যবস্থা করে সেখান থেকে সাইন বোর্ড দেখে দেখে একটা বেডিং স্টোরস-এ ঢুকল। বিছানা বালিশ তোষক চাদর ওয়াড় সব এক জায়গাতেই পেয়ে গেল। সে-সবও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জায়গায় পৌঁছুনোর নির্দেশ দিয়ে বড় রকমের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

অভ্যস্ত না হলেও পকেটে টাকার জোর থাকলে কলকাতা শহরে কযেক ঘণ্টার মধ্যে জিনিসপত্র যোগাড় করে দুটো ঘর বাসযোগ্য করে তোলা খুব কঠিন কিছু নয়। বাপীও পেরেছে। কিন্তু ভিতরের তৃপ্তিটুকুর স্বাদ আলাদা। জিত্ মালহোত্রা মুখ বুজে তাকে সাহায্য করেছে। মালিকটির মেজাজ জানে বলেই এতক্ষণ একটি কথাও জিজ্ঞাসা করে নি। এমন কে আসছে এখানে যার জন্য মনিবের এত দরদ, সে কৌতূহল ছিলই' বেলা প্রায় একটার সময় বাপী তাকে ছুটি দিয়ে চলে যেতে বলতে জিজ্ঞাসা করল, কে আসছেন এখানে...আপনারজন কেউ?

বাপী গম্ভীর। বুড়ো আঙুলটা নিজের বুকে ছুঁইয়ে জবাব দিল, একেবারে এখানকার। কাছাকাছির হোটেলে খাওয়া সারার ফাঁকে আর একটা সমস্যা মনে এলো। যে মূর্তি হয়েছে মাস্টারমশাইয়ের, দেখে সকলেই আঁতকে উঠবে। চুল-দাড়ির ওপর আপাতত হাত নেই। হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রথমে মাঝারি সাইজের একটা সুটকেস কিনল। তারপর রেডিমেড জামা-কাপড়ের দোকান থেকে সব চেয়ে বড় সাইজের দুজোড়া টুইলের সার্ট আর দু'জোড়া পাজামা কিনে ফেলল। শরীরে কিছু নেই, কিন্তু দেহের খাঁচাটা কম নয়। জলপাইগুড়িতে টুইলের শার্টই পরতে দেখত ভদ্রলোককে।

বেলা আড়াইটে তিনটে নাগাদ গলির সেই খুপরি থেকে মাস্টারমশাই আর কুমুকে নিজের গাড়িতে তুলে নতুন ফ্ল্যাটে নিয়ে এলো। ললিত ভড়ের বেশবাস শুধু বদলেছে। আচরণে রকম-ফের নেই' কোটরের দু'চোখ ঘর দুটোর ওপর ঘোরাফেরা করে বাপীর মুখের ওপর এসে থেমেছে, তারপর আরো উষ্ণ হয়ে মেয়ের দিকে ফিরেছে। বিড়বিড় করে বলেছেন, খেতে দে, খিদে পেয়েছে।

পরের পাঁচ-ছ'টা দিনও বাপীর এক রকম ঝোঁকের ওপর কেটে গেল। ওপরতলার বয়স্ক বাড়িঅলা লোকটি ভদ্র। তার সঙ্গে আলাপ করে বাপী একজন বড় ডাক্তারের হদিস পেয়ে তাঁকে ধরে এনেছে। ক'দিনের মধ্যে যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি

জানিয়েছেন রোগীর বাঁচার কোনো আশা নেই। বুক ঝাঁঝরা, পেটে ঘা, মাত্রাতিরিক্ত রক্তাল্পতা—বেঁচে আছেন কি করে সেটাই আশ্চর্য। তবু যতদিন বাঁচেন...। লম্বা ওষুধ-পত্রের ফিরিস্তি দিয়ে যতটা সম্ভব কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা করে গেলেন তিনি। যখন-তখন রাজ্যের খিদে ছাড়া আর কি যে কষ্ট মাস্টারমশায়ের বাপী ভেবে পায় না।

ওপরতলার ভদ্রলোক তাঁর চাকরকে বলে একটা বাচ্চা চাকর যোগাড় করে দিয়েছেন। কুমকুমকে সাত কথা জিজ্ঞাসা করলে সহজে একটার জবাব দেয় না। মুখের দিকে চেয়ে থাকে শুধু। পারিষ্কার আটপৌরে জামা-কাপড়ে এখন বেশ সুশ্রীই দেখায় মেয়েটাকে। প্রসাধনের প্রলেপ না থাকতে আরো ভালো লাগে। কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে না পেয়ে ওই রকম করে চেয়ে থাকে যখন, তখন মুশকিল হয়। মেয়েটার চোখের তারায় কতকালের কান্না জমে আছে ঠিক নেই। বাপীর ভয়, কখন না ভেঙে পড়ে। ও কাঁদতে জানে না, কান্নাকাটি দেখতেও পারে না। তাই ছোকরা চাকরটার সংগেই পরামর্শ করে ওই ছোট্ট সংসারের যাবতীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে হয়েছে তাকে। চাল ডাল তেল নুন চিনি কেরোসিন, ঝাঁটা মশলাপাতি স্টোভ বালতি মগ হাঁড়ি কড়া সসপ্যান চায়ের কেটলি পেয়ালা প্লেট খাবার ডিশ বাটি—দুজনের একটা সংসার চালাতে এমন আরো কত কি যে লাগে বাপীর ধারণা ছিল না। চাকরটা এসে দফায় দফায় ফিরিস্তি দেয়, অমুক অমুক জিনিস চাই। কুমকুম সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু বাপী তক্ষুনি গাড়ি নিয়ে ছোটে। বাপকে ছেড়ে মেয়ে এক ঘণ্টার জন্যেও বাইরে যাক চায় না। কিন্তু নিজের ওদিকে হাঁপ ধরার দাখিল। তবু বাপীর ভিতরের কোথায় যেন একটা আশ্চর্য রকমের আনন্দের উৎসও খুলে গেছে। এক খাওয়া ভিন্ন আর সব-কিছুর ওপর বীতশ্রদ্ধ এবং ক্রুদ্ধ ওই বিদায়ী মানুষটার জন্য যেটুকু করতে পারছে তাই যেন ওরই পরম ভাগ্য।

বাপীর হুকুমমতো মাস্টারমশাইয়ের চুল-দাড়ির জঙ্গল পরামাণিক ডাকিয়ে কুমু কিছুটা সাফ করতে পেরেছে। সবটা পারে নি। এটুকু করতেই নাকি ক্ষেপে গেছিল। পারে তো দু-জনকেই মারে আর কুমু হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছে। সব দাড়ি কামিয়ে ফেললে চামড়ার ওপর হাড় উঁচিয়ে উঠবে। একমুখ দাড়ির জঙ্গল জলপাইগুড়ি থাকতেও বাপী অনেক সময় দেখেছে। এটুকু সংস্কারের ফলে এখন সেই মানুষের কিছুটা আদল এসেছে।

ফাঁক পেলে বাপী দুবেলাই আসছে। সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে এসে দেখে মাস্টারমশাই ঘরে একলা খাটের ওপর বসে আছেন। কুমকুম ঘরে নেই। বাড়িতেও না। সংগে সংগে স্নায়ুগুলো টান-টান বাপীর। কখন কিজন্যে দরকার হয় ভেবে আরো অনেক টাকাই ওই মেয়ের হাতে গুঁজে দিয়েছে। টাকার অভাবে বাপকে ফেলে বেরুতে হয়েছে এমন হতে পারে না। ওর কড়া নিষেধ সত্ত্বেও নেই কেন? এদিক-ওদিক চেয়েও বাচ্চা চাকরটাকেও না দেখে মেজাজ আরো বিগড়ে গেল।

মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করল, কুমু কোথায়? আপনি একলা কেন?

কথা জিজ্ঞাসা করলে রোজ যা করেন ভদ্রলোক আজও তাই করলেন। গর্তে-ঢোকা দুই চোখের একটা ঝাপটা মেরে অন্য দিকে চেয়ে বসে রইলেন।

বাপী তবু অসহিষ্ণু।—আপনাকে বলে কোথাও গেছে না এমনি চলে গেছে?

মুখ না ফিরিয়ে রাগে গজগজ করে উঠলেন।—ওষুধ আনতে গেছে, খিদে পেয়েছে খেতে দেবার নাম নেই—আমাকে ওষুধ গেলাবে!

বাপী নিজের কাছেই অপ্রস্তুত একটু। যার মনে চোর সে-ই অন্যের মধ্যে চোর দেখে। দরকারে বেরুতে পারে সেটা না ভেবে প্রথমেই সন্দেহ। একটা মোড়া টেনে কাছাকাছি বসল। ভদ্রলোক এখনো তাকে চেনে না বা পছন্দ করে না। পছন্দ অবশ্য কাউকেই করে

না, খিদের তাগিদ ভিন্ন নিজের মেয়েকেও চেনে না। কাছাকাছি বসার দর্ন বিরক্ত মুখে ভদ্রলোক আরো একটু ঘুরে বসলেন।

মানুষটা বেশি দিন নেই আর জানা কথাই। ঘরে তাঁকে একলা পেয়ে একটা চাপা আবেগ ভেতর থেকে ঠেলে উঠলে। বলল, আচ্ছা মাস্টারমশায়—

কানে ঢুকল না। অন্য দিকেই মুখ ফিরিয়ে আছেন।

—মাস্টারমশাই! আমি আপনাকে ডাকছি—এদিকে ফিরুন না, দেখুন না আমাকে চিনতে পারেন কি না?

এবারে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন ওর দিকে। কোটরের চোখে রাগের ঝাপটা।—কে তোমার মাস্টারমশাই?

—আপনি। আমি বাপী—বানারহাট স্কুলে আপনি আমাদের ড্রইং করাতেন, জলপাইগুড়িতে আপনার বাড়িতে আপনার কাছে আমি থেকেছি—কত গল্প করেছি—আপনি আমাকে রান্না শিখিয়েছেন, যোগ-ব্যায়াম শিখিয়েছেন—আপনার কিছু মনে পড়ে না?

গর্তে-ঢোকা দুটো চোখ অস্বাভাবিক চিকচিক করছে। রাগে কিনা বাপী বুঝছে না। সাগ্রহে আবার বলল, আপনি কত গল্প করতেন, বুদ্ধের গল্প দুর্ভিক্ষের গল্প—আর কত সুন্দর সুন্দর শ্লোক শোনাতেন—আপনি বলতেন, 'দারিদ্র্যে দোষো গুণরাশিনাশী' —বলতেন, স্বদেশের ঠাকুর বিদেশের কুকুর—মনে আছে?

হঠাৎ বুকের তলায় একটা মোচড় পড়ল বাপীর। মনে হল মানুষটার কোটরগত ওই চকচকে চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছে। তার দিকেই চেয়ে আছে। বাপী কি ঠিক দেখছে? ব্যগ্র মুখে প্রায় চেঁচিয়ে বলল, মনে পড়ছে মাস্টারমশাই—আমাকে চিনতে পারছেন?

এবারে বিড়বিড় করে যে জবাব দিলেন, শুনে বাপীরই রোমে রোমে কাঁটা দিয়ে উঠল।—সব মনে আছে...চিনতেও সব সময়েই পারি...কিন্তু মনে পড়ে কি লাভ...চিনে কি লাভ...কুমুরে অসুবিধে, আমারও অসুবিধে...আবার হয়তো আমাকে ফেলে সব পালাবে...কুমুকে বলিস না।

নিজের অগোচরে বাপী ছিটকে মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তাঁর সামনে তাঁর খাটে এসে বসেছে। ও কত বড় হয়েছে এখন এই মুহূর্তে অন্তত মনে নেই। জোরে মাথা নেড়ে বলে উঠল, না মাস্টারমশাই না—আপনার কোনো ভয় নেই। আপনি যতকাল বাঁচবেন আপনার সব ভার আমার—এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, আমাকে বিশ্বাস করুন!

বিশ্বাস যে করলেন, অনুভব করতে একটুও সময় লাগল না। গর্তের দু'চোখ জলে ভরে গেছে। দাড়ি-ছাওয়া মুখে হাসি। দেখছেন। নির্নিমেষে চেয়ে আছেন। বললেন, জেল-ফেরত তোর সঙ্গে দেখা হতে ডিস্টিংশনে বি-এস-সি পাশের কথা বলে তুই আমাকে মিষ্টির দোকানে টেনে নিয়ে গিয়ে খুব খাইয়েছিলি, আর আমি তোকে বলেছিলাম বড় নরম মন তোর, তোর কিসসু হবে না—মনে আছে?...এখনো এই মন তোর, এত হল কি করে রে!

বাপী চেষ্টা করছে হাসতে। চেষ্টা করছে কিছু বলতে। কোনোটাই পারছে না।

ওষুধের প্যাকেট হাতে কুমকুম ফিরল। এক খাটে দু'জনকে এমন ঘন হয়ে বসে থাকতে দেখে অবাক!

বাপী খাট ছেড়ে উঠে পড়ল। কুমকুমকে বলল, মাস্টারমশাই আমাকে চিনতে পেরেছেন, সব মনেও পড়েছে! আর ভুল হবে না কথা দিয়েছেন—কিন্তু আমাদেরও যেন আর এতটুকু

ভুল না হয়—বুঝলে?

অপ্রত্যাশিত খুশির ধাক্কায় কুমকুম তাড়াতাড়ি বাবার দিকে তাকালো। তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। গলার কাছে কি দলা পাকিয়ে আছে বাপীর। সেটা আনন্দের কি বন্ত্রণার জানে না। ঘর থেকে বেরিয়ে লম্বা পা ফেলে গাড়িতে এসে উঠল।

॥ চোদ্দ ॥

টানা চব্বিশ দিনের ট্রাম বয়কটের ফয়সলা শেষ পর্যন্ত হল। এক পয়সার যুদ্ধ শেষ। সরকারের তরফ থেকে এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধি স্থগিতের নির্দেশ ঘোষণার ফলে আপাতত গণদাবির জয়। বাপীর ধারণা পুঁজিপতিরা এ জয় খুব স্বস্তির চোখে দেখছে না। কারণ এর পিছনে নিরীহ মানুষগুলোর সংঘবদ্ধ বিপ্লবের চেহারাটা উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে। চোখ চালিয়ে নিজের ভিতরটা দেখতে চেষ্টা করেছে বাপী। সেও তো ছোটখাটো এক পুঁজি-পতিই হয়ে বসেছে। তবু সাধারণের এই জয় তার ভালো লাগছে। গা-ঝাড়া দিয়ে বাপী আত্মপ্রসাদ বাতিল করল।

এবারে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়। আবু রব্বানীকে একস্প্রেস টেলিগ্রাম করে মালের ট্রাক পাঠাতে বলেছে। ফাঁক পেলে নিজেরও একবার ঘুরে আসার ইচ্ছে। পুরো এক মাসও হয়নি কলকাতা এসেছে কিন্তু মনে হচ্ছে কত দিন হয়ে গেল শিকড় ছাড়া হয়ে আছে।

ঊর্মিলাদের যাওয়া কি কারণে এক সপ্তাহের জন্য পিছিয়েছিল। সেই যাত্রারও সময় এগিয়ে এসেছে। ফ্ল্যাটে আসার পর একদিন মাত্র ওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছিল। শিগগীরই যাবে কথা দিয়েছিল। হঠাৎ ললিত ভড়কে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার দরুন সময় পেয়ে ওঠেনি। সে মেয়ে হয়তো রাগে ফুঁসছে। রাতে ওর নাগালের মধ্যে টেলিফোন নেই। বিজয়ের আপিস থেকে দিনে করতে পারে। এর মধ্যে ক'বার করে তাই করেছে কে জানে। দিনের বেলায় ঘরে আর কতক্ষণ থাকে বাপী, ফোন ধরে কে।

ঊর্মিলার ওখানেই যাবে ঠিক করে প্যান্ট আর শার্ট বদলাবার জন্য সন্ধ্যায় ফ্ল্যাটে ফিরেছিল। একটু বাদে দরজার ওধারে কলিং বেল বেজে উঠল। বাপী অবাক একটু।... কে হতে পারে। একটু আগে জিত্ মালহোত্রাকে ছেড়ে এসেছে—সে নয়। একমাত্র মিষ্টি চেনে এই ফ্ল্যাট। সে এসেছে ভাবা যায় না। তার কাছ থেকে ঠিকানা আর ফ্ল্যাটের হদিস নিয়ে দীপুদা আসতে পারে অবশ্য।

দ্বিতীয় দফা বেল বাজল। বাপী এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল।

অসিত চ্যাটার্জি। ফর্সা মুখে খুশি উপচে উঠল। সঙ্গে অন্তরঙ্গ অনুযোগ। কি ব্যাপার বলো তো তোমার! কদিনের মধ্যে নো-পাত্তা! আপিস থেকে রোজ কবার করে টেলিফোন করছি কেউ ধরেই না! আপিস-ফেরতা দু-দিন এসে ফিরে গেলাম—তুমি নেই, দরজায় তালা।

লোকটাকে দেখামাত্র একটা বিজাতীয় আক্রোশ ভেতর থেকে ঠেলে উঠতে লাগল। তার সঙ্গে যুঝতে হলে মুখে দরাজ হাসি টেনে আনতেই হয়।—এসো অসিতদা এসো। আমিও কদিন ধরে তোমার কথাই ভাবছিলাম। একদম সময় পাইনি। এক হাতে কাঁধ জড়িয়ে ধরে বসার জায়গায় নিয়ে এলো।—আমার ফ্ল্যাটের হদিস আর টেলিফোনের নম্বর তোমাকে কে দিল?

সোফায় আরাম করে বসে জবাব দিল, বাঃ, মিলু এসেছিল না!

সাদা কথায় কদিন আগে যার স্ত্রী এসে গেছে এখানে, তার স্বামী কেন জানবে

না। কিন্তু এত সাদা বাপী ভাবতে পারছে না। ঠিকানা বা ফোন নম্বর পেলে এই লোক এখানে এসে হানা দেবে অথবা যোগাযোগ করবে জানা কথাই। তবু দিয়েছে। দিয়ে মিষ্টি বোঝাতে চেয়েছে, যে যাই ভাবুক ওদের পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার কোনো অভাব নেই। ফাঁকিও নেই।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারদিকে একবার চোখ চালিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ভিতরের দিকটাও একবার দেখে নিল। তারপর একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে মন্তব্য করল, নাঃ, টাকা না থাকলে সুখ নেই—চমৎকার ফ্ল্যাট তোমার। তারপরেই অন্তরঙ্গ অথচ কড়া অনুযোগ। আমি আসি আর যাই করি তোমার ওপর কিন্তু দারুণ রেগে আছি।

সঙ্গে সঙ্গে বাপীরও আকাশ থেকে আছাড় খাওয়া মুখ।—কি অপরাধ করলাম?

—বাড়ির দোরে সেদিন মিলুকে নামিয়ে দিলে, একবারটি ভিতরে এলে না বা দেখা করলে না!

মগজে শক্ত চিন্তার কারকুরি চলেছে। মুখের হাসিতে খুঁত নেই।—
মিস্...মানে মিলু গিয়েই তোমার কাছে নালিশ ঠুকল বুঝি?

খুশি থাকলে লোকটা প্যাঁচ-ট্যাচের ধার ধারে না বাপী আগেও লক্ষ্য করেছে। এখনো নিজের দোষ ঢাকার চেষ্টা করল না, ইয়ে মেজাজটা সেদিন আমার খুব ভালো ছিল না, আর দিনটাও কেমন ছিল তোমার মনে আছে তো? হাঙ্গামা, গুলি-গোলা—অথচ রাত পর্যন্ত ওর বাড়ি ফেরার নাম নেই। তুমি বলো, চিন্তা হয় না?

বাপী ঘটা করে মাথা নাড়ল। চিন্তা না হওয়াটাই অস্বাভাবিক।

—আমি ভাবলাম ওই মওকায় ঠিক কেউ না কেউ ওকে নিজের বাড়ি টেনে নিয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি ভাই, মিলুর আপিসের খাতিরের লোকগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না—বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাতির করার জন্য বা লিফট দেবার জন্যে সর্বদা হাঁ করে আছে। আর মিলুরও একটা গুণ স্বীকার করতেই হবে, আমি রেগে যাই জেনেও মিথ্যে বলে না—জিগ্যেস করলে কোথায় ছিল বা কোথায় গেছিল সত্যি কথাই বলে দেয়। রাত সাড়ে আটটায় বাড়ির দোরে গাড়ি থামতে ভাবলাম তাদের কেউ হবে—আমার তখনকার মেজাজ বুঝতেই পারছ। সেই মেজাজের মুখে যখন শুনলাম তুমি ওর আপিসে এসে ধরে নিয়ে গেছ আর তুমিই বাড়ী পোঁছে দিয়ে গেলে তখন আমিই আবার উল্টে হাঁ। দোরগোড়ায় এসেও পালিয়ে যেতে দিল বলে তখন মিলুকেই বকলাম।

এমন বিশ্বাস আর এই হৃদ্যতার কথা শুনে ভিতরটা আরো হিংস্র হয়ে উঠছে বাপীর। এই ঘরে বসে বাপী সেদিন যে খোঁচাটা দিয়েছিল, এ তারই জবাব। মিষ্টিই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে লোকের রোগের খোঁচা দিয়েছিলে সে তোমাকে কত পছন্দ করে আর কত বিশ্বাস করে নিজের চোখেই দেখো।

মুখের মেকি হাসি গলায় নামল। বলল, অত রাতে তোমার খপ্পরে পড়লে সহজে ছাড়া পেতাম! হাতে সময় নিয়ে যাব'খন একদিন।...কিন্তু জানান না দিয়ে আজ প্রথম দিন এলে, ঘরে তো সেসব কিছুই মজুত নেই—

মাখন-মার্কা হৃষ্টবদনে লজ্জা-লজ্জা হাসি।—না হে, তোমার এখানে এসে আর ওসব চলবে না...কথা দিতে হয়েছে।

—কি ব্যাপার? ভিতরে একপ্রস্থ হোঁচট খেলেও বিস্ময়টুকু নির্ভেজাল।

চোখের মিটিমিটি হাসিতে সোনালি ফ্রেমের চশমাটাও বেশি ঝিকমিক করছে এক কথায় পাঁচ কথা বলার অভ্যেস। রয়েসয়ে জবাব দিল, মিলুর মাথা ইদানীং আগের থেকে ঠাণ্ডা দেখছি, কথায় কথায় আগের মতো অত রেগে ওঠে না...নিজের দাদা আর মায়ের ওপরেই বরং এখন বেশি রাগ। তারাই আমার মাথাটা বিগড়ে দিচ্ছে বুঝছে বোধ

হয়। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব বা মাখামাখিতে আপত্তি নেই—আপত্তি শুধু ড্রিংক করার ব্যাপারে। খুব ইচ্ছে হলে বাড়িতে বসে একটু-আধটু ড্রিংক করতে পারি—কিন্তু তোমার এখানে এসে নয়।

বাপীর ঠোঁটে হাসি। মগজ তৎপর আবার। এতক্ষণের হিংস্র থাবাটার এক ঘা বসিয়ে দেবার সুযোগ আপনা থেকে উপস্থিত। মিষ্টি সেদিন কিছু জোরের বড়াই করে গেছিল। এই লোকের ভালবাসার জোর। তাতে ভেজাল নেই বলেই তার একটু-আধটু বিকৃতি বরদাস্ত করতেও অসুবিধে হবে না বলেছিল। মিষ্টির সেই সব কথা একটা যন্ত্রণার মতো দাগ কেটে আছে। বাপী বিশ্বাস করেনি, কারণ এই জোরের দিকটা সে চেনে। নিজেকে দিয়ে চিনেছে, অনেক দেখে চিনেছে।

ঊর্মিলার ওখানে যাওয়ার চিন্তা আজও বাতিল। জোরের যাচাই কিছুটা এই রাতেই হতে পারে। মিষ্টিকে কথা দিয়েছে তার এখানে এসে ড্রিংক করবে না। লোকটাকে কথা রাখার মতো সবল ভাবতেও রাজি নয় বাপী। অন্তরঙ্গ সুরে বলল, চায় না যখন একেবারে ছেড়েই দাও না, ও আর এমন কি জিনিস।...কিন্তু আমার এখানে এসে ড্রিংক ছাড়া আর কিছুতেই নিষেধ নেইতো?

—আর কি?

—কাজের চাপে হাঁসফাঁস দশা গেছে কটা দিন. সবে আজই একটু হাল্কা হতে পেরেছি তাই তোমাকে পেয়ে দারুণ ভাল লাগছে...শিগগীর ছাড়া পাচ্ছ না। কিন্তু আমার বেজায় খিদে পেয়ে গেছে, আগে কোথাও গিয়ে বেশ মেজাজে ডিনার সেরে আসা যাক চলো।

অসিত চ্যাটার্জির তক্ষুনি ঘাড় কাত। এসবে আপত্তি করার মতো বেরসিক নয়।

আধ ঘণ্টার মধ্যে বাপীর গাড়ি পার্ক স্ট্রীটের এক জমজমাট রেস্তরাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। বাইরে আলোর বহর দেখে এটাই সব থেকে অভিজাত মনে হল। এত গাড়ি দাঁড়িয়ে যে পার্ক করার জায়গা মেলা ভার। রাস্তার উল্টো দিকে জায়গা খুঁজে বার করতে হল।

ঢোকার পথে পাগড়ি আঁটা তকমা-পরা দরোয়ান সেলাম ঠুকে দরজা খুলে দিল। ভিতরে পা দিয়ে বাপীরই চোখে ঘোর লাগার দাখিল। পায়ের নিচে পুরু গালচে বিছানো। অন্ধকার-ছোঁয়া খুব মৃদু আর নরম লালচে আলোয় মানুষ দেখা যায়. দশ হাত দূরের মুখ ভালো দেখা যায় না। বাইরে থেকে এলে বা অনভ্যস্ত চোখে এ আলোয় চোখ বসতে সময় লাগে। মদিরাচ্ছন্ন বাতাস. ডিশে কাঁটা বা চামচ ঠোকার টুন-টান শব্দ, সোডার ফসফস মুখ খোলা. মেয়ে-পুরুষ বহু গলার গুনগুন রব, মিহি মোটা হাসি—ভোগবতীর আমেজ ঠাসা আসর।

এখানে ক্যাবিনের বালাই নেই। রসিক-রসিকারা আড়াল কেউ চায় না। দূরে দূরে দু'জন চারজন বা ছ'জনের তকতকে টেবিল চেয়ার। টেবিলে ধপধপে সাদা ঢাকনা। নিচে সিট নেই. দোতলার ব্যালকনিতে ঠাঁই মিলল। দোতলার পরিবেশও একই রকম জমজমাট।

বেয়ারা ফুড চার্ট আর ড্রিংক চার্ট রেখে গেল। ড্রিংক চার্টটা ঠেলে সরিয়ে বাপী ফুড চার্টটা টেনে নিয়ে বলল. এখানকার ফুড খুব ভালো. সেদিন এক পার্টিকে নিয়ে এসেছিলাম—তাঁরা অবশ্য বলে এখানকার ড্রিংকের কোনো তুলনা নেই...তা আমি তো ওসবের মর্ম বুঝি না, আমার ফুডই ভালো লাগল।

চারিত্রিক নীতির প্রশ্ন যেখানে. বাপী পারতপক্ষে মিথ্যে বলে না। কিন্তু চাণক্য-নীতির মুখে বাছ-বিচার নেই। তখন অম্লানবদন। গম্ভীর। ফুড বাছাই চলছে। আড়-চোখে এক-একবার সামনের মুখখানাও লক্ষ্য করছে। অসিত চ্যাটার্জির দু চোখ ব্যালকনির সব কটা টেবিলে ঘুরছে। কি মেয়ে কি পুরুষ কারো গেলাস এখানে সুরাশূন্য নয়।

একটু বাদে নোটবই আর পেন্সিল হাতে অর্ডার নেবার জন্য স্টুয়ার্ড এগিয়ে এলো। বাপী ডাকালো ডিনারের অর্ডার দিল। লেখা শেষ করে অফিসার থমকে তাকালো। অবাকই একটু।—নো ড্রিংক?

—নো ড্রিংক।

সে চলে গেল। লালচে ঝিমুনো আলোয় অসিত চ্যাটার্জির ফর্সা মুখ নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে এখন। তবু একটু হাসি টেনে বলল, এখানে এসে ড্রিংক-এর অর্ডার না দেওয়া ওরা বোধ হয় আর দেখেনি।

—তা আর কি করা যাবে, কথা যখন দিয়েছ...।

—কথা দিয়েছি বলতে, গঙ্গাজলে গলা ডুবিয়ে তো আর প্রতিজ্ঞা কিছু করিনি।—এদের খাবার আনতে সময় লাগবে, তেষ্টাও পেয়ে গেছে।

বোকা-বোকা মুখে বাপী জলের গেলাসটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

—ধেৎ, জল কে খাবে, এখানে এসে নিরেমিষ গেলার কোনো অর্থ হয় না, তোমার অভ্যেস নেই তাই বুঝলে না—তুমি ভাই যা হোক একটা-দুটো দিতে বলো, গলা না ভেজালে কিছু নামবে না।

—একটা দুটো মানে...ড্রিংক?

এত তেষ্টা যে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না অসিত চ্যাটার্জির। মাথা নাড়ল।

বাপী টেবিলে আঙুল ঠুকে বয়কে ডাকল। ছাপানো ড্রিংক চার্টটা কাছে টেনে নিয়ে কোন জিনিসটার সব থেকে বেশি দাম দেখে নিল। তারপর সেই নামের ওপর আঙুল রেখে কার্ড সামনে ঠেলে দিল।—এ জিনিস চলবে?

ঝুঁকে নাম দেখেই অসিত চ্যাটার্জির দু'চোখ চকচক করে উঠল।—অনেক দাম যে...

এক পেগের অর্ডার নিয়ে বয় চলে গেল। বাপীর কোমল-গম্ভীর দু'চোখ সামনের লোকের মুখের ওপর স্থির একটু।—আমার কাছে তুমি এর থেকে ঢের দামী মানুষ, সকলে তোমাকে বোঝে না কেন আমি ভেবে পাই না।

সোনালি চশমা আঁটা মাখন-মূর্তি গলেই যাচ্ছে।—হিংসে, স্রেফ হিংসে ভাই, কিন্তু আমিও অসিত চাটুজ্জ্যে, কারো তোয়াক্কা রাখি না।

হুইস্কির গেলাসে সোডা ঢেলে দিয়ে বয় চলে যেতে বাপী বলল, শাশুড়ী জামাইকে আর সম্বন্ধী ভগ্নীপতিকে ভালো চোখে দেখবে না বরদাস্ত করবে না—এ কেমন কথা বুঝি না।

দু'ঢোক গলা দিয়ে নামার সঙ্গে সঙ্গে অসিত চ্যাটার্জির ভিন্ন মূর্তি। ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, হিমালয়ের মতো মাথা উঁচু লোক ভাবে যে নিজেদের। বরদাস্ত করবে কি করে? তাদের মেয়ে বোনকে রেস জুয়া আর মদের নেশায় একেবারে সর্বস্বান্ত করে ফেললাম না।

তাপ বাড়ার ফলে এবারের চুমুকে গ্লাসের অর্ধেকের বেশি শেষ! নিরীহ বিস্ময়ে বাপী চেয়ে রইল একটু।—মদ তো তোমাকে খুব একটা বেশি খেতে দেখি না...রেস আর জুয়া সত্যি বেশি খেলো নাকি?

—ক্ষেপেছ! ওরা যাই ভাবুক অত টাকা কোথায় আমার! মৌসুমের সময় মাঠে এক-আধদিন যাইনে এমন নয়, আর জুয়াও একটু-আধটু খেলি সত্যি কথাই—কিন্তু সে সব তোমার কাছে নস্যি—তবু তাই বলে ওদের অত মাথা-ব্যথা কেন! ওদের কাছে কখনো হাত পাততে গেছি!

গেলাস খালি। বাপীর হুকুমে বেয়ারা দ্বিতীয় দফা গেলাস সাজিয়ে দিয়ে গেল। ডিশ থেকে একটা দুটো চিনেবাদাম তুলে বাপী দাঁতে কাটছে, আর অনেকটা আপন

মনেই হাসছে। নতুন গেলাসে নতুন চুমুক বসিয়ে মাখন-মুখ উৎসুক।—হাসছ যে?

—না, ভাবছিলাম...

—কি?

—আমাদের চিন্তাটিন্তাগুলো দিনে দিনে কেমন ছোট হয়ে গেল, মানে ন্যারো হয়ে গেল সেই কথা।...নইলে এই ঘোড়দৌড় আমাদের সেই কতকালের রাজরাজড়ার খেলা, যার যত বড় দিল তার-এ খেলায় ততো বেশি টান।...জুয়াতে হেরে যুধিষ্ঠির হেন মানুষ সভার মধ্যে নিজের স্ত্রীকে বে-ইজ্জত পর্যন্ত করালেন তাতে দোষ হল না, আর আমরা দশ-বিশ টাকায় একটু আনন্দ পেতে চাইলেই মস্ত দোষ।...আর সুরা জিনিসটাই বা কি? আসল—দেব-দেবতা থেকে শুরু করে মহাযোগী ঋষি পর্যন্ত এ জিনিস ছাড়া কার চলত?

কথা নয়, সমস্ত মন ঢেলে কথকতা শুনছে অসিত চ্যাটার্জি। তারপর গলায় সবটুকু আকুতি ঢেলে বলল, বাপী আমাদের বাড়িতে একবারটি এসে মিলুকে ঠিক এমনি করে বলে বোঝাও, ওই মা আর দাদাটি সত্যি মাথাটা ওর মাঝে মাঝে বিগড়ে দিচ্ছে!

রসালো ডিনার শেষ হবার ফাঁকে মোট চারদফা গেলাস শেষ। এরপর আর একবার ওয়ান ফর দি রোড-এও বাপী আপত্তি করল না। পঞ্চম গেলাস শেষ হতে ঘড়িতে সাড়ে দশটা। বিল মিটিয়ে বাপী চটপট উঠে পড়ল। আর বাড়লে লোকটাকে হয়তো সিঁড়ি দিয়ে নামানো দায় হবে।

হাত ধরে নিচে নামালো। রাস্তায় এসে ট্যাক্সির খোঁজ। রাস্তার ওধারে দুতিনটে ট্যাক্সি দাঁড়িয়েই আছে। তাকে ধরে পার হতে হতে বাপী বলল, আমাকে তুমি কিন্তু মুশকিলে ফেললে অসিতদা, মিলুকে কথা দিয়েও কথা রাখলে না—ও আমাকেই এরপর যাচ্ছেতাই বলবে—

আর তিন হাতের মধ্যে ট্যাক্সি। তার আগেই লোকটা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। গলায় হুমকি।—কি? তোমাকে যাচ্ছেতাই বলবে? মিলু ছেড়ে মিলুর বাপ এসে কিছু বলুক দেখি তোমাকে—মুখ একেবারে ভোঁতা করে দেব না? আমার নাম অসিত চাটুজ্জে!

...টাকা মন্দ খরচ হল না আজকে। বাপীর পরিতুষ্ট মুখ। খরচের কড়ায় গণ্ডায় সার্থক। ফ্ল্যাটে এসেও নিজের মনে হেসেছে আর অসিত চ্যাটার্জি ঘরে ফেরার পর মিষ্টির মুখখানা কেমন হতে পারে কল্পনা করতে চেষ্টা করেছে। তার জোরের মানুষের জোর বোঝা গেছে। মিষ্টি বুঝতে চায় না, কারণ এই জোরের কল্পনাটুকুই ওর কাছে শেষ সম্বল। জোর গলায় বলেছিল, এতে ভেজাল থাকলে ও নিজেই ছেঁটে দিত বা দেবে।...দেখা যাক।

পরদিনও সকাল থেকে একটা প্রচণ্ড লোভের রাশ টেনে ধরে আছে। এয়ার অফিসে গিয়ে মিষ্টির মুখখানা একবার দেখার লোভ। আজ ও গিয়ে দাঁড়ালে সেই মুখের প্রতিক্রিয়া কেমন হয় দেখার বাসনা।

নিজেকে আগলাবার জন্যেই সকালের কাজের পর দুপুরের লাঞ্চ সেরেই ঊর্মিলার ওখানে চলে গেছে। আর মাত্র দুটো দিন আছে ওরা, ওই মেয়ে ক্ষেপেই আছে। বিকেলে আবার কোন ফ্যাসাদে আটকে যায় কে জানে। মাস্টারমশায়ের শরীর সকালে বেশ খারাপ দেখে এসেছে। প্রতিদিন থেকে প্রতিদিন খারাপ মনে হচ্ছে। তাঁর সময় দ্রুত ঘনিয়ে আসছে বোঝা যায়। সকালে ভদ্রলোক ওকে বলেছে পারলে বিকেলে আবার আসিস বাবা, তোকে দেখলেই প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়। বাপী আসবে আশ্বাস দিয়ে এসেছে।

বিজয় আপিসের কার সঙ্গে দেখা করার জন্যে নিচে নেমেছে। এখন আর ওর আপিস নেই। বেশ লম্বা একপ্রস্থ বকা-ঝকা রাগারাগির পর ঊর্মিলা একটু ঠাণ্ডা মাথায়

বাপীকে ভালো করে লক্ষ্য করল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, দিনে না হয় তুমি কাজ নিয়ে ব্যস্ত...রাতে কি নিয়ে ব্যস্ত?

—রাতে ব্যস্ত তোমাকে কে বলল?

—কাল রাত সাড়ে দশটায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বিজয়কে এদিকের এক সাহেবের ফ্ল্যাট থেকে তোমাকে ফোন করার জন্য পাঠিয়েছিলাম। ফোন বেজে গেছে, কেউ ধরে নি।

আগে যে প্রসঙ্গ বাপী এড়িয়ে গেছে, আজ হঠাৎ তার বিপরীত ঝোঁক কেন, জানে না। ঠোঁটের হাসিতে কৌতুক মিশল একটু। জবাব দিল, কাল রাতে হোটেলে একজনকে এনটারটেন করতে হল।

যেভাবে বলল, ঊর্মিলার চাউনি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবে জানা কথাই।—কে একজন? মহিলা না ভদ্রলোক?

—ভদ্রলোক। তবে যা ভাবছ তার সঙ্গে তার যোগ আছে।

ঊর্মিলা উৎসুক।—কি যোগ?

—মহিলার হাসব্যান্ড।

ঊর্মিলা ডবল উৎসুক।—মিষ্টির হাসব্যান্ড! রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত তাঁকে একলা এনটারটেন করলে?

বাপী হাসছে মিটিমিটি। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, আর একদিনও হোটেলে করেছিলাম—

বড় বড় চোখ করে ঊর্মিলা আগে একদফা পর্যবেক্ষণ করে নিল। তারপর জোর দিয়ে বলল, তোমার মতিগতি একটুও ভালো দেখছি না——ভদ্রলোককে পথে বসাবার মতলব নাকি?

—ভদ্রলোকের যা চরিত্র নিজেই অনেকখানি পথে বসে আছে।

ঊর্মিলার চাউনি এখনো বিস্ফারিত তেমনি।—মিষ্টির সঙ্গে তোমার দেখা হয়?

বাপী নির্লিপ্ত।—না হবার কি আছে।

ঊর্মিলা ব্যগ্রমুখে ঝাঁঝিয়ে উঠল, আর আমাকে একটিবার দেখালে না! আমার এত ইচ্ছে ছিল...

কথার মাঝে থমকালো। কৌতূহলের ওপর দুশ্চিন্তার ছায়া পড়তে লাগল। গলার স্বরেও চাপা আবেগ মিশল একটু।—বাপী, তোমাকে আমি বোধ হয় তোমার থেকেও ভালো চিনি...তুমি কক্ষনো কোনো ছোট কাজ করতে পারো না, করবেও না। মাঝখান থেকে আরো দুঃখ পাওয়ার রাস্তা করছ না তো?

শেষের কথায় বাপী কানও পাতল না। এতক্ষণের দাবিয়ে রাখা সেই লোভটাই আবার মাথায় চেপে বসল। মিষ্টির সামনে আজই একটিবার গিয়ে দাঁড়ানোর দুর্বার লোভ। সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যানও ঠিক। গম্ভীর।—তুমি আর দয়া করে আমার ওপর মাস্টারি করতে বোসো না—যাকে পেয়েছ তাকেই সামলে-সুমলে রাখো। দুদিন বাদে আমেরিকা দেখতে তো যাচ্ছ—ভালো করে কলকাতা দেখা হয়েছে?

তক্ষুনি রেগে ওঠার সুযোগ পেল ঊর্মিলা।—খুব দেখা হয়েছে, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একজন আপিস ঠ্যাঙাচ্ছে—আর একজনের কলকাতায় এসেও পাত্তা নেই—জিগ্যেস করতে লজ্জাও করে না!

বাপী তক্ষুনি উঠে দাঁড়াল।—লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। পাঁচ মিনিট সময় দিলাম, রেডি হয়ে নাও। আমি ততক্ষণে নিচে নেমে বিজয়ের বুকে একটু দাগা দিয়ে আসি—

ঊর্মিলার খুশি আর ধরে না। হড়বড় করে এটা সেটা গল্প করে চলেছে। সেই খুশির

ফাঁকে গাড়ির স্পিড কত চড়ানো হয়েছে খেয়াল নেই। বাপীর ঘড়ির দিকে চোখ আছে। বেড়ানোর নামে বেরুনো, বেড়াতে একটু হবেই। আর বিকেল চারটের মধ্যে সেই এয়ার অফিসের দরজায় গাড়ি ভিড়ানোরও তাগিদ।

ঠিক সময় ধরেই পৌঁছুলো। নিজে গাড়ি থেকে নেমে ঊর্মিলাকে বলল, নামো—

এবার অফিসের সাইনবোর্ড দেখে ঊর্মিলা অবাক!—এখানে কোথায়?

—ভয় নেই, আজই টিকিট কেটে তোমাকে নিয়ে কোথাও হাওয়া হয়ে যাচ্ছি না। এসো—

ওকে নিয়ে দোতলায় উঠল। কয়েক পা এগোলেই সেই ঘর। অপেক্ষা করতে হল না, ঘরে দ্বিতীয় কেউ নেই। দরজা ঠেলে বাপীই প্রথম ভিতরে ঢুকল, তারপর ওটা রেখে বাইরের দিকে চেয়ে ডাকল, এসো—

কলম রেখে মিষ্টি সোজা হয়ে বসেছে। এই লোককে দেখামাত্র মুখে তাপ ছড়াচ্ছিল। তারপরেই অবাক। ঊর্মিলাও ভিতরে পা দিয়ে বিমূঢ়।

বাপী গম্ভীর। এটা যে অফিস তার জন্য ভ্রূক্ষেপ নেই। ঊর্মিলাকে বলল, দেখো—

ঊর্মিলা বড় বড় চোখ করে সামনে চেয়ে দেখল খানিক। মিষ্টিও।

মিষ্টি। চাপা উচ্ছ্বাসে প্রায় নিজের অগোচরে ঊর্মিলার গলা দিয়ে নামটা বেরিয়ে এলো। তারপর টেবিলের কাছে এগিয়ে একমুখ হেসে বলল, আমাদের ফ্রেন্ড্ কি দুষ্টু দেখো, আমি মিষ্টি দেখতে চেয়েছিলাম বলে আগে থেকে কিচ্ছু না জানিয়ে হুট্ করে এনে হাজির করল! ঘুরে বাপীর দিকে তাকালো।—আমি তো মিষ্টি দেখলাম কিন্তু আমি কে ওকে বললে না?

গায়ত্রী রাইয়ের মেয়ে, তার বুদ্ধি নেই কে বলবে। জায়গা বুঝে আমার না বলে আমাদের ফ্রেন্ড বলল। বাপীর একেবারে সাদামাটা মুখ। জবাব দিল,—বলার দরকার নেই, বুঝেছে। সব থেকে দূরের চেয়ারটায় বসল সে।

ঊর্মিলা আবার টেবিলের দিকে ফিরল।—কে বলো তো?

—ঊর্মিলা। সৌজন্যবোধে মিষ্টির ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি। তার এই ব্যক্তিত্ব যতটা সজাগ ততোটা সহজ নয়।—বসুন।

ইচ্ছে করেই 'তুমি'র জবাবে 'তুমি' বলল না।

—বসুন! মুখোমুখি চেয়ারটায় বসে পড়ে অকৃত্রিম খুশির সুরে ঊর্মিলা বলল, আমি ভাই আস্ত একখানা জংলি মেয়ে, আপনি-টাপনি সিকেয় তুলে রেখে দাও। আঙুল তুলে বাপীকে দেখালো।—ওই জবরদস্ত ফ্রেন্ড-এর ওপরেও প্রথম দিনই তুমি চালিয়ে কেমন ঘায়েল করেছিলাম জিগ্যেস করো।

স্বতোৎসারিত খুশির উষ্ণ স্পর্শ একটু আছেই। চেষ্টা করলেও এরকম মেয়েকে ঠাণ্ডা ব্যবধানে সরিয়ে রাখা সহজ নয়। মিষ্টি তবু ওদিকের লোকের দিকে একবারও না তাকিয়ে ঈষৎ তেরছা সুরে বলল, মালিকের মেয়ের কাছে ঘায়েল হতে পারা তো ভাগ্যের ব্যাপার।

ঊর্মিলার চোখ তক্ষুনি বড় বড় আবার।—ভাগ্য আমার? তুমি তাহলে ফ্রেন্ডকে কেমন চেনো? মেয়ে ছেড়ে উল্টে খোদ মালিকই কেমন ঘায়েল হয়ে গেল জানো না তো। ভুরু কুঁচকে ঘাড় বেঁকিয়ে বাপীর দিকে তাকালো। বলে দেব?

বাপী ছোট হাই তুলল একটা—তোমার জিভ আর কে টেনে ধরে রাখতে পারছে।

আবার একটা খুশির ঝাঁকুনি দিয়ে ঊর্মিলা সামনে তাকালো।—কটা বছরের মধ্যে মাকেই ও যেভাবে ওর হাতের মুঠোয় নিয়ে নিল, হিংসেয় আমার গা জ্বলে যেত—আমি বলতাম মায়ের বয়েস আর দশটা বছর কম হলে আর ওর দশটা বছর বেশি হলে ঠিক একটা

গড়বড় হয়ে যেত!

অফিস আর ব্যক্তিত্ব ভুলে মিষ্টিও এবারে একটু হেসেই ফেলল।—চা বলি?

ঊর্মিলা বাপীর দিক ফিরল।—খাবে?

চেয়ারের কাঁধে মাথা রেখে বাপী ঘরের ছাদ দেখছে।—আমার অনুমতি দরকার?

—ছাই দরকার। মিষ্টির মুখোমুখি।—বলো।

বেল টিপে হুকুম করতে বেয়ারা দু' মিনিটের মধ্যে ট্রে-তে পট আর তিনটে পেয়ালা রেখে গেল। সেই ফাঁকে ঊর্মিলা টেবিলে দু-হাত রেখে আর একটু ঝুঁকে মিষ্টিকে দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে খুশির মন্তব্য।—সত্যি মিষ্টি। গম্ভীর থাকলে মিষ্টি, হাসলে মিষ্টি, কথা কইলে মিষ্টি—এত মিষ্টি আমি ভাবিনি!

পেয়ালার চা ঢালতে ঢালতে মিষ্টি একবার তার দিকে তাকিয়ে আলতো করে জিজ্ঞাসা করলো, নিজের মুখ আয়নায় দেখো-টেখো না?

—আমার সঙ্গে তোমার তুলনা! আমি হলাম গিয়ে একটা জংলি মাকাল ফল...লেখা-পড়ায় কাঁচকলা—আর তুমি? এক-একবার কাগজে তোমার রেজাল্ট বেরোয় আর ওই বাবুর তখন—

কি হচ্ছে! সোজা হয়ে বসে একটা পেয়ালা টেনে নিতে নিতে বাপী বলল, পরস্ত্রীর কাছে এইসব গল্প করার জন্য তোমাকে এখানে আনা হয়েছে নাকি?

এই প্রথম মিষ্টি সোজা তাকালো তার দিকে। চেষ্টা সত্ত্বেও ভিতরের আঁচ গোপন থাকল না খুব। গলা না চড়িয়ে বলল, পরস্ত্রী যে সে-জ্ঞান ওর থেকে তোমার আর একটু বেশি থাকলে আমার সুবিধে হয়।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বাপী দেওয়ালের ক্যালেণ্ডার দেখছে। নিস্পৃহ গোছের জবাবও দিল।—মনে রাখতে চেষ্টা করব।

গত রাতে একজন মাতাল হয়ে ঘরে ফেরার কারণে এই উষ্মা আর এই মুখই দেখবে আশা করেছিল। কিন্তু ঊর্মিলা একটু ঘাবড়ে দিয়ে বলল, আমি এলাম বলে...?

ওর দিকে চেয়ে মিষ্টি তক্ষুনি হাসল—তুমি এলে বলে ও-কথা বলব কেন? তোমাকে সত্যি খুব ভালো লেগেছে।

ঊর্মিলা সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল।—বলো কি।

—হ্যাঁ। ঠোঁটের ফাঁকে তার পরেও হাসি ঝুলছে।—তোমাকে দেখার পর ভাবছি এক-একটা লোক কত বোকা হয়। খুব মন দিয়ে তারা ট্র্যাজিক হিরো হতে চেষ্টা করে।

এবারের মোলায়েম খোঁচাটা বাপীর ঠিকই লাগল। নাগালের জনকে ছেড়ে ধরা-ছোঁয়ার বাইরের দূরের জনকে নিয়ে বিভোর হয়ে থাকার খোঁচা। কিন্তু সময় বুঝে ঊর্মিলাও চোখ কপালে তুলতে জানে। একটু চেয়ে থেকে তরল গলায়ই বলে উঠল, মুখ্যসুখ্যু মানুষ অত বুঝিনে ভাই...ফ্রেণ্ডের ওপর তুমি খুব রেগে আছ এটুকু শুধু বুঝছি। তুমি কেন, ও আমাকে কম জ্বালিয়েছে! তবু তো তোমাকে আমার থেকে বেশি কেয়ার করে—তুমি আর তোমার বর ওর খোঁজখবর রেখো একটু, নইলে আরো অধঃপাতে যাবে।

মিষ্টি নিজেকে ব্যক্তিত্বের সংযমে বেঁধেছে আবার। সামান্য মাথা নেড়ে স্পষ্ট অথচ মোলায়েম সুরে বলল, আমাদের অত সময় হবে না ভাই—এতকাল তোমরা খোঁজ-খবর রেখেছ, তোমরাই রেখো।

—আমরা! দুদিন বাদে আমরা তো আমেরিকায়! জানোই না বুঝি? বোকার মতো ফেঁসে গেলাম বলে, নইলে এই লোকের ভার কেউ কাউকে দেয়! তরল উচ্ছ্বাসে জিব এবারে আরো আলগা। কি অন্যায় দেখো, ছেলেদের বেলায় তিন-চারটে বউ নিয়ে ঘর করলেও দোষ নেই, আমাদের বেলায় একের বেশি হল তো মহাভারত অশুদ্ধ।

রসের কথায় ঊর্মিলা এমনিতেই ঠোঁট কাটা মেয়ে। কিন্তু এখন যেন ইচ্ছে করেই আরো বেপরোয়া। ও-পাশ থেকে বাপী আলতো করে বলল মহাভারতে তোমাদের একসঙ্গে পাঁচজনের ঘর করার নজির আছে, এত যখন টান বিজয়কে বলে দেখতে পারো...যদি রাজি হয়ে যায়!...

ঊর্মিলা ভ্রূকুটি করে তাকালো তার দিকে।—দেব ধরে থাপ্পড়। তারপরেই চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল।—আজ চলি ভাই, অনেক হামলা করে গেলাম—তোমার মনে থাকবে নিশ্চয়।

সৌজন্যবোধে মিষ্টিও উঠে দাঁড়াল। মুখের ওপর চোখ রেখে হাসছে অল্প অল্প। সামান্য মাথাও নাড়ল।

—থ্যাংক ইউ। বাপীকে ডাকল, এসো—

ঊর্মিলা আগে আগে দরজার দিকে এগলো। পিছনে বাপী। ঊর্মিলা দরজা ঠেলে বেরুতেই বাপী ঘুরে দাঁড়াল।

টেবিলের ও-ধারে মিষ্টি দাঁড়িয়ে তখনো। ঠোঁটের হাসি মিলিয়েছে। বাপী চেয়ে আছে। মিষ্টিও। এতক্ষণের উষ্ণ তাপ সেই পলকের মধ্যেই মুখের দিকে ঠেলে উঠেছে।

পলকা গাম্ভীর্যে বাপী বলল, চলি তাহলে?

মিষ্টি জবাব দিল না, চেয়েই আছে।

বাপী দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো।

বাপী গাড়ি চালাচ্ছে। সামনের দিকে গম্ভীর মনোযোগ। পাশে ঊর্মিলা। আড়ে আড়ে দেখছে তাকে। একটু বাদে আধাআধি ঘুরেই বসল। ভুরুতে পলকা ভ্রূকুটি। আটঘাট বেঁধে প্রস্তুত হবার মতো করে বলল, তাহলে কি দাঁড়াল?

বাপী নির্লিপ্ত জবাব দিল, কি আর, তোমার দেখাব ইচ্ছে ছিল, দেখা হল।

ঊর্মিলারও গম্ভীর হবার চেষ্টা। সামান্য মাথা নাড়ল।—হ্যাঁ দারুণ দেখা হল। প্রথমে মিষ্টি দেখলাম। তারপর মিষ্টির চোখ দিয়ে তোমাকে দেখলাম। শেষে তোমার চোখ দিয়ে মিষ্টিকে দেখলাম। এত দেখার ধাক্কায় এখন আমি খাবি খাচ্ছি, আর ভাবছি এ-সময়ে মায়ের বেঁচে থাকার খুব দরকার ছিল।

মায়ের কথায় বাপী একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিল তাকে।—এ সময়ে মানে?

—মানে বুঝতে তোমার অসুবিধে হচ্ছে? মা ছাড়া কে আর তোমাকে চুলের ঝুঁটি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে বানারজুলির মাটিতে পা দুটো পুঁতে রাখতে পারত?

বিবেকের কাঁটা ফোটাতে চায় ভেবে বাপীর ভিতরটা উষ্ণ হয়ে উঠল। তবু নিস্পৃহ সুরেই জিগ্যেস করল, তোমার খুব ভাবনা হচ্ছে?

—খুব। সম্ভব হলে বিজয়কে বলে যাওয়া ক্যানসেল করতাম।...এক্ষুনি কি ভাবছিলাম জানো?

ভিড়ের রাস্তা। বাপী মুখ ফেরালো না। কান খাড়া।

—ভাবছিলাম...এই মিষ্টি-হারা হয়ে বানারজুলিতে ফিরে সেই রাতে ক্ষেপে গিয়ে আমাকে যে তুমি একেবারে শেষ করে দাও নি সেটা নেহাত মায়ের পুণ্যির জোর। মিষ্টি তোমার চোখে কত মিষ্টি সেটা আজ বোঝা গেল। কিন্তু আমার মায়ের মতো অত পুণ্যির জোর তার স্বামী বেচারার আছে?

ধরা পড়ে বাপীরও মুখোশ খুলছে। ঠোঁটের ফাঁকে ক্রূর হাসির ঝিলিক।—নেই মনে হল?

—খুব। থাকলে মিষ্টি আরো ঢের সহজে তোমাকে বরদাস্ত করতে পারত। নয়তো ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারত। তার বদলে শ্যাম আর কুল দুই নিয়ে বেচারী কেবল জ্বলছে মনে হল।

বিশ্লেষণ শুনে কান জুড়লো। মা গায়ত্রী রাই তোমার মেয়ের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। ভিতরে পরিতুষ্ট আরো। মেয়েটা ভালবাসতে জানে বলেই ভালবাসার অনেক চেহারাও অনায়াসে মনে দাগ কাটে। তবু গায়ত্রী রাইয়ের মেয়েকে আর বাড়তে দেওয়া নিরাপদ ভাবছে না। তাই সামনে মনযোগ। গম্ভীর।—বাজে বোকো না।

—বাজে বকা হল? ঊর্মিলার গলা চড়ল একটু।—ওর বরকে তুমি একলা হোটেলে নিয়ে গিয়ে এনটারটেন করো কোন মতলবে—উদারতা দেখাও, না বুকে ছুরি বসাও?

সামনে ট্র্যাফিকের লাল আলো জ্বলে উঠেছে বাপীর সেদিকে খেয়াল নেই। একটা ক্রুদ্ধ ডাক শুনে আচমকা ব্রেক কষে গাড়ি থামালো। অদূরের পুলিশটা চেঁচিয়ে উঠেছে আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির নম্বর নেবার জন্য নোটবইটাও হাতে উঠেছে। তাড়াতাড়ি গাড়িটা ব্যাক করে বাপী সাদা দাগের এ-ধারে নিয়ে এলো। রুষ্ট পুলিশের দিকে চেয়ে এমন করে হাসল যেন লজ্জায় তারই মাথা কাটা যাচ্ছে। আশপাশের গাড়ি থেকেও অনেক দেখছে।

ছদ্মরাগে ঊর্মিলার দিকে ফিরে বাপী চোখ পাকালো।—তুমি মুখ বন্ধ করবে, না এর পর লোক চাপা দেব?

কিন্তু মুখের কথা শেষ হবার আগেই চোখ দুটো হঠাৎ প্রচণ্ড রকমের ধাক্কা খেল একটা। ঊর্মিলার ও-পাশ ঘেঁষে রং-চটা একটা ছোট অস্টিন গাড়ি দাঁড়িয়ে। তার চালকের বিস্ফারিত দুই চোখ এই গাড়ির দিকে। তার পাশে যে বসে সেই মহিলারও। স্থান-কাল ভুলে দু'জনেই তারা ঝুঁকে বাপীকে দেখছে, ক্রিম রঙের ঝকঝকে বিলিতি গাড়ি দেখছে, আর ঊর্মিলাকে দেখছে।

অস্টিনের চালকের আসনে বসে মণিদার পাশের বাড়ির কনট্রাকটর সন্তু চৌধুরী। তার পাশে মণিদার বউ গৌরী বউদি।

.. সন্তু চৌধুরীর স্টিয়ারিং-ধরা ডান হাতের পুষ্ট কব্জিতে সেই মস্ত সোনার ঘড়ি। দু'হাতের আঙুলে সেই রকম ঝকঝকে সাদা আর নীল পাথরের আংটি। পরনে ট্রাউজার গায়ে সিল্কের শার্ট। শার্টে হীরের বোতাম। ফর্সা রং বটে, মুখশ্রী আগেও সুন্দর ছিল না। ছটা বছর বয়েস বাড়ার দরুন কিনা জানে না, দেখামাত্র এই সাজসজ্জায় মানুষটাকে বাপীর আগের থেকেও খারাপ লাগল।

আগে লাল আলো খেয়াল না করে পুলিশের ধমক খেয়েছে। এখন আবার সবুজ আলোয় থেমে আছে দেখে পুলিশ হাঁক দিল। পিছনের দাঁড়ানো গাড়িগুলো হর্ন দিচ্ছে পাশের অস্টিনও ততক্ষণে বিশ গজ এগিয়ে গেছে। রাস্তাটা পেরিয়ে বাপী গাড়ির স্পিড চড়াতে গিয়েও ব্রেকেও পা রাখল। সামনের অস্টিন ফুটপাথের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গৌরী বউদি নামছে।

নিজের গাড়ি বাপী হাত দশেক পিছনে দাঁড় করালো। সামনের অস্টিন ওর জন্যেই দাঁড়িয়ে গেছে বুঝতে অসুবিধে হল না। গৌরী বউদি শুধু নয়, সন্তু চৌধুরীও নেমেছে। স্টার্ট বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে ইশারায় ঊর্মিলাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে বাপীও হাসি-হাসি মুখে নেমে এলো।

গৌরী বউদির পরনের হাল্কা নীল দামী শাড়ি। গায়ের শামলা রঙের সঙ্গে মানায় না এমন কটকটে শাড়ি বা ব্লাউস আগেও পরত না। তবে প্রসাধনের পরিপাট্য আগের থেকে কিছু বেড়েছে মনে হল। তা সত্ত্বেও বয়েসের দাগ স্পষ্ট। কাছে আসার ফাঁকে

বাপী হিসেব করে নিয়েছে।...সেদিন আঠাশ ছিল, এখন চৌত্রিশ। আঠাশের ধারালো কথাবার্তা আর তার থেকেও বেশি ধারালো মেজাজের ফাঁকে যে রসের দাক্ষিণ্য উঁকিঝুঁকি দিত, এখন তাতেও টান ধরেছে মনে হয়।

বিস্ময়ের ধাক্কায় সন্তু চৌধুরীর বরং আগের থেকেও দিল-খোলা হাসি মুখ। কাছে আসতে এক হাত কাঁধের ওপর তুলে দিয়ে বলল, আমরা তাহলে ভুল দেখি নি ব্রাদার —অ্যাঁ?

বাপীও হাসিমুখে মাথা নাড়ল। ভুল দেখে নি। তোয়াজের সুরে বলল, সন্তুদা আবার কবে ভুল দেখেছে।

এই সন্তু চৌধুরীই একদিন ওর চেহারাখানা 'ডিসেপটিভ' বলেছিল বাপী ভোলে নি। ভদ্রলোক আবার হাসল এক দফা।—তোমার বউদি তো দেখেও বিশ্বাস করতে পারে নি, তাই গাড়ি থামিয়ে নামলাম। কথার ফাঁকে আপাদ-মস্তক চোখ বুলিয়ে নিল একবার।—বিশ্বাস করা শক্তই অবশ্য...সেই তুমি পাঁচ-ছ' বছরের মধ্যে এই তুমি! কি ব্যাপার বলো দেখি ভায়া, চাকরিতে তো এত বরাত ফেরে না—ব্যবসা?

বাপী তেমনি হেসে মাথা নেড়ে সায় দিল।

সন্তু চৌধুরী ওর ঝকঝকে বিলিতি গাড়িটা আর একবার দেখে নিল। একই সঙ্গে ঊর্মিলাকেও। তারপর জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যবসা? কলকাতাতেই?

জবাবে কোটের ভিতরের পকেট থেকে মোটা ব্যাগটা বাপীর হাতে উঠে এলো। আইভরি ফিনিশড কার্ড বার করে তার হাতে দিল। ফ্ল্যাট নেবার পর এ কার্ড নতুন করা হয়েছে। ব্যবসার নাম মালিকের নাম বাড়ির ঠিকানা ফোন নম্বব সবই এতে ফলাও করে ছাপা আছে।

কার্ডটা উল্টে-পাল্টে দেখে সন্তু চৌধুরী সেটা গৌরী বউদির দিকে এগিয়ে দিল। হাতে নিয়ে গৌরী বউদিও চোখ বোলালো। বাপীর এখন অন্তত 'ডিসেপটিভ' মুখ তাতে নিজেরও সন্দেহ নেই। বুকের তলায় খুশির ঢেউ, বাইরে লজ্জা-লজ্জা মুখ।

তরল স্বীকৃতির সুরে সন্তু চৌধুরী বলল, তোমার সঙ্গে সেই পাঞ্জায় হারার পরেই আমার মনে হয়েছিল তুমি কালেদিনে কিছু একটা হবে—নাও ইউ আর রিয়েলি সাম-বডি! এ গ্রান্ড সারপ্রাইজ ব্রাদার—

গৌরী বউদিকে একবার দেখে নিয়ে সন্তু চৌধুরী আবার বাপীর দিকে তাকালো। খুব মজাদার কিছু মনে পড়েছে যেন।—তোমার বউদির সঙ্গে ও-টাও কথা বলছ না কি ব্যাপার! চওড়া কপালের তুলনায় ছোট ছোট দুই চোখে কৌতুক উপচে উঠল। জবাবের অপেক্ষা না রেখে তরল উচ্ছ্বাসে নিজেই মুখর আবার।—আমি ভায়া সব-কিছু স্পোর্টিংলি নিয়ে থাকি, বুঝলে? সেদিক থেকে আমি এভার গ্রীন অ্যান্ড এভার ইয়ং। হুট করে তুমি ঘর-ছাড়া হতে আমি তোমার হয়েই এক হাত লড়েছিলাম কিনা জিগেস করে দেখো!

বেশ গলা ছেড়ে হেসে উঠল সন্তু চৌধুরী। বাপীর হাসি ছোঁয়া নিরীহ দু'চোখ এখন গৌরী বউদির মুখের ওপর। চকিত ধড়ফড়ানিটুকু দৃষ্টি এড়ালো না। তার ঘর-ছাড়া হবার ব্যাপারটাকে এই লোকের কাছে গৌরী বউদি যে নিজের কদর বাড়ানোর মতো করেই বিস্তার করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাগ দূরে থাক বাপীর মজাই লাগছে।

সামলে নিয়ে বিরক্তির ভ্রূকুটি জোরালো করে তুলল গৌরী বউদি। ঝাঁঝালো গলায় বলল, মেয়েমানুষের সঙ্গে কি ইয়ারকি হচ্ছে! ছ'বছর আগের সেই মেজাজেই বাপীর দিকে ফিরল।—মস্ত মানুষ হয়েছ দেখতে পাচ্ছি, গরিব দাদার বাড়ির রাস্তা আর মনে নেই নিশ্চয়ই?

বাপী অম্লানবদনে জবাব দিল, নিশ্চয় আছে। হুকুম হলেই যেতে পারি।

গৌরী বউদি অপলক চেয়ে রইল একটু। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমার হুকুম করার দিন গেছে, ইচ্ছে হলে যেও একদিন...বাচ্চু এখনো তার বাপীকাকাকে ভোলে নি।

সাদা কথা ক'টা প্রাঞ্জল ঠেকল। গৌরী বউদির রাগ বিরাগ বা ঠেসঠিসারার সঙ্গে গলার এই সুর মেলে না। কিন্তু বাচ্চুর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরটা নির্দয় হয়ে উঠতে চাইল।...বছর সাতেক বয়েস ছিল তখন ছেলেটার, এখন বছর তের হবে। এই বয়সে বাপী অনেক জানত অনেক বুঝত, অনেক কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতো। আবু তখন বলত, মেয়ে-পুরুষের ভালবাসাবাসির ব্যাপারে মানুষে জানোয়ারে কোনো তফাৎ নেই। এই গৌরী বউদি আর মণিদা বানারজুলি বেড়াতে আসার ফলে বাপীর চোখের সামনে রহস্যের শেষ পর্দাটুকুও ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার হয়ে গেছিল।...আজ নিজের ছেলে মায়ের এই অভিসার কি-চোখে দেখছে? কি ভাবছে?

গৌরী বউদির দৃষ্টি আবার পিছনের গাড়ি অর্থাৎ ঊর্মিলার দিকে। সন্তু চৌধুরীও ঘনঘন ওদিকেই তাকাচ্ছিল। চাপা আগ্রহ নিয়ে ভদ্রলোক এবারে বাপীর দিকে ফিরল।—মেয়েটি কে...বাঙালী মনে হচ্ছে না তো?

—বাঙালী নয়।

—তোমার বউ?

বাপী চট করে গৌরী বউদির গম্ভীর মুখখানা দেখে নিল একবার। ঠোঁটের ফাঁকে সরস হাসি, সন্তু চৌধুরীর দিকে ফিরে জবাব দিল, আমার নয়, অন্য এক ভদ্রলোকের বউ।

গৌরী বউদি তাড়াতাড়ি নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। নিরাপদ ব্যবধান বুঝে সন্তু চৌধুরী চাপা আনন্দে গলা খাটো করে বলল, কংগ্র্যাচুলেশনস! তোমাকে দেখে খুব আনন্দ হল ব্রাদার...ফাঁক পেলে তোমার বাড়ি যাব'খন একদিন।

ভুল বোঝার ইন্ধন নিজেই যুগিয়েছে। ওই হাসি মুখের ভোল পাল্টে দেবার জন্য হাত দুটো নিশপিশ করে উঠল এখন। ওদিক থেকে গৌরী বউদির নীরব ঝাঁঝালো তাড়া খেয়ে ব্যস্ত পায়ে সন্তু চৌধুরী তার গাড়ির দিকে এগোল।

নিজের জায়গায় ফিরে গাড়িতে স্টার্ট দিতেই ঊর্মিলা ধমকে উঠল, মেয়েছেলে দেখলেই অমন আটকে যাও কেন—বসে আছি তো বসেই আছি।

সামনের গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। বাপী ধীরে সুস্থে চালাচ্ছে।

ঊর্মিলা আবার জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে দেখে ভদ্রলোক আর মহিলা দু'জনেই খুব অবাক মনে হল...কে?

সামনে চোখ রেখে বাপী এবার গম্ভীর মুখে জবাব দিল, মহিলা আমার জ্যাঠতুতো দাদার বউ। ভদ্রলোক তাঁর প্রেমিক।

ঊর্মিলার চাউনি উৎসুক। ঠিক বিশ্বাস হল না। তরল সুরেই আবার জিগ্যেস করল, তোমার আর মিষ্টির মতো?

বাপী ভিতরে ভিতরে ধাক্কা খেল একপ্রস্থ। গৌরী বউদির সঙ্গে সন্তু চৌধুরীর সম্পর্কটা কোন দিন নোঙরামির ঊর্ধ্বে মনে হয়নি বাপীর। তাই জবাবও অকরুণ।—বিজয় আর ফুটফুটে একটা ছেলেকে ফেলে তোমার অন্য কোনো লোকের ঘর করার মতো।

ঊর্মিলা বুঝল। সঙ্গে সঙ্গে নাক মুখ কুঁচকে বলে উঠল, কি বিচ্ছিরি! একটু বাদেই উৎসুক আবার।—এই জন্যেই তোমার ওপর মহিলাকে একটুও খুশি মনে হল না।—কিন্তু ওঁরা আমাকে অমন ঘন ঘন দেখছিলেন কেন—আর শেষে ভদ্রলোক কি বলছিলেন তোমাকে?

বাপী শেষেরটুকুর জবাব দিল। বলল, আমিও অন্যের বউয়ের সঙ্গে আনন্দ করে বেড়াচ্ছি ধরে নিয়ে ভদ্রলোক আমাকে কংগ্র্যাচুলেট করছিলেন।

ঊর্মিলা বাপীর কাঁধে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে নিজে সোজা হয়ে বসল।

বাপী বিমনা। মিষ্টির অফিস থেকে যে মেজাজ নিয়ে বেরিয়েছিল তার সুর কেটে গেছে। ছ'টা বছর জুড়ে মণিদার ছেলে বাচ্চুর মুখখানা ভাবতে চেষ্টা করল। পারা গেল না। সাত বছরের সেই দুষ্টু কাঁচ মুখখানা চোখে ভাসছে।

বুকের তলায় অবাঞ্ছিত মোচড় পড়ছে একটা।...মিষ্টির কোলেও আজ যদি একটা বাচ্চা থাকত বাপী কি করত? অসহিষ্ণু আক্রোশে চিন্তাটা মগজ থেকে ছিঁড়ে সরাতে চেষ্টা করল। পারল না। ভিতরের কেউ বরাবর যা করে তাই করছে। ওকে বিচারের মুখে এনে দাঁড় করাচ্ছে। জিগ্যেস করছে, সন্তু চৌধুরীর সঙ্গে তফাৎ কোথায়? তফাৎ কতটুকু?

ওই অদৃশ্য বিচারকের মুণ্ডুপাত করতে চেয়ে বাপী মনে মনেই ঝাঁঝালো জবাব দিল, তফাৎ ঢের, তফাৎ অনেক—মিলন আর ব্যাভিচারে যত তফাৎ—ততো।

কিন্তু ক্ষোভে আর আক্রোশে ওই একজনকে কেন্দ্র করে নিজের ভিতরটাও সময় সময় কত ব্যাভিচারী হয়ে ওঠে বাপী জানে। বিবেকের এই দ্বন্দ্ব থেকেও নিজেকে খালাস করার তাড়না। জীবনের শুরু থেকে সমস্ত সত্তা দিয়ে যার ওপর দখল নিয়ে বসে আছে তারই হাতে মার খাচ্ছে মনে হলে বাসনার আগুন শিরায় শিরায় জ্বলে ওঠে সত্যি কথাই। সর্বস্ব গ্রাস করেই তখন তাকে আবার সেই দখলের অন্তঃপুরে টেনে এনে বসাতে চায়। ব্যাভিচার শেষ কথা নয়। এক দরজায় ঘা খেলে ব্যাভিচার সতের দরজায় হানা দিয়ে বেড়ায়। মিষ্টি আর অসিত চ্যাটার্জীর সম্পর্কটাকেও মিলন ভাবতে রাজি নয় বাপী তরফদার। তার চোখে এও ব্যাভিচার। তাই এত দাহ, এত যন্ত্রণা। যাকে পেয়েছে. চোখ কান বুজে মিষ্টি তাকেই দোসর ভাবতে চাইছে।

...যদি সত্যি হয়, বাপীর যদি ভুল হয়ে থাকে. আর কারো বিচারের দরকার হবে না। বাপীর নিজের বিবেকই তাকে বেতের ঘায়ে দূরে সরিয়ে নেবে।

বিদেশে পাড়ি দেবার খানিক আগে ঊর্মিলা আবার না বুঝে এই বিবেকের ওপরেই আঁচড় কেটে বসল। বাপী এয়ারপোর্টে এসেছে ওদের তুলে দিতে। অকারণ ব্যস্ততায় বিজয় মেহেরা এদিক-ওদিক টহল দিচ্ছে। ঊর্মিলা একটা সোফায় চুপচাপ বসে। অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। মন খারাপ! বাপীকেও সামনে বসিয়ে রেখেছে

মন বাপীরও ভালো না। গায়ত্রী রাইয়ের এই মেয়ে কত কাছের। আজ এত দূর চলে যাচ্ছে বলে সেটা আরো বেশি অনুভব করছে। তবু নিজে হালকা হবার আর ওকে হালকা করার জন্যে টিপ্পনীর সুরে বলল. অত মন খারাপের কি হল, গিয়ে তো দুদিন বাদেই ভুলে যাবে।

ঊর্মিলা সোজা হয়ে বসল একটু। চোখে পলক পড়ছে না। বলল, বাপী, তোমাকে ফেলে আমার সত্যি যেতে ইচ্ছে করছে না।

বাপী ঘাড় ফিরিয়ে বিজয়কে খুঁজল। অদূরে দাঁড়িয়ে সে মালের ওজন দেখছে। বাপী এদিক ফিরল আবার।—ডাকব?

—ডাকো, বয়েই গেল। আমি কেন বলছি তুমি বেশ ভালোই জানো। তার থেকে এখানকার পাট তুলে নিয়ে বানারজুলি চলে যাও না বাপু, আমি নিশ্চিন্ত হই—

বাপী হাসছে মিটি-মিটি।—গেলাম। তারপর?

—তারপর আবার কি? সেখানে আবু রব্বানী আছে, সে তোমাকে পাহাড়ের মত উঁচু-মাথা প্রাণের বন্ধু ভাবে—যতদিন না দেখাশুনার অন্য লোক ঘরে আসছে, সে

দেখবে। ধমকে উঠল, হাসছ কেন?

—হাসছি না। ভাবছি।...বিজয়কে বাতিল করে তোমাকেই যদি আটকে ফেলতাম, তুমি কি করতে?

—তোমার মাথা করতাম।

—যে আসবে সে-ও তাই করবে না কি করে বুঝলে?

—কেন করবে? যে আসবে তারও যে একজন বিজয় থাকবে তার কি মানে?

—কিন্তু যার কাছে আসবে তার কেউ আছে জানলে?

রাগত সুরে ঊর্মিলা বলে উঠল, কে আছে? কোথায় আছে? সব চুকেবুকে গেছে যখন, ঘটা করে জানানোর দরকারটা কি?

বাপীও গম্ভীর এবার।—সব চুকেবুকে গেছে যখন তোমারই বা আমাকে নিয়ে এত দুর্ভাবনার কারণটা কি?...তুমি নিজেই বলো আমি কক্ষনো কোনো ছোট কাজ করতে পারি না—সে-বিশ্বাস এখন আর নেই তাহলে?

ঊর্মিলার মুখে আর কথা যোগালো না। চেয়ে আছে। চোখ দুটো বেশি চিকচিক করছে। এবারে তাকে একটু আশ্বাস দেবার মতো করে বাপী বলল, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, চুকেবুকে যদি গিয়ে থাকে, তাহলে সব ফুরিয়েই গেল। গেছে কিনা তাতে আমার যেমন সন্দেহ, তোমারও তেমনি। এর মধ্যে ছোট কাজ, বড় কাজ কিছু নেই, সুযোগ পেলে এর ফয়সালা আমি করব. সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর এই ইচ্ছেটাকে তুমি সাদা চোখে দেখতে পারছ না বলেই অশান্তি ভোগ করছ। সব গুলি মেরে দিয়ে নিশ্চিন্তে বাতাস সাঁতরে চলে যাও।

বাপী আবার হাসছে বটে, কিন্তু খুব কাছের একজন অনেক দূরে চলে যাচ্ছে এটুকু অনুভব না করে পারছে না। মাইকে যাত্রীদের সিকিউরিটির দিকে এগোতে বলা হল। ওদিক থেকে বিজয় মেহেরা হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলো।

আরো আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ওদের এরোপ্লেন আকাশে উড়তে দেখা গেল। অন্ধকারে এরোপ্লেন ঠিক দেখা গেল না। সগর্জনে একটা একটা বড় আলো দেখতে দেখতে ছোট হয়ে গেল, তারপর আর দেখা গেল না।

•

ঘড়িতে রাত পৌনে দশটা। ফাঁকা রাস্তায় বাপী তীব্র বেগে গাড়ি চালিয়ে আসছে। গাড়ি সার্কুলার রোডে পড়তেই মাস্টারমশাইয়ের কথা মনে হল। ঊর্মিলার ওখানে ছোটা-ছুটিতে আর কাজের ঝক্কিতে দু'দিনের মধ্যে একটা খবরও নেওয়া হয়নি। তার আগেও ভাল কিছু দেখিনি। ভদ্রলোক এখন নিশ্চিন্তে খুব নিশ্চিত কোন দিকে পা বাড়িয়েছেন সেটুকু আরো স্পষ্ট।

এত রাতে উনি জেগে নেই হয়তো। কুমুর জেগে থাকা সম্ভব। বাড়ির কাছের একটা লাইব্রেরিতে নাম লিখিয়েছে। ছোকরা চাকরটাকে দিয়ে বই আনায়। বাবার বিছানার পাশে বসে রাত জেগে বই পড়ে। বাপী যখনই যায়, লাইব্রেরির ছাপ-মারা একটা না একটা বই চোখে পড়ে। ছোকরা চাকরটা একদিন বই বদলে এনে তার সামনেই হেসে হেসে বুড়ো বাবুকে অর্থাৎ মাস্টারমশাইকে বলছিল, লাইব্রেরীর লোক নাকি ঠাট্টা করেছে, তার দিদি-মণি এই রেটে পড়লে শিগগীরই লাইব্রেরি ফাঁকা হয়ে যাবে। কুমকুম লজ্জা পেয়েছে। মাস্টারমশাই মেয়ের রাত জেগে বই পড়ার কথা বলেছিলেন। বাপীর মনে হয়েছে সময়ে ঘুমে এরই মধ্যে এই মেয়ের অভ্যস্ত হওয়ার কথা নয়।

যাবে কি যাবে না, দ্বিধা। আবার তক্ষুনি তা নাকচ করার ঝোঁক। গাড়ির স্পিড আরো চড়ল।

যা আশা করেছিল, তাই। দুটো ঘরেই আলো জ্বলছে। নিঃশব্দে গাড়ি থামিয়ে নেমে এলো। ঘরের দরজা বন্ধ। মাস্টারমশায়ের ঘরের দরজায় কয়েকটা মৃদু টোকা দিতে কুমকুম দরজা খুলে দিল।

—বাপীদা...এত রাতে?

বাপী তক্ষুনি লক্ষ্য করল। বিস্ময়ের আঁচড়ে মেকি কিছু ধরা পড়ল না। ভেতর কারো কত তাড়াতাড়ি বদলায় বাপীর ধারণা নেই। এই মেয়ের কাছে অন্তত এটুকু রাত বেশি রাত হল কি করে!

—আলো জ্বলছে দেখে নামলাম।...কেমন?

—একরকমই। ঘুমোচ্ছে। এসো...

ওর সঙ্গে নিঃশব্দে বাপী শয্যার কাছে এলো। বুক পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। দাড়ি সত্ত্বেও মাস্টারমশায়ের মুখ দুদিন আগের থেকে বেশি ফোলা মনে হল বাপীর। চাদর টেনে দেখতে গেলে ঘুম ভাঙার সম্ভাবনা। সে চেষ্টা না করে পাশের ঘরে এলো। ছোকরা চাকরটা মেঝেতে মাদুর পেতে শোবার তোড়জোড় করছিল। বাপীকে দেখে তাড়াতাড়ি মাদুর গুটিয়ে নিয়ে চলে গেল।

কুমকুম ব্যস্ত হয়ে বলল, বোসো বাপীদা, এক পেয়ালা চা করে আনি?

—এত রাতে আর চা না। চেয়ার টেনে বসল।—এর মধ্যে ডাক্তার দেখে গেছে? মুখ তো আরো ফোলা মনে হল।

—আমারও মনে হয়েছে। বাপী লক্ষ্য করছে, দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও ভেঙে পড়ার মেয়ে নয়। বলল, সকালে ডাক্তারকে ফোন করেছিলাম, শুনেও তিনি তো এই ওষুধই চালিয়ে যেতে বললেন...। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির মতো দেখা গেল একটু, বলল, দুদিন আসনি, বাবা নিজেকে ছেড়ে তোমার জন্যে বেশি ব্যস্ত।...এদিকে অন্য কাজে এসেছিলে বুঝি?

—একজনকে এয়ারপোর্টে তুলে দিয়ে ফিরছিলাম, ভাবলাম দেখে যাই—

বাপী চিন্তা না করেই দুজনের বদলে একজনকে বলেছে। তার ফলে এমন একটা প্রশ্ন শুনবে কল্পনার মধ্যে ছিল না। কুমকুমের চাউনি হঠাৎ উৎসুক একটু। বলে ফেলল বউদি কোথাও গেলেন?

শোনামাত্র বাপীর ভিতরে নাড়াচাড়া পড়ল একপ্রস্থ। প্রথমেই রাস্তায় দাঁড়ানো মেয়ের অন্তরঙ্গ ছলাকলা কিছু কিনা বোঝার চেষ্টা। সে-রকম আদৌ মনে হল না। তবু পাশ কাটিয়ে জবাব দিল, না, অন্য কেউ। সোজা চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ তোমার এ-কথা মনে হল?

আমতা আমতা করে কুমকুম বলল, শুনলে তুমি রাগ করবে না তো বাপীদা?

বাপীর সন্দিগ্ধ চাউনি ওর মুখের ওপরে আরো স্থির একটু।—আমি রাগ করব এমন কি কথা তুমি বলতে পারো?

গলার স্বরে হঠাৎ উষ্ণ আমেজ কেন কুমকুম তাই বুঝে উঠল না। বিমর্ষ অথচ ঠান্ডা সুরে বলল, তা না...আমি কেমন মেয়ে জানি, তবু বাবা তোমার কাছে কতখানি, নিজের চোখে দেখছি বলে রোজই খুব আশা হয়, বউদিও হয়তো তোমার সঙ্গে এসে বাবাকে একবারটি দেখে যাবেন। এখন বুঝছি আমার জন্যেই ঘেন্নায় আসছেন না...

এই মুখ দেখে আর এই কথা শুনে বাপীই বিমূঢ় হঠাৎ। তারপরেই চকিতে মনে পড়ল কিছু। এবারে গলার স্বরও নরম।—বউদি বলে কেউ কোথাও আছে তুমি ধরে নিলে কি করে?

সঙ্গে সঙ্গে কুমকুমও হকচকিয়ে গেল।—সেদিন যে তোমার গাড়িতে তোমার পাশে... বউদি নয়?

হ্যাঁ, বাপীরও সেই সন্ধ্যার কথাটাই মনে পড়েছিল। তার পাশে সেই একজনকে দেখে কুমকুম যা ভেবে বসে আছে, তা-ও ভাবতে ভালো লাগছে। এমন কি মেয়েটার এই ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখখানাও এখন ভালো লাগছে! ঠোঁটের হাসি চোখে জমা হচ্ছে। খুব হাল্কা করে জবাব দিল, এখন পর্যন্ত নয়।

এর পরেও মেয়েটার বিমূঢ় মুখে বিস্ময়ের আঁচড় পড়ছে দেখল। কেন পড়ছে তা-ও আঁচ করতে পারে।...সেই সন্ধ্যায় গাড়িতে তার পাশে বসার আগেই মিষ্টি শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে দিয়েছিল। বাপীকে সজাগ রাখার আর তফাতে রাখার সংকল্প বোঝানোর জন্যেই শাড়ির আঁচল মাথার ওপর দিয়ে বুকের আর একদিকে টেনে এনেছিল।...কুমকুমের এ-রকম ভুল হতেই পারে।

বাপী উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গও বাতিল।—আর রাত করব না, তুমি যাও। ...টাকা আছে তো হাতে?

মেয়েটার কমনীয় মুখে কৃতজ্ঞতা উপচে উঠল। বলল, অনেক আছে!

—ঠিক আছে।...ডাক্তারকে কাল আমিই না হয় ফোন করে দেব'খন একবার, এসে দেখে যাক। পারি তো একেবারে ধরেই নিয়ে আসব—

কুমু এমন চেয়ে রইল যে, বাপী তার পরেও থমকে দাঁড়াল। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আরো কিছু ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে।—বাপীদা আর কত করবে তুমি আমাদের জন্য—আর কত করবে?

এই ব্যাপারটাই বাপীর চোখে বা কানে সয় না।...আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে রেশমাকে মনে পড়ল। সেই সাপ-ধরা মেয়েটার কিছু ধারালো স্ফুলিঙ্গ হঠাৎ এর মধ্যেও আশা করছে কেন, জানে না। ঝাপটা-মারা গোছের গলার স্বর।—বাজে বোকো না, তোমার জন্যে কিছু করা হলে তখন ঋণ শোধের কথা ভেবো, বাপীদা কাউকে দয়া করে কিছু করে না, তখন মনে রাখতে চেষ্টা কোরো।

কুমকুম থতোমতো খেয়ে চেয়ে আছে। অবাকও।

নির্জন রাস্তায় গাড়ির স্পিডের কাঁটা পঞ্চাশের দাগ ছুঁয়েছে।...সব চুকেবুকে গেছে ভাবে না বলেই ঊর্মিলার দুশ্চিন্তা। ভালবাসার চেহারা ওই মেয়ে চেনে। মিষ্টির ওখান থেকে বেরিয়ে টিপ্পনী কেটেছিল, শ্যাম আর কুল দুই নিয়ে বেচারী কেবল জ্বলছে মনে হল। বাপী তাই বিশ্বাস করেছে, করে জোর পেয়েছে। আজও প্লেনে ওঠার আগে ঊর্মিলা হার মেনে ওর গোঁ বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। তারপর কুমকুমের কথা শুনেও কান দুটো লোভাতুর হয়ে উঠেছিল! শিকারে বেরিয়ে সেই সন্ধ্যায় কুমকুম গাড়িতে বাপীর পাশে যাকে দেখেছিল, তাকে তার বউ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেনি। বউদি নয় শুনে অবাক হয়েছে। আর বাপীর জবাব শুনেও মেয়েটা হকচকিয়ে গেছে। বাপী বলেছে, এখন পর্যন্ত নয়।

...মাথায় ঘোমটা তোলা কারো বউ এখন পর্যন্ত তার বউ নয় শুনলে অবাক হবারই কথা।

রণে আর প্রণয়ে নীতির বালাই রাখতে নেই। শয়তানকেও কাছে ডাকতে বাধা নেই। ও-কথার পর কুমকুমের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎই শয়তানের কিছু ইশারা মনের পাতাল ফুঁড়ে সামনে ধেয়ে আসতে চেয়েছে। তাই কুমকুমের পরের উচ্ছ্বাসটুকু বাপী বরদাস্ত করতে চায়নি। বরং সর্বনাশের দড়ির ওপর হেসে খেলে নেচে বেড়াতে পারে এমন মেয়ে রেশমাকে মনে পড়েছে।

কেন মনে পড়েছে বাপী এখন আর সেটা তলিয়ে দেখতে রাজি নয়। ভাবতে রাজি

নয়। তাহলে নিজেরই কোনো ভয়াবহ চেহারা ধরা পড়ার আশঙ্কা। ইচ্ছেটাকে বাপী চার চাকার তলায় গ‍ুঁড়িয়ে দিয়ে গাড়ি ছ‍ুটিয়েছে।

॥ পনেরো ॥

পরের একটা মাস বাপী কাজের মধ্যে ডুবে থাকল। মেয়েদের র‍ূপ সাজে, প‍ুর‍ুষের কাজে। মনের অবস্থা যেমনই থাক, প‍ুর‍ুষের এই র‍ূপটাকে বাপী কোনদিন অবহেলা করেনি। প্রাকপ্রচারের চটকে আর পার্টির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার ফলে শ‍ুর‍ু থেকেই সোনা ফলার লক্ষণ দেখা গেছে। আব‍ু রব্বানী এর মধ্যে তিনদফা ট্রাক বোঝাই মাল চালান দিয়েছে। চিঠিতে তার একবার কলকাতায় ঘ‍ুরে যাওয়ার ইচ্ছের কথাও লিখেছে। দোস্ত‍্কে এতদিন না দেখে ওর ভালো লাগছে না।

কিন্তু বাপীর কাছে আগে কাজ পরে দোস্তি। আর এক প্রস্থ মালের অর্ডার দিয়ে ট্রাক ফেরত পাঠিয়েছে। তাকে এখন আসতে নিষেধ করেছে। বানারজ‍ুলিতে এখন অনেক কাজ। ওর ওপরেই সব থেকে বেশি নির্ভর। গেল মাসে সেখানকার লেনদেনের হিসেব যা পাঠিয়েছে, তা দেখে বাপী আরো নিশ্চিন্ত। তার অন‍ুপস্থিতিতে সেখানকার লাভের অঙ্ক কোথাও মার খায়নি। ফাঁক পেলে বাপী নিজেই একবার যাবে লিখেছে। কিন্তু তেমন ফ‍ুরসৎ যে শিগগির হবে না তা-ও জানে। জিত্ মালহোত্রার কাজেকর্মে বাপী খ‍ুশি। ছেলেটা যেমন চৌকস তেমনি তৎপর। বাপী কি চায় বা কতটা চায় ম‍ুখ চেয়ে ব‍ুঝতে পারে। তব‍ু একা সে কত দিক সামলাবে। তেমন বিশ্বস্ত কাউকে পেলে বাপী তক্ষ‍ুনি টেনে নেয়। কিন্তু অজানা অচেনা লোক ঢ‍ুকিয়ে এতট‍ুকু ঝ‍ুঁকি নেবার মধ্যে সে নেই। সেরকম দরকার হলে আব‍ুকেই বরং বানারজ‍ুলি থেকে ব‍ুঝে শ‍ুনে কাউকে পাঠাতে বলবে।

কাজের চাপের মধ্যেও মাস্টারমশাইকে একবার করে দেখতে আসতে চেষ্টা করে! রোজ হয় না। যেদিন পারে না, জিত্‌কে খবর নিতে বলে দেয়। এ ব্যাপারেও লোকটার কিছ‍ু গ‍ুণ লক্ষ্য করেছে বাপী। মনিবের মাস্টার, তাই ওরও মাস্টারজি! তার মেয়েকে বলে মিস ভড়। অস‍ুস্থ মাস্টারের প্রতি মনিবের এত দরদের হেতু ওই মেয়ে কিনা মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু এই চালাক লোকটার ম‍ুখে কৌত‍ূহলের আভাসও দেখেনি।

বাপীর ফ্ল্যাটে এখন দ‍ুজন কাজের লোক মোতায়েন। একজন আধাব‍ুড়ো বাব‍ুর্চি রোশন। ইউ-পিতে ঘর। খাসা রাঁধে। এক হোটেল থেকে জিত্ ওকে খসিয়ে এনেছে। জিতের রাতের ডিনার এখন এখানে বরাদ্দ। দ‍ুটো বেডর‍ুমের একটাকে অফিস ঘর করা হয়েছে। সকাল দ‍ুপ‍ুরের বেশির ভাগ ঘোরাঘ‍ুরির মধ্যে কাটে। বিকেলের দিকে সে অফিস খ‍ুলে বসে। রাতে খেয়েদেয়ে মেসে ফেরে। বাইরে কাজ না থাকলে সকাল দশটা থেকে লাঞ্চ টাইম পর্যন্ত বাপী অফিসে বসে।

দ্বিতীয় কাজের লোকটার নাম বলাই। মিষ্টির মা মনোরমা নন্দীর সংগ্রহ। কথায় কথায় বাপী একদিন দীপ‍ুকে বলেছিল, ঘরের কাজ জানে আবার ফোন ধরে নাম-ঠিকানা লিখে রাখতে পারে এমন একজন বিশ্বাসী লোক খ‍ুঁজছে। তার দ‍ু'দিনের মধ্যে মনোরমা নন্দী একে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছেন। বছর উনিশ ক‍ুড়ি বয়েস। নাম ঠিকানা লিখতে পড়তে পারে কিনা জিগ্যেস করতে ম‍ুখে জবাব দিয়েছিল, ক্লাস ফাইভ ফেল, বাবা পড়ালে না বলে এই দ‍ুর্গতি। বাপী তক্ষ‍ুনি তাকে বহাল করেছে। ঘ‍ুম থেকে উঠে প্রায়ই দেখে মেঝেতে ইংরেজি কাগজ বিছিয়ে বলাই গম্ভীর ম‍ুখে চোখ বোলাচ্ছে। আর কিছ‍ু না হোক, এই কাগজ পড়া দেখেই বাব‍ুর্চি রোশন তাকে সমীহ করে। নাম-ধাম

খবর প্রয়োজন ইত্যাদি শুনে নিয়ে একটা খাতায় লিখে রাখে। মানিব ফিরলেই গড়গড় করে তাকে জানায়।

দীপুদার সঙ্গে মনোরমা নন্দীও একদিন এসে ফ্ল্যাট দেখে গেছেন। দরদী মাসির মতোই যতটুকু সম্ভব গোছগাছ করে দিয়ে গেছেন। বলাই আর রোশনকে সদাব্যস্ত সাহেবের খাওয়া-দাওয়া যত্ন আত্তি সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন। দীপুদা বাপীকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোর কথা তুলতে বাপীই তাড়াতাড়ি বাধা দিয়েছে। ঘরের ছেলে, যখন খুশি যাব, গল্প করব, খাব—নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন করলেই নিজেকে পর পর লাগবে মাসিমা।

মাসিমা খুশি। কিন্তু ঘরের ছেলের এ পর্যন্ত তার বাড়ি যাওয়ার ফুরসৎ হয়নি। দীপুদা এ নিয়ে টেলিফোনে অনুযোগ করেছে। বাপী বলেছে, সকাল থেকে রাত কি করে কাটছে যদি দেখতে তোমার মায়া হত দীপুদা।

অন্তরঙ্গ আপ্যায়ন অসিত চ্যাটার্জির দিক থেকেও এসেছে। বাপীর একই জবাব। যাবে, কিন্তু আপাতত দম নেবার সময় নেই। তারপর সাদা মুখ করে জিজ্ঞাসা করেছে, নেমন্তন্নটা তোমার না মিলুর?

অসিত চ্যাটার্জি ঘুরিয়ে জবাব দিয়েছে, আমি আর মিলু কি আলাদা? জানো আমার জন্য ও বাপের বাড়ি যাওয়াও ছেড়েছে প্রায়!

—তোমার জন্যে কেন?

লালচে দু ঠোঁট পুলকে টসটস।...পতির নিন্দা সতীর কাঁহাতক সয়। গেলেই তো আমার ঝুড়ি ঝুড়ি নিন্দে শুনতে হবে—

হেসেছে বাপীও। আর মনে মনে লোকটাকে জাহান্নমে পাঠিয়েছে।

ঊর্মিলা টেলিগ্রামে তাদের পৌঁছানো সংবাদ পাঠিয়েছিল। চার সপ্তাহ বাদে তার লম্বা চিঠি। বিজয় কাজে জয়েন করেছে। সকালে বেরোয়, রাতের আগে তার টিকি দেখা মেলে না। সপ্তাহে পাঁচদিন ওখানকার সব মানুষই কাজ-পাগল। বাকি দুদিন ফুর্তি আর বেড়ানো। কিন্তু ঘরকন্নার কাজে ওরা এত ব্যস্ত যে বেড়ানোর ফুরসৎ মেলেনি। ঘরের সমস্ত কাজ মায় রান্না পর্যন্ত ঊর্মিলাকে নিজের হাতে করতে হয়। প্রথম প্রথম কান্নাই পেয়েছে। কিন্তু সকলেই তাই করছে দেখে সয়েও যাচ্ছে। লিখেছে, এত দূরে গিয়ে এখন সব থেকে বেশি মনে পড়ে বানারজুলির কথা। তাজ্জব দেশ অনেক আছে, কিন্তু বানারজুলি বোধ হয় আর কোথাও নেই। মা-কে শুধু মনে পড়ে না মনে হয় মা যেন সেখানে তার অবাধ্য ছেলেটার আশায় একলা বসে দিন গুনছে। মায়ের সঙ্গে কোয়েলা, বাদশা ড্রাইভার, আর পাহাড়ের বাংলোর ঝগড়ুকেও খুব মনে পড়ে। মায়ের এই আশ্রিতদের ফ্রেন্ড কি ভুলে যাবে? তার পরেই খোঁচা। বানারজুলির আকাশ বাতাস পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে না পেলে ছেলেবেলার মিষ্টিকে কি আর অত মিষ্টি লাগত?

ঊর্মিলার দুষ্টুমি বাপী বুঝতে পারে। এইরকম করে মায়ের কথা আর বানারজুলির কথা লিখে ওকে কলকাতা থেকে সরাতে চায়। কিন্তু মিথ্যে লেখেনি। কাজে ডুবে থাকলেও মাঝে মাঝে হাঁপ ধরে। বানারজুলি তখন বিষম টানে। ওই ঊর্মিলার থেকেও ঢের বেশি ঘরছাড়া মনে হয় নিজেকে। তার চিঠিটা পাওয়ার পর দু-তিন দিনের জন্য একবার বানারজুলি ঘুরে আসবে ঠিক করল। গিয়ে কাজ নিয়ে মাথা ঘামাবে না। ওখানকার পাহাড়ে জঙ্গলে আগের মতোই নিজেকে ছড়িয়ে দেবে।

হল না। মাস্টারমশাই মারা গেলেন। ললিত ভড় চলে গেলেন।

আজীবন মানুষটা একটাই মুক্তি চেয়েছিলেন। ক্ষুধার মুক্তি। শুধু নিজের নয়, সকলের। এমন চাওয়ার খেসারত অনেক দিয়েছেন। এবারে সত্যিই মুক্তি। তাঁর বেঁচে থাকার মধ্যে তবু কিছু সোরগোল ছিল। গেলেন বড় নিঃশব্দে। গভীর রাতে বাপীর

একবার খোঁজ করেছিলেন নাকি। একটু ছটফটও করেছিলেন। এমন প্রায়ই হয়। তাই শেষ ঘনিয়েছে কুমকুম ভাবেনি, কারণ অন্যাদিনের মতোই খেয়েছেন। ঘুমিয়েছেন। রাত তিনটে নাগাদ মেয়েকে ডেকেছেন। ভোর হতে দেরি কত জিজ্ঞেস করেছেন। তখনো সাংঘাতিক কিছু কষ্ট হচ্ছে বলেননি। কেবল বলেছেন, ঘরে বাতাস এত কম কেন! বাবার মুখ দেখে আর শ্বাসকষ্ট দেখে কুমকুমের অবশ্য খারাপ লেগেছে। কিন্তু অত রাতে কি আর করবে সকালের অপেক্ষায় ছিল।

সকাল পাঁচটার মধ্যে শেষ।

বাপী কুমকুমের টেলিফোন পেয়েছে সকাল ছ'টায়। বাড়িঅলার ঘর থেকে ফোন করেছে. বলাই ধরেছিল। সাহেবের নিকট-কেউ অসুস্থ খুব. এ ক'দিনের মধ্যে বলাইয়ের জানা হয়ে গেছিল। কারণ. এই মেয়ে-গলার টেলিফোন সে আরো দিন দুই ধরেছে, আর একজনের শরীরের খবর সাহেবকে জানাতে হয়েছে। যেতে না পারলে সন্ধ্যার পর টেলিফোনে খবর দেবার কথা কুমকুমকে বাপীই বলে রেখেছিল।

দশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি বার করে বাপী বেরিয়ে পড়ল। উল্টো দিকে দু মাইল গাড়ি হাঁকিয়ে জিত্‌কে তার মেস থেকে তুলে নিল। আজ পর্যন্ত নিজের চোখে তিন-তিনটে মৃত্যু দেখেছে। পিসি. বাবা. গায়ত্রী রাই। না. আরো দুটো দেখেছে। বনমায়াব আর রেশমার। এই এক ব্যাপারে বাপীর নিজের ওপর এতটুকু আস্থা থাকে না। ভিতরে কিছু গোলমেলে ব্যাপার হতে থাকে।

...প্রসন্ন ঘুমে গা ছেড়ে শুয়ে আছে মানুষটা। চোখ দুটো আধ-বোজা। দুনিয়ার কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অভিযোগ রেখে গেছেন মনে হয় না। বাপী অপলক চোখে দেখছিল।

—শেষের ক'টা দিন বড ভালো কাটিয়ে গেলাম রে। আর কত খেলাম!

বাপী চমকে এদিক-ওদিক তাকালো।. .ক'দিন আগে মাস্টারমশাই বলেছিলেন কথা-গুলো। মনে হল. এখনো তাই বলছেন।

কুমকুমের মুখে রাতের বৃত্তান্ত শুনল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টনটনে জ্ঞান ছিল।

কুমকুমের বিবর্ণ, বিষণ্ণ মুখ। কিন্তু কাঁদছে না। বাপী তাইতেই স্বস্তি বোধ করছে। এ-সময়ে কারো আছাড়ি-বিছাড়ি কান্না শুনলে বা দেখলে আরো দম বন্ধ হয়ে আসে। ভেবেছিল. সেই রকমই দেখবে। আশ্রয় বা অবলম্বন খোয়ানোর ত্রাসে শোক অনেক সময় বেশি সরব হয়ে ওঠে। কুমকুমের বেলায় সেরকমই হবার কথা। বাপী মেয়েটার বিবেচনা আর সংযমের প্রশংসাই করল মনে মনে!

এক ঘণ্টার মধ্যে জিত্‌ সংকার সমিতির গাড়ি ভাড়া করে খাট আর ফুল নিয়ে হাজির। আর যা-কিছু দরকার শ্মশানে পাওয়া যাবে।

চিতা জ্বলে উঠতে জিত্‌কে বাপী তার ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে দিল. কাজের মৌসুমে এক-সঙ্গে দুজনেই আটকে থাকলে চলে না।

বিকেল তিনটের মধ্যে মর-দেহ ছাই। কুমকুমকে আগে নিজের গাড়িতে তার বাড়ি পৌঁছে দিল। ওপরতলার বাড়ি-অলা আর তার স্ত্রী সদয় হয়ে ছোকরা চাকরটাকে দিয়ে ঘর দুটো ধোয়ার কাজ সেরে এসেছে। দাহ-অন্তে কুমকুম গঙ্গায় স্নান করেছে। জিতের কেনা চওড়া খয়রা-পেড়ে কোরা শাড়ি পরেছে। অত শোকের মধ্যেও মুখখানা কমনীয় লাগছিল। নিজের ফ্ল্যাটের রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে বাপী তার কথাই ভাবছিল। আগে মাস্টারমশাইকে নিয়ে সমস্যা ছিল। এখন তিনি নেই বলে সমস্যা।

ফ্ল্যাটে পা দিতেই বলাই জানালো, পার্টির ফোন পেয়ে জিত্‌ সাহেব বেরিয়ে গেছেন। আর, খানিক আগে জামাইবাবু টেলিফোন করেছিলেন।

বাপী অবাক।—জামাইবাবু কে?

—আজ্ঞে...ও বাড়ির দিদিমণির বর, নন্দী সাহেবের ভগ্নীপতি...

এবারে বুঝল। বাপীর কেন যেন মনে হল মনোরমা নন্দীর পাঠানো লোককে রাখার ব্যাপারে আর একটু চিন্তা করা উচিত ছিল। জিজ্ঞাসা করল, দিদিমণি আর জামাই-বাবুকে তুমি চেনো?

খবর দিয়ে আবার কি ফ্যাসাদে পড়া গেল বেচারা ভেবে পেল না। জামাইবাবু বা দিদিমণি বললে নিজের কদর হবে ভেবেছিল। সাহেবের চাউনি দেখে অন্যরকম লাগছে। এবারে সত্যি জবাব দিল। পিওনের চাকরির আশায় নন্দী সাহেবের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে যেত, সেখানে ওঁদের দুই-একদিন দেখেছে...ও চেনে, তাঁরা ওকে চেনেন না।

ফোনে কি বলল জিজ্ঞাসা করতে বলাই আর জামাইবাবু শব্দটা মুখে আনল না। জানালো, সাহেব নেই শুনে ভদ্রলোক জানতে চাইলেন কোথায় গেছেন, কখন ফিরবেন। বলাই বলেছে কখন ফিরবেন ঠিক নেই, সাহেবের একজন নিকটজন মারা যেতে খুব সকালে সেখানে গেছেন, পরে সেখান থেকে শ্মশানে চলে গেছেন। কে নিকটজন ভদ্রলোক তাও জিগ্যেস করেছিলেন কিন্তু ও আর কিছু জানে না বলে এর বেশি বলতে পারে নি।

শোকের খবর নিতে অসিত চ্যাটার্জি বিকেলে এসে হাজির হতে পারে ভেবেও বিরক্ত।

অবেলায় অনেকক্ষণ ধরে চান করল। তারপর কিছু খেয়ে বিছানায় গা ছেড়ে দিল। ঘড়িতে বিকেল পাঁচটা। মাস্টারমশায়ের অনেক স্মৃতি চোখে ভাসছে। সে-সব ঠেলে সরিয়ে মাথাটাকে খানিকক্ষণের জন্য শূন্য করে দেওয়ার চেষ্টা।

একটু বাদে তাতেও বাধা পড়ল। হলঘরে ফোন বেজে ওঠার শব্দ কানে এলো। পাঁচটার পরে পার্টির টেলিফোন আসে না বড়। জিত্ হতে পারে। দু-হাতে ফোনটা নিয়ে বলাই ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকল। সাহেব শোবার ঘরে থাকলে তাই রীতি। হল-ঘর ছাড়া অন্য দুটো ঘরেও ফোন রিসিভ করার প্লাগ পয়েন্ট করে নেওয়া হয়েছে এই জন্যেই। বলাইএর শঙ্কিত মুখ দেখে বাপীর মনে হল অসিত চ্যাটার্জিরই ফোন আবার। শোকের খবর নেবার আগ্রহে চলেই আসে নি সেটা মন্দের ভালো। আসতে চাইলে কোনো অজুহাতে বারণ করা যাবে। প্লাগ করে দিয়ে বলাই তক্ষুনি সরে গেল।

বাপী শুয়ে শুয়েই রিসিভার কানে লাগিয়ে ক্লান্ত-গম্ভীর সাড়া দিল, হ্যালো.

—আমি মিষ্টি।

শোয়া থেকে বাপী উঠে বসল একেবারে। ঠাণ্ডা স্পষ্ট দুটো কথা কানের ভিতর দিয়ে ভিতরের কোথাও নামতে থাকল। বাপী ফের সাড়া দিতে ভুলে গেল।

নীরবতার ফলে লাইন কেটে গেল ভেবে ওদিকের গলার স্বর সামান্য চড়ল।—হ্যালো।

—হ্যাঁ, বলো।

—তোমার কে আত্মীয় মারা গেলেন শুনলাম...কে?

জেনেও বাপী জিজ্ঞেসা করল, কার কাছ থেকে শুনলে?

—অফিস থেকে টেলিফোন করেছিল। বলল, তোমার কোন আত্মীয় মারা গেছেন, তুমি শ্মশানে চলে গেছ।...তোমার তেমন নিকট-আত্মীয় কে আছেন আমি ভেবে পেলাম না।

—আত্মীয় নয়। খুব কাছের একজন।

চুপ একটু।—কে?

—তুমি চিনবে না।

—ও আচ্ছা, এই জন্যেই ফোন করছিলাম।

—কোথা থেকে?

—অফিস থেকে।

—আসবে?

—কোথায়? তোমার ওখানে?

এদিক থেকে নীরবতাটুকুই জবাব।

ওদিকেও থমকালো মনে হল একটু।—আজ না, তাছাড়া শ্মশানে গেছিলে শুনলাম। তুমি ক্লান্ত নিশ্চয় খুব।

বাপীর গলায় উচ্ছ্বাসের ছিটেফোঁটাও নেই। জবাব দিল, তুমি এলে ক্লান্তি বাড়বে না।

ওদিকে হাসির চেষ্টা। সুরও বিব্রত একটু।—আজ থাক্।......তোমার আপনার কেউ মারা গেলেন খবর পেয়ে অফিস থেকে টেলিফোনে বলেছিল...বিকেলের দিকে আমাকে তুলে নিয়ে তোমার ওখানে যাবে। আমি রাজি হইনি। তাকে ফেলে একলা চলে গেছি শুনলে কি ভালো হবে?

মনে যাই থাক, বাপী তক্ষুনি ঠাণ্ডা জবাব দিল, ভালো হবে না।

ওদিকের পরের সুর আরো সহজ।—তোমারও তো আমার ওখানে আসার কথা ছিল একদিন—

—তোমার হাজব্যাণ্ড বলেছিলেন। সাহস হয়নি...

—কেন?

—তোমার রাগ কতটা পড়েছে বুঝতে পারিনি।

গলার স্বরে কৌতুকের আভাস।—আমি রাগ কখন করলাম যে পড়বে।

—মাসখানেক আগে যেদিন ঊর্মিলাকে নিয়ে গেছিলাম। তোমার হাতভাবে মনে হয়েছিল জীবনে আর আমার মুখ দেখতে চাও না।

হাসি।—আমি তোমার মতো অত রাগ পুষে বসে থাকি না। সেদিন কেন অত রাগ হয়েছিল তুমি ভালোই জানো।

—কথার খেলাপ করে তোমার হাজব্যাণ্ড যদি ড্রিংক করে বাড়ি ফেরে তার দায় আমার ঘাড়ে কেন?

চুপ একটু। তারপর কথা শোনা গেল।—যেতে দাও, আগেও তুমি কক্ষনো কিছু বুঝতে চাইতে না—এখনো না।

—আগে বলতে? বাপীর এখনো না বোঝার ভান।

আগে বলতে অনেক আগে। সেই বানারজুলি থাকতে। চট করে প্রসঙ্গ বদলে ফেলল। —ঊর্মিলা বাইরে চলে গেল?

—হ্যাঁ।

—আমার সম্পর্কে যাচ্ছেতাই ভেবেছে নিশ্চয়?

—না। আমাকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বানারজুলি চলে যেতে পরামর্শ দিয়ে গেছে।

—কেন?

—কোন দিন মার-ধর খেতে পারি ভেবেছে হয়তো।

হাসল।—তোমাকে হয়তো তার চিনতে এখনো কিছু বাকি আছে তাহলে। আচ্ছা, আজ ছাড়ি?

—হ্যাঁ।

ওদিকে টেলিফোন নামানোর শব্দ।

হাতের রিসিভারটা বাপী বার কয়েক নিজের গালে ঘষল। কানের ভেতর দিয়ে একটা স্পর্শ এতক্ষণ ধরে তাকে লোভাতুর করে তুলেছিল। ফোন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত প্রতিক্রিয়া। মিষ্টি এই তার দ্বিতীয় জীবনের গোড়া থেকেই আপস চেয়ে আসছে। এখনো চায়। কেন চায়, বাপীর কাছে তা একটুও অস্পষ্ট নয়। মন থেকে ছেঁটে দিতে

পারলে তাকে নিয়ে ও-মেয়ের এতটুকু মাথাব্যথা থাকত না। পারছে না। বাপীর মন বলে দিচ্ছে পারা সম্ভব নয়।

বাপী তরফদার শেষ দেখবে। যদি আরো ছিন্ন-ভিন্ন ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়—হবে। তবু মিষ্টির আপোসের দোসর হতে রাজি নয়।

মাস্টারমশায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তির কাজ পুরোহিতকে বলে কয়ে বাপী এক মাসের জায়গায় তেরোদিনে টেনে নিয়ে এলো। আড়ম্বরের ধার দিয়েও যায়নি। তা বলে আচার-অনুষ্ঠানের ত্রুটি রাখেনি। কুমকুম কালীঘাটে কাজ করেছে। শেষ হতে বেলা তিনটে গড়িয়েছে। বাপী এতক্ষণ থাকতে পারবে নিজেও ভাবে নি। সাহায্যের জন্য জিত্ উপস্থিত ছিল। তাকে রেখে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু কাজ শুরু হবার পর কেন যেন আর নড়তেই পারল না। জিত্‌কে চলে যেতে বলল।

খুব ছেলেবেলায় বাপী পিসির কাজ করেছিল। একটু বড় হতে বাবার কাজ করেছে। মনে রাখার মতো কোন ছাপই তখন পড়েনি। এখনো অভিভূত হয়েছে এমন নয়। পড়ার নেশায় আত্মার খবর বইয়ে যা একটু-আধটু পড়েছে। তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামায়নি। আজ এই কাজ দেখতে ভালো লাগার স্বাদটুকু নতুন। গঙ্গায় স্নান করে চওড়া লালপেড়ে কোরা শাড়ি পরে কুমকুম কাজের আসনে বসেছে। একপিঠ ছড়ানো চুল। যজ্ঞের আগুনের আভা বার বার মুখে এসে পড়ছে। এই সময়টুকু অন্তত ওর সমস্ত অস্তিত্ব একাগ্র নিষ্ঠায় অবনত। ওর দিকে তাকিয়ে শুচিতা যে ঠিক কাকে বলে বাপী ভেবে পেল না। মৃতের আত্মা বলে কোথাও যদি কিছু থেকে থাকে, তার প্রসাদ থেকে এই কুমুকে অন্তত বঞ্চিত ভাবা যাচ্ছে না।

পরদিন থেকেই আবার বাস্তব চিন্তা। মেয়েটাকে কোন কাজে লাগানো যেতে পারে ভাবছে। একটা কাজ হাতে মজুত। বানারজুলি থেকে মদ চালান আনার প্রস্তাব দিয়েছিল জিত্ মালহোত্রা। এখনো সে-আশা একেবারে ছাড়ে নি। তার মতে ওখান থেকে এখানে এতে ঢের বেশি লাভ। আবুকে জানালেই ব্যবস্থা পাকা করতে তার সময় লাগবে না। রেশমা হলে বাপী একটুও ভাবত না। রেশমার থেকে এই মেয়ে ঢের বেশি নরকের আবর্তে ডুবেছে, বাপীর তবু দ্বিধা একটু। মাস্টারমশায়ের মেয়ে বলেই হয়তো। জীবন-যুদ্ধে এ-রকম ভাবপ্রবণতার ঠাঁই নেই ভেবেই কুমকুমের মধ্যে অনেক সময় রেশমাকে দেখতে চেয়েছে সে। তবু মন স্থির করে উঠতে পারছিল না।

পরের সন্ধ্যায় কুমকুম নিজেই তুলল কথাটা। প্রথমে বাড়ির কথা। জিজ্ঞাসা করল মাসের বাকি কটা দিন ও এখানেই থাকতে পাবে, না তার আগেই বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

বাপীর ভিতরে একটা তির্যক আঁচড় পড়ল তক্ষুনি। চুপচাপ চেয়ে রইল একটু। জিজ্ঞাসা করল, বাড়ি ছাড়ার কথা উঠছে কি করে, তুমি কোথায় যাবে?

কুমকুম অবাক একটু।—বিব্রতও। বলল, বাবার জন্য যা করেছ—করেছ, এখন আমার জন্যে এত ভাড়া গুনে এ বাড়ি তুমি আটকে রেখে দেবে নাকি?

ভেতরটা তেতে উঠছে বাপী নিজেই টের পাচ্ছে। জবাবও নীরস।—তোমার জন্য কিছু দান খয়রাত করার কথা আমি ভাবছি না। আমি জিগ্যেস করছি, বাড়ি ছাড়লে তুমি কি করবে?

পুরুষের গলার আওয়াজ পেয়ে সামনের দরজায় একটি মাঝবয়সী রমণী মুখ বাড়ালো। পলার মা। পলা কুমকুমের ছোকরা চাকর। মাস্টারমশাই চোখ বুজতে কুমকুমের কাছে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। বাপীকে দেখে চট করে সরে গেল।

শুকনো গলায় কুমকুম বলল, পলার মা বলেছিল তাদের বস্তিতে একটা ঘর খালি আছে। অসহায় অথচ ঠাণ্ডা দু' চোখ বাপীর মুখের ওপর থমকালো একটু। আবার

বলল, নিজের ভাবনা-চিন্তা আমি অনেক দিন ছেড়েছি বাপীদা। বাবাকে নিয়ে আমার যেটুকু সাধ ছিল তার ঢের বেশি তুমি মিটিয়ে দিয়েছ। আমার মতো একটা মেয়ের জন্য তুমি ভেবো না।

বাপী চেয়ে আছে। দেখছে...এই দু' আড়াই মাস ভালো থেকে ভালো খেয়ে ভালো পরে মেয়েটার শ্রী অনেক ফিরেছে। পুরুষের ক্ষুধার মুখে অনায়াসে নিজেকে এখন আগের থেকেও বেশি লোভনীয় করে তুলতে পারবে হয়তো। এই জোরেই বাড়ি ছাড়ার কথা বলছে কিনা বাপীর বোঝার চেষ্টা। গলা দিয়ে রাগ আর ব্যঙ্গ একসঙ্গে ঠিকরে বেরুলো।—বাড়ি ছেড়ে বস্তিতে যাবে আর আগের মতো রাস্তায় দাঁড়াবে ঠিক করেছ তাহলে?...নাকি পলার মা তোমাকে ভালো খদ্দের জোটানোর আশ্বাসও দিয়েছে?

কুমকুমের সমস্ত মুখ পলকে বিবর্ণ পাংশু। মাথা নীচু করে একটা চাবুকের যন্ত্রণা নিঃশব্দে সহ্য করল। আস্তে আস্তে মুখ তুলল তারপর।—বাপীদা, তুমি এত বড় যে বাবা চলে যাবার পর তোমার কাছে আসতেও আমার অস্বস্তি। তাই তোমার বোঝা আর না বাড়িয়ে নিজের অদৃষ্ট নিয়েই আবার ভেসে যাওয়ার কথা বলছিলাম—

তিক্ত রূঢ় গলায় বাপী বলে উঠল, আমি একটুও বড় না। অনেক কাজ আমাকে করতে হয় যা কেউ বড় বলবে না বা ভালো বলবে না! আমি কারো মতামতের ধার ধারি না। সে-রকম কোনো কাজে আমি তোমাকে টেনে নিতে পারি—তাতে আর কিছু না হোক, বাড়ি ছাড়তে হবে না বা রাস্তায়ও গিয়ে দাঁড়াতে হবে না। রাজি আছ?

অবিশ্বাস্য আগ্রহে কুমকুম উঠে দাঁড়ালো। চোখে মুখে বাঁচার আকুতি। মুখেও তাই বলল।—বাগডোগরার এয়ারপোর্টেও তুমি কাজ দেবার কথা বলেছিলে বাপীদা—এখনো যদি সে রাস্তা থাকে আমি তো বেঁচে যাই—আমি কোন্ মুখে আর তোমাকে সে-কথা বলব!

কৃত্রিমতা থাকলে বাপীর চোখে ধরা পড়ত। নেই। মেজাজ প্রসন্ন নয় তবু বলল, এ-ও জল-ভাত রাস্তা কিছু নয়, ঝুঁকি আছে বলেই এতেও কিছু বুদ্ধি-বিবেচনার দরকার আছে, সাহসের দরকার আছে।

আশায় উদ্‌গ্রীব মুখ কুমকুমের।—আমার বুদ্ধি-বিবেচনায় কুলোবে কিনা তুমিই ভালো জানো বাপীদা—আমার আর খোয়ানোর কিছু নেই, তাই ঝুঁকি নেবার মতো সাহসের অভাব অন্তত হবে না। তাছাড়া তুমি আছ, চোখ বোজার এক মাস আগেও বাবা কি বলে গেছে তুমি জান না বাপীদা—

কানে গরম কিছুর ছেঁকা লাগল। ওকে থামিয়ে বাপী চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো। তেমনি নীরস গম্ভীর গলায় বলল, শোনো, যিনি চলে গেছেন, এরপর তাঁকে টানলে আমারও অসুবিধে, তোমারও। এখন থেকে তুমি শুধু তুমি—মনে থাকবে?

ধাক্কা সামলে নিয়ে কুমকুম মাথা নাড়ল। থাকবে।

—ঠিক আছে। আপাতত যেমন আছ—থাকো।

বাপী বেরিয়ে এলো। একটু বাদে গাড়ি দক্ষিণে ছুটল।...মেয়েটা দুঃখ পেল হয়তো, কিন্তু ও নিজে স্বস্তিবোধ করছে। মাস্টারমশাই মুছে গেছেন। যে আছে নতুন করে আর তার কিছু হারানোর নেই, খোয়ানোর নেই—এটুকুই সার কথা, সত্যি কথা। ও মেয়ে নিজেই এ-কথা বলেছে। বাপীও শুধু এই বাস্তবের ওপরেই নির্ভর করতে পারে। নইলে তার যেমন অসুবিধে, মেয়েটারও তেমন ক্ষতি।

এখন আর বিবেকের আঁচড়পাঁচড় কিছু নেই। হাল্কা লাগছে।

মাস্টারমশাই মারা যেতে কাজে একটু ঢিলে পড়েছিল। বাপী তাই আবার কটা দিন

বেশ ব্যস্ত। একটু খুশি মেজাজেই সেদিন দক্ষিণদিক থেকে গাড়ি চালিয়ে আসছিল। এক নামী ওষুধের কারখানার কর্তাব্যক্তির সঙ্গে একটা বড় কনট্রাক্টের কথাবার্তা পাকা। তাদের পারচেজ অফিসারের মারফৎ চাহিদার লিস্টও হাতে এসে গেছে। বছরে আপাতত দেড়-দু লাখ টাকার মাল তারা ওর কাছ থেকে নেবে আশা করা যায়।

আজ আর ঘোরাঘুরি না করে তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার ইচ্ছে। ঊর্মিলা এর মধ্যে আরো দুটো চিঠি লিখেছে। একটারও জবাব দেওয়া হয়নি। এরপর হয়তো রাগ করে টেলিগ্রাম করে বসবে। আর কিছু না হোক, মেয়ে তার মায়ের মেজাজখানা পেয়েছে। ঘরে ফিরে প্রথম কাজ ওকে চিঠি লেখা।

গাড়ি ভবানীপুরের রাস্তায় পড়তে ভিতরটা উসখুস করে উঠল।...সামনের বাঁয়ের রাস্তায় গাড়িটা ঘুরিয়ে দিলে সেই পঁচিশ-ঘর বাসিন্দার টালি এলাকা পাঁচ মিনিটের পথ। আজ নতুন নয়, এ-পথে এলেই গাড়িটা ওদিকে ঘোরাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ব্রুকলিন রতন বণিক ওকে যতো টানে, নিজেরই অগোচরের নিষেধ ততো বড় হয়ে ওঠে।

পার্ক স্ট্রীটের মুখে পড়ার আগেই আজ আবার আর একজনের কথা মনে পড়ল। গৌরী বউদি।...সেদিন বাইরে একটা পরিবর্তন দেখে নি গৌরী বউদির, কিন্তু ভিতরে কিছু রকম-ফেরের আভাস্ পেয়েছিল। অথচ তফাতটা কি স্পষ্ট করে ধরতে পারে নি। ওকে বলেছিল, ইচ্ছে হলে যেও একদিন বাচ্চু এখনো তার বাপীকাকাকে ভোলে নি।

গাড়িটা ঘুরিয়ে দিল। ওখানে যেতে নিষেধ নেই আর।

দোরগোড়ায় গাড়ি থামিয়ে বিকেলের টান-ধরা আলোয় পাশাপাশি দুটো বাড়িই দেখে নিল একবার। দুটোই জীর্ণ, মলিন। চুন-বালি খসা। অনেকদিন সংস্কার হয়নি বোঝা যায়। বাড়ি দেখে বিচার করলে সন্তু চৌধুরীর রোজগারে কিছু ভাঁটা পড়েছে মনে হবে। গাড়িতে বসেই কয়েকবার হর্ন বাজালো। কিন্তু দোতলার বারান্দায় কেউ এসে দাঁড়াল না। অগত্যা নেমে দোতলার কলিংবেল টিপল।

একটু বাদে যে এসে দরজা খুলল, সে বাচ্চু কোনো সন্দেহ নেই। বছর তের বয়েস। আগের থেকে অনেক লম্বা হয়েছে। পরনে হাফপ্যান্ট, গায়ে ময়লা হাফশার্ট। শুকনো রোগাটে মূর্তি।

ঝকঝকে গাড়িটা দেখে আর ফিটফাট এক সাহেব মানুষ দেখে ছেলেটা ভেবাচাকা খেয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইল। চেনা আদল অথচ ঠিক ধরতে পারছে না কে।

বাপী বলল, তোর বাপীকাকুকে চিনতেই পারলি না রে!

শুকনো মুখে আচমকা খুশির তরঙ্গ। বলা মাত্র চিনেছে। কিন্তু সেদিনের সেই বাপীকাকু আজ এমন গাড়ি-অলা মস্ত সাহেব হয়ে গেছে দেখে উচ্ছল হয়ে উঠতে পারছে না। তাড়াতাড়ি বলল, চিনেছি, মা বলেছিল তুমি কলকাতায় আছ, একদিন আসতেও পারো—

তার হাত ধরে বাপী হাসিমুখে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, অনেক বড় হয়ে গেছিস—কোন ক্লাস হল এখন?

—ক্লাস সেভেন।

—ফাস্ট্-টাস্ট হচ্ছিস তো?

দোতলায় উঠে হাত ছেড়ে দিতে ছেলেটা বিব্রত মুখে বলল, এবার ফেল করতে করতে পাশ করে গেছি—

—সে কি রে! কেন, দেখবার কেউ নেই বুঝি?

আসার সঙ্গে সঙ্গে বাপীকাকুকে এমন অপ্রিয় খবরটা দিতে হল বলে ছেলেটার বিমর্ষ মুখ। মাথা নাড়ল, নেই।

দোতলায় এখনো আগের মতো ডাইনিং টেবিল পাতা। কিন্তু যত্নের অভাবে টেবিল চেয়ার এমন কি ঘরের দেওয়াল পর্যন্ত শ্রীহীন। সামনের বসার ঘরের পর্দাও বিবর্ণ ছেঁড়াখোঁড়া।

বাচ্চু তাকে বসার ঘরে এনে বসালো। সোফা-সেটিগুলোরও কাল ঘনিয়েছে বোঝা যায়।

—তোর মা বাড়ি নেই?

ছেলেটা ভেবাচেকা খেয়ে গেল একটু। তারপর বলল, মা তো এ বাড়িতে থাকে না—মায়ের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল, তুমি জানো না?

একটা বড় রকমের ধাক্কা সামলে বাপীর সহজ হবার চেষ্টা। কিন্তু ছেলেটার কথার জবাবে মাথাও নাড়তে পারল না। মা কবে থেকে এ বাড়িতে থাকে না তা-ও জিজ্ঞাসা করতে পারল না।

বাচ্চু এবারে নিজেই মাথা খাটিয়ে বলল, সন্তুকাকু অনেক দূরে বাড়ি করেছে তো—মা সেইখানে থাকে।...তোমাকে এখন কি সুন্দর লাগছে দেখতে বাপী কাকু—আগের থেকে ঢের ভালো। ছেলেটা কি বলবে বা কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।—ভিখুদা আছে বাপীকাকু, তোমাকে এক পেয়ালা চা দিতে বলি?

বুকের তলায় মোচড় পড়ছে। বাপী তাড়াতাড়ি সায় দিল, বল্—

ছুটে চলে গেল। ফিরেও এলো তক্ষুনি। অপ্রতিভ মুখ।—এই যাঃ! ভিখুদাও তো বাড়ি নেই বাপীকাকু...আমি করে আনি?

বাপী তাড়াতাড়ি বাধা দিল, তোকে করতে হবে না, বোস—আমি চা খুব কম খাই।

ঘরটা অন্ধকার লাগছিল। বাচ্চু সুইচটা টিপে দিয়ে মুখোমুখি বসল।

—তোর বাবার অফিস থেকে ফিরতে রাত হয় এখনো?

বাচ্চু আবার অবাক।—বাবার অফিস কি, কত বছর আগেই তো চাকরি চলে গেছে। বাবা এখন দুপুরে খেয়ে-দেয়ে বেরোয় আর অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যের সময় আসে। খানিকক্ষণের মধ্যে এসে যাবে—

এবারের ধাক্কাটা ততো বড়ো না হলেও বড়ই। মণিদার চাকরি কেন চলে গেছে আঁচ করা কঠিন নয়। তার ওখানে বাপীর চাকরির প্রসঙ্গে গৌরী বউদি বাধা দিয়ে বলেছিল, তোমার ওখানে ঢুকে পরের ছেলে হাতকড়া পরুক শেষে। হাতকড়া না পরলেও মণিদা নিজের চাকরিই রাখতে পারল না। ছেলেটার এই স্বাস্থ্য বা এই চেহারা কেন বাপী এখন বুঝতে পারছে।...ফুটপাথে দাঁড়িয়ে গৌরী বউদি সেদিন বলেছিল, তার হুকুম করার দিন গেছে। সে-কথার অর্থও এখনও জলের মত স্পষ্ট।

সাগ্রহে বাচ্চু জিজ্ঞাসা করল, আজ তুমি এখানে থাকবে বাপীকাকা? বলে ফেলেই অপ্রস্তুত একটু। প্রস্তাবটা কত অসম্ভব নিজেই বুঝছে যেন।

ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে বাপীর শুধু মায়া হচ্ছে না। যন্ত্রণাও হচ্ছে। বাপীকাকু-অন্ত প্রাণ ছিল একদিন, একসঙ্গে খাওয়া-শোয়া পড়া হুটোপুটি করার সব স্মৃতিই হয়তো মনে আছে। বলল, থাকতে পারছি না, তবে তোর সঙ্গে এর পর থেকে মাঝে মাঝে দেখা হবে। আমি কলকাতায় আছি তোর মা বলল?

—হ্যাঁ।

—মায়ের সঙ্গে তোর কোথায় দেখা হল, এখানেই?

—হ্যাঁ, মা তো মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে আসে, আর মাসের প্রথমে আমার জন্য বাবার হাতে টাকা দিয়ে যায়...এবারে টাকা দিতে এসে বলেছিল। তার পরেই সন্ত্রস্ত।—বাবা এলে তাকে কিন্তু এসব কিছু বোলো না বাপীকাকু, শুনলেই আমাকে মারবে।

বুকের তলায় আরো একটা আঁচড়। হাত ধরে কাছে টেনে নিল।—বাবা তোকে আজকাল মারে নাকি?

—খুব। ভয়ে ভয়ে দরজার দিকটা দেখে নিল একবার। তারপর গোপন কিছু ফাঁস করার মতো করে বলল, মা যখনই আসে, বাবাকে যাচ্ছেতাই করে বকাবকি করে তো, বাবা তখন খুব রেগে থাকে—তারপর একটু কিছু হলেই আমাকে মারে। পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হয় বলেও মার খেতে হয়—তুমি আমাকে আবার আগের মতো পড়াবে বাপীকাকু?

ঘরে যেন বাতাস কম।—দেখি, কি ব্যবস্থা করা যায়। এই বাপের কাছেই শুধু ছেলেটা কিছু আদর-যত্ন আর প্রশ্রয় পেত। দুটো চারটা বছর বাদে এই ছেলে ওই বাপকে কি চোখে দেখবে বা কতটুকু ভয় পাবে?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। বাচ্চু সচকিত তক্ষুনি। ভয়ে ভয়ে বলল, বাবা আসছে। বাপীকাকুকে দেখে বাবা খুশি হবে কিনা সেই আশংকা।

মণিদা ঘরে ঢুকল। রাস্তার আলোয় দোরগোড়ায় ঝকঝকে গাড়ি দেখেছে, তখনো তার ঘরে কেউ এসেছে ভাবেনি হয়তো। এই বেশে বাপীকে দেখে হকচকিয়ে গেল।

—বাপী যে...কখন এলি?

—এই তো কিছুক্ষণ। তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, এবার যাব।

—বোস্ বোস্, চা-টা দিয়েছে?

বাচ্চু বলে উঠল, ভিখুও বাড়ি নেই বাবা, কে দেবে?

মণিদার শরীরের বাড়তি মেদ ঝরে গেছে। জামাকাপড়ের বিলাস সুখের দিনেও খুব ছিল না, কিন্তু এখন দুরবস্থা বোঝা যায়! গালে তিনদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

ঠাণ্ডা গলায় বাপী বলল, চায়ের দরকার নেই, বোসো।

মণিদা পরিশ্রান্ত বেশ। ঘামছে। বসে একটু সহজ হবার চেষ্টা। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বিড়ি বার করে ধরালো। আগে সর্বদা চুরুট মুখে থাকত। বলল, তুই কলকাতায় আছিস খবর পেয়েছি, অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছিস শুনলাম.. নিচের ওই গাড়িটা তোর নাকি?

—হ্যাঁ।

—বেশ, বেশ। উৎসুক একটু।—কিসের ব্যবসা করছিস?

—অনেক রকমের। বাচ্চুকে বলল, সাতটা বাজল, তুই বই-টই নিযে বোসগে যা—আমি বাবার সঙ্গে কথা বলি।

বাচ্চু তক্ষুনি চলে গেল। বাপী মণিদার দিকে ফিরল।—তোমার খবর তেমন ভালো নয় বোধ হয়?

—নাঃ। চাঁচাছোলা প্রশ্ন শুনে সহজ হবার চেষ্টা ছেড়ে মণিদা বলল, একটা গণ্ডগোলে পড়ে চাকরিটা চলে গেল, তোর বউদিও অবুঝের মতো বিগড়ে গেল . । হাতের বিড়িটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে এবার অসহায়ের মতো বলে ফেলল, কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করে দিতে পারিস?

—পারি। বাপীর গলার স্বর চড়া নয়, কিন্তু কঠিন।—তোমার চাকরি গেল বউদি বিগড়ে গেল তার শাস্তি ছেলেটা পাচ্ছে কেন? ওর এই হাল কেন? এই চেহারা কেন? ওর গায়ে হাত তুলতে তোমার লজ্জা করে না?

মণিদা আবার ভেবাচাকা খেযে তার দিকে চেয়ে রইল।

গায়ে হাত তোলার কথাটা বলে ফেলার দরুনও ছেলেটার দুর্ভোগ হতে পারে মনে হতে বাপী আরো তেতে উঠল।—শোনো, বাচ্চুর জন্য আমি ভালো মাস্টার ঠিক করে

দেব, ওর লেখা-পড়া খাওয়া-দাওয়ার সব ভার আমি নিলাম। তোমার পোষালে আলাদা রোজগারের ব্যবস্থাও আমি করে দেব। কেবল, ওই ছেলেটার ওপর তোমাদের কারো শাসন আমি বরদাস্ত করব না, এটুকু মনে রাখতে হবে।

উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার করে সামনে ধরল।—যদি রাজি থাকো তো কাল-পরশুর মধ্যে একদিন গিয়ে দেখা কোরো—আর বাচ্চুকে নিয়ে যেও।

মণিদা কার্ড হাতে নিল। এ সেই হাবা-মুখ ভাইটাই কিনা ভেবে পাচ্ছে না।

বাপী নেমে এলো।

খিঁচড়নো মেজাজ নিয়েই ফ্ল্যাটে ফিরল। বাইরে দরজা খোলা দেখে আরো বিরক্ত। এসেছে কেউ। শুধু জিত্ হলে দরজা খোলা থাকার কথা নয়।

ঘরে পা দিয়েই দু' চোখ কপালে। খোশ মেজাজে বসে গল্প করছে তিনটি মানুষ।

জিত্ মালহোত্রা। তার পাশে অসিত চ্যাটার্জি।

ওদের দুজনের সামনের সোফায় আবু রব্বানী।

॥ ষোল ॥

যত দোস্তিই থাক, মালিকের সম্মান আবুর কাছে কম নয়। তার হুট করে এসে হাজির হওয়াটা পছন্দ হবে কিনা সেই সংশয়ও আছে। হাসি মুখে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। জিত্ও।

আবুর পরনে ধবধবে সাদা চোস্ত, গায়ে জালি গেঞ্জির ওপর রঙিন ফুলকাটা সাদা পাঞ্জাবি, তার ওপর গাঢ় খয়েরি রঙের চকচকে মেরজাই। হঠাৎ মনে হবে ইতিহাসের পাতা থেকে কোনো নবাবজাদা উঠে এসেছে। ওকে দেখে বাপী কত খুশি মুখ দেখে বোঝা যাবে না। বানারজুলি টানছিল। আবু রব্বানী নিজেই তার চোখে অনেকখানি বানারজুলি। তবু ওকে আরো একটু বিব্রত করার কৌতুকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘটা করে দেখে নিয়ে চোখে চোখ রাখল।

আবুর ফাঁপরে-পড়া মুখ! বলে উঠল, ঘাট হয়েছে জনাব, মালের সঙ্গে চালান হয়ে এসে গেছি, কালই আবার ট্রাকে চেপে ফেরত চলে যাব।

বাপীর হাবভাব দেখে আর আবুর কথা শুনে অসিত চ্যাটার্জী আর জিত্ও মজা পাচ্ছে। বাপীর ঠোঁটে হাসি একটু এসেই গেল। এগিয়ে এসে দু' হাত আবুর দুই কাঁধে তুলে দিল। তারপর সামান্য চাপ দিয়ে আবার তাকে সোফায় বসিয়ে দিল। সামনের সোফায় নিজেও বসল।—কখন এসেছ?

—দেড় ঘণ্টা হয়ে গেল। তোমার ট্রাক গুদোমে এসে দাঁড়াতেই জিত্ সাহেব সব ছেড়ে আগে আমাকে খালাস করে সোজা তোমার এখানে এনে তুলল। তুমি নেই দেখে গাঁটের পয়সা খরচা করে অনেক খাওয়ালে।

আবুকে জিতের একটু খাতির করারই কথা। একে মুরুব্বী মানুষ এখন, তার ওপর ওর সুপারিশের জোরেই সুদিনের মুখ দেখছে।

হাসিমুখে বাপী অসিত চ্যাটার্জির দিকে ফিরল।—অসিতদা কতক্ষণ?

—অনেকক্ষণ। সময়ে এসে গেছিলাম তাই আমিও চপ কাটলেট রসগোল্লা সন্দেশ থেকে বাদ পড়িনি—তুমি শুধু ফসকালে।

বাপী মনে মনে জিতের বুদ্ধির তারিফ করল। দুএকদিন দেখে এই লোককেও খাতিরের পাত্র ধরে নিয়েছে। আবুর দিকে ফিরল। ঠোঁটের হাসি চোখে ঠিকরলো। অসিতদার সঙ্গে গল্প তো করছিলে দেখলাম—কি, বুঝতে পেরেছ?

আবু খুশিতে ডগমগ।—আমি কি এত বোকা বাপীভাই, তুমি ওঁর বিবিসাহেবার ছেলেবেলার বন্ধু শুনেই ধরে ফেলেছি। এতক্ষণ তো বাহিনজির ছেলেবেলার গল্পই বলছিলাম জামাই সাহেবকে—একবার তুমি যে তাকে পেল্লায় ময়াল সাপের গেরাস থেকে ছিনিয়ে এনেছিলে তাও জামাইসাহেব আমার কাছ থেকে এই প্রথম শুনলেন। ওঁকে দেখে আমাদের সেই ফুটফুটে ছোট্ট বাহিনজি এখন কেমনটি হয়েছেন খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

আবু পদস্থ হয়েছে বটে। আগের দিনে পড়ে থাকলে মেমসায়েবের মেয়েকে বাহিনজি না বলে মিসি সায়েবটায়েব কিছু বলত। বাপী সাদা মুখ করে সায় দিল, দেখে এসো—অসিতদাকে বলো।

হৃষ্টমুখে আবু জবাব দিল, বলতে হবে না, আমি অলরেডি ইনভাইট!

বাপী হেসে ফেলল, আবার ইংরেজি কেন!

অসিত চ্যাটার্জি আর জিত্‌ও হাসছে। আবু মাথা চুলকে বলল, গড়বড় হয়ে গেল বুঝি—কি করব, তোমাদের কলকাতার বাতাসের দোষ, জিভে সুড়সুড় করে ইংরেজি বেরিয়ে আসে।

চাকরিতে বহাল হবার পর জিত্‌ মালহোত্রা এই প্রথম বোধ হয় মালিকের হালকা মেজাজের হদিস পেল। সকলকে ছেড়ে বাপীর পলকা গম্ভীর মনোযোগটা হঠাৎ জিতের দিকে।—মিস্টার চ্যাটার্জি মানে অসিতদার সঙ্গে তোমার কত দিনের আলাপ?

যে-রকম চেয়ে আছে আর যে ভাবে বলল, যেন গলদ কিছু ধরা পড়েছে। অপ্রতিভ জিত্‌ জবাব দিল, আগে কয়েকবার এখানে দেখেছি...আলাপ আজই।

বাপী আরো গম্ভীর।—তুমি তো বুদ্ধির ঢেঁকি দেখি, মিস্টার চ্যাটার্জি একজন আর-এ, চার্টারড অ্যাকাউন্টেন্টের সগোত্র, আর এক মস্ত তেল কোম্পানির চিফ অ্যাকা-উন্টেন্ট—এ খবর রাখো?

কি বলতে চায় কেউই বুঝছে না। আবু দোস্তকে দেখছে। অসিত চ্যাটার্জির বদনের সলজ্জ আভায় সোনালি চশমা চিকচিক করছে। ফ্যাসাদ শুধু বেচারা জিতের। খবর রাখে না যখন মাথা নাড়া ছাড়া আর উপায় কি।

বাপীর পালিশ করা মুখ।—তিন মাস ধরে খাতাপত্রের হাল কি করে রেখেছ তুমিই জানো। সব ঠিকঠাক করে দেবার ব্যাপারে সাহায্য করার মতো এমন আর একজন কলকাতার শহর চষে পাবে?

আবুর চোখে কৌতুক। অসিত চ্যাটার্জির ফর্সা মুখ খুশিতে টসটসে। এতক্ষণে মনিবের ইশারার হদিস পেয়ে জিতের অমায়িক বদন। পারলে এক্ষুনি গুণী মানুষটির তোয়াজ তোষামোদ শুরু করে দেয়। হালকা মেজাজে বাপী অসিত চ্যাটার্জিকে সতর্ক করল।—জিত্‌ এরপর তোমাকে ছেঁকে ধরবে অসিতদা, ওর তোয়াজে ভুলো না, হাত দিয়ে ওর জল গলে না—সাহায্য চাইলেই পঁচিশ পারসেন্ট চড়িয়ে ফী হাঁকবে।

বাড়তি রোজগারের লোভ আছেই। চড়িয়ে ফী হাঁকলে শেষ পর্যন্ত সেটা কার ঘাড়ে গিয়ে পড়বে ভেবে না পেলেও অসিত চ্যাটার্জির চোখে জিতের কদর বেড়ে গেল। ফলে অন্তরঙ্গ হাসি মুখ তার দিকে ফিরল।—ফী-এর জন্য কি আছে, দরকার হলেই বলবেন। আপিসের দশটা-পাঁচটা ছাড়া অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস।

চতুর জিতের দুকুল বজায় রাখার চেষ্টা। সপ্রতিভ মুখে সে মাথা নাড়ল, থ্যাংক্‌স।

আবুর আসাটা বাপী একটা বড় উপলক্ষ করে তুলল। রাতের খাওয়া-দাওয়ার আগে আজও অসিত চ্যাটার্জিকে ছাড়ল না। বলাই তার রোশন বাবুর্চির তৎপরতায় আয়োজনে কার্পণ্য নেই। খাওয়ার আনন্দের মধ্যে বাপী বলল, এক জিনিসের অভাবে তোমার সবটাই

নিরামিষ লাগছে বোধ হয় অসিতদা, কিন্তু আজ তুমি কথার খেলাপ করলে না দেখে মিলু নিশ্চয় খুশি হবে।

অভাব কোন্ জিনিসটার বুঝতে আবু বা জিতেরও অসুবিধে হল না। লজ্জা পেয়ে অসিত চ্যাটার্জি ্লল, কি যে বলো, আমি কি রোজই ওসব খাই নাকি—

সঙ্গে সঙ্গে · ুর আফসোস।—জামাই সাহেবের চলে জানলে আমি তো গোটা কয়েক বাছাই মাল নিয়ে আসতে পারতাম!

সোনালি চশমার ওধারে দু'চোখ উৎসুক।—ওদিকে ভালো ভালো জিনিস পাওয়া যায় বুঝি?

বাপী জবাব দিল, নেপাল ভূটানের ও-সব জিনিস এদিকে তো দেখতেই পাও না তোমরা। আবুর দিকে ফিরল, হবে'খন, অসিতদা তো পালিয়ে যাচ্ছে না—।

খাওয়ার পর্ব শেষ হতে জিত্কে বলল, দু'জনেই তো সাউথে যাবে. একটা ট্যাক্সি ধরে অসিতদাকে নামিয়ে দিয়ে যাও।

তারা চলে যেতে আবু সোফায় বসে মৌজ করে একটা বিঁড়ি ধরাবার ফাঁকে দোস্ত-এর মুখখানা দেখে নিচ্ছে। চোখাচোখি হতে বাপীর ঠোঁটে হাসি ছড়ালো। ঊর্মিলা দূরে চলে গেছে। কাছের মানুষ বলতে এখন শুধু এই একজন।

ভণিতা ছেড়ে আবুও সোজাসুজি চড়াও হল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, শুধু জামাই-আদর নয়, বেশ একটা টোপও ফেললে মনে হল?

বাপী হাসছে।—কেন, খাতা-পত্র ঠিক রাখার দরকার নেই?

আবু মাথা নাড়ল।—আগের মতো তোমার ভেতর-বার এক লাগছে না বাপীভাই।—ভদ্রলোক সত্যি অত গুণের মানুষ নাকি?

ছদ্ম গাম্ভীর্যে বাপী সায় দিল. হ্যাঁ, তার অনেক গুণ।

আবু তবু অপেক্ষা করল একটু। তারপর একটা বড় নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিঁড়ির ধোঁয়া ছেড়ে বলল. আগের দিন আর নেই, নইলে তোমাকে ধরে ধরে গোটাকয়েক ঝাঁকানি দিলে ভিতরে যা আছে গলগল করে বেরিয়ে আসত। যাক, তার বিবিসাহেবের খবর কি?

—ভালোই। এয়ার অফিসে ভালো চাকরি করছে।

—তোমার সঙ্গে দেখা-টেখা হয়?

—ক্বচিৎ কখনো। আপাতত তার হাজব্যান্ডের সঙ্গেই বেশি খাতির।

আবু টান হয়ে বসল।—আপাতত?

বাপীর মগজে সূক্ষ্ম কিছু বুনুনির কাজ চলেছে। আবু রব্বানী হঠাৎ এভাবে চলে আসাটাও সামনে পা ফেলে এগোনোর মতো লাগছে। নিরীহ মুখে মাথা নেড়ে সায় দিল।

আবুরও ধৈর্য বাড়ছে। জিগ্যেস করল, এদের বিয়ে হয়েছে ক'দিন?

—বছর দাড়াই প্রায়।

কৌতূহ· একটা চোখ আগের মতোই ছোট হয়ে এলো।—বাচ্চা-কাচ্চা?

এই সাদাসাপটা প্রশ্নের তাৎপর্য বেআব্রু গোছের ঠেকল বাপীর কানে। মাথা নাড়ল। নেই। আবুর জিভ আরো বেসামাল হবার আগে প্রসঙ্গ বাতিল। তোমার খবর কি বলো. হুট করে চলে এলে. দুলায় ছাড়ল?

রসের ঝাঁপি বন্ধ হয়ে গেল আবুও বুঝল। দোস্ত-এর পেট থেকে আপাতত আর কোনো কথা টেনে বার করা যাবে না। জবাব দিল, তোমার কাছে আসছি শুনে পারলে নিজেও ছুটে আসে।...আর. ছাড়াছাড়ির কি আছে. যে বোঝা কাঁধে চাপিয়েছ মাসের মধ্যে আট-দশ দিন বাইরেই কাটাতে হয়। কিন্তু তুমি কথা রাখলে যা-হোক—

—কি কথা?

—আসার সময় কত রকম বুঝিয়ে এসেছিল—হাওয়াই জাহাজে এক-দেড় ঘণ্টার পথ, দরকার হলে কি হপ্তায় একবার করে চলে যাবে—তিন মাসেও একবার তোমার ফুরসৎ হল না?

বাপী বলল, দরকার হলে যেতাম। বেশ তো সামলাচ্ছ।

জবাবে গড়গড় করে আবু অনেক কথা বলে গেল। এবার থেকে দরকার যাতে হয় ফিরে গিয়েই সেই ব্যবস্থা করছে। তিন মাসের মধ্যে একবারও আসার নাম নেই দেখে দুলারিও সাত-পাঁচ ভেবেছে। ও জানে কলকাতা হুরী-পরীর দেশ—কেউ গেলে তাকে ভুলিয়ে রাখে। দোস্ত কোনো জ্যান্ত পরীর খপ্পরে পড়েছে কিনা সেই চিন্তাও করেছে। আবার আবুর আসার ব্যাপারেও খুঁত-খুঁত করেছে। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ গিয়ে হাজির হলে বাপীভাই নারাজ হবে কিনা চিন্তা। আবু বলেছে, নারাজ হয় হবে, কিন্তু দোস্তকে না দেখে আর সে থাকতে পারছে না?

বাপীর ভালো লাগছে। ঠিক এ-সময় ওকেই সব থেকে বেশি দরকার ছিল। কিন্তু মনে যা আছে এক্ষুনি ফাঁস করার তাড়া নেই। দিন-কতক ওকে ধরে রাখতে হবে। ওখানকার ব্যবসার খবর শুনল! লেখাপড়ায় দিগ্‌গজ বলে এখন একটু আফসোস আবুর। সে কারণে রণজিৎ চালিহার মতো একটু হম্বি-তম্বির চালে চলতে হয়। অসুবিধে খুব হচ্ছে না। কেবল বাপীভাই পাশে না থাকলে ফাঁকা ফাঁকা লাগে, এই যা। বাপী পাহাড়ের বাংলোর বুড়ো ঝগড়ু, বাদশা ড্রাইভার আর কোয়েলার খবরও নিয়েছে। এর মধ্যে পাহাড়ের বাংলো থেকে ঝগড়ু একদিন নাচতে নাচতে নেমে এসেছিল। সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপার থেকে মেমসায়েবের মেয়ের চিঠি পেয়েছে। সেই চিঠি ওদের দেখাতে এসেছিল। তার ঊর্মি লিখেছে, ওদের কোনো চিন্তা নেই, নতুন মালিক সকলকে ভালো রাখবে। মালিকের পাত্তা নেই দেখে ওরা একটু ভাবনায় পড়েছিল।

—কেন ওরা টাকা-কড়ি ঠিক মতো পাচ্ছে না?

—তা পাচ্ছে, কিন্তু বিয়ে-সাদি করে মালিকের কলকাতাতেই থেকে যাওয়ার মতলব কিনা সে-চিন্তা তো হতেই পারে।

বানারজুলির কথাপ্রসঙ্গে আবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, ধামন ওঝার ছেলে সেই হারমাকে মনে আছে তো তোমার?

—থাকবে না কেন, রেশমার হারমা...

—হারমার রেশমা বলো, বেঁচে থাকতে রেশমা ওকে পাত্তাই দেয়নি।

—হারমার কি হয়েছে?

—মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে। তুমি থাকতেই তো দিন-রাত রেশমার ঘর আগলে পড়ে থাকত, কেউ মুখ দেখতে পেত না। এখন আবার দিন ছেড়ে রাতেও বাইরে টো-টো করে বেড়ায়। ওর এখন মাথায় ঢুকেছে, চালিহা সাহেবের জন্য রেশমা সাপের ছোবল খেয়ে মরেনি—ও জান দিয়েছে তোমার জন্যে। কেউ বিশ্বাস করে না, দুলারিও ওকে ডেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ওর ওই এক কথা—

বাপী সচকিত একটু।—সে কি? আমার ওপর খুব রাগ নাকি ওর?

—রাগ না...দুঃখু। বলে, তোমাদের উঁচু-মাথা বাপী সাহেব কেবল দিল্ কাড়তেই জানে, দিলের কদর জানে না।

রাতটা এরপর অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কাটল বাপীর। আধ-ঘুমে মাথার মধ্যে একটা হিজিবিজি ব্যাপার চলতে থাকল। পাহাড়ী জঙ্গল...বুনো হাতি,..রেশমা পাহাড়ের বাংলো...নেশার বুঁদ ঝগড়ু...রেশমা। বাপী...রেশমা...রণজিৎ চালিহা টাকা মদ—

রেশমা। হারমা—রেশমা—হারমা রেশমা—

সকালে উঠে বাপী নিজের ওপরে বিরক্ত। কি দোষ করেছে? কোন দুর্বলতার প্রশ্রয় দিয়েছে? এত দিন পরেও এ-রকম টান পড়ে কেন? হারমা যা ভাবে ভাবুক। যা বলে বলুক। তাতে ওর মগজে দাগ পড়ে কেন?

সকালটা আবুর সঙ্গে গল্প-গুজবের পর কলকাতার ব্যবসার আলোচনায় কেটে গেল। সব দেখেশুনে আবু দোস্ত-এর তারিফ করল, তুমি যাতে হাত দাও তাই সোনা দেখি বাপীভাই!

প্রশস্তির জবাবে আঙুল তুলে বাপী জিত্‌কে দেখিয়ে দিল। বলল, জিত্ সঙ্গে থাকলে তার আর মার নেই, ওরও কেরামতি কম নয়। সঙ্গে সঙ্গে ছদ্ম আশংকা। মাইনে বাড়ানোর চাপ দিলো বলে।

আবু অখুশি নয়। জিত্‌কে জোটানোর বাহাদুরি সবটাই তার। চিঠিতে দোস্ত এই লোকের প্রশংসা আগেও করেছে। তার ভাগ্য শিগগীরই আরো কিছু ফিরবে ধরে নিয়ে ভারিক্কি স্বরে মন্তব্য করল, চাপ দিলে আমি চোখ বুজে স্যাংশন করে দেব। বলে ফেলে সভয়ে বাপীর দিকে তাকালো।—স্যাংশনই তো বলে—না কি?

জিত্ হাসছে আর টেবিলের কাগজপত্র গুছিয়ে রাখছে। গায়ত্রী রাইয়ের কাছে মাস-কয়েকের চাকরির কালে এই আবু রব্বানী তাকেও সেলাম ঠুকত। যার অনুগ্রহে লোকটার আজ এই কপাল, তার দাক্ষিণ্য থেকে সে-ও বঞ্চিত হবে না, তিন মাসে সেই বিশ্বাস আরো বেড়েছে।

আলতো করে বাপী বলল, জিত্ তোমার। অন্য স্যাংশনের আশায় অনেক দিন ধৈর্য ধরে বসে আছে—

মালিকের মনে কি আছে জিত্ নিজেও ধরতে পারল না। ঠাট্টার ব্যাপার কিছু কিনা না বুঝে আরো উৎসুক। দুজনারই কৌতূহল জিইয়ে রেখে বাপী জিগ্যেস করল, ডাটা-বাবুর ক্লাবের সঙ্গে তোমার লাল জলের কারবার কেমন চলছে এখন?

—ফার্স্টো কেলাস। ক্লাব তো আছেই, প্রাইভেট প্র্যাকটিসও আগের থেকে বেড়েছে—রইস খদ্দেররা এসে অর্ডার পেশ করে যায়। কেন বলো তো?

—জিত্‌কে তুমি কলকাতার বাজার সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলে দিয়েছিলে?

আবু মাথা চুলকে সায় দিল। বলল, আমার মনে হয়েছিল ওই জলের কারবার এখানে ভালো চলতে পারে।

—বানারজুলি থেকেও ঢের ভালো চলতে পারে। জিত্ খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে কলকাতার মতো বাজার আর হয় না। আমি গা করছি না বলে ওর মেজাজ খারাপ।

আবু জিতের মুখখানা দেখে নিল। এ ব্যাপারে তার আগ্রহ সত্যি কম মনে হল না। দোস্ত ঠাট্টা করছে না বা বাড়িয়ে বলছে, না বুঝে তাকেই জিগ্যেস করল, তুমি তাহলে গা করছ না কেন?

বাপী প্রায় নিরাসক্ত।—এসে গেছ যখন নিজেই বুঝেশুনে নাও। ভালো বুঝলে শুরু করা যাবে।

দোস্ত্‌কে কাগজপত্রে মন দিতে দেখে আবু একটু বাদে বসার হলঘরে চলে এলো। দোস্ত দিনকতক থেকে যেতে বলেছে। সে সানন্দে রাজি। তাই ঘরে একটা চিঠি পাঠাতে হবে। দুলারি লিখতে পড়তে জানে না সে-জন্য আবুর এই প্রথম আপসোস একটু। নইলে দোস্ত-এর খবরাখবর দিয়ে বেশ রসিয়ে একখানা চিঠি লেখা যেত। কিন্তু পড়াতে হবে বড় ছেলেটাকে দিয়ে। সে ব্যাটা এখনই লায়েক হয়ে উঠেছে। ছোট সাইকেলে চেপে বানারহাটের স্কুলে যায়। চিঠিতে বেচাল কথা থাকলে ফিরে গিয়ে দুলারির মুখঝামটা

খেতে হবে।

মনিবের হুকুমে জিত্ ড্রাইভারসুদ্ধু একটা ভালো প্রাইভেট গাড়ির সন্ধানে বেরুলো। তিন দিন সকাল-সন্ধ্যা ভাড়া খাটবে। আবুর জন্য দরকার। টাকা যা লাগে লাগবে। মালিককে বাদ দিলে ব্যবসায় আবু রব্বানীর মর্যাদা এখন সকলের ওপরে। সঙ্গে গাড়ি থাকলে এখানকার পার্টির কাছে সেই মর্যাদা বজায় থাকবে। কলকাতার ঠাট আলাদা। পার্টির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করানোর জন্য মালিক নিজে তার জেনারেল ম্যানেজারকে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় কি করে। সে কাজটা জিত্ মালহোত্রা করলে বরং কোম্পানীর চটক বাড়বে। আর, এই কাজের ফাঁকে আবুর ইচ্ছেমতো কলকাতা দেখাও হবে।

মালিকের দরাজ মনের খবর জিত্ ভালোই রাখে। আজ আরো খুশি কারণ, আবু সাহেবের জন্য গাড়ি ঠিক করতে বলে মনিব তাকেও চটপট ড্রাইভিং শিখে নিতে বলেছে। বানারজুলির মোটরগাড়ি এখন আবু সাহেবের জিম্মায়। ওর ড্রাইভিং শেখা হলে জিপটা কলকাতায় নিয়ে আসবে হয়তো।

বড় হোটেলের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে পছন্দসই প্রাইভেট গাড়ি জোটানো শক্ত নয়। জিত্ একেবারে গাড়িতে চেপেই ফিরল। গাড়ি কি জন্যে আর কার জন্যে শুনে আবু হাঁ। বলল, তোমার কাণ্ড দেখে আমি ঘাবড়ে যাচ্ছি বাপী ভাই।

হাসি চেপে বাপী বলল, তুমি কম লোক? ঘাবড়াবার কি আছে—

বিকেলে ওদের ফেরার অপেক্ষায় বসেছিল। আসলে ভাবছিল কিছু। মগজে একটা ছক তৈরী হচ্ছিল। আর থেকে থেকে কুমকুমের মুখ সামনে এগিয়ে আসছিল। রেশমার মতো করে না হোক' অবস্থা-বিপাকে এই কুমকুমও সর্বনাশের দড়ির ওপর কম হেসে খেলে নেচে বেড়ায়নি।

কলিং বেল বাজতে বলাই দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল। আবু বা জিত্ নয়। মণিদা। তার কথা বাপীর এর মধ্যে মনে পড়ে নি। মণিদার শুকনো ক্লান্ত মুখ। দায়ে ঠেকে আসাব অস্বস্তিও অস্পষ্ট নয়।

বোসো মণিদা। বাচ্চু এলো না?

—আমি ইয়ে বাড়ি থেকে আসছি না, পরে একদিন আনব'খন.

গদী আঁটা সোফায় বসে ফ্ল্যাটের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। এই মানুষকে দেখে বাপীর আজ আর রাগ হচ্ছে না। বরং মায়া হচ্ছে। এই একটিমাত্র মানুষের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক। অসময়ে দু'হাত বাড়িয়ে আশ্রয় দিয়েছিল। শুধু খেতে ভালোবাসতো, নইলে বরাবর সাদাসিধে চাল-চলনের মানুষ ছিল। স্ত্রীর প্রতি অন্ধ আনুগত্যের ফলে আজ এই হাল।

বলাইকে হুকুম করে আগে তার ভালো জলখাবারের ব্যবস্থা করল। তারপর সোজা কাজের কথা। বাচ্চুর অ্যানুয়েল পরীক্ষা কবে?

—দু'আড়াই মাসের মধ্যেই বোধ হয়...

বাপী ভাবল একটু। তারপর বলল, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এই সপ্তাহের মধ্যেই আমি ওর জন্যে একজন ভালো মাস্টার ঠিক করে পাঠাচ্ছি।...কিন্তু আমার মতে তারপব ছেলেটাকে এখানে আর রাখা ঠিক হবে না, অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। ওর মা...বিশেষ করে সন্তু চৌধুরীর কাছ থেকে ওকে তফাতে সরানো দরকার।

মণিদার অসহায় পাংশু মুখ।

বাপী জিজ্ঞাসা করল, বাইরের খুব ভালো কোন ইনিষ্টিটিউশনে রেখে ওকে পড়ানো যায়? খরচ যা-ই লাগুক তোমাকে ভাবতে হবে না—ওর গার্জেন হিসেবে আমার নাম

থাকবে।

মণিদার চোখে-মুখে সংকটের দরিয়া পার হবার আশা। নরেন্দ্রপুর আর দেওঘরের বিদ্যাপীঠের কথা বলল। সামর্থ্য থাকলে ছেলেকে নিজেই ওরকম কোনো জায়গায় পাঠাতো। ছেলেটার সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে নিজেই স্বীকার করল। যন্ত্রণাও চাপা থাকল না আর। তুই যদি ছেলেটার ভার নিস আমি আর ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখব না। এত ঠকেছি...আর সহ্য হচ্ছে না।

বাপীর জিজ্ঞাসা করার লোভ, গৌরী বউদির যে নালিশ শুনে ওকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলা হয়েছিল সেটা এখন আর মণিদা বিশ্বাস করে কি না। লোভ সামলালো। বলল, এই দুটো মাস কাউকে আর কিছু বলার দরকার নেই—যা করার তুমি চুপচাপ করে যাও।

উঠে ভিতরের ঘরে গিয়ে দু-তিন মিনিটের মধ্যে ফিরে এলো। দশখানা একশ টাকার নোট মণিদার পকেটে গুঁজে দিয়ে বলল—এই হাজারটা টাকা তোমার কাছে রাখো এখন। তোমাকে কিন্তু-কিন্তু করতে হবে না, এও বাচ্চুর জন্যে। মুখোমুখি বসল আবার।—এবারে তোমার কাজের কথা, বলো কাজ করবে তো?

দু'চোখ ছলছল মণিদার। ভিতর থেকে আরো কিছু যন্ত্রণা ঠেলে বেরুলো। বলল, কাস্টমসের পাকা চাকরি গেছে...কেউ আর বিশ্বাস করতে চায় না।

যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষটার ভেতর দেখতে পাচ্ছে বাপী। তবু এ ব্যাপারে স্পষ্ট কথাই বলল।—কোম্পানীর লোক দরকার, তুমি কোম্পানীর কাজ করবে, সেখানে বাপী বসে কেউ নেই এটুকু মনে রাখলেই আমার দিক থেকে আর কোনো অসুবিধে হবে না।

জিতের সঙ্গে আবু ঘরে ঢুকল। বাপী ওদের সঙ্গে মণিদার পরিচয় করিয়ে দিল। তার কোম্পানীতে যোগ দেবার কথাও জানালো। মণিদাকে বলল, যতদিন না এদিকে সুবিধে মতো অফিস ঘর মেলে তাকে রোজ উল্টোডাঙার গোডাউনে হাজিরা দিতে হবে। জিত্ চেষ্টা করছে, অফিস-ঘর পেতে দেরি হবে না। কাজ আপাতত মাল চালানের খাতা-পত্র ঠিক রাখা আর পার্টির কাছে চিঠি লেখা বা তাদের চিঠির জবাব দেওয়া। জিত্ই সব দেখিয়ে শুনিয়ে আর বুঝিয়ে দেবে। বানারজুলি থেকে আবু রব্বানী তার অ্যাপয়েন্ট-মেন্ট লেটার পাঠাবে।

একটু বাদে মণিদা আর জিত্ চলে গেল। বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে আবু বলল, আমাকে বাঁশ দিয়ে ঠেলে আর কত ওপরে তুলবে—একটু আগে তোমার হোমরাচোমরা পার্টিদের খাতিরের চোটে হাঁপ ধরে গেছল, এসেই আবার এই—

বাপী হাসছে—দেখাশুনা হল সব?

—এখনো সব নয় শুনছি, জিত্ শাসিয়ে রেখেছে কাল রবিবার, পরশু মাঝারি আর ছোট পার্টির সঙ্গে মোলাকাত হবে।

—জলের ব্যবসার খোঁজ নিয়েছ?

—নিশ্চয়। জিত্ ঠিকই বলেছে, টুইংকিল টুইংকিল ইস্টার—ঘাবড়ে যেও না, বাইরে বেরিয়ে একটাও ইংরেজি বলিনি।

চায়ের পর্বের পরেও দোস্ত্ গা ছেড়ে বসে আছে দেখে আবু উসখুস করতে লাগল। শেষে বলেই ফেলল, ইয়ে—কোথাও বেরুবে-টেরুবে না?

—কোথায়?

আবুর মুখে দুষ্টু হাসি।—কোথায় আমি তার কি জানি। ভাবলাম আমার জন্য তুমি অপেক্ষা করছ—এলেই বেরুবে।

ওর ইচ্ছে বাপী খুব ভালো করেই বুঝছে। অসিত চ্যাটার্জির আপ্যায়নে সাড়া দেবার

জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। অস্বাভাবিক কিছু নয়। ওর চোখে সেই দশ বছরের মেয়েই লেগে আছে। এখন চৌদ্দটা বছর জুড়বার তাগিদ।

বাপী উঠল। বলল, চলো—

ভাদ্র-শেষের ছোট বেলা। আলো-ঝলমল রাস্তা। দোস্ত্ এখন ভারী চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে দেখেও আবু মজা পাচ্ছে। জামাই সাহেবের সামনে টোপ ফেলার ব্যাপারটা মনের তলায় ঘুরপাক খাচ্ছে। দোস্তের মতলব এখনো আঁচ করতে পারেনি।

সামনে চোখ রেখে বাপী জিজ্ঞাসা করল, বানারহাট স্কুলের মাস্টারমশাইদের মনে আছে তোমার?

হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন আবু ভেবে পেল না।—যারা মারধর করত তাদের মনে আছে। কেন বলো তো?

—আমাদের ড্রইং করাতো ললিত ভড়—তাকে মনে আছে?

—পেটুক ভড়! তাকে খুব মনে আছে। ব্ল্যাক বোর্ডে খড়ি দিয়ে এঁকে এঁকে কত রকমের খানা খাইয়েছে!

—এখানেও ফুটপাথে খড়ি দিয়ে এঁকে রাস্তার মানুষকে অনেক খানা খাইয়েছে—সকলে পাগল ভাবত।

—আ-হা...তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে বুঝি?

—হয়েছিল। খেতে না পেয়ে আধমরা হয়ে গেছল। শেষের দু'মাস একটু শান্তি পেয়ে গেছে। কিছুদিন আগে মারা গেল।

আবু চুপ খানিকক্ষণ। তারপরে বলে উঠল, যাচ্ছি এক জায়গায় আনন্দ করতে, দিলে মনটা খারাপ করে—

বাপী শুধু হাসল একটু।

দোরগোড়ায় তার গাড়ি থামার আগেই কুমকুম ভিতর থেকে দেখেছে। তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এলো। সঙ্গে অচেনা লোক দেখে থমকালো একটু।

বাপী হাসিমুখে বলল, কটা দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম। ভালো আছ তো?

কুমকুম মাথা নাড়ল। বাপীদার সঙ্গে এসেছে তাই দু'হাত জুড়ে অচেনা সঙ্গের লোকটাকে নমস্কার জানিয়ে তাদের ভিতরের ঘরে বসালো। আর হঠাৎ ঘাবড়ে গেছে কেমন। সামনে যাকে দেখছে সে বেশ সুশ্রী বটে, কিন্তু জঙ্গলের বড় সাহেবের দশ বছরের যে ফুটফুটে মেয়েটাকে মনে আছে, পরের চৌদ্দ বছরে তার চেহারা এই দাঁড়াতে পারে কল্পনায় আসে না।

নিরীহ মুখে দোস্ত তার দিকে তাকাতে আরো খটকা লাগল। জিগ্যেস করল, বহিনজি তো...?

—তুমি কোন বহিনজির কথা ভাবছ? একটু আগে যে মাস্টারমশায়ের কথা বললাম তার মেয়ে কুমকুম।

আবু হতচকিত কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু বোকা নয়, চট করে সামলে নিল। দরাজ হেসে বলল, উনিও বহিনজিই তো হলেন তাহলে। কুমুর দিকে ফিরল, মাস্টারজির হাতে আমিও বছর কতক ঠেঙানি খেয়েছি।

কুমু হাসিমুখেই নরম প্রতিবাদ করল, বাবা ভয় দেখাতেন, মারতেন না কাউকে।

বাপী সাদা মুখে কাজের কথায় চলে এলো। আবুর পরিচয় দিল। বলল, ও-ই সর্বে-সর্বা এখন, তোমার যা কিছু বোঝাপড়া সব এরপর ওর সঙ্গে আর জিতের সঙ্গে—আমাকে আর বিশেষ পাচ্ছ না।...আমাকে যতটা বিশ্বাস করো একেও ততটাই বিশ্বাস করতে পারো।

কুমুর মুখে কথা নেই চুপচাপ চেয়ে রইল।

দোস্তের মাথায় কি যে আছে আবু ভেবে পাচ্ছে না। তাই আগবাড়িয়ে সেও কিছু বলছে না।

বাপী জিজ্ঞাসা করল, টাকা কেমন আছে?

—আছে...।

পার্স থেকে এক গোছা টাকা বার করে তার দিকে বাড়িয়ে দিল।—এই পাঁচশ টাকা রাখো তোমার কাছে।

কুমকুম ইতস্তত করতে আবার বলল, আবুর সামনে লজ্জা করার কিছু নেই, ও আমার থেকে কড়া মুরুব্বী, এখন থেকে যা পাবে সব তোমার পাওনা থেকে কড়াক্রান্তি কেটে নেবে। ধরো।

কুমকুম হাত বাড়িয়ে টাকা নিল। সম্মান বাঁচিয়ে সাহায্য করা হল আবু এইটুকুই ধরে নিল।

দশ মিনিটের মধ্যে আবার গাড়িতে পাশাপাশি দুজনে। আবু বলল, অ্যাস্‌ মানে গাধা আবার ডংকি মানেও গাধা—আমি কোন্‌টা?

বাপী হাসছে।—কি হল?

প্রথম দিন তুমি আমার ঘরে রেশমার বদলে দুলারিকে দেখে হাঁ হয়ে গেছলে...তার বদলা নিলে মনে হচ্ছে।..তোমার সব ইন্টারেস্ট এখন তাহলে এই বাহিনজি?

সব না- কিছুটা।

আবুর খুশি ধরে না।—এও দেখতে শুনতে তো ভালোই। ঠাণ্ডা মেয়ে হলেও বেশ বুদ্ধি ধরে মনে হল—ঠিক না?

—ঠিক। কিন্তু তুমি তো চিনতেই পারলে না।

—আমি আগে দেখলাম কোথায় যে চিনব!

—দেখেছ। ভেবে দেখো...।

আবু বিমূঢ় খানিক। এরকম ভুল তার হবার কথা নয়।—কোথায় দেখেছি?

—বানারজুলিতে। আমি তখন ডাটাবাবুর ক্লাবের সেই কোণের ঘরে থাকতাম। চা-বাগানের এক অফিসারের বন্ধু মেয়েছেলে নিয়ে এসেছিল বলে আমাকে কোণের ঘরটা ছেড়ে দিতে হয়েছিল—সেজন্যে তুমি ডাটাবাবুর ওপর খেপে গেছলে, আর সেই মোটা কালো লোকটাকে দেখে বলেছিলে, এই চেহারা নিয়ে বউয়ের সংগে রঙ্গরস করার জন্যে কোণের ঘর চাই—মনে পড়ছে?

মনে পড়ছে বটে। কিন্তু তার ফলে আবু চারগুণ অবাক।—এই বহিনজি সে নাকি! সেই লোকটার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে?

সামনে চোখ রেখে বাপী নির্লিপ্ত মুখে গাড়ি চালাচ্ছে। জবাব দিল, শুধু সেই লোক কেন, তারপর আরো কত লোকের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে।

আবু আধাআধি ঘুরে বসেছে দোস্তের দিকে। জল-ভাত কথাগুলোও ঠিক-ঠিক মাথায় ঢুকছে না। এখানে একে কোথায় পেলে?

—রাতের রাস্তায়! কারো জন্যে অপেক্ষা করছিল।

এও হেঁয়ালির মতো লাগল।—রাতের রাস্তায়...কার জন্যে অপেক্ষা করছিল?

—পকেটে পয়সা আছে এমন যে কোনো রসিক পুরুষের জন্য। হাতে কিছু পেলে তবে বস্তিঘরের রুগ্ন বাপের জন্য খাবার আসবে।

আবুর মুখে কথা নেই আর। স্তম্ভিতের মতো বসে রইল। তার দিকে না তাকিয়ে বাপী মোলায়েম করে বলল, তুমি যে ইন্টারেস্টের কথা ভাবছিলে ঠিক সে ইন্টারেস্ট

যে নয় আমার এখন বুঝতে পারছ?

ধাক্কাখানা এমনি যে আবু তার পরেও নির্বাক। একটু বাদে একই সুরে বাপী আবার মন্তব্য করল, তবু মেয়েটাকে আমি খারাপ ভাবি না।

রবিবারের বিকেল পর্যন্ত বাপীর ফ্ল্যাট ছেড়ে নড়ার নাম নেই। আড্ডা দিয়ে আর গড়িমসি করে কাটিয়ে দিল। অথচ সকাল থেকেই আবু আশা করছে এই ছুটির দিনে দোস্ত্ ওকে প্রত্যাশার জায়গাটিতে নিয়ে যাবে। শেষে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বলল, বেরুবে না কি সমস্ত দিনটা ঘরেই কাটিয়ে দেবে?

বাপী সাদামাটা মুখ করে চেয়ে রইল একটু। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আঁচড় পড়ল কি পড়ল না। গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে বলল, চলো—

কিন্তু এবারও আবুর অপ্রস্তুত হবার কপাল। অভ্যর্থনায় যারা এগিয়ে এলো তাদের একজন সুদীপ নন্দী আর একজন মনোরমা নন্দী। আবু দেখেই চিনেছে। তারা চিনতে পারল না। খাতিরের ছেলের সঙ্গে এসেছে তাই খাতির করেই বসালো। তার আগে আবুর আদাবের ঘটা দেখে মা-ছেলে দুজনেই অবাক একটু।

হাসিমুখে বাপী বলল, মাসিমার কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, দীপুদা তুমিও ওকে চিনতে পারলে না?

সুদীপ বলল, চেনা-চেনা লাগছে কিন্তু ঠিক...

—বানারজুলির জঙ্গলের সেই অপদেবতা আবু রব্বানী। পাথর ছুঁড়ে কত বুনো মুরগি আর খরগোশ মেরে খাইয়েছে, মনে নেই?

বলা মাত্র ছেলে ছেড়ে মায়েরও মনে পড়েছে। মনোরমা দেবী বলে উঠলেন, ওকে তো জঙ্গলের বীটম্যান করা হয়েছিল...।

বাপীর সরব হাসি। সেই লোক আর নেই মাসিমা। আবু এখন আমাদের কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার, দু'গন্ডা বি-এ, এম-এ পাশ ওর আন্ডারে চাকরি করছে—নিজের বাড়ি নিজের গাড়ি।

লজ্জা পেয়ে আবু বলল, ছাড়ো তো, মাসিমা আর দীপুদার কাছে আমিও তোমার মতো একটা ঘরের ছেলে—

বাপীর মজা লাগছে। মওকা বুঝে সেয়ানা আবুও নিজেকে ঘরের ছেলে করে ফেলল। বানারজুলির সেই দাপটের কালে মহিলাকে মেমসায়েব আর দীপুদাকে ছোট সাহেব না বললে গর্দান যাবার ভয় ছিল।

বাইরে অন্তত মা ছেলে দুজনেরই হাসি-মুখ আর খুশি-মুখ। কিন্তু আসলে ভেবে পাচ্ছে না, একটা বুনো জংলি ছেলেরও ভাগ্য এমন ছপ্পর ফুঁড়ে ফেরে কি করে। টাকার ঘরে রূপের বাসা। সেই জংলি ছেলেরও রূপ ফিরে গেছে বটে।

আদর-আপ্যায়নে কার্পণ্য নেই। বাপী মোটে আসে না বলে মনোরমা দেবী বার কয়েক অনুযোগ করলেন। শিগ্‌গীরই আবার আসবে কথা দিয়ে ঘণ্টাখানেক বাদে আবুকে নিয়ে বাপী উঠল। ছেলের পিছনে মা-ও নিচের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। এক ধাপ নেমে বাপী ঘুরে দাঁড়াল।—মিষ্টির খবর কি মাসিমা, অনেক দিন দেখি না...

মহিলার অপ্রসন্ন মুখ। গলা খাটো করে জবাব দিলেন, কে জানে মাথায় কি ঢুকেছে, এখানেও বেশি আসে-টাসে না।

গাড়ি তাঁদের চোখের আড়াল হতে আবু ঝাঁঝালো চোখে দোস্তের দিকে ফিরল। বাপী বলল, আর পাঁচ-সাত মিনিট মুখ বুজে অপেক্ষা করো, নিয়ে যাচ্ছি—

আবু ধৈর্য ধরে বসে রইল বটে, কিন্তু তার ভিতরে অনেক প্রশ্ন কিলবিল করছে

এখন। বড় রাস্তা ছেড়ে কয়েকটা ছোট রাস্তা ঘুরে গাড়িটা মিনিট সাতেকের মধ্যেই থামল এক জায়গায়। আঙুল তুলে বাপী বলল, ঠিক চারটে বাড়ির পরে ওই বাড়িটা—নেমে যাও।

আবু আকাশ থেকে পড়ল।—আর তুমি?

—আমি না। একটা ট্যাক্সি ধরে ফিরে এসো, তাহলে আর রাস্তা ভুল হবে না।

—তাহলে আমারও গিয়ে কাজ নেই। ফেরো!

বাপী গম্ভীর।—দেখো তোমাকে আমি বোকা ভাবি না। তোমার একা যাওয়া দরকার, একাই যাবে। নামো।

আবছা অন্ধকারে দোস্তের মুখ ভালো দেখা যাচ্ছে না। দরজা খুলে আবু নামল। সামনের বাঁক ঘুরে বাপী তখনি গাড়িসুদ্ধু চোখের আড়ালে।

বড় রাস্তায় পড়ে নিজের মনেই হাসছে।

রাত নটার পরে আবু ফিরল। গোল গোল দু'চোখ বাপীর মুখের ওপর তুলে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে রইল।

হাসি চেপে বাপী জিগ্যেস করল, হল?

আবু মাথা নাড়ল। মুখেও জবাব দিল, হল।

কিন্তু রাতের খাওয়া সারা হবার আগে দোস্তের আর কোনো কিছুতে উৎসাহ দেখা গেল না। আবু সঙ্গ দেবার জন্য বসল শুধু। পর পর দু জায়গায় খাওয়া হয়েছে, খিদে নেই। সে দোস্তের খাওয়া দেখছে অর্থাৎ ভালো করে মুখখানা দেখছে।

খাওয়ার পর রাতের আড্ডা বাপীর শোবার ঘরে বসেই হয়। আবুর গুরু-গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে এবারে বাপী হেসে ফেলল।—কেমন দেখলে?

—এত ভালো ভাবিনি, তোমার জন্যে বুকের ভেতর টনটন করছিল।

বাপী হাসছে।—আর অসিত চ্যাটার্জির জন্যে?

—খুব আদর যত্ন করেছে, তবু তাকে ধরে আছাড় মারতে ইচ্ছে করেছিল।

আলতো করে বাপী মন্তব্য করল, সে সুযোগ পাবে'খন।

আবু রব্বানী নড়েচড়ে বসল। বাপী জিগ্যেস করল, মিষ্টি তোমাকে দেখে খুশি হল?

—খুব।

—কি বলল?

—বানারজুলির পুরনো কথা, বনমায়ার কথা—আমার সে-সময়ের সাহসের কথা শোনালো জামাই সাহেবকে। পরিবার আর ছেলেপুলের কথা জিগ্যেস করল, এখানে মেমসায়েবের মেয়ে ঊর্মিলা আর তার বরের সঙ্গে আলাপের খবরও বলল—কেবল তোমাকে মোটে চেনেই না বোঝা গেল।

বাপী হেসে ফেলল।—বোঝা গেল?

—খুব। এই জন্যেই তো তোমাকে নিয়ে মিষ্টি বহিনজির ভিতরেও কিছু গড়বড় ব্যাপার আছে টের পেলাম।

বাপীর বাইরে নিরীহ মুখ। ভিতরে হাসছে। ঊর্মিলাও এই গোছের কিছু বলে গেছল। ওই মিষ্টিকে দেখে সব চুকে-বুকে গেছে বলে তারও মনে হয়নি। বাপী প্রস্তুত হচ্ছে। রণে বা প্রণয়ে নীতির বালাই থাকতে নেই।

আবুর একটা চোখ এবারে ছোট একটু। জেরায় জেরবার করার ইচ্ছে।—মিষ্টি বহিনজির মেমসায়েব মা এখন তাহলে তোমার মাসিমা?

হাবা মুখ করে বাপী মাথা নেড়ে সায় দিল।

—ওই মা আর ছেলের কাছে তোমার এখন খুব খাতির কদর?

আবারও মাথা নাড়ল।—খুব।

—আসার সময় মেমসায়েব মেয়ের সম্পর্কে অমন কথা বলল কেন—তেমন বনছে না?

—জামাইয়ের সংগে বনছে না।

এটা শোবার ঘর ভুলে আবু বিড়ি ধরালো একটা।—বনছে না কেন?

—জামাই মদ খায়, রেস খেলে, জুয়ার নেশায় বউয়ের টাকা চুরি করে, ঝগড়া করে।

—সত্যি?

বাপী মাথা নাড়ল। সত্যি।

—মেমসায়েবের তাহলে কি ইচ্ছে?

বাপী নির্লিপ্ত জবাব দিল, তার আর তার ছেলের ধারণা কাগজ-কলমের বিয়ে, ছিঁড়ে ফেললেই ফুরিয়ে যায়—অমন লোকের সংগে ঘর করার কোন মানে হয় না।

আবু লাফিয়ে উঠল।—বিসমিল্লা। তুমি তাহলে গুলি মেরে দিচ্ছ না কেন?

ঠেস দেবার মতো করে বাপী ফিরে বলল, দুলারির বেলায় তুমি অন্ধ ছুট্টু মিঞাকে গুলি মেরে দিতে পেরেছিলে?

আবু লজ্জা পেল।—লোকটা মরার জন্য ধুঁকছিল তাই মায়া পড়ে গেছল। তোমারও কি এই মরদের ওপর মায়া পড়েছে?

—আমার না। তোমার বহিনজির পড়েছে। তার বিশ্বাস, জামাই সাহেব যতোই নেশা করুক জুয়া খেলুক টাকা সরাক বা ঝগড়া করুক—লোকটার ভালবাসায় কোনো ভেজাল নেই—তোমার জামাই সাহেবের এটাই নাকি আসল পুঁজি—এই পুঁজির জোর মিথ্যে হলে কাউকে কিছু বলতে হত না, তোমার বহিনজি নিজেই তাকে ছেঁটে দিত।

ব্যাপারখানা তবু মাথায় ভালো ঢুকছে না আবুর। জিজ্ঞাসা করল, তাহলে?

—তাহলে ওই লোকের ভালোবাসার সবটাই যে ভেজাল আর তোমার বহিনজির বিশ্বাস সবটাই যে ভুল এটুকু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারলেই ফুরিয়ে যায়।

—কি করে? আবু স্পষ্ট করে ধরতে ছুঁতে পারছে না বলে দ্বিগুণ উন্মুখ।

সোনা মুখ করে বাপী জবাব দিল, সেটা খুব আর কঠিন কি।...তুমি জিত্‌কে একটু তালিম দিয়ে যাও, বেচারা অসিত চ্যাটার্জিকে যেন ভালো করে খাতির-যত্ন করে, রেসের নেশায় বউয়ের আলমারি থেকে টাকা সরাতে হবে এ কি কথা! আর ভদ্রলোক রংদার মানুষ, ভালো জিনিস খুব পছন্দ—মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে কুমকুমকে নিয়ে বোতলের ব্যবসা তো তোমরা শুরুই করে দিচ্ছ—ও জিনিসেরও অভাব হবার কথা নয়...

আবু লাফিয়ে উঠল। কুমকুমকে নিয়ে বোতলের ব্যবসা!

—সেদিন গিয়ে বলে এলাম কি? অমন বিশ্বস্ত আর ভালো মেয়ে কোথায় পাবে। ...তাছাড়া মেয়েটার অভিজ্ঞতারও শেষ নেই।

নিরীহ মুখের দুই ঠোঁটে হাসিটুকু আরো স্পষ্ট হয়ে ঝুলছে। আবুর গোলগোল চোখ তার মুখের ওপর চড়াও হয়েই আছে। আর দুর্বোধ্য কিছু নেই। অস্পষ্ট নেই।

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কাছে এসে আধখানা ঝুঁকে সেলাম ঠুকল একটা। বলল, ঠিক আছে, এর পরের সব ভার তুমি এই বান্দার ওপর ছেড়ে দিতে পারো।

পরের দুটো দিন আবু জিত্‌কে নিয়ে ব্যস্ত। তার পরের দিন বানারজুলি ফেরার তাড়া। বাপীকে বলল, জিত্ সাহেব আর কুমকুম বহিনকে তিন-চার দিনের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। আমি তো খুব ঘন ঘন আসতে পারব না, ওদেরও দরকার মতো একটু ছোটা-ছুটি করতে হবে। নিয়ে যাই, দেখে-শুনে বুঝে আসুক। কুমকুম বহিন তোমার বাংলোয়

কোয়েলার কাছে থাকবে'খন, আর জিত্ সাহেবের তো বউ ছেলে সেখানেই।...তোমার অসুবিধে হবে?

পাশার দান ফেলা হয়ে গেছে! বাপী মাথা নাড়ল। অসুবিধে হবে না।

নিরাসক্ত মুখ আবুরও।—তুমি ঠিকই বলেছিলে বাপীভাই, কুমু বহিন ভারী ভালো মেয়ে। নতুন করে এখন কি ব্যবসায় নামছি শুনেও একটু ঘাবড়ালো না। বলল, বাপীদার ব্যবস্থার ওপর আর কোন কথা নেই।...ওর বাবা নাকি চোখ বোজার খানিক আগেও বলে গেছে আমাদের স্বর্গ-নরক বলে কিছু নেই...দরকার হলে ওই বাপীর জন্য যদি প্রাণ দিতে পারিস তাহলে সব স্বর্গ।

আবু হাসছে অল্প অল্প। বাপী নির্লিপ্ত! ভেতরটা খরখরে হয়ে উঠছে। কিন্তু বাপী তা হতে দেবে না। পাশার দান ফেলা হয়ে গেছে।

॥ সতেরো ॥

পরের টানা প্রায় দেড় বছরের নাটকে বাপী তরফদারের প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। সে নেপথ্যে দাঁড়িয়ে। শান্ত, নিরাসক্ত। কাজের সময় কাজে ডুবে থাকে। অবসর সময় বই পড়ে। পড়ার অভ্যেস আগেও ছিল। এই দেড় বছরে সেটা অনেক বেড়ে গেছে। যাওয়া-আসার পথে এক-এক সময় গাড়ি থামিয়ে স্টল থেকে গাদা গাদা ইংরেজি-বাংলা বই কিনে ফেলে। এই কেনার ব্যাপারেও বাছ-বিচার নেই খুব। গল্প-উপন্যাস আর ভালো লাগে না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখার মতো যে-সব বইয়ে জীবনের হাজারো অদৃশ্য খুঁটিনাটির সন্ধান মেলে সে-সব বেশি পছন্দ। ভালো লাগলে পাতা উল্টে যায়, না লাগলে ফেলে দেয়।

কমলার প্রসাদ অঝোরেই ঝরছে। এক বছরের ওপর হয়ে গেল কাছাকাছির অভিজাত এলাকাতে বাড়ি কেনা হয়েছে। টাকা কোনো সমস্যা না হলে যেমন বাড়ি কেনা যায় সেই রকমই। এক তলায় অফিস, দোতলায় বাস। মণিদাকে বাপী এ অফিসে এনে বসায়নি। সে উল্টোডাঙার গোডাউনের অফিসেই বসছে। বাচ্চুকে নরেন্দ্রপুরে ভর্তি করে দিয়ে পার্ক স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে মণিদা গোডাউনের পাশে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আছে। ছেলে সরানোর ব্যাপারটা মণিদার মনেই ছিল। আগে বাচ্চুর কাছেও ফাঁস করেনি। কারণ, সন্তু চৌধুরী তখন পাঁচ ছ'মাসের জন্য গৌরী বউদিকে নিয়ে ইংল্যান্ড সফরের তোড়জোড় করছে। রওনা হবার আগের ক'দিন তারা বাচ্চুকে দেখতে ঘন ঘন পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে এসেছিল। বাচ্চুর মাসের বরাদ্দ টাকা সন্তু চৌধুরীর কোনো বিশ্বস্ত জন প্রতি মাসের গোড়ায় মণিদাকে দিয়ে যাবার কথা। মণিদা সে টাকা সই করে রাখবে। ভরসা করে তারা একেবারে সব টাকা তার হাতে তুলে দিতে পারেনি। মণিদা ব্যবস্থার কথা শুনেছে। কোনো মন্তব্য করেনি।

পাঁচ ছ'মাস বাদে ফিরে এসে থাকলেও তারা বাচ্চু বা মণিদার হদিস পায়নি। পার্ক-স্ট্রীটের বাড়িতে অন্য অপরিচিত ভাড়াটে দেখেছে। আর সন্তু চৌধুরীর টাকাও মণিদা ছোঁয়নি দেখে হয়তো ধরে নিয়েছে, তাদের আক্কেল দেবার জন্যেই লোকটা বাড়ি ঘর ছেড়ে আর সব বেচে দিয়ে ছেলে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। বাপীর বাড়ি কেনার খবরও তাদের জানার কারণ নেই। বাচ্চুর দু-তিন মাস অন্তর ছুটিছাটায় আসে এখানে। বাপী কাকুর কাছে থাকে। সে ক'টা দিন খুব আনন্দ ছেলেটার। বাবার কাছেও গিয়ে থাকতে চায় না। ছেলেকে দেখার জন্য মণিদাকেই আসতে হয়। বাপী আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে। এখানে এসে ছেলেটা মায়ের নামও মুখে আনে না। এটা বাপের নিষেধ কিনা

জানে না। হস্টেলে ফিরে যাবার সময় হলে ওর মন খারাপ হয় বুঝতে পারে। কিন্তু যেতে আপত্তি করে না। আবার কবে ছুটি ক্যালেন্ডারে দেখে রাখে। যাবার আগে জিগ্যেস করে, জিত্ কাকুকে পাঠিয়ে তখন আবার আমাকে নিয়ে আসবে তো?

ছেলেটাকে অনায়াসে নিজের কাছেই এনে রাখা যেত। কিন্তু বাপী নিজেই এখন মাসের মধ্যে টানা পনের দিন কলকাতায় থাকে না। কলকাতার ব্যবসা মোটামুটি বাঁধা ছকের দিকে গড়াতে সে আবার বাইরের ঘাঁটিগুলো তদারকে মন দিয়েছে। আবু উত্তর বাংলা নিয়ে পড়ে আছে। বিহার আর মধ্যপ্রদেশের রিজিয়ন্যাল ম্যানেজারদের কাজকর্ম এখন আবার বাপী নিজে দেখছে। মাসে দেড় মাসে একবার করে বানারজুলিতেও যেতে হচ্ছে। কিন্তু দেড় বছরের এই কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোন রকম উত্তেজনা বা উদ্দীপনার ব্যাপার নেই। প্রাচুর্য থেকে কোনো কৃত্রিম আনন্দ ছেঁকে তোলার আগ্রহ নেই। চারদিকে খাল বিল নদী-নালা সমুদ্র, তৃষ্ণায় ছাতি-ফাটা চাতক তবু স্বাতী নক্ষত্রের ফটিক জল ছাড়া অন্য জল স্পর্শ করে না। সামাজিক যোগাযোগও কমে আসছে বাপীর। বাড়ি কেনার পর মিষ্টিকে আর অসিত চ্যাটার্জিকে একবার মাত্র নেমন্তন্ন করে আনা হয়েছিল। তাদের ঘরের শান্তিতে আবার চিড় খেয়েছে তখনই বোঝা গেছল। সেই কারণে দীপুদার যাতায়াত আগের থেকে বেড়েছে। তার মায়ের টেলিফোন আসাও। কিন্তু আগ্রহ সত্ত্বেও বাপীকে তারা তেমন নাগালের মধ্যে পায় না। তার ঘন ঘন টুর প্রোগ্রাম। ফিরলে কাজের ডবল চাপ।

অসিত চ্যাটার্জীর সামনে কিছু বাড়তি রোজগারের টোপ ফেলার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই বাপী জিত্‌কে বলে দিয়েছিল হিসেব-পত্রের ব্যাপারে ওই লোকের কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য নেবার বা কোম্পানীর ভাউচারে এক পয়সা দেবার দরকার নেই। ফলে জিত গা করছে না দেখে অসিত চ্যাটার্জী নিজেই কাজের কথা তুলেছিল। বাপীর জবাবে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। বলেছে, তার ধারণা এটা মিলু বা তার মা-দাদা কেউ পছন্দ করবে না।

অপছন্দের ব্যাপারে স্ত্রীর সঙ্গে তার মা-দাদাকে জুড়ে দেবার ফলে ফর্সা মুখ রক্ত-বর্ণ।—আমি কাজ করে বাড়তি উপার্জন করব তাতে কার কি বলার আছে? আর মিলুই বা আপত্তি করবে কেন?

—জিগ্যেস করে দেখো। তার আপত্তি না হলেও আর কথা কি...কাজ করে কত লোকই তো কত টাকা নিয়ে যাচ্ছে।

জিজ্ঞাসার ফল কি হয়েছে বাপী আঁচ করতে পারে। অসিত চ্যাটার্জী মেয়ে জাতটার ওপরেই বীতশ্রদ্ধ। বলেছিল, যত লেখা-পড়াই শিখুক মেয়েরা মোস্ট্ আন্‌প্র্যাকটিক্যাল। সেন্টিমেন্টাল ফুল্‌স্ যত সব।

ব্যবসার বাইরে জিত্ মালহোত্রার সঙ্গেও বাপীর অন্য কোনো কথা হয় না। এমন কি প্রত্যক্ষ যোগ নেই বলে এখানকার মদের ব্যবসা কেমন চলছে, সে খবরও নেয় না। কিন্তু জল কোন দিকে গড়াচ্ছে চোখ বুজে অনুমান করতে পারে। এই দেড় বছরের মধ্যে আবু রব্বানী পাঁচ-ছ'বার কলকাতায় এসেছে। ওদের লাল জলের ব্যবসা চালু হবার পরেই আবুকে বাপী এখানকার জন্য একটা লিকার শপের লাইসেন্স বের করার পরামর্শ দিয়েছিল। নিজেদের দোকান থাকলে শুধু সুবিধে নয়, নিরাপদও। টাকা খসালে বোবার মুখে কথা সরে। লাইসেন্স বার করতে জিতের বেশি সময় লাগেনি। লাইসেন্স কুমকুমের নামে। আবু আর জিত্ তার অংশীদার। লাভের চার-আনা শুধু বাপীর নামে জমা হবে—কিন্তু কাগজে-কলমে সে কেউ নয়। এরপর মধ্যকলকাতায় যে দোকান গজিয়ে উঠেছে তাতে খুব একটা জাঁকজমকের চিহ্ন নেই। যে দুজন কর্মচারীকে বহাল করা

হয়েছে তারাও বানারজ্বলির লোক এবং আব্বর লোক।

জিত্ মালহোত্রা সময়মতো অফিসে আসে, দরকার মতো পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করে, কিন্তু বিকেল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার পর সে নিপাত্তা। শনিবারও বেলা একটার পর তার টিকির দেখা মেলে না। এই ব্যস্ততা যে শ্বধ্ব ওদের জলীয় ব্যবসার কারণে নয়, তাও বোঝা গেছে। বাড়তি রোজগারের আশায় ছাই পড়লেও অসিত চ্যাটার্জির সঙ্গে জিতের যে গলায় গলায় ভাব এখন তার প্রমাণ দীপ্বদার নালিশ। তার অব্বঝ বোন আবার অশান্তির মধ্যে পড়েছে। অমান্বষ ভগ্নীপতি প্রায় রাতেই বদ্ধ মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফেরে। শনিবার শনিবার রেসের মাঠে যায়। দীপ্বদার চেনাজানা অনেকেই তাকে দেখেছে। শনিবার অন্য দিনের থেকে নেশার মাত্রা বেশি হয়, তাই মিষ্টিরও রেসের ব্যাপারটা জানতে ব্বঝতে বাকি নেই। ঝগড়ার ম্বখে ওই অপদার্থই ব্বক ঠ্বকে বলে, সে রেসে যায় নেশা করে—তাতে কার বাপের কি। রোজ মদ খাওয়া আর ফি হপ্তায় রেস খেলার অত টাকা কোথা থেকে পায় দীপ্বদারা ভেবে পায় না।

বাপী নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত। মিষ্টির মত নেই বলে ওই লোকের তার এখান থেকে কিছ্ব বাড়তি রোজগারের প্রস্তাব নাকচ করা হয়েছে, সে-খবর দীপ্বদা বা তার মাকে অনেক আগেই জানানো হয়ে গেছে।

কুমকুমের সঙ্গে বাপী এখন আর দেখা পর্যন্ত করে না। কিন্তু তার সমাচারও নখ-দর্পণে। জীবনের এই ব্বত্তে সে শক্ত দ্বটো পা ফেলে দাঁড়িয়েছে। এখন সে নিজের সহজ মাধ্বর্যে আত্মস্থ। দ্বিধাদ্বন্দ্বশ্বন্য। কুমকুম বহিনের প্রসঙ্গে আব্ব রব্বানী প্রশংসায় পঞ্চম্বখ। ব্বদ্ধি ধরে, কথা শোনে, একট্বও হড়বড় করে না। ব্বত্ত বদলের শ্বর্বতেই কুম্বর জন্যে বেশি ভাড়ার ফ্ল্যাট ঠিক করা হয়েছে। মাথার ওপর বাড়িঅলা বসে থাকলে কাজের অস্ববিধে। তার দেখাশ্বনার জন্য একজন আয়া আর একজন ব্বড়ো চাকর আছে। সেই তখন আব্বর সঙ্গে বাপী একবার কুম্বকে দেখতে গেছল। মনে মনে বাপী নিজেও তখন ওর বিবেচনার তারিফ করেছিল। বেশবাস আর প্রসাধনে র্বচির শাসনও জানে মেয়েটা। আলগা চটক কিছ্ব নেই। বাড়তির মধ্যে আগের সেই ঝকঝকে সাদা পাথরের ফ্বলটা আবার নাকে উঠে এসেছে। ওটার জেল্লা চোখে ঠিকরোবার জন্যেই।

এর মাস তিনেক বাদে আব্ব তৃতীয় দফা যখন কলকাতায় এসেছে, তার সঙ্গে বানার-জ্বলির বাদশা ড্রাইভার। এখন ব্বড়োই বলা চলে। কলকাতায় মালিকের কাছে এসেছে। ভারী খ্বশি।

বাপী আব্বকেই জিজ্ঞাসা করেছে, কি ব্যাপার?

আব্ব মাথা চ্বলকে জবাব দিয়েছে, ও কিছ্বদিন এখন কুমকুম বহিনের কাছে থাকবে।

বাপী আর কিছ্ব জিজ্ঞাসা করেনি। আব্ব কোন্ চটকের ওপর নির্ভর করতে চায় তক্ষ্বনি ব্বঝে নিয়েছে। ওরও এখন মাথা হয়েছে বটে একখানা। দিন কয়েকের মধ্যে একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড চকচকে গাড়ি কেনা হয়েছে। কিছ্বদিন বলতে বাদশা ড্রাইভার কুমকুমের কাছে টানা চার মাস ছিল। ও বানারজ্বলি ফিরে যাবার আগে মালিককে জানিয়ে গেছে, দিদিজির গাড়ি চালানোর হাত এখন খ্বব পাকা আর খ্বব সাফ। ভারী ঠাণ্ডা মাথায় গাড়ি চালায় দিদিজি—মালিকের চিন্তার কোন কারণ নেই।

পাকা হাত দেখাবার লোভে কুমকুম কোনো দিন গাড়ি চালিয়ে বাপীর কাছে আসেনি। জিত্ অনেক করে বলা সত্ত্বেও আসেনি। শ্বনেছে মিস ভড়ের নাকি দার্বণ লজ্জা। জিত্ আশা করেছিল এ-কথা শোনার পর মালিকই একদিন তাকে গাড়ি নিয়ে আসতে বলবে।

বাপী বলেনি। কিন্তু কুমকুমের গাড়ি চালানো নিজের চোখেই দেখেছে একদিন। পার্ক স্ট্রীট ধরে আসার পথে বাপীর গাড়ি ট্রাফিক লাইটে আটকে গেছল। সামনের সোজা

রাস্তা ধরে সারি সারি গাড়ি যাচ্ছে আসছে। সেই চলন্ত সারিতে কুমুর গাড়ি। গাড়ি চালিয়ে কুমু দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাচ্ছে। ডান হাতেই কনুই পাশের খোলা জানলায় রেখে স্টিয়ারিং ধরে বসায় শিথিল ভঙ্গিটুকু চোখে পড়ার মতোই। কুমকুমের ওকে দেখার কথা নয়। দেখেওনি। বাপী এর পর নিজের মনেই হেসেছে অনেকক্ষণ ধরে। রাতের আবছা আলোর নিচে এই মেয়েকে শিকারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত কে বলবে।

এর পর যা, বাপীর সামনে তার সবটাই ছকে বাঁধা ছবির মতো স্পষ্ট।

...ব্যস্ততার অজুহাতে অসিত চ্যাটার্জীর সঙ্গে জিতের মাখামাখির ভূমিকা কমে আসছে। সে পিছনে সরছে। সামনে মিস ভড়। কুমকুম ভড়। অসিত চ্যাটার্জী তার অন্তরঙ্গ সাহচর্যের দাক্ষিণ্যে ভাসছে। রমণীর যে রূপ গুণ বুদ্ধি পুরুষের আবিষ্কারের বস্তু, অসিত চ্যাটার্জীর চোখে কুমকুমের সেই রূপ সেই গুণ আর সেই বাস্তব বুদ্ধি। পয়সা আছে, তবু আর পাঁচটা মেয়ের মতো ড্রাইভারের মুখাপেক্ষী নয়। নিজের গাড়ি নিজে ড্রাইভ করে। নিজের তত্ত্বাবধানে মদের দোকান চালায় এমন মেয়ে এই কলকাতা শহরেও আর আছে কিনা জানে না। সে জানে মিস ভড়ের বাবার দোকান ওটা। অসময়ে বাবা মরে যেতে লাইসেন্স নিজের নামে করে নিয়ে অনায়াসে সেই দোকান চালাচ্ছে। সামনে এসে বেচাকেনা করে না অবশ্য, পর্দার আড়ালে পিছনের চিলতে ঘরে বসে দু'তিন ঘণ্টা দেখাশোনা করে। কেউ টেরও পায় না এটা কোনো মেয়ের দোকান। আর যে-কোনো মেয়ে হলে বাপ চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে দোকান বেচে দিয়ে টাকার বাণ্ডিল বুকে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘরে বসে থাকত। নিজে মদ ছোঁয় না, কিন্তু পুরুষের এই নেশাটাকে সংস্কারে অন্ধ মেয়েদের মতো অশ্রদ্ধার চোখেও দেখে না। মান্যগণ্য অতিথিদের জন্য একমাত্র জিনিস ঘরে মজুত। চাইতে হয় না। একটু উসখুস করলেই তেষ্টা বোঝে। উদার হাতে বার করে দেয়। আবার বেশি খেতে দেখলে আপত্তি করে। বলে, অত ভালো নয়, আনন্দের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই ভালো। কুমকুমের চিন্তা হবে না তো কি। এত রূপ আর এত বিদ্যা যে মানুষের, তার ভালো মন্দের দিকে চোখ না রেখে কোনো মেয়ে পারে?

এ-সব খুঁটিনাটি খবর বাপী বানারজুলিতে বসে শুনেছে। আবু হেসে হেসে বলেছে, আর খুব বেশি দেরি নেই দোস্ত, জামাইসাহেব ঘায়েল হল বলে।

বাপী সচকিত।—দুলারি কিছু জানে না তো?

—ক্ষেপেছো! গেল মাসেও কুমকুম বহিন এসে তিন রাত তোমার বাংলোয় থেকে গেছে—দুলারির সঙ্গে এখন খুব ভাব তার। ও বলে, মেয়েটা কত ভালো, বাপীভাই একেই বিয়ে করছে না কেন। এ-সব শুনলে আর খাতির করবে!

ফূর্তির মুখে আবু বলেছিল, কুমকুম বহিন এবারে এসে খুব মজার কথা শুনিয়ে গেছে বাপীভাই। ওই লোকটার জন্যে তার নাকি মায়া হয়। কি রকম মায়া জানো? খারাপ সময়ে একবার ও কালীঘাটের মন্দিরে গেছল—মা কালীর কাছে প্রার্থনা করতে যদি একটু দিন ফেরে। সেখানে গিয়ে দেখে এক ভদ্রমহিলার মানতের পাঁঠা বলি হচ্ছে। জীবটার জন্য মহিলার এমন মায়া যে বলির আগে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকল। কুম-কুমেরও ওমনি মায়া, কিন্তু পুজোর বলি না দিয়ে পারে কি করে।

আবুর হা হা হাসি। কিন্তু বাপী তেমন খুশি হতে পারেনি। এ-রকম শুনলে বিবেকের ওপর আঁচড় পড়ে! এই বাস্তবে নেমে বাপী সেটা চায় না।

ঘটনার ঢল এবারে পরিণতির মোহনার দিকে। সেদিন শনিবার। সন্ধ্যার ঠিক পরেই দীপুদা এলো। থমথমে মুখ। সাধারণত টেলিফোন করে বাপী আছে কি নেই জেনে নিয়ে আসে। কিছু একটা তাড়ায় এই দিনে খবর না নিয়ে বা না দিয়ে এসে গেছে। এই মুখ দেখা মাত্র বাপীর মনে হয়েছে তার প্রতীক্ষার গাছে কিছু ফল ধরেছে।

—এসো। হঠাৎ যে?

—তোমার সংগে সীরিয়াস কথা আছে...।

—বোসো। কি ব্যাপার?

হল-এর অন্য মাথায় দাঁড়িয়ে বলাই কিছু একটা করছে। সেদিকে চেয়ে দীপুদা বলল, তোমার ভিতরের ঘরে গিয়ে বসি চলো।

শোবার ঘরে এসেই চাপা রাগে বলে উঠল, রাসকেলটার এত অধঃপতন হয়েছে আমি শুনেও বিশ্বাস করিনি।

তিন হাতের মধ্যে মুখোমুখি বসে বাপী চুপচাপ চেয়ে রইল। অর্থাৎ ব্যাপার খানা কি কিছু বুঝছে না।

বোঝানোর জন্যেই দীপুদার আসা। তপ্ত গলায় দীপুদা যা শোনালো তাতে বাপীর মনে হল, প্রতীক্ষার গাছে ফল শুধু ধরেনি, অনেকটা পেকেও গেছে।

—মেয়েছেলে নিয়ে গোলমেলে ব্যাপার বেশিদিন ধামা-চাপা থাকে না। অসিত চ্যাটার্জির আপিসের এক বন্ধু আগে ওর বাড়িতে আসত, আড্ডা দিত। মিষ্টির সংগেও বেশ আলাপ-পরিচয় হয়ে গেছল। ওই স্কাউনড্রেলের সেটা পছন্দ নয় বুঝেই ভদ্রলোক বছরখানেকের মধ্যে বাড়িতে আর আসেটাসে না। সপ্তাহ তিনেক আগে সে এয়ার-অফিসে এসে মিষ্টির সংগে দেখা করে গেছে। কর্তব্যজ্ঞান আছে বলেই না এসে পারেনি। বলেছে, একটি সুশ্রী মেয়ে নিজে ড্রাইভ করে সপ্তাহের মধ্যে কম করে চার দিন তাদের অফিসে আসে। অফিসে ঢোকে না। ছুটির আগে আসে, গাড়িতে বসেই অপেক্ষা করে। অসিত চ্যাটার্জী নেমে এলে তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যায়। প্রত্যেক শনিবার দিন একটা বাজার দু'পাঁচ মিনিট আগে তার গাড়ি আসে, হাজার কাজ থাকলেও তখন অসিত চ্যাটার্জীকে অফিসে ধরে রাখা যায় না। ঠিক নেশা না থাকলেও আগে ওই বন্ধুটি মাঝেসাঝে অসিত চ্যাটার্জীর সংগে রেসের মাঠে যেত। শনিবারে ঘড়ি ধরে এই অফিস পালানোর তাড়া দেখেও তার সন্দেহ হয়। কয়েকটা শনিবার তাই সে-ও রেসের মাঠে গেছে। সব কদিনই সেই মেয়ের সংগে অসিত চ্যাটার্জীকে দেখেছে। তারা গ্র্যান্ডে বসে খেলে। ছসাত মাস হয়ে গেল এই এক ব্যাপার চলছে। জিগ্যেস করলে অসিত চ্যাটার্জী বলে, মেয়েটির বাবা তাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ একজন ছিলেন। উনি মারা যেতে তাঁর এই মেয়ে এখন ফার্ম দেখাশুনা করে। বিনে পয়সায় অসিত চ্যাটার্জী ফার্মের খাতাপত্র ঠিক করে দেয় বলেই এত খাতির কদর। সত্যি যদি হয় তাহলে বলার কিছু নেই। শুধু বন্ধুটির নয়, অফিসেই অনেকেরই খটকা লেগেছে বলে শুভানুধ্যায়ী হিসেবে সে মিষ্টিকে খোলাখুলি জানাবার দরকার মনে করেছে।

মিষ্টি জানে, একটা বড় ফার্মে বিকেলে পার্ট টাইম কাজ জুটেছে বলে ফিরতে রাত হয় লোকটার। অনেক টাকা দেয় তারা। সেই টাকায় মদ গিলে ঘরে আসে। কিন্তু মতি-গতি বদলাচ্ছে, তাও লক্ষ্য করছে। মদ খাওয়া বা রেস খেলা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি হলে বেপরোয়ার মতো কথা বলে। শাসায়। তা বলে এরকম ব্যাপার কল্পনাও করা যায় না। তাই শোনামাত্র সব যে বিশ্বাস করেছে তাও নয়। যে সেধে এসে এমন খবর দিয়ে গেল তার রাগ বা আক্রোশ থাকা অস্বাভাবিক নয়। আজকাল বাড়িতে আসে না তার কারণ আসতে হয়তো নিষেধই করা হয়েছে।

দীপুদা জানিয়েছে, বোকা মেয়ে তার পরেও বাকে বা মাকে একটি কথাও বলেনি। ওই পাষণ্ডের সংগে বোঝাপড়া করতে গেছে। সেই রাতে নেশার মুখে কিছু বলেনি। পরদিন সকালে ধরেছে। বলেছে, তুমি রোজই প্রায় অফিস থেকে একটি মেয়ের সংগে বেরিয়ে যাও শুনলাম—সে নিজে ড্রাইভ করে, তুমি পাশে বসে থাকো। কি ব্যাপার?

অন্ধকারে জানোয়ারের মুখে হঠাৎ জোরালো আলোর ঘা পড়লে যেমন ধড়ফড় করে ওঠে, কয়েক পলকের জন্য সেই মুখ নাকি অসিত চ্যাটার্জীর। মিষ্টির যা বোঝার সেই কটা মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে নিয়েছে। তারপর জানোয়ারের মতোই তর্জন-গর্জন লোকটার।—কোন্ সোয়াইন বলেছে? আমি কখন কোন কাজে কার গাড়িতে বেরোই তা না জেনে তোমাকে এ সব বলে কোন্ সাহসে? তোমার সেই চরিত্রবানেরা কারা আমি জানতে চাই? অফিসে তোমার চারদিকে যারা ছোঁকছোঁক করে বেড়ায়—তারা? কোন মতলবে তোমাকে তারা এ-সব বলে তুমি জানো না? না কি জেনেও ন্যাকামো করছ?

দীপুদার বোন তারপরেও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। সে থামতে চেয়েছে, আপিসের পর সে কোন বড় ফার্মে পার্টটাইম কাজ করে. ফার্মের নাম কি, টেলিফোন নম্বর কি।

এরপর শয়তানের মুখোশ আরো খুলেছে। চিৎকার করে বলেছে, যে স্ত্রীর এত অবিশ্বাস তার কোন কথার জবাব সে দেবে না। তাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে কারো ঘাড়ে মাথা থাকবে না বলে শাসিয়েছে।

মিষ্টি এরপর টেলিফোন করে দাদাকে শনিবারের রেসের মাঠে যেতে বলেছে। শুনে দীপুদা প্রথমে আকাশ থেকে পড়েছিল। মিষ্টি শুধু বলেছে, কিছু গণ্ডগোলের ব্যাপার চোখে পড়তে পারে, কিছু বলবে না, শুধু দেখে এসো, পরে কথা হবে।

দুর্বোধ্য হলেও কাকে নিয়ে বোনের অশান্তি, জানা কথাই। দীপুদা গত শনিবারে রেসের মাঠে গেছল, এই শনিবারেও মাঠ থেকে ফিরে সোজা আগে মিষ্টির ওখানে গেছল। মাঠে যা দেখার দেখেছে। তারপর মিষ্টির মুখে সব শুনেছে। তাদের মা এখনো কিছু জানে না। সব শোনার পর মায়ের মাথাই না খারাপ হয়ে যায় দীপুদার এই চিন্তা।

বাপীর মুখের রেখা নিজের প্রতি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না। চুপচাপ শুনছে। চেয়ে আছে। মিষ্টির ওখান থেকে দীপুদা সরাসরি এখানে কেন, বোঝার চেষ্টা।

দুর্ভাবনায় মুখ ছাওয়া দীপুদার, একটু চুপ করে থেকে বলল, মেয়েটি সুশ্রী আর অবস্থাপন্ন তো বটেই, বেশ কালচারও মনে হল। এমন এক মেয়ের সঙ্গে স্কাউনড্রেলটা কি ভাঁওতা দিয়ে ভিড়েছে তার ঠিক কি! এরকম একটা থার্ড রেট লোক ওখানে পাত্তা পেল কি করে?

এ আলোচনা যেন অবান্তর। বাপী বলল, ওই থার্ড রেট লোক তোমার বোনের কাছেও পাত্তা পেয়েছিল...এ কথা ভেবে আর কি হবে। এখন সমস্যাটাই বড়।

দীপুদা কথাটা মেনে নিয়েই বলল, মিষ্টি তখন ছেলেমানুষ, কি আর কাণ্ডজ্ঞান। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছে। উৎসুক একটু। আচ্ছা বছর সাতাশ-আটাশ বয়েস. ব্যবসা আছে, নিজে ড্রাইভ করে—এ-রকম কোনো মেয়েকে তুমি চেনো বা দেখেছ?

বাপী ভিতরে সচকিত। প্রশ্নটা ব্যারিস্টার সুদীপ নন্দীর নিছক কাঁচা কৌতূহল মনে হল না। প্রশ্নটা তার না হয়ে তার বোনের হতে পারে। মাকে কিছু না বলে বা তার সঙ্গে শলাপরামর্শ না করে হন্তদন্ত হয়ে আগে এখানে এসেছে কেন? বাপীর ঠাণ্ডা দু'চোখ দীপুদার মুখের ওপর স্থির একটু। তারপর উঠে বলাইকে টেলিফোন এ-ঘরে দিয়ে যেতে হুকুম করল।

নম্বর ডায়েল করল। জিতের নম্বর। কাছাকাছির মধ্যে এখন তারও আলাদা ফ্ল্যাট হয়েছে। বউ ছেলে নিয়ে এসেছে। জিত্ সাড়া দিতে বাপী শুধু বলল, একবার এসো—

ঘনিষ্ঠ আলাপ না থাকলেও জিত্ মালহোত্রাকে সুদীপ নন্দীও চেনে। আরো উৎসুক। —তাকে ডাকলে কেন:..এ ব্যাপারে সে কিছু জানে?

জবাবে ঠাণ্ডা মুখে বাপী তার কৌতূহল আরো চড়িয়ে দিল।—অপেক্ষা করো। এক্ষুনি এসে পড়বে।

ট্যাক্সি হাঁকিয়ে জিত্ দশ মিনিটের মধ্যে হাজির। বলাই খবর দিতে তাকেও শোবার ঘরেই ডাকা হল। সন্দীপ নন্দীকে দেখে সদাসপ্রতিভ জিত্ দু'হাত জুড়ে কপালে ঠেকালো। বাপী বলল, পাঁচ-ছ'মাস আগে তুমি এ'র ভগ্নীপতি অসিত চ্যাটার্জী আর তোমার চেনাজানা কোন্ ওয়াইন-শপের মেয়ে মালিকের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে চেষ্টা করেছিলে...যা জানো দীপুদাকে বলো। নিজের দোষ ঢাকার জন্য কিছু গোপন করার দরকার নেই।

বাপী উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। জিত্কে ওটুকু না বললে চলত। ওর নিজের বুদ্ধিই যথেষ্ট। তার ওপর আবু রব্বানী অনেক রকমের তালিম দিয়েই রেখেছে। কলে-পড়া মুখ করে ও কি বলবে বাপী জানে। বলবে, চ্যাটার্জী সাহেবের সঙ্গে আগে তারই গলায় গলায় ভাব হয়ে গেছল।...চ্যাটার্জী সাহেবের মতো অত না হলেও অল্পস্বল্প নেশার অভ্যাস তারও আছে। লিকারশপের সেই মেয়ে মালিকের কাছ থেকে জিনিস কিনত। সেই মেয়ে তাকে খুব খাতির করত আর সস্তায় জিনিস দিত। কারণ, ইনকাম ট্যাক্সের অনেকের সঙ্গে তার দহরম-মহরম। তার গত দু'তিন বছরের ইনকাম ট্যাক্সের জট জিত্ সাফ করে দিয়েছে, অনেক টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছে। চ্যাটার্জী সাহেব ড্রিংকএর এত বড় সমজদার, তাই জিত্ই সেই মেয়ে মালিকের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। সস্তায় ভালো জিনিস পাওয়া ছাড়া এর থেকে আর কোনো বিভ্রাট হতে পারে ভাবেনি। বেগতিক দেখে মাস পাঁচ ছয় আগে জিত্ ভয়ে ভয়ে ব্যাপারটা মালিককে জানাতে চেষ্টা করেছিল!...আর শেষে বলবে, মালিকের শোনার সময় বা আগ্রহ হয়নি দেখে সে-ও চুপ মেরে গেছে।

তাসের ঘর ধসে গেছে। মিষ্টি মেয়েদের কোনো হস্টেলে যাওয়ার মতলবে ছিল। তার বাবার জন্য পারেনি। বাবা রিটায়ার করে কলকাতায় চলে এসেছে। সকলে মিলে একরকম জোর করেই তাকে বাড়িতে ধরে নিয়ে এসেছে। এখন ঝড়ের পরের স্তব্ধতা থিতিয়ে আছে।

মনোরমা নন্দীর ঘন ঘন টেলিফোন আসছে। গলার চাপা স্বর শুনেই বাপী বুঝতে পারে টেলিফোনের তাগিদটা মেয়ের অগোচরে। সব থেকে বেশি এখন তাকেই দরকার, আভাসে ইঙ্গিতে তাও বলতে কসুর করেননি। ...রবার বাপী এ' সেটা বলে এড়িয়েছে। তারপর স্পষ্ট আশ্বাস দিয়ে বলেছে, আপনি ব্যস্ত হবেন না ম...মা, যখন সময় হবে আমি নিজেই যাব, আপনাকে বলতে হবে না।

সন্দীপ নন্দীও কোর্ট ফেরত বাড়িতে হানা দিচ্ছে প্রায়ই। মায়ের বাড়িটা এরপর সম্পূর্ণ তার একার হবে এই আশাতেই হয়তো দ্রুত ফয়সলার দিকে এগনোর তাড়া তার। টাকার যার গাছপাথর নেই, আর মন যার অত দরাজ—সম্পর্ক পাকা হবার পর সে ওই বাড়ির ওপর থাবা বসাতে আসবে না এ বিশ্বাস আছে। তিক্তবিরক্ত সে আসলে নিজের বোনের ওপর। তার মাথায় কি-যে আছে ভেবে পাচ্ছে না। কারো সঙ্গে কথা নেই। চুপচাপ আপিসে যায় আসে। এত বড় এক ব্যাপারের পরেও ডিভোর্সের কথায় হাঁ না কিছুই বলে না। দীপুদার বাপীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা।

বাপীর একই জবাব।—আমার পরামর্শ যদি শোনো তো ব্যস্ত হয়ো না। এত বড় ব্যাপার হয়ে গেল বলেই ধৈর্য ধরে কিছুদিন সবুর করো। মাসিমাকেও তাড়াহুড়ো করতে বারণ করো।

দেড় মাসের মধ্যে অসিত চ্যাটার্জীর ভরাডুবি ঘনিয়ে এলো আর এক দিক থেকে। এর পিছনে সবটাই কুমকুমের হাতযশ। বড় তেল কোম্পানীর চিফ অ্যাকাউনটেন্ট, জমা-

খরচের হাজার হাজার কাঁচা টাকা অসিত চ্যাটার্জীর হেপাজতে। আজকের জমার টাকা কাল বা পরশু পিছনের তারিখ দিয়ে খাতায় দেখালে কে আর ওটুকু কারচুপি ধরছে। ক্যাশ ব্যালান্স ঠিক রাখাও তো তারই দায়। তারিখ অনুযায়ী সেটা ঠিক থাকলেই হল। শনিবারে রেসের মাঠের জন্য পাঁচ-সাতশ বা হাজার টাকা সরিয়ে সোমবারে আবার সে টাকাটা পুরিয়ে রাখলেই হল। দু'চারবার এ-রকম করেছে। শনিবারে তাড়াতাড়ি ব্যাংক বন্ধ, কুমকুম হয়তো সময় করে টাকা তুলে রাখতে পারেনি। অসিত চ্যাটার্জীকে ফোনে জানিয়ে রেখেছে, কিছু টাকার ব্যবস্থা রেখো, সোমবার পেয়ে যাবে।

রেসে জিতলে তো কথাই নেই, ঘাটতির টাকা তক্ষুনি পকেটে এসে গেছে। না জিতলেও সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি। রবিবারের সান্ধ্য বৈঠকে কুমকুম দোকান থেকেই সে-টাকা এনে তার হাতে তুলে দিয়েছে। তাই আপিসের টাকায় হাত দিতে অসিত চ্যাটার্জির তখন আর ভয়-ডর নেই।

কুমুর টেলিফোন পেয়ে শেষবারে চার হাজার টাকা সরিয়েছে। হাতে খুব ভালো ভালো টিপ আছে। কি কি উৎসব উপলক্ষে বড়দরের খেলা। কপালদোষে সেদিন সবটাই হার হয়ে গেল, রবিবারের সন্ধ্যায় এসে অসিত চ্যাটার্জী আয়ার মুখে শুনল হঠাৎ কোনো জরুরী কাজে কুমকুম বাইরে গেছে, পরদিন সকালের মধ্যেই ফিরবে বলে গেছে। অসিত চ্যাটার্জী তখনো নিশ্চিন্ত। পরস্পরের প্রতি এমনি মুগ্ধ তারা যে বাজে ভাবনা-চিন্তার ঠাঁই নেই।

কিন্তু পরদিন অফিসে যাবার আগে টাকা নিতে এসে দেখে কুমকুম ফেরেনি। এবারে অসিত চ্যাটার্জীর চিন্তা হয়েছে একটু। কুমকুমের জরুরি কাজে হঠাৎ যাওয়া বা দিন-কতকের জন্য আটকে পড়া নতুন নয়। আগেও এরকম হয়েছে। সেরকম কোনো জরুরী কাজের জন্য যদি চলে গিয়ে থাকে, চার হাজার টাকার ব্যাপারটা হয়তো ভুলেই বসে আছে।

ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে, একদিন ছেড়ে চার-পাঁচ দিনও এই ঘাটতি ধামা-চাপা দিয়ে রাখা সহজ ব্যাপার। কিন্তু লোকটার বরাত নিতান্তই খারাপ এবার। ভিতরের কারো শত্রুতার ফল কিনা জানে না। সেই বিকেলের মধ্যেই ধরা পড়ে গেল। বড় সাহেব স্বয়ং অ্যাকা-উণ্টস চেক করতে বসল।

অসিত চ্যাটার্জীর মাথায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। চাকরি খতম তো বটেই। এখন জেলে বাঁচে কি করে। কাকুতি মিনতি করে আর হাতে পায়ে ধরে দুটো দিনের সময় নিল। কুমকুমের প্রতীক্ষায় পাগলের মতো সন্ধ্যে পর্যন্ত কাটল। আর কোনো পথ না দেখে শ্বশুরবাড়িতে ছুটল মিষ্টির সঙ্গে দেখা করতে। অনেক করে বলে পাঠালো ভয়ানক বিপদ—একবারটি দেখা না হলেই না। মিষ্টি নিচে নামেনি। দেখা করেনি।

পরদিন সকাল নটা নাগাদ বাপীর কাছে এসে ধর্ণা দিল। উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি। এক্ষুনি চার হাজার টাকা না পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বাপী খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করল। খুঁটিয়ে শুনল সব। টাকার জন্য তার স্ত্রীর কাছে গেছল কিনা তাও জেনে নিল। তারপর উঠে নিজের ঘরে এসে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল। নম্বর ডায়েল করল।

ওদিক থেকে দীপুদা সাড়া দিল। বাপী মিষ্টিকে ডেকে দিতে বলল।

কয়েক মুহূর্তের অধীর প্রতীক্ষা। ফোন ধরবে কি ধরবে না সেই সংশয়।

—বলো।

একটা বড় নিঃশ্বাস সংগোপনে মুক্তি পেয়ে বাঁচল।—ও-ঘরে অসিত চ্যাটার্জী বসে আছে। তার এক্ষুনি চার হাজার টাকা চাই। না পেলে জেল হবে। অফিসের ক্যাশ ডিফাল-কেশন...। তার খুব পরিচিত কে একজন মহিলা হঠাৎ দু'তিন দিনের জন্য বাইরে চলে

গেছে, সে ফিরে এলেই টাকাটা দিয়ে দেবে বলছে...

একটু বাদে ওদিকের ঠান্ডা গলা ভেসে এলো।—আমাকে ফোন কেন?

—দেব?

—যাকে দেবে আমার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। থাকলে চার হাজার টাকা আমিই দিতে পারতাম। তোমার টাকা বেশি হলে বা দয়া করার ইচ্ছে হলে দিতে পারো।

ফোন নামিয়ে রাখার শব্দ। বাপীও রিসিভার নামিয়ে বেরিয়ে এলো। ঠান্ডা মুখে অসিত চ্যাটার্জীকে বলল, মিষ্টিকে ফোন করেছিলাম, টাকা দিতে পারছি না।

অসিত চ্যাটার্জী আর্তনাদ করে উঠল, চার হাজার টাকার জন্য আমার জেল হয়ে যাবে বাপী? আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, মিস ভড় আজ ফিরলে আজকের মধ্যেই টাকাটা তোমাকে দিয়ে যাব!

পিছনে জিত্ এসে দাঁড়িয়েছে, অসিত চ্যাটার্জী লক্ষ্য করে নি। বাপী ওর দিকে তাকাতে সে-ও দেখল। জিতের মুখে ভাব-বিকার নেই। অসিত চ্যাটার্জীর কথা কানে গেছে বলেই তাকে বলল, মিস ভড় খানিক আগে ফিরেছে, একটু আগে তার ফোন পেয়েছি।

ডুবন্ত লোকটা বাঁচার হদিস পেল। এক রকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

দু'মাসের আগেই কোর্টের রায় বেরিয়েছে। ডিভোর্স মঞ্জুর। বিচ্ছেদের মামলা রুজু করেছিল অসিত চ্যাটার্জী। অভিযোগ, স্ত্রী দীর্ঘদিন যাবৎ তার সঙ্গে ঘর করে না। অন্য পক্ষ থেকে কেউ প্রতিবাদ করে নি। ফয়সলা যাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ব্যারিস্টার সন্দীপ নন্দী এবং সেই চেষ্টা করেছে। তাদের তরফ থেকে কেউ হাজিরাও দেয় নি, অসিত চ্যাটার্জীর অনুকূলে এক তরফা ডিক্রি জারি হয়েছে।

সেই দিনই বিকেলে কুমকুম এলো। বাড়িতে এসে বাপীর সামনে দাঁড়ালো এই প্রথম। খানিক আগে দীপুদা ফোনে বাপীকে রায়ের খবর জানিয়েছে।

বাপী অনেক দিন কুমুকে দেখে নি। আগের থেকেও কমনীয় লাগছে। বিনম্র হাসি-হাসি মুখ। বাপীর মনে হল, কাজ হাসিল করতে পারার কৃতিত্বে আজ অনায়াসে সোজা এখানে এসে হাজির হতে পেরেছে। ভিতরে ভিতরে বিরক্ত তক্ষুনি। প্রশংসা বা পুরস্কার পাবার জন্য বানারজুলিতে আবু রব্বানীর কাছে চলে গেলে আপত্তির কিছু ছিল না।

কি ব্যাপার, হঠাৎ যে?

একটুও ভণিতা না করে কুমকুম বলল, আমার কিছু টাকা দরকার বাপীদা...।

পুরস্কার নিতেই এসেছ তাহলে। বাপীর মুখের রেখা কঠিন। গলার স্বরও সদয় নয়। কত টাকা?

দ্বিধা কাটিয়ে কুমকুম বলল, বেশি টাকাই দরকার। আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি, জলপাইগুড়ির সেই ভাঙা ঘরদোর ঠিক করে নেব ভাবছি.. কিছুদিন চলার মতো আবার নতুন করে গোড়া থেকেই কিছু শুরু করার মতো কত হলে চলে তুমিই ভালো বুঝবে।

বাপী বিমূঢ়ের মতো চেয়ে রইল খানিক। অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, চলে যাচ্ছ! আমরা মানে আর কে? অসিত চ্যাটার্জী?

লজ্জা পেলেও সপ্রতিভ মুখেই মাথা নাড়ল কুমকুম। বলল, ওই লোকের ভালো কিছু নেই সত্যি কথাই বাপীদা, কোনো ভালো মেয়ের তাকে বরদাস্ত করতে পারার কথাও নয়। তবু যেখান থেকে যেখানে টেনে এনেছি, দেখা যাক না কিছুটা ফেরাতে পারি কিনা। না পারলেও আমার তো হারাবার কিছু ভয় নেই বাপীদা।

বাপী হতভম্বের মতো চেয়েই আছে। এক ঝটকায় ঘরে চলে গেল। তক্ষুনি চেকবই আর কলম নিয়ে ফিরল। খসখস করে চেকে কুমকুমের নাম লিখল। একটু থমকে বড়সড় একটা টাকার অঙ্ক বসালো। পছন্দ হল না। পাতাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিল। এবারে যে টাকার অঙ্কটা বসালো সেটা আরো বড়।

চেক হাতে নিয়ে টাকার পরিমাণ দেখে কুমকুমের দু'চোখ বিস্ফারিত।—এত টাকা কি হবে বাপীদা। না না, এত দরকার নেই—আমরা তো ভাল ভাবে কিছু রোজগার করতে চেষ্টা করব!

অন্য দিকে চেয়ে বাপী বিড়বিড় করে বলল, কিছু বেশি না, নিয়ে যাও...।

কুমকুম চুপচাপ চেয়ে রইল। আহত গলায় বলল, এর পর আমাকে তুমি আরো বেশী ঘৃণা করবে তো বাপীদা?

বাপী আসতে আসতে ফিরল তার দিকে। চোখের কোণ দুটো শিরশির করছে। একটা উদ্‌গত অনুভূতি জোর করেই গলা ঠেলে বেরিয়ে এলো। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ওরে না না—এর পর আমাকে তুই কত ঘেন্না করবি তাই বরং বলে যা!

হতচকিত কুমকুম ত্রস্তে কাছে এগিয়ে এলো। তাড়াতাড়ি পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। ধরা গলায় বলল, তার আগে আমার যেন সত্যি মরণ হয় বাপীদা। বাবা আজ আমাকে আশীর্বাদ করছেন—তুমিও করো।

রাত প্রায় আটটা। বাপী উঠল। ঘরে এসে জামা-কাপড় বদলালো। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

সাতাশি নম্বরের সেই বাড়ি। বাপী নিঃশব্দে গাড়ি থামালো। নিচের বৈঠকখানায় দীপুদা আর তার মা। আজকের কোর্টের ফয়সালার প্রসঙ্গেই তাদের আলোচনা হচ্ছিল মনে হয়। বাপীকে দেখে দুজনেই খুশি, কিন্তু গলার স্বর চড়িয়ে কেউ অভ্যর্থনা জানাল না। দীপুদা বলল, এসো, মা তোমার কথাই বলছিল।

—মিষ্টি কোথায়?

—ওপরে তার ঘরে। খবর দেব? এবারের আগ্রহ মনোরমা নন্দীর।

—আমি গেলে অসুবিধে হবে?

—না না অসুবিধে কিসের! মহিলার ব্যস্ত মুখ।—দীপু, বাপীকে নিয়ে যা।

দায়টা ছেলের ঘাড়ে চাপালেন মনোরমা নন্দী। ছেলেও খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না হয়তো। কিন্তু প্রকাশ করে চলে না।—এসো, এসো।

দোতলায় উঠে ছোট ঢাকা বারান্দা ধরে দীপুদা তাকে কোণের ঘরের সামনে নিয়ে এলো। পর্দা ঝুলছে। ভিতরে আলো জ্বলছে। পর্দাটা সামান্য ফাঁক করে দীপুদা বলল, মিষ্টি কি কচ্ছিস রে...বাপী এসেছে।

পর্দার ফাঁক দিয়ে দেয়াল-ঘেঁষা ড্রেসিং টেবিলটা চোখে পড়ল বাপীর। তার আয়নায় দেখা গেল একটা বই হাতে মিষ্টি শোয়া থেকে আস্তে আস্তে উঠে বসেছে। আয়নায় তারও দরজার দিকে চোখ। বাপীকে দেখছে।

দীপুদা তাকে ভিতরে পৌঁছে দিয়ে সরে গেল। বাপীর দু' চোখ মিষ্টির মুখের ওপর। শাড়ির আঁচলটা আরো ভালো করে টেনে দিতে দিতে সেও সোজা চেয়ে রইল। শান্ত, গম্ভীর। শোবার ঘরে এসে উপস্থিত হওয়া বরদাস্ত করতে আপত্তি, সেটা পলকে বুঝিয়ে দিল।

তক্ষুনি সেই ছেলেবেলার মতোই একটা অসহিষ্ণু তপ্ত বাসনা বাপীর শিরায় শিরায় দাপাদাপি করে গেল। তার পরেই সংযত আবার। বলল, ওরা নিচেই বসতে বলেছিলেন,

আমি উঠে এলাম।

মিষ্টির চোখে পলক পড়ল না। বলল, দেখতে পাচ্ছি।

আবারও নিজের সঙ্গে যুঝতে হল একটু। বসতেও বলে নি। ড্রেসিং টেবিলের সামনের থেকে কুশনটা টেনে নিয়ে বাপী নিজেই বসল। স্নায়ু বশে রাখার চেষ্টা—আমার আসাটা এখনো তেমন পছন্দ হচ্ছে না মনে হচ্ছে।

অনড় দৃষ্টি তেমনি আটকে আছে।—কেন এসেছো? সব কিছুর ফয়সালা হয়ে গেল ভেবেছ?

বাপী একটু থেমে জবাব দিল, তোমার আমার দুজনেরই তাই ভাবার কথা।...যা হয়ে গেল তার ধাক্কাটা বড় করে দেখছ বলেই বোধ হয় তুমি এক্ষুনি সেটা ভাবতে পারছ না।

এবারের চাউনি তীক্ষ্ন। মিষ্টির গলার স্বর চড়ল না। কিন্তু আরো কঠিন।—যা হয়ে গেল তার পিছনে তোমার কতটা হাত ছিল?

বাপীর দু'চোখ ওই মুখের ওপরেই হোঁচট খেল একপ্রস্থ। তারপর স্থির হল, খুব ধীরে বুকের দিকে নেমে এলো একটু। আবার চোখ উঠে এলো। আশার আলো নিভলে যে জানোয়ার অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় বাপী আগে তার টুঁটি টিপে ধরল। তার পরেও আকাশ থেকে পড়ল না। মিথ্যে বলল না। জবাব দিল, হ্যাঁ, সবটাই।

মিষ্টির মুখের তাপ চোখে জমা হচ্ছে।—এর পরেও তাহলে তুমি কি আশা করো?

—আশা করেছিলাম অসিত চ্যাটার্জীর জোরের পুঁজিটা তোমাকে খুব ভালো করে দেখিয়ে দিতে পেরেছি। বাপীর ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ঝলসালো, চোখের তারায় বিদ্রুপ ঠিকরলো।—তুমি বড়াই করে বলেছিলে না এই পুঁজিতে ভেজাল নেই বলে, তার জুয়া আর নেশার রোগ বরদাস্ত করতেও তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে না...তা না হলে নিজেই তাকে ছেঁটে দিতে? এখন সবটাই মিথ্যে সবটাই ভেজাল দেখিয়ে দেবার পরেও আমি কি আশা করি তোমার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে? আমাকে তোমার দয়ার পাত্র ভেবেছ?

প্রতিটি কথা নির্দয় আঘাতের মতো কানে বিঁধল। কিন্তু এমনি নির্মম সত্য যে কোনো জবাব মুখে এলো না। অসহিষ্ণু আরক্ত চোখে মিষ্টি চেয়ে রইল শুধু।

কুশন ছেড়ে বাপী উঠে দাঁড়ালো। সামনে এগিয়ে এলো একটু। পুরুষের উঁচু মাথা। —শোনো, আঠারো বছর ধরে আমি শুধু তোমাকে চেয়েছি, তোমার কথা ভেবেছি। এতে কোনো ভেজাল নেই—মিথ্যে নেই। বারো থেকে আজ এই তিরিশ বছর বয়েস পর্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি—এর পর হাতে গুণে আর তিন দিন অপেক্ষা করব। আমার কি প্রাপ্য যদি স্বীকার করে নিতে পারো, এই তিন দিনের মধ্যে তুমি আসবে, নিজে এসে আমাকে ডেকে নেবে। তা যদি না পারো এখানকার পাট গুটিয়ে আমি চলে যাব—আর তোমাকে বিরক্ত করতে আসব না।

লম্বা পা ফেলে হাতের ধাক্কায় পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে গেল।

॥ আঠারো ॥

এরোপ্লেন আকাশে ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাপীকে ছেলেবেলার ছেলেমানুষিতে পেয়ে বসল। চোখে মুখে ঠোঁটে সেই রকম দুষ্টুমি। ছলে কৌশলে সেই রকম হাত-পা গা ছোঁয়ার লোভ। মিষ্টি টের পাচ্ছে। কিন্তু সহজে তার দিক ফিরছে না বা সোজা হয়ে বসছে না। সে জানলার দিকে। বাইরের আকাশ দেখার সুবিধে নিরাপদও।

এয়ারপোর্টে মিষ্টির মা বাবা দাদার সামনে বাপী এতক্ষণ মানানসই রকমের গম্ভীর ছিল। তার আগেও অসহ্য রকমের কতগুলো দিন গাম্ভীর্যের খোলসের মধ্যে ঢুকে

থাকতে হয়েছে। মিষ্টিকে বাপী তিন দিনের সময় দিয়েছিল। সেই তিনটে দিন এই মেয়ে ওকে কম যন্ত্রণা আর উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখেনি। মনে পড়তে বাপীর হাত দুটো সেই ছেলেবেলার মতো নিশপিশ করে উঠল।

...সেই তিন দিনের বিকেল পর্যন্ত কোনো সাড়া মেলেনি। তার পরেও মিষ্টি নিজে আসেনি। টেলিফোনে তার গলা ভেসে এসেছে।...ফোনে ডাকলে হবে?

মুহূর্তের মধ্যে কি যে ঘটে গেল বাপীই শুধু জানে। কতকালের সত্তা-দুমড়োনো একটা জগদ্দল পাথর টুপ করে খসে পড়ে গেল। শূন্যে উঠে বাপীর মাথাটা তখন ঘরের ছাদে ঠোক্কর খেলেও অসম্ভব কিছু মনে হত না। স্নায়ুগুলোর ঝাঁপাঝাঁপি বন্ধ করতে সময় লেগেছিল। তারপর জবাব দিয়েছে, হবে। কিন্তু তোমার আসতে অসুবিধে কি?

—অসুবিধে বুঝে নাও।

—বুঝলাম তুমি না এলেও আমার যাওয়া আর ঠেকাচ্ছে কে?

জবাবে মিষ্টি টুক করে ফোনটা নামিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু সেখানে মিষ্টির মা বাবা আর দাদার সমাদরের বেড়া টপকে কতটুকু আর নিরিবিলিতে পাওয়া সম্ভব। ফলে সেখানেও বিরাট মানুষ হব, জামাইয়ের মানানসই গাম্ভীর্যের মুখোস ধরে রাখতে হয়েছে। মুখখানা আরো গুরুগম্ভীর করে তুলতে হয়েছিল শাশুড়ীর প্রস্তাব শুনে। কাগজ কলমের বিয়েতে আর তাঁর আস্থা নেই। বিয়ে হবে হিন্দুমতে অগ্নিসাক্ষী করে। বাপীর তাতে আপত্তির কারণ ছিল না। কিন্তু সেটা ফাল্গুনের তৃতীয় সপ্তাহ। সে-মাসে আর বিয়ের তারিখ নেই। তারপর টানা চৈত্র মাসে হিন্দু বিয়ের কথাই ওঠে না। বিয়ের তারিখ আছে বৈশাখের মাঝামাঝি।

বাপীর তখন মনে হয়েছিল অত দূরের বৈশাখ আর আসবে কিনা সন্দেহ। ফলে ভাবী শাশুড়ীকে ঘাবড়ে দেবার মতো ঠাণ্ডা মুখ করে আপত্তি জানাতে হয়েছে।...সব বিয়েই বিয়ে। ও সময়ে তাকে ভারতবর্ষের বাইরেও চলে যেতে হতে পারে।

মনোরমা নন্দী তার পরেও মেয়ের মারফৎ বৈশাখ পর্যন্ত বিয়েটা স্থগিত রাখতে চেয়েছিলেন। মিষ্টি বলেছিল, মা যখন চাইছে ক'টা দিন সবুর করোই না।

বাপী আরো গম্ভীর।—ঠিক আছে। তুমি কাল পরশুর মধ্যে আমার সঙ্গে বানারজুলি চলো—বিয়ে না হয় পরেই হবে।

মিষ্টি প্রথমে থমকে তাকিয়েছিল। তারপর দ্রুত প্রস্থান। মা-কে কি বলেছে বাপী জানতেও চায়নি। মোট কথা সেই থেকে ভদ্রোচিত গাম্ভীর্যের মুখোস সরানোর তেমন ফুরসৎ মেলেনি। টাকার জোরে রেজিস্ট্রি আপিসে পিছনের তারিখ বসিয়ে নোটিস দেওয়া হয়েছিল। আজই সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে বিয়ে শেষ। দুপুরে অতিথি-অভ্যাগতদের নিয়ে নামী হোটেলে লাঞ্চ পার্টির পর শ্বশুরবাড়ি থেকে সোজা দমদম এয়ারপোর্ট। এতেও শাশুড়ীর খুব আপত্তি ছিল। এ জামাই অসিত চ্যাটার্জী নয় বুঝেই হাল ছেড়েছেন। রেজিস্ট্রি বিয়ের দোষ ঢাকার জন্য মেয়ের কপালে বড় করে সিঁদুরের টিপ পরিয়েছেন, মোটা করে সিঁথিতে সিঁদুরের দাগ কেটে দিয়েছেন।

জীবনে মিষ্টি এসেছে। তাই সবার আগে বানারজুলি ডেকেছে। সেখানকার আকাশ বাতাস জঙ্গল পাহাড় তারা আসবে বলে উন্মুখ হয়ে আছে। জীবনে মিষ্টি এলো এটা এখন আর স্বপ্ন নয়, স্বপ্নের মত বাস্তব। এমন বাস্তবের বাসর বানারজুলি ছাড়া আর কোথায় হতে পারে। আবু রব্বানীকে খবর দিয়ে রাখা হয়েছে বিয়ের পরেই তারা যাচ্ছে। সে বোধ হয় এতক্ষণ বাগডোগরা এসে বসে আছে।

কিছুক্ষণ ধরে নিঃশব্দে খুনসুটি করার পরেও মিষ্টি সোজা হয়ে বসল না বা জানলা

থেকে মুখ ফেরালো না। বাইরের দিকেই চেয়ে আছে আর হাসি চেপে আছে। সেই ছেলেবেলার দুষ্টুমি টের পাচ্ছে। বাপীও হার মানবে না। তার ঘুম পেল। মাথাটা বার বার মিষ্টির কাঁধে ঠোক্কর খেতে লাগল। শেষে ওই কাঁধের আশ্রয়ে ঘুমিয়েই পড়ল। কিন্তু হাত সজাগ। সেটা মিষ্টির বাহুর ওপর দিয়ে তার কোলের ওপর নেমে এসে বিশ্রামের জায়গা খুঁজছে।

এবারে মিষ্টি ধড়ফড় করে তাকে ঠেলে সরালো। এরোপ্লেন যাত্রী খুব বেশি না হলেও একেবারে কম নয়। চাপা তর্জনের সুরে বলল, এই! হচ্ছে কি?

—কি হচ্ছে?

গলা আরো নামিয়ে মিষ্টি বলল, শ্লীলতাহানির চেষ্টা।

মিষ্টি এবারে সোজা হয়ে বসল। গম্ভীর। কিন্তু ঠোঁটে হাসি ছুঁয়ে আছে। সিঁথি আর কপালের জ্বলজ্বল সিঁদুরের আভা গালে আর মুখের দিকে নেমে আসছে।

দুর্বার লোভের এমন স্বাদও বাপীর আগে জানা ছিল না। একটু বাদে বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল। গলা খাটো করে বলল, আমি একটা গাধা। গোটা এরোপ্লেনটা রিজার্ভ করে আসা উচিত ছিল।

মিষ্টি সামান্য ঘাড় ফিরিয়ে পলকে দেখে নিল। ঠোঁটের হাসিটুকুকেও আর প্রশ্রয় দেওয়া নিরাপদ ভাবছে না। নির্লিপ্ত চোখ আবার সামনের দিকে।

বাপীর আরো মজা লাগছে। এবার আপিসের জুনিয়র অফিসারের ব্যক্তিত্বের ফাঁক দিয়ে [illegible]লির মিষ্টি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

বাগডোগরা।

আবু দুটো গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টে হাজির। ওর নিজের গাড়ি একটা। অন্যটা বাপীর গাড়ি। বাদশা চালিয়ে এসেছে। সেই গাড়ি আবার ফুল আর লতাপাতা দিয়ে সাজানো। কলকাতা থেকে আরো অতিথি অভ্যাগত আসতে পারে ভেবে দুটো গাড়ি আনা। শুধু দুজনকে দেখার পরে মনে হল, এ সময় ঝামেলা বাড়াবে দোস্ত এত বোকা নয়।

দুহাতে বাপীকে জাপটে ধরল প্রথম। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, তুমি মরদ বটে একখানা দোস্ত।

নিরীহ মুখে বাপীও খাটো গলায় জবাব দিল চৌদ্দ বছর বয়সে বাবার সেই মারের পর তুমিই তো সাহস দিয়ে বলেছিলে [illegible]।

তাকে ছেড়ে আবু সভয়ে দেখে নিল মাইনাজি শুনল কি না। তারপর মিষ্টিকে শুনিয়েই বলল ভেরি ডেনজারাস [illegible] হও আর যাই হও, এখন থেকে আমি সব সময় মালকান বহিনজির দিকে।

ঘুরে মিষ্টির উদ্দেশ্যে আধখানা নুয়ে বশম্বদ কুর্নিশ করে উঠল। অপ্রস্তুত মিষ্টি বলে উঠল, ও-কি!

—সেরে রাখলাম। আবুর ডগমগ মুখ।—এরপর সব গোস্তাকি মাফ হয়। আমি কিন্তু আর তোমাকে তুমি-টুমি বলতে পারব না বহিনজি—দোস্ত আস্কারা দিয়ে জংলি মানুষকে কাঁধে তুললে আমার কি দোষ!

মিষ্টি হেসে জবাব দিল, কিছু দোষ নেই, বলতে হবে না।

বানারজুলি পৌঁছুতে সন্ধ্যা।

আবুর কান্ড দেখে বাপী হাসবে না রাগ করবে। আবুকে বেশি ঘটা করতে নিষেধ করে দিয়েছিল। পাশাপাশি দুটো বাংলোই রকমারি রঙিন আলোয় ঝলমল করছে। দুই বাংলোর মাঝের মেহেদি গাছের পার্টিশনের ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য আলোর ফুল। দুই

বাংলোর উঠোনে আর বারান্দায় লোক গিসগিস করছে। ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত উত্তর বাংলার কেউ বাকি নেই বোধ হয়। চা-বাগানের অনেক পদস্থজনেরাও আমন্ত্রিত হয়ে এসেছে। বাপী তরফদার আবু রব্বানীও আর উপেক্ষার পাত্র নয়। ডাটাবাবুও তার রেজিমেন্ট নিয়ে হাজির। বুফে ডিনারের সব ভার তার ওপর। বাইরের যে-সব অভ্যাগতরা স্বস্থানে ফিরতে পারবে না, রাতে তাদের ক্লাব হাউসে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আবুর আয়োজনে ত্রুটি নেই।

উপহার আর অভিনন্দন পর্বের পরে মিষ্টিকে নিয়ে বাপীর বাংলোর ঘরে উঠে আসতে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। এরপর সাড়ে আটটায় ডিনার। আত্মজনেরা কেউ ভিড়ে মিশে যেতে রাজি নয়, তারা বাংলোর ভিতরে অপেক্ষা করছিল। বাপী প্রথমে দুলারির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। মিষ্টিকে বলল, আবুর বউ, আমার এখানকার গার্জেন।

বউ দেখে খুশিতে দুলারির চোখে পলক পড়ে না। তারপর স্বভাব-গম্ভীর গলায় বাপীর দিকে ফিরে বলল, তোমার বউ না গার্জেন দেখে ভিরমি খায় বাপীভাই—তা আমি এখন গড় করি না কি করি?

বাপী গম্ভীর একটু।—ছোট বোনকে গড় করবে কি, আশীর্বাদ করো।

এদের শিক্ষা-দীক্ষা যেমনই হোক হেলা-ফেলার যে নয় পরোক্ষে মিষ্টিকেই সেটুকু বুঝিয়ে দিল। এরপর কোয়েলা এগিয়ে এলো। সেও তার রুচিমতো সাজসজ্জা করেছে। খাটুনি নেই, খেয়ে ঘুমিয়ে বেচারী আরো খানিকটা বিপুলা হয়েছে। অতি কষ্টে উপুড় হয়ে দু'হাত মাটিতে ঠেকালো। গড়ের মধ্যে এই ওদের সেরা গড়। মিষ্টি এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে সোজা হতে সাহায্য করল, এটুকুতেই কালো মুখ খুশিতে আটখানা।

খবর পেয়ে ঝগড়ুও হাজির। সকালেই পাহাড়ের বাংলো থেকে নেমে এসেছে। বয়েস এখন সাতাত্তর। মোটামুটি মজবুত এখনও। বউয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বাপী তাকেও মর্যাদা দিতে ভুলল না। বাদশা ড্রাইভারের সঙ্গে পথেই পরিচয় করানো হয়েছে।

একটু বাদে ঘর্মাক্ত কলেবরে আবু এলো। সকলকে সরিয়ে দুলারি মিষ্টিকে একটু বিশ্রাম নিতে বলছিল। আবু বাধা দিল, বিশ্রাম সেই রাত্তিরে হবে—এখন মুখ-হাত ধুয়ে সাজ-টাজ যদি কিছু করার থাকে জলদি করে নিতে হবে। আরো লোক এসে গেছে, আবার ডিনারের সময় হচ্ছে।

বাপী সত্যিকারের গম্ভীর।—আরো লোক এসে গেছে?

—বা রে, আসবে না!

—তোমাকে নিষেধ করলাম, আর তুমি এত বড় এক ব্যাপার করে বসে আছ?

আজ অন্তত আবু কারো ভ্রূকুটির তোয়াক্কা রাখে না। জবাব দিল, ছাড়ো তো! এ কি আমার বিয়ে যে তিন দিন আগেও হবু বিবি চেলা কাঠ নিয়ে তাড়া করেছে।

বিড়ম্বনা সামলে দুলারি সকোপে তাকালো তার দিকে। মিষ্টি হেসে ফেলল। বাপী বলে উঠল, আমারও তো সেই বরাত! তাহলে তুমি এত ঘটা করতে গেলে কেন?

আবু হাসছে।—বহিনজির চেলা কাঠ তো চন্দন কাঠ, কার সঙ্গে কার তুলনা। দু'হাত কোমরে তুলে সদর্পে দুলারির মুখোমুখি।—কি বলেছিলাম?

একটু কাঁচুমাচু মুখ করে দুলারি মিষ্টির দিকে তাকালো।—বলেছিল, এই সুরৎ নিয়ে আর বহিনজির কাছে গিয়ে কাজ নেই।

আবুর উদ্দেশ্যে মিষ্টির চোখে অনুযোগ করার আগেই আবু চেঁচিয়ে উঠল, নো ট্রু—নো ট্রু বহিনজি! আমি কক্ষনো একথা বলিনি।

ইংরেজির ধাক্কায় মিষ্টি হেসে ফেলল। বাপী হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে কি বলেছিলে?

এবারও দুলারিই জবাব দিল, বলেছিল, দোস্ত-এর বউয়ের নাম মিষ্টি, কত মিষ্টি দেখো'খন—এক কথাই হল না?

মিষ্টি লজ্জা পাচ্ছে। ভালোও লাগছে। এই মানুষগুলো লেখা-পড়া জানে না, শহরের আদব কায়দা জানে না এ একবারও মনে আসছে না।

সব শেষে আবু আর দুলারিকে বিদায় দিয়ে বাপী ঘরে এলো। রাত সাড়ে দশটার ও-ধারে। বাংলো নিঝুম এতক্ষণে। ঝলমলে সাজ-পোশাক বদলে মিষ্টি চওড়া লালপাড় হালকা বাসন্তী রঙের শাড়ি পরেছে। সেই রঙেরই ব্লাউস। খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে বসে আছে।

বাপী দু'চোখ ভরে দেখল খানিক। ঠোঁটের হাসি চেপে মিষ্টিও চেয়ে রইল। গায়ের জামাটা খুলে বাপী একদিকে ছুঁড়ে দিল। দরজা দুটো বন্ধ করে কাছে এসে দাঁড়ালো। মিষ্টির ঠোঁটে হাসি টিপটিপ করছে।

—কেমন লাগছে?

মিষ্টির চোখে মিষ্টি কৌতুক। জবাব দিল, এখনও বানারজুলির মতো লাগছে না।

বাপী থমকালো একটু। জানালার পর্দার ওপরের ফাঁকটুকু দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। বলল, এক্ষুনি লাগবে, দেখো।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল। তারপর জানালা দুটোর পর্দা সরিয়ে দিতেই দু'দিক থেকে বাইরের জ্যোৎস্না এসে ঘরে আর বিছানায় লুটোপুটি খেল।

বাপী বলল, শুয়ে পড়ো। চোখ বুজে শোনো।

মিষ্টি তাই করল। বাপী নিঃশব্দে একটা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। দেখতে দেখতে চারদিকের নীরবতা আরো নিঝুম। না, নিঝুম বলা একেবারে ভুল। রাশি রাশি ঝিঁঝি একসঙ্গে গলা মিলিয়েছে। সামনে জঙ্গলের গাছপালার সঙ্গে চৈত্রের বসন্ত বাতাসের মিতালির সড়সড় শব্দ থেকে পুষ্ট হচ্ছে। মিষ্টি কান পেতে শুনছে।

প্রায় মিনিট দশেক বাদে সুইচ টিপে সবুজ আলোটা জ্বালল। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, বানারজুলি?

মিষ্টির চোখে হাসি দুলছে। মাথা নেড়ে সায় দিল। বলল, বেশ তো ছিল, আলো জ্বাললে কেন?

—হুঁ? বাপীর পলকা ভ্রূকুটি।—কেন জ্বাললাম?

তার গা ঘেঁষে বসল। চেয়ে আছে। মিষ্টিও। বাপী হাসছে অল্প অল্প। মিষ্টিও। বাপীর দু'চোখ লোভে টইটম্বুর। বাসনার দাপাদাপি টের পাচ্ছে তবু হাত বাড়াচ্ছে না। এই রাত কৃপণের মতো খরচ করার রাত।

হাসি-টুপটুপ ঠোঁটের কোণ দাঁতে কেটে মিষ্টি বলল, কি?

বাপী জিজ্ঞাসা করল, কি?

মিষ্টি বলল, এক গেলাস জল দেব?

বাপী বুঝে উঠল না। জিজ্ঞাসা করল, জল কেন?

মিষ্টি বলল, সেই কতকাল ধরে জল দিয়ে গিলে খাবার সাধ।

তার পরেই প্রমাদ গুনল। লুঠতরাজের দস্যুকে সেধে অন্তঃপুরের দরজা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরে সবুজ আলো। জানালার পর্দা সরানো। মিষ্টি চেষ্টা করল বাধা দিতে। পারা গেল না। দেড় যুগের বুভুক্ষু দস্যু সব বাধা ছিঁড়েখুঁড়ে তাকে বিপুল বিস্মৃতির মাঝদরিয়ায় টেনে নিয়ে চলল।

পৃথিবী কি থেমে ছিল কিছুক্ষণ...বা অনেকক্ষণ! কোনো নিঃসীম নীরবতার গভীরে ডুবে গেছল। নাকি বাপী ঘুমিয়ে পড়েছিল? আস্তে মুখ তুলে তাকালো। দেখছে।

কোন্ অপরিসীম শান্তির জগৎ ঘুরে এখান থেকে এখানেই ফিরে এলো।

মিষ্টিও চেয়ে আছে। তাকেই দেখছে।

কটা দিন প্রায় হাল ছেড়ে ভোগের এক অবুঝ দুরন্ত রূপ দেখল মিষ্টি। যৌবনের অতনুবাস্তবে এই লোক প্রথম নয়। কিন্তু পুরুষ যেন এই প্রথম। আগেও ভোগ দেখেছে। নিজেকে সেই ভোগের এমন একাত্ম দোসর ভাবতে পারেনি। দেহ-পথে সমস্ত সত্তার ওপর এমন দুর্বার দখল বিস্তার দেখেনি। আবার স্বার্থপরের দখলও নয়। দু'দিকেরই সমর্পণ শর্ত, সমর্পণ লক্ষ্য।

নিজের ছাব্বিশের এই মেদশূন্য সুঠাম দেহ সম্পর্কে মিষ্টি কম সচেতন নয়। সক্রিয় চেষ্টায় বয়েসটাকে বাইশের পাকাপোক্ত গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রেখেছে। কিন্তু কটা দিনের মধ্যেই অনুভব করেছে, যা আছে খুব বাড়তি কিছু নয়। এটুকু না থাকলে ওই দামাল পুরুষের দোসর হওয়া খুব সহজ হত না। মিষ্টির অবাক লাগে, এত ক্ষুধা এত তৃষ্ণা আর এমন দুর্জয় আবেগ নিয়ে এই মানুষ এতকাল বসে ছিল কি করে।

মিষ্টি সেদিন না বলে পারল না, যে কাণ্ড করছ, দুদিনে ফুরিয়ে গেলাম বলে।

বাপী নিরীহ মুখে ঘটা না করে দেখতে লাগল তাকে। এ-রকম দেখাটাই হঠাৎ জুলুমের সূচনা মিষ্টি এ ক'দিনে সেটা বুঝে নিয়েছে। চকিতে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ হামলার মতলব দেখলেই সে ঘর থেকে পালাবে। অগত্যা গম্ভীর আশ্বাসের সুরে বাপী বলল, যতই করিবে দান, ততো যাবে বেড়ে।

বারান্দায় আবুর হাঁক শোনা গেল, বাপী ভাই আছ?

মিষ্টি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বারান্দায় এলো। তাকে বসতে দিয়ে বলল, দিদি এলো না?

দিদি শুনে আবু গলে গেল।—তুমি ডাকছ শুনলে ছুটে আসবে—

বাপীও বারান্দায় এসে চেয়ার টেনে বসল। হাতে আগের দিনের খবরের কাগজ। ভাবখানা, এতক্ষণ এটা নিয়েই সময় কাটাচ্ছিল। এখনো ওতেই চোখ। এক-পলক দেখে নিয়ে আবু জিজ্ঞাসা করল, দোস্ত্-এর তবিয়ৎ ভালো তো?

—খুব ভালো। কেন?

—চার-চারটে দিন কেটে গেল, রোজই আশা করছি বহিনজিকে নিয়ে একবার গরিব ঘরে যাবে।

ছোট হাই তুলে বাপী জবাব দিল, কি করে যাই, নিজেও যাবে না, আমাকেও ছাড়বে না। সারাক্ষণ চোখে আগলে রেখেছে. দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী, বুঝতেই পারো. .

মিষ্টির মুখ লাল। চারদিনের মধ্যে দুদিন জঙ্গল দেখতে বেরোনোর কথা সেই বলেছে। টেনে বার করা যায় নি। রাগ করে ভিতরের দরজার দিকে পা বাড়ালো।

বাপী শাড়ির আঁচল টেনে ধরল। আ-হা, সত্যি কথা বললাম বলে আবুর সামনে অত লজ্জা কিসের। বিয়ের পর বউ ওকে একমাস পর্যন্ত ঘর ছেড়ে বেরুতে দেয়নি—তারও দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী—বেরুতে চাইলে দুলারি নাকি চেলা-কাঠ নিয়ে তাড়া করত। তুমি তো অতটা করো না।

আবু গলা চেঁড়ে হেসে উঠল। বলল, তুমি খামোখা লজ্জা পাচ্ছ বহিনজী—সেই বাচ্চা বয়েসে তোমার জন্য বাপীভাই যে পাহাড় থেকে ঝাঁপ খায়নি আমার বাপঠাকুর্দার ভাগ্য। এখন উল্টো বলতে না পারলে ভাত হজম হবে?

আবু উঠে পড়ল। তার কাজের অন্ত নেই। একবার খবর নিতে এসেছিল। বাপীকে বলল, ঠিক আছে, দুলারিকে বলব'খন দোস্ত এখন বেজায় ব্যস্ত—ফুরসৎ মিললে

বাহিনীকে নিয়ে আসবে।

সেই দিনই দুপুরের আকাশ অন্য রকম। বাতাস অন্য রকম। চৈত্রের মেঘ কালো আস্তরণ বিছিয়ে সূর্য ঢেকেছে। পাহাড়ী এলাকায় অসময়ের মেঘ নতুন কিছু নয়। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস দিয়েছে। গাছপালার সড়সড় শব্দ কানে আসতে ক'দিনের মধ্যে বাপীর মনে হল, বানারজুলির জঙ্গল আজ ওদের ডাকছে।

যেমন ছিল দুজনে তেমনি বেরিয়ে পড়ল। বাপীর পরনে পাজামা, গায়ে গেঞ্জির ওপর শার্ট। ও এ-ভাবে বেরুলো দেখে মিষ্টিরও সাজ বদলের কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। আট-পোরে ভাবে পরা দামী শাড়ি কুঁচি দিয়ে পরে নিল। গায়ে ফিকে লাল ব্লাউস। পিঠের ওপর খোলা চুল। যাচ্ছে জঙ্গলে। সেখানে যা সহজ তাই সুন্দর।

কিন্তু বাইরে এত ছোলাছুলি বাতাস আগে বুঝতে পারেনি। পাশাপাশি পাকা রাস্তা ধরে চলেছে। একটু বাদে মিষ্টি ফাঁপরে পড়ল। চুল সামলাতে গেলে শাড়ি যে বেসামাল হয়, আবার শাড়ির নিচের দিক ঠিক রাখতে গেলে আঁচল ওড়ে। বার কয়েক দেখে নিস্পৃহ গলায় বাপী বলল, যে যেদিকে চায় যেতে দাও না, অত ধকল পোহানোর কি দরকার।

ধমকের সুরে মিষ্টি বলল, খুব সখ যে, জঙ্গলে না নেমে হাঁটিয়ে মারছ কেন?

বাপী জবাব দিল না। মুচকি হেসে এগিয়েই চলল। দুপুরের রাস্তা একেবারে নির্জন বলেই মিষ্টিও খুব একটা অস্বস্তি বোধ করছে না। চলতে চলতে মাথার চুল আঁট-খোঁপা করে নিল। আর শাড়ির আঁচলটা কাঁধের ওপর দিয়ে এনে ভালো করে কোমরে জড়িয়ে নিল। সামনে কেউ পড়লে আঁচলটা চট করে খুলে মাথায় টেনে দেওয়া যাবে।

বাপী মন্তব্য করল, এয়ার অফিসের জুনিয়র অফিসার মালবিকা এইবার ঠিক-ঠিক খসল—বানারজুলির মিষ্টির খোঁজ পাচ্ছি।

খুব মিথ্যে বলিনি। মিষ্টির নিজেরই ফেলে আসা এক দূরের অতীতের দিকে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে। একটু আগে যে বাংলোটার সামনে এসে দাঁড়াল, দেখা মাত্র সেই অতীত আরো কাছে এগিয়ে এলো। তাদের সেই বাংলো। সামনের কাঠের বারান্দাটা ঠিক তেমনি আছে।

পাশের লোকের দিকে চেয়ে সভয়ে বলল, কি মতলব, ভেতরে যাবে নাকি?

বাপী মাথা নাড়ল। যাবে না। বলল, ওই বারান্দাটার দিকে চেয়ে একটা দৃশ্য দেখছি। এমনি দুপুরে চোরের মতো এসে আমি একজনের অঙ্ক বসে দিচ্ছি। সে যখন টুকছে আমি তখন চোরের মতোই গায়ের সঙ্গে লেগে দাঁড়িয়ে তার গায়ের আর মাথার ঝাঁকড়া চুলের গন্ধ নাকে টানছি। অঙ্ক টোকায় ব্যস্ত সে আমাকে কাঁধ আর কোমর দিয়ে ঠেলে দিয়ে বলছে, আঃ, সরো না।

—অসভ্য কোথাকারের। দু'গালে লালের ছোপ পড়ল।

সেখান দিয়ে জঙ্গলে নামার মুখে কি মনে পড়তে মিষ্টি বলল, যাঃ, সেই গাছটা কেটে ফেলেছে।

বাংলোর সামনে রাস্তার ধারের সেই গাছটা হালে কাটা হয়েছে মনে হয়। মাস কয়েক আগেও বাপী ওটা ওখানে দেখেছে। সেই গাছের ডালে বসে বাপী নানা কৌশলে মিষ্টিকে বাংলো থেকে টেনে আনত।

জঙ্গলে ঢুকেই মিষ্টির একখানা হাত বাপীর দখলে। এই উপদ্রব মিষ্টির ভোলার কথা নয়। ভোলেনি মুখ দেখেই বোঝা গেল। ভ্রূকুটি করে বলল, ধেৎ, কেউ দেখে ফেলবে—

হাতের দখল আরো ঘন করে বাপী বলল, এই জঙ্গলে শুধু নিজের জন ছাড়া আর

কেউ কাউকে দেখে না।

মিষ্টি বাধা না। তার অদ্ভুত ভালো লাগছে। অনেক পিছনে ফেলে আসা অতীত এমন জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে কে জানত! ছোট বড় গাছগুলো বাতাসে দুলে দুলে সেই আগের মতোই ডাকছে ওদের। সেই রঙিন প্রজাপতির দল জোড় বেঁধে এদিক ওদিক ভেসে বেড়াচ্ছে। জোড়ায় জোড়ায় কাঠবেড়ালি গাছের ডালে লুকোচুরি খেলছে। খরগোশের জুটি একটা আর একটাকে ধাওয়া করছে। পেখম-মেলা ময়ূর তার ময়ূরির মন ভোলাচ্ছে। জঙ্গলের এ যৌবনে জরা নেই।

খুশি মনে মিষ্টি তন্ময় হয়ে দেখছে। সব ছেড়ে হাত ধরা মানুষটা যে অপলক চোখে ওকেই দেখছে খেয়াল নেই।

একটা গাছের মোটা সোটা ডালের ওপর হাত রেখে বাপী বলে উঠল, বাঃ, ঠিক সেই রকমই আছে—উঠে পড়া যাক, তারপর তুমি আমার পা বেয়ে উঠে পাশে বোসো।

মিষ্টি তক্ষুনি বুঝেছে। সমস্ত মুখ টকটকে লাল। এইভাবে ওকে তুলে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে পাশে বসানো হত। পড়ে যেতে পারে বলে ধমকেই এক হাতে নিজের গায়ের সঙ্গে ওকে জড়িয়ে ধরে থাকত। বাঁদরের ভয় দেখিয়ে আরো কত রকমের দুষ্টুমি করত। নামানোর সময় আগে নিজের বুকের ওপর টেনে নামাতো। তারপরেও সহজে ছাড়তে চাইত না। পিঁপড়ের ডাঁইয়ের ভয় দেখিয়ে ওই রকম করে দশ-বিশ গজ এগিয়ে যেত।

—তুমি একটা অসভ্যের ধাড়ী—চলো।

আবার খানিক চলার পর বাপী আচমকা থমকে দাঁড়াল। গলা দিয়ে স্‌স্‌স করে ত্রাসের শব্দ বার করল একটা, সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে মিষ্টিকে জড়িয়ে ধরে অন্য হাতের আঙুল একটা শিশু গাছের গুঁড়ির দিকে তুলে বলে উঠল, সাপ!

বিষম চমকে মিষ্টি একেবারে তার বুক ঘেঁষে দাঁড়াল।—কোথায়?

আরো ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বাপী শিশুগাছের মোটা গুঁড়িটা দেখালো। ওই যে!...এই যাঃ, ওখানেই তো ছিল!...একটু আগে দেখলাম, ওই গাছের গুঁড়িতে জড়ানো সাদা-কালোর ছোপ মারা একটা বিশাল ময়াল লম্বা চ্যাপ্টা মুখটা সামনের দিকে টান করে এগিয়ে দিয়ে একটা ছোট মেয়েকে চোখে আটকে ফেলেছে, আর তাকে ধরার জন্য গাছের গুঁড়ি থেকে শরীরের প্যাঁচ খুলছে—সেদিকে চেয়ে অবশ মেয়েটা থরথর করে কাঁপছে—কোথা থেকে একটা ছেলে এসে এক ধাক্কায় মেয়েটাকে পাঁচহাত দূর ছিটকে ফেলে দিল, তারপর তাকে তুলে নিয়ে ছুটে পালালো।

জোর করেই দু'হাতে বাপী ওকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে, তেমনি শক্ত করে আগলে রেখে বলল, তারপর সেই মেয়ের মায়ের হাতে ওই ছেলের কানমলা পুরস্কার জুটল।

রক্তে দোলা লাগছে, মাথাটাও ঝিমঝিম করছে মিষ্টির।—ছাড়ো, কে কোন্ দিক থেকে এসে যাবে।

বাপী হাসছে।—বললাম না জঙ্গলের জগৎ আলাদা, এসে গেলেও কেউ কাউকে দেখে না। সেদিনের জন্য আমার কি পুরস্কার পাওনা ছিল?

জবাবে এদিক-ওদিক চেয়ে মিষ্টি নিজের ঠোঁটে তার ঠোঁট দুটো ছুঁয়ে দিয়েই ধাক্কা মেরে সরালো তাকে।

বাপী হাসতে লাগল।

মিষ্টি বলল, আর বেড়িয়ে কাজ নেই, ফেরো!

বাপী বলল, আমার কি দোষ, একে একে সব মনে করিয়ে দিচ্ছি।

মিষ্টির ঠোঁটে চাপা হাসি। টিপ্পনীর সুরে বলল, জীবনে প্রথম পুরুষ চিনিয়েছ, সব মনে আছে, আর বেশি মনে করিয়ে দিতে হবে না!

বলল বটে, এক্ষুনি ফিরতে মোটেই চায় না। ছেলেবেলায় জঙ্গলে ঢুকলে রক্তে নেশা ধরত। এখনো তাই। তার থেকেও বেশি। সঙ্গের লোক হঠাৎ বেশ সভ্য-ভব্য হয়ে গেল লক্ষ্য করছে। জঙ্গলের গাছ চেনালো। ব্যবসার কাজে লাগে এমন কিছু গাছ দেখালো। সাপ ধরার গল্প করল। প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে ঘুরতে ঘুরতে আর এক জায়গায় দাঁড়ালো।

গাছ-গাছড়ার মাঝে একটু ফাঁকা জায়গা। বাপী ভাবুকের মতো চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। তারপর আলতো করে জিগ্যেস করল, এ জায়গাটা মনে আছে?

চারদিক চেয়ে মিষ্টি ঠিক ঠাওর করতে পারল না। মাঝের আলোচনা অন্য প্রসঙ্গে ঘুরে যাওয়ার ফলে সজাগও ছিল না তেমন। জিগ্যেস করল, এখানে কি?

জবাবে বাপী হঠাৎ গায়ের শার্টটা খুলে মাটিতে আছড়ে ফেলল। তারপর মিষ্টির বিমূঢ় চোখের সামনে পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়ালো। বলল, এখানে কিছু বেপরোয়া ব্যাপার ঘটেছিল বলে পিঠে এই দাগগুলো পড়েছিল। বাংলোয় দাঁড়িয়ে তুমি নিজের চোখে দেখেছিলে—

ওই হাসি-হাসি মুখ আর চোখের দিকে তাকিয়েই ভিতরে ভিতরে বিষম অস্বস্তি মিষ্টির। মুহূর্তের মধ্যে জঙ্গলের কোনো আদিম ইশারা আষ্টেপৃষ্ঠে ছেঁকে ধরতে চাইছে তাকে। শরীর ঝিমঝিম করছে। ছোট ছেলেকে আশ্বস্ত করার মতো করে তাড়াতাড়ি বলল, ঠিক আছে, ওখানেও হাত বুলিয়ে আদর করে দেব'খন, জামা পরে নাও।

বাপী বাধ্য ছেলের মতো নিচু হয়ে জামা কুড়োতে গেল। তারপর মিষ্টি কিছু বোঝার আগে চোখের পলকে ছোঁ মেরে তাকে মাটি থেকে শূন্যে তুলে ফেলল। এক হাত ঘাড়ের নিচে, অন্য হাত দুই হাঁটুর পিছনে। একেবারে বুকের ওপর তুলে এনেছে।

মিষ্টির গলা দিয়ে একটু গোঁ গোঁ শব্দ বেরুলো শুধু। দুই ঠোঁট আর মুখও ততক্ষণে এই অকরুণ দস্যুর দখলে। বাধা দেবার সর্ব শক্তি নিঃশেষে টেনে নিচ্ছে। আর বুঝি থামবেই না।

থামল। মুখ তুলল। দু'চোখে অমোঘ অভিলাষের তরল বন্যা। চাপা ভারি গলায় বলল, পিঠের এ-দাগ ঘরের আদরে ভোলানো যাবে না।

দু'চোখ বড় করে মিষ্টি তাকালো একবার। জঙ্গলের সেই আদিম ইশারা এখন দামামা বাজিয়ে ধেয়ে আসছে। সর্বাঙ্গ অবশ। অবশ অঙ্গের আধখানা মাটিতে আর আধখানা মাটির জামাটার ওপর নেমে এলো টের পেল। তারপর পৃথিবী আবার থেমে গেল। জঙ্গলের কানাকানি স্তব্ধতার গভীরে ডুবে গেল। আজ বাপী নয়, মিষ্টি তফরদার প্রায়-অচেনা এক জগৎ ঘুরে এখান থেকে এখানেই ফিরে এলে।

জঙ্গল ভেঙে মিষ্টি আগে আগে চলেছে। ছেলেবেলায় জঙ্গলের সোজা পথে ও-বাড়ি গেছে। এতকাল বাদে ঠিক ঠাওর করতে পারছে না। ভুল হয় হবে, তবু পিছন ফিরে তাকাবে না।

বাপী তার হাত দশেক পিছনে। রাগের মর্যাদা দিচ্ছে আর হাসছে অল্প অল্প। খানিক বাদে ভুল রাস্তায় পা বাড়াতে দেখে পিছন থেকে বলল, ওদিকে গেলে এক-আধটা-বাঘ-ভালুকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।

মিষ্টির পা থেমে গেল। আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। গনগনে মুখ। কথা বলার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তপ্ত জবাবটা আপনা থেকে এসে গেল।—বাঘ-ভালুকও তোমার থেকে ঢের বেশি নিরাপদ—বুঝলে?

অপরাধী মুখ করে বাপী তক্ষুনি মাথা নেড়ে স্বীকার করল। তারপর কোন দিকে যেতে হবে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

মিষ্টি আবার আগে আগে চলল। এত দুঃসাহস কারো হতে পারে, তার শরীরটাকে নিয়ে কেউ এমন কাণ্ড করতে পারে ভাবা যায় না। প্রচণ্ড রাগই হচ্ছে মিষ্টির। কিন্তু রাগটা পিছনের লোকের ওপর যত না, তার থেকে ঢের বেশি নিজের ওপর। কারণ ওই লোকের ওপর যত রাগ হবার কথা, চেষ্টা সত্ত্বেও ঠিক ততো রাগ হচ্ছে না।

পাছে এও টের পেয়ে যায় সেই রাগে আগে আগে চলেছে। সেই ভয়েও।

জঙ্গল ছাড়িয়ে রাস্তায় উঠলো। মিনিট তিনেকের পথ। বাংলো দেখা যাচ্ছে। আগে আগে পা বাড়িয়েও মিষ্টি থমকে দাঁড়াল। গেটের সামনে বিচ্ছিরি দেখতে একটা লোক দাঁড়িয়ে। খালি গা। মিস-কালো। একরাশ চুলদাড়ি। নিজের মনে বিড়বিড় করছিল। মিষ্টিকে দেখে ঘোলাটে চোখে তার দিকে চেয়ে রইল।

মিষ্টি ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরে তাকালো। বাপী হাত পনের দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁটে হাসি ছুঁয়ে আছে। এগিয়ে এসে বলল, কি হল, যাও?

—ওই লোকটা কে?

—ওর নাম হারমা। মাথার ঠিক নেই।

—আমাকে এভাবে দেখছে কেন?

—মনের মানুষের অভাবে ওর এই হাল। তুমি যে-মুখ করে ফিরছিলে সগোত্র ভেবে ওর বোধ হয় পছন্দ হয়েছে। চলো—

মিষ্টির হাত ধরে বাপী গেটের দিকে এগলো। এবারে মিষ্টি আর বাধা দিল না। লোকটার চাউনি দেখে অস্বস্তি লাগছে। দাঁড়িয়েই আছে। চেয়েই আছে।

—কি চাই?

বাপীর ঠাণ্ডা প্রশ্নে লোকটার সম্বিৎ ফিরল একটু। হাত তিন-চার দূরে সরে দাঁড়াল। পুরনো অভ্যেসে একটা হাত তুলে কপালে ঠেকালো। কিন্তু চাউনি সদয় নয় এখনো। ঘুরে হনহন করে জঙ্গলে নেমে গেল।

॥ উনিশ ॥

বানারজুলির বসন্ত এবারে শুধু আনন্দের পসরা সাজিয়ে বসে আছে। সেই আনন্দের ছোঁয়া বাপীর শিরায় শিরায়। অস্তিত্বের কণায় কণায়। এতকালের নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা, দুঃসহ প্রতীক্ষা—সবেরই কিছু বুঝি অর্থ আছে। হাত বাড়ালে সহজে যা মেলে তার সঙ্গে এই পাওয়ার কত তফাৎ, সমস্ত সত্তা দিয়ে সেটুকু অনুভব করার জন্যেই বোধ হয় অত যন্ত্রণা আর অমন প্রতীক্ষার প্রয়োজন ছিল। নিজের সৃষ্টিবিস্তারে শিল্পী অনেক সময় নিজেই ভেসে যায়, ডুবে যায়।

মিষ্টিকে নিয়ে আবু রব্বানীর বাড়িতে সেদিন সকালের দিকে এসেছিল। আগের বারে সন্ধ্যায় এসেছিল। আবু অনুযোগ করেছিল, জঙ্গলের গরিবখানা বহিনজি রাতে আর কি দেখবে, সকালে এলে ভালো লাগত।

এবারে বাপী তাই সকালে নিয়ে এসেছে। আবুর এখন দস্তুরমতো বড়সড় কাঠের বাংলো। একেবারে জঙ্গলের মধ্যে এরকম বাংলো বানারজুলিতে আর দুটি নেই। মিষ্টির সত্যি ভালো লেগেছে। ইলেকট্রিক নেই তাই আগের বারে রাতে এসে গা ছমছম করেছিল। আবু বা দুলারি কারোই ইলেকট্রিক পছন্দ নয়। জঙ্গলের মধ্যে বিজলীর আলো বেখাপ্পা। জঙ্গলে থাকার মজা মাটি। দিনের আলোয় চারদিকের সবুজের মধ্যে সবুজ বাংলোটা

সত্যি সুন্দর।

প্রায় ঘণ্টা দুই আদর আপ্যায়ন আর আড্ডার পর মিষ্টির আপাদমস্তক একদফা ভালো করে দেখে নিয়ে দুলারি হঠাৎ বাপীকে বলল, তোমাদের বিয়েতে মরদেরা বউকে কত গয়না দেয় শাড়ি দেয়, তুমি বহিনজিকে কি দিলে বাপীভাই?

ভিতরে ভিতরে বাপী সত্যি অপ্রস্তুত। অন্যভাবে সামাল দিল। সাদামাটা মুখ করে বলল, এত দিয়েছি যে তোমার বহিনজি নিতে পারছে না।

শুধু দুলারি নয়, আবুও উৎসুক। আর কিছু বলছে না দেখে দুলারিই জিজ্ঞেস করল, কি দিলে?

মুখে জবাব না দিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা বাপী বার দুই তিন নিজের বুকে ঠুকল। অর্থাৎ নিজেকেই দিয়ে ফেলেছে।

আবু রব্বানী আনন্দে হৈ-হৈ করে বলে উঠল, বহিনজি বুঝলেও এই দেওয়ার কদর ও বুঝবে না দোস্ত, ও বুঝবে না—নিজেকে ফতুর করে দিয়েও মন পেলাম না।

দুলারির কোপ আর আবুর চপলতায় দেওয়ার প্রসঙ্গ ধামা চাপা পড়ে গেল। কিন্তু বাংলোয় ফেরার পথে দুলারির কথাগুলো বাপীর মাথায় ঘুর-পাক খেতে লাগল। জঙ্গলের মেয়ের পর্যন্ত যে-বাস্তব চোখদুটো আছে ওর তাও নেই। মিষ্টিকে ঘরে এনে তুলেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত তাকে কিছুই দেওয়া হয়নি। না দুটো ভালো শাড়ি না কিছু গয়না। কলকাতা থেকে ওকে তুলে নিয়ে বানারজুলিতে ছুটে আসা ছাড়া মাথায় আর কিছু ছিলই না। ইচ্ছে দুটো ছেড়ে দু'ডজন শাড়ি কিনে ফেলতে পারত। আর গয়নাও..

আবার মনে পড়ল কি। ঠোঁটে স্বস্তির হাসি।

শোবার ঘরে ঢুকে মিষ্টি বাইরের শাড়িটাও বদলাবার ফুরসৎ পেল না। দু-মিনিট বিশ্রামের জন্য সবে শয্যায় এসে বসেছিল। আঁতকে উঠে দাঁড়াল।—ও কি!

বাপী ঘরে ঢুকে ভিতরের দরজা দুটো বন্ধ করছিল। বাইরের দরজা বন্ধই ছিল। ছিটকিনি দিয়ে বাপী ঘুরে দাঁড়াল।—কি?

—এই সাতসকালে দরজা বন্ধ করছ কেন?

নিরীহ মুখে বাপী ঘড়ি দেখল।—সকাল কোথায় এখন, বেলা সাড়ে দশটা।

—ভালো হবে না বলছি, দরজা খোলো শিগগীর!

বাপী ঘটা করে নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা।—উঃ। পাপ মন সবেতে সাপ দেখে। হাসতে হাসতে দেরাজ খুলে বড় একটা চাবির গোছা বার করল। একটা চাবি বেছে নিয়ে সামনে ধরল। কোণের পেল্লায় সিন্দুকটা দেখিয়ে বলল, ওটা খোলো।

মিষ্টি থতমত খেল একটু।—ওটা কি?

আঙুল তুলে দেয়ালে টাঙানো গায়ত্রী রাইয়ের বড় ছবিটা দেখালো।—এটা ওই ঠাকরোনের, খোলোই না।

ওই মহিলার সম্পর্কে এ কদিনে অনেক শুনেছে। চাপা আবেগও লক্ষ্য করেছে। তাই দুষ্টুমির ব্যাপার কিছু ভাবল না। খুলল।

ওপরে ভাঁজ ভাঁজ করা রঙ-চঙা কার্পেট, রঙিন বেড-কভার, শৌখিন গায়ের চাদর। বাপীই এগিয়ে এসে একে একে সেগুলো তুলে ফেলল। তার পরেই মিষ্টির দু'চোখ ধাঁধিয়ে যাবার দাখিল। এত সোনা একসঙ্গে দেখেনি। শুধু সোনা নয়, একদিকে হীরে জহরত মণি মুক্তো। ঝুঁকে প্রথমে সোনার বাটগুলো তুলে বাপী বেড-কভারে ঢাকা বিছানার ওপর রাখল। মিষ্টি হাঁ করে দেখছে। ছোট বড় মিলিয়ে পনেরটা বার। হাতে নিয়ে দেখল। সব থেকে ছোটটার ওজন দশ ভরির কম হবে না। বিশ-তিরিশ ভরি ওজনেরও আছে। বাপী হীরে জহরত মুক্তোর কাঁধ-উঁচু ট্রেটাও এনে খাটের ওপর

রাখল।

মিষ্টির হঠাৎ কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। সোনার বাজার চড়া। একশ দশ পনের টাকা ভরি। কম করে আড়াইশ' ভরি হবে এখানে। আর ট্রেতে এতসব দামী পাথর। এসব খোলা পথে সিন্দুকে এসে উঠেছে ভাবতে পারছে না। ঘরে কারো এত সোনা থাকে কি করে! কেন থাকে!

—এই সব তোমার?

বাপীর মজাই লাগছিল। জবাব দিল—এই স-ব তোমার। এর ডবল ছিল। ওই ঠাকরোনটি তার মেয়েকে এই কাঁধে ঝোলাতে না পেরে মনের দুঃখে অর্ধেক তাকে ভাগ করে দিয়েছে, বাকি অর্ধেক তোমার জন্যে রেখে গেছে।

মিষ্টি মনে মনে মস্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল একটা।—উনি আমার কথা জানতেন?

—ও বাবা, না জানলে। রেহাই পেলাম কি করে! পিঠের দাগ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে।

এই লোকের অসাধ্য কিছু আছে ভাবে না মিষ্টি। জিগ্যেস করল, তুমি কলকাতায় ছিলে আর এ-সব এখানে পড়ে ছিল?

—না তো কি, এর থেকে ঢের দামী জিনিস ছিনিয়ে আনার তালে ছিলাম বলে এসবের কথা মনেও ছিল না। আজ দুলারি বলতে মনে পড়ল।

মিষ্টি হেসে ফেলল। তারপর বলল, বুঝলাম, কিন্তু এসব ব্যাঙ্কে না রেখে ঘরে ফেলে রেখেছ কোন সাহসে?

—ব্যাঙ্কের থেকে এখানে রাখা ঢের নিরাপদ। ধরা পড়লে চোখে সর্ষেফুল দেখতে হবে।

শোনামাত্র মিষ্টির আবার সেই অস্বস্তি। কিছু সংশয় প্রকাশ পেলে দেয়ালের ওই মহিলার প্রতি অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা ভাবতে পারে।—ঠিক আছে, এখন চটপট তুলে ফেলো।

—তুলে ফেলব মানে? দুলারি দারুণ লজ্জা দিয়েছে। খাওয়া-দাওয়া সেরেই তোমাকে নিয়ে আর এসব নিয়ে শিলিগুড়ি যাব। সেখানে গয়নার অর্ডার দিয়ে পরে শাড়ি কেনা হবে।

মিষ্টির আবার মজা লাগছে। চোখেমুখে কপট খেদ এটুকু সোনার আর হীরেমুক্তোর গয়না?

কি দিয়ে হয় বা কতটা হয় বাপীর ধারণা নেই। তবু ঠাট্টা বুঝল। হেসে জবাব দিল, করে রাখতে দোষ কি, ইঁটের ডেলা আর পাথরকুঁচির মতো তো পড়েই আছে।

জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখে মিষ্টিই এবার খাট থেকে সব-কিছু তুলে নিয়ে আবার সিন্দুকে রাখল। তার ওপর যা ছিল একে-একে সব তুলে চাপা দিতে লাগল।

—ও কি! সব চাপাচুপি দিচ্ছ, শিলিগুড়ি যাবে না?

—না।

—আলবৎ যাবে। বাপী বাধা দিতে এগিয়ে এলো।

দেখো, পাগলামো করো না! তোমার এই বুদ্ধি দেখলে দশ বছরের ছেলেও হাসবে।

—কেন হাসবে?

—কলকাতা থেকে এসে শিলিগুড়ি যাব গয়না গড়াতে আর শাড়ি কিনতে? কলকাতায় গিয়ে যা-হয় হবে।

বেজার মুখ দেখে হেসে ফেলে মিষ্টি কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। ঘরের দরজা বন্ধ এখনো। এই লোককে বিশ্বাস নেই। বলতে যাচ্ছিল, এই জঙ্গলের রাজ্যে তুমিই

আমার সেরা গয়না।

আরো সাত দিন বাদে মিষ্টিকে নিয়ে বাপী ভুটান পাহাড়ে বাংলোয় চলে এলো। দিন দশেক নিরিবিলিতে কাটানোর ইচ্ছে এখানে। নিজেই ড্রাইভ করে এসেছে। পাহাড় বেয়ে ওঠার সময় গায়ত্রী রাইয়ের স্বামীর অ্যাক্সিডেন্টের গল্প করেছে। ফলে এমন সুন্দর পাহাড়ী রাস্তাটাকে মিষ্টি ভয়ের চোখে দেখল। পরে ওঠা-নামার সময় গল্পের ফাঁকে ওর দিকে ঘাড় ফেরালেই ধমক লাগায়, সামনে চোখ রেখে চালাও—বর্ষায় এ-রাস্তায় তুমি মোটে আসবে না!

বাপীর দু-কান জুড়োয়। আরো বেপরোয়া হতে ইচ্ছে করে।

দুজনকে একসঙ্গে পেয়ে ঝগড়ুর কালো মুখে খুশি ধরে না। মাথায় তুলে রাখা সম্ভব হলে রাখত। পাহাড়ের এই বাংলোর সে-সব জমজমাট দিনগুলো সে ভুলতে পারে না। তাই মনমরা। দিনকতকের জন্য হলেও মরা নদীতে খুশির জোয়ার এসেছে। এই মালিক মস্ত দিলের মানুষ গোড়া থেকেই জানে। কিন্তু তার পরীপনা বউও যে সেই রকমই হবে, নিজের হাতে খেতে দেবে, বসে গল্প শুনতে চাইবে, এ কি ভেবেছিল?

এখানে বসন্ত আরো উদার। আরো অকৃত্রিম। বাংলোর সামনেই ফুলের বাহার। পিছনে ব্যবসার গাছ-গাছড়ার চাষ করে পাঁচ-ছ'টা লোক। বাংলোর বাইরে যে-দিকে তাকায় জঙ্গল আর পাহাড়, পাহাড় আর জঙ্গল। পাহাড়গুলোও রিক্ত নয় এখন। মৌসুমি ফুলের মুকুট পরে বসে আছে। আর জঙ্গল তো ঋতুসাজে সেজেই আছে। তার বাতাস রক্তে দোলা দিয়ে যায়। তখন নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

যেতে হয়ও। জীবনের এই দোসরই তাকে বসন্তের বে-হিসেবী ভোগের রকমারি স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বাধা দিতে গেলে বাঁধ ভাঙে। তখন আর কৃপণ হতে ইচ্ছে করে না। হাল ছেড়ে রাগই করছিল।—তুমি এত জানো কি করে?

এ সম্পর্কেও বাপীর কিছু বইপত্র পড়া ছিল। তা ফাঁস না করে মাথা চুলকে জবাব দিয়েছে, দেখে-শুনে একজন মেয়ে মাস্টার রেখেছিলাম—সেই শিখিয়ে পড়িয়ে পাকা করে দিয়েছে।

দু-হাতের ধাক্কায় বাপী খাট থেকে উল্টে পড়তে যাচ্ছিল। সেই ফাঁকে মিষ্টি ঘর থেকে পালিয়েছে। ভালো মুখ করে ঝগড়ুর সঙ্গে গল্প করতে বসেছে। আর ভয়ে ভয়ে বার বার পিছন ফিরে দেখছে।

তিন দিন বাদে বাপী ওকে নিয়ে বাংলো থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। বলল, চলো আজ জঙ্গলে বেড়িয়ে আসি।

মিষ্টি উৎসুক তক্ষুনি। তার পরেই থমকালো।—কোনরকম অসভ্যতা করবে না?

বাপী হাসতে লাগল।—তা কি বলা যায়, সব এখানকার বাতাসের দোষ।

—যাব না, যাও।

বাপী আশ্বাস দিল, ঠিক আছে, চলো। এই জঙ্গলে পিঠে দাগ পড়ার মতো কোনো কারণ ঘটেনি।

পিঠে না হোক, মনে দাগ পড়ার মতো কিছু ঘটেছিল। মিষ্টির হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় পা ফেলা মাত্র সেটা মনে পড়ে গেল। আঙুল তুলে সামনের মস্ত দেবদারু গাছটা দেখিয়ে বলল, ওখানে এক অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

মিষ্টির তক্ষুনি আগ্রহ।—কার সঙ্গে?

—উদোম ন্যাংটো এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। তখন হাড় কাঁপানো শীত—ওই গাছটার নিচে দিব্বি বসেছিল, সমস্ত গায়ে ভস্মমাখা, সামনে একটা ত্রিশূল। অমন দুটো চোখ আমি আর দেখিনি, ঝাঁকড়া চুল-দাড়িতেও তার আলো ঠিকরোচ্ছিল। আমার দিকে একটু

চেয়ে থেকে বলল, আগে বাঢ়্। মিল জায়গা।

মিষ্টি অবাক।—কি মিল জায়গা?

—ওই জানে। আমার তখন সব সামনে এগোনোটা শুধু তোমাকে লক্ষ্য করে। এসবে ভক্তি বিশ্বাসের ছিটে-ফোঁটাও নেই—কিন্তু গমগমে গলার স্বর আমার কানে বসে গেল, আর তারপর থেকে মনে এক আশ্চর্য জোর পেলাম। হেসে মন্তব্য করল, এর কোনো মানে নেই, সবটাই সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার জানি, কিন্তু তখন শুধু মনে হচ্ছিল, আমার দিন ফিরবেই আর তোমারও নাগাল পাবই।

মিষ্টি বাধা দিল, মানে নেই বলছ কেন. দিনও ফিরেছে, নাগালও পেয়েছ।

বাপী হেসে উঠল। জবাব দিল, সে-কি ওই সন্ন্যাসীর দয়ায় নাকি! আমার তেড়ে-ফুঁড়ে এগনোটা তো দেখোনি। তবে এগনোর জোরটা মনের সেই অবস্থায় অনেক বেড়ে গেছল সত্যি কথা।

মিষ্টি আর কথা বাড়ালো না। সাধুসন্তদের মাহাত্ম্য সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাদের প্রতি কোনোরকম অবিশ্বাস বা অবজ্ঞার কথাও শুনতে চায় না।

ফেরার পথে জঙ্গল ঘেঁষা সেই ছোট পাহাড়। বাপী নিজে উঠল খানিকটা হাত ধরে মিষ্টিকেও টেনে তুলল। তারপর টেনে জায়গায় বনমায়ার শোকে পাগল সেই বুনো হাতির খপ্পরে পড়েছিল, আর কোন্ পর্যন্ত ওটা তাদের ধাওয়া করে নিয়ে গেছল. দেখালো। এই অবধারিত মৃত্যু থেকে প্রাণে বাঁচার গল্প মিষ্টি কলকাতায় বাপীর প্রথম-বারের সেই নামী হোটেলের সুইটে বসে শুনেছিল। তখনো শিউরে উঠেছিল। কত অল্পের জন্য বেঁচেছে চোখে দেখে এখন আরো গায়ে কাঁটা।

দুদিন বাদে সকালের দিকে আবু গাড়ি নিয়ে হাজির। একটা বড় কনট্রাক্টের যোগা-যোগ। মালিকের সামনে পার্টির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ইচ্ছে। বহিনজিকে আশ্বাস দিল বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসতে পারবে।

বাপীর ফিরতে সন্ধ্যা গড়ালো। বাদশা পৌঁছে দিয়ে গেল। মুখ-হাত ধুয়ে চা খেতে খেতে বাপীর মনে হল, মিষ্টি একটু চুপচাপ। জিগ্যেস করল, সমস্ত দিন কি করলে?

মিষ্টি বলল, ঝগড়ুর সঙ্গে গল্প করলাম, তোমার এখানকার বাগানে কি কি চাষ হয় না হয়, ঝগড়ু বোঝালো, সাপের বিষ তোলার ঘরও দেখালো—একটা মেয়ে মরে গেল বলে অমন লাভের ব্যবসাটাই তুমি বন্ধ করে দিলে বলে ঝগড়ুর খুব দুঃখ।

বাপী চেয়ে রইল একটু। তারপর অল্প অল্প হাসতে লাগল।—তোমার আরো কিছু বলার ইচ্ছে মনে হচ্ছে?

মিষ্টিও হাসল একটু।—তুমি রাগ না করলে বলতে পারি।

—তুমি আমার রাগের পরোয়া করো এই প্রথম জানলাম। আচ্ছা, বলেই ফেলো—

মিষ্টির তবু দ্বিধা।—আজ থাকগে, সমস্ত দিনের ধকল গেছে তোমার...।

—কিছু না। তার দিকে চেয়ে বাপী একটু মজার খোরাক পাচ্ছে। বলল, যেদিন তোমাদের ডিভোর্সের রায় বেরুলো, আমার ওপর ক্ষেপে গিয়ে তুমি জিগ্যেস করেছিলে যা হয়ে গেল তার পিছনে আমার কতটা হাত ছিল. আমি বলেছিলাম সবটাই—মনে আছে?

মিষ্টি মাথা নাড়ল, মনে আছে।

—তার মানে তোমাকে চাওয়া বা পাওয়ার ব্যাপারে আমি কোনো মিথ্যের আশ্রয় নিইনি। তোমার আমার মধ্যে লুকোচুরির কিছু থাকতে পারে না এটুকু ধরে নিয়ে মনে কি আছে বলে ফেলো দেখি?

এবারে মিষ্টি সোজা চেয়ে রইল একটু। মনে যা আছে ব্যক্ত না করা পর্যন্ত নিজেও স্বস্তি বোধ করছে না। বলে গেল, কলকাতার এয়ারপোর্ট থেকে প্রথম যেদিন তুমি আমাকে হোটেলে নিয়ে গেছলে সেদিনও তুমি বনমায়ার সেই বুনো হাতির হাত থেকে প্রাণে বাঁচার ব্যাপারটা আমাকে বলেছিলে।...বলেছিলে, তোমার সঙ্গে একজন ছিল, সেই তোমাকে বাঁচালে। সেই একজন কোনো মেয়েছেলে তখনো বলোনি...এখানে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে সেই জায়গা যখন দেখালে, তখনও না।

বাপীর ঠোঁটের হাসি মিলিয়েছে। বুকের তলায় মোচড় পড়ছে। কলকাতার হোটেলে রেশমার নামটা করতে পারেনি বলে নিজেকে অকৃতজ্ঞ ভাবছিল. তাও মনে আছে।

—তোমার কাছে এ গল্প কে করল, ঝগড়ু?

সাদা মনেই করেছে। তোমাকে বাঁচানোর ব্যাপারে জঙ্গল আলো করা মেয়েটা কত সাহস আর কত বুদ্ধি ধরে তাই বলছিল।...রাত পোহাতে হঠাৎ সে এখান থেকে চলে গেল, আর কয়েকদিনের মধ্যে বানারজুলির সাপঘরে গিয়ে সাপের ছোবল খেয়ে আত্মহত্যা করল—সেই শোক আর সেই অবাক ব্যাপার ওর মনে লেগে আছে।

মুখের দিকে চেয়ে কিছু একটা যন্ত্রণার আভাস দেখছে মিষ্টি। একটু চুপ করে থেকে বাপী ঠাণ্ডা গলায় জিগ্যেস করল, বানারজুলির বাংলোর সামনে সেদিন যে পাগল লোকটাকে দেখেছিলে, মনে আছে?

—হারমা না কি নাম বলেছিলে।

—হ্যাঁ: রেশমা ওকে ভালবাসত না, ও দারুণ ভালবাসত। তার শোকে এই দশা। এখন ওর ধারণা রেশমা আমার জন্যেই আত্মহত্যা করেছে। বলে বেড়ায়, রেশমাকে যে বাঁচতে দিল না তার কি ভালো হবে...।

মিষ্টি সত্রাসে চেয়ে আছে।

—হারমার ধারণা খুব মিথ্যে নয়।...রেশমাকে বাঁচাতে পারতাম। তাহলে বাপী মরত। সে তোমাকে পেত না। তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারত না।

মিষ্টি নির্বাক।

ভারী অথচ নিরুত্তাপ গলায় বাপী এরপরে অব্যর্থ সেই বীভৎস মৃত্যু থেকে রেশমার তাকে বাঁচানোর চিত্রটা অকপটে তুলে ধরল। বাংলোয় ফেরার পর রাতের ঘটনাও।

মিষ্টি উৎকর্ণ। তারও চোখে মুখে বেদনার ছায়া।

বাপী বলল, এরপর ক্ষিপ্ত হয়ে সে আমার কত বড় শত্রুর হাতের মুঠোয় চলে গেল আর কোন্ অনুশোচনায় সে নিজের ওপর অমন বীভৎস শোধ নিল—সে কথা তুমি দুলারির মুখে শুনে নিতে পারো—রেশমা তাকে সব বলে গেছে।

মিষ্টি সখেদে মাথা নাড়ল। দু চোখে অনুতাপ: আর কারো কাছে কিছু শোনার দরকার নেই।

তেমনি ভারী গলায় বাপী আবার বলে গেল, কিন্তু তোমার কথার জবাব এখনো দেওয়া হয়নি।...যাই করুক, রেশমা রেশমাই। নিজের ওপর ওরকম শোধ সে-ই নিতে পারে। সেই বীভৎস দৃশ্য তুমি কল্পনা করতে পারবে না। পর পর অনেকগুলো রাত আমি ঘুমুতে পারিনি। যন্ত্রণায় বুক ফেটে গেছে। কলকাতায় বা এখানে তোমার মনে এতটুকু ভুলের ছায়া পড়ুক তা আমি চাইনি। তোমাকে পাওয়ার আনন্দে স্বার্থপরের মতো অতবড় শোকের স্মৃতিও ভুলতে চেয়েছি। এই তার নাম করিনি।

মিষ্টির বিচ্ছিরি লাগছে। নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে। ছেলেবেলা থেকে যাকে হাড়ে হাড়ে চিনেছে, তার ভোগের দুর্বার তৃষ্ণাও দেখছে এখন। রেশমার সম্পর্কে এই গোপনতাব ফলে একটা কুৎসিত সন্দেহ বার বার মনে আসছিল, নিজের কাছে অন্তত সেটা অস্বীকার

করার নয়। চেয়ার ছেড়ে কাছে এসে দাঁড়াল। একটা হাত তার পিঠে রাখল।—ঘাট হয়েছে, আর কক্ষনো তোমাকে কিছু বলব না—হল?

—হাজার বার বলবে। বললে বলেই এখন হাল্কা লাগছে। তোমার আমার মধ্যে কোনো মিথ্যে থাকবে না, লুকোচুরি থাকবে না—ব্যস!

দশ দিন বাদে আবার বানারজুলি। এসে সেই বিকেলেই গেটের কাছে আবার হারমাকে দেখেছে। বাংলোর দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে কি বলছিল। তাকে দেখেই ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠল। লোকটা নাকি বলে, রেশমাকে যে বাঁচতে দিল না তার কি ভালো হবে...।

মিষ্টির এই অস্বস্তি বাপীও লক্ষ্য করেছে। আবুকে বলেছে, হারমার এদিকে আসা আটকাও তো। তোমার বহিনজি ঘাবড়ে যায়।

তিন দিন দার্জিলিং আর দুদিন শিলিগুড়ি বেড়ানোর পর আবার বানারজুলিতে ফিরে মিষ্টি কলকাতায় ফেরার জন্য ব্যস্ত। তার এক মাসের ছুটি প্রায় শেষ।

এ ব্যাপারে বাপী নির্লিপ্ত। জিগ্যেস করল, এয়ার অফিস তোমাকে কত মাইনে দেয়?

—কেন, তুমি তার থেকে বেশী দেবে?

—দেব।

মিষ্টি হেসেই জিজ্ঞাসা করল, কত বেশি দেবে?

—বেণীর সঙ্গে মাথা।

তার চাকরির ব্যাপারে এই লোক বিগড়বে এরকম আশংকা মিষ্টির ছিলই। এরপর যা দেখল তাতে দু চক্ষু স্থির। উত্তর বাংলার নানা ব্যাঙ্কের এক-গাদা পাশবই। তার কোনোটাতে বাপী তরফদার, কোনোটাতে বিপুল তরফদার, কোনোটাতে বিপুলনারায়ণ তরফদার, কোনটাতে বা শুধু নারায়ণ তবফদার। এক একটাতে টাকার অঙ্ক দেখেও মাথা ঘোরার দাখিল।

শুধু অবাক নয়, মিষ্টি অস্বস্তিও বোধ করেছে। সাদা সিধে রাস্তায় এত টাকা এলে নামের এত কারচুপি কেন? শুধুই ইনকাম ট্যাকস এড়ানোর জন্যে বলে মনে হল না। পাহাড়ের বাংলোয় গিয়ে সে আরো কিছু দেখেছে জেনেছে। রেশমাকে নিয়ে অমন এক আবেগের ব্যাপার ঘটে গেল বলেই মুখ ফুটে তখন কিছু জিগ্যেস করতে পারেনি। বানারজুলিতে ফেরার পর ভুলে গেছল।

ভাবনাটা এখনো চেপেই গেল মিষ্টি। বাপীর তক্ষুনি আবার দরকারী কাজ মনে পড়েছে। এসব পাশবই বাতিল করে দুজনের নামে অ্যাকাউন্ট করতে হবে। চার পাঁচ দিন অন্তত লাগবে তাতে।

তাকে কিছু না জানিয়ে মিষ্টি টেলিগ্রামে আবো এক সপ্তাহেব ছুটির মেযাদ বাড়িযে নিল।

ওই সব ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট দুজনের নামে ট্রান্সফারের সময়েও সেই নাম বদলের খেলা দেখল। এবারে একজনের নয়, দুজনেরই। কোথাও মিষ্টি তরফদার কোথাও মালবিকা তরফদার। কোথাও শুধু মিষ্টি দেবী বা মালবিকা দেবী। কোনটাতে আগে বাপীর নাম পরে ওর। কোনটাতে আগে ওর পরে বাপীর।

মিষ্টির সাদামাটা বিস্ময়।—নামের ওপর এত হামলা কেন?

জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেছে। দুষ্টুমি চিকিয়ে উঠেছে।—সত্যি আমি রাম বোকা একটা, আসল লোক এত কাছে, তাকে ছেড়ে কিনা তার নামের ওপর হামলা!

নিরাপদ ব্যবধানে সরে গিয়ে মিষ্টি আবার জানতে চেয়েছে, বলো না কি ব্যাপার?

বাপীর এবারে সত্যি বলার দায়ে-পড়া মুখ।—জেল-টেল যদি হয় কখনো, একলা

গিয়ে মরি কেন, দুজনে জড়াজড়ি করেই যাব।

মিষ্টিও হেসে ফেলে তাড়াতাড়ি কৌতূহল চাপা দিল। ধুরন্ধর কম নয়, উদ্বেগ টের পেয়েই এই ঠাট্টা। মিষ্টি তার পরেও শুধু লক্ষ্য করেছে। মুখের আয়নায় ভেতর দেখতে চেষ্টা করেছে। বড় রকমের গলদ বা জটিলতা কিছু থাকলে কেউ এমন নিঃশঙ্ক অকপট স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে দিন কাটাতে পারে না। এখানে এসে মিষ্টি পাহাড়ী ঝরনা কম দেখল না। পাথুরে বিঘ্ন ঠেলে, কোনো আবর্জনা গায়ে না মেখে তরতর করে নেমে আসে। হাতে নিলে স্ফটিকস্বচ্ছ। এই লোকের সঙ্গে মেলে। বিঘ্ন মানে না। আবর্জনা গায়ে মাখে না। ওসব যে দেখে, দেখুক।

মিষ্টিও আর দেখতে চেষ্টা করল না। উৎকণ্ঠাও সরে গেল। সবই জানতে বুঝতে খুব সময় লাগবে মনে হয় না। পাহাড়ের বাংলোয় এই লোকের সেদিনের জোরের কথাগুলো ভোলার নয়। বলেছিল, তোমার আমার মধ্যে কোনো মিথ্যে থাকবে না, লুকোচুরি থাকবে না—ব্যস!

থাকবে না যে, তার প্রমাণ কলকাতা রওনা হবার দিনও আর এক-দফা পেল। উপলক্ষ হাতের চিঠি। এই সকালে এসেছে। আমেরিকা থেকে ঊর্মিলা একসঙ্গে ওদের দুজনকে লিখছে। রেজিস্ট্রি হয়ে যাওয়ার পরেই বাপী আট-দশ লাইনের চিঠিতে বিয়ের খবর আর বানারজুলিতে লম্বা হনিমুন কাটানোর খবরটা শুধু দিয়েছিল। তার জবাব। চিঠিতে এমন কিছু প্রগলভ রসিকতার আভাস ছিল যার দরুন বউয়ের জেরার ভয়ে অনেক পুরুষ ওটা লুকিয়ে ফেলতে চাইত। চিঠিটা নিজে পড়ে বাপী নিঃসংকোচে তার হাতে তুলে দিয়েছে। পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত মিটিমিটি হেসেছে।

'ফ্রেন্ড ডিয়ার অ্যান্ড ডিয়ার ডিয়ার মিষ্টি। চিঠি পেলাম। চিঠি এত ছোট কেন তাও বুঝলাম।

যুগলে শোনো! দেশের মতো এখানেও সামাব এখন। ছোট বড় যে কোনো উপলক্ষে এখানে এখন মেয়ে পুরুষের নাচার ধুম। ওর আপিসের অসভ্য বন্ধুগুলোর আমাকে নিয়ে নাচার জন্য টানাটানি। আমি ছুতোনাতায় পালিয়ে বেড়াই। কিন্তু সেদিন চিঠিখানা পেয়ে আর পড়েই ঘরের মধ্যে আমি এমন নাচা নাচতে লাগলাম যে তোমাদের মিস্টার মেহেরার দুই চোখ ছানাবড়া। ঘাবড়ে গিয়ে আমাকে থামাতে এসে আরো বিপাকে পড়ে গেল। আমি তাকে নিয়েই ধেই ধেই নাচতে লাগলাম।

বাপী, তুমি একখানা সত্যিকারের শয়তান। যা চাও তাই পা । তাই করো। আমি এরকম শয়তানের কত যে ভক্ত জানলে মিষ্টি না রেগে যায়। যাক এখন কি করে মিষ্টি পেলে না জানা পর্যন্ত আমার ভাত হজম হবে না। পত্রপাঠ সবিস্তারে লিখবে।

মিষ্টি, তুমি কত যে মিষ্টি একদিন স্ব-চক্ষে দেখেছি। আজ সত্যি কথা বলছি ভাই, তোমার সেদিনের অত ঠাণ্ডা হাব-ভাব দেখেও আমার মনে হয়েছে তুমি কোনো গৌরবের সমর্পণের অপেক্ষায় বসে আছ। নইলে সেদিন তুমি অত ঘটা করে ফ্রেন্ডের অস্তিত্ব উপেক্ষা করতে চাইতে না। কিন্তু খুব সাবধান, ওই ডেনজারাস মানুষকে কক্ষনো যেন আর মিষ্টি ছাড়া করতে চেও না। তার মিষ্টি ছাড়া হবার আক্রোশ আমি যেমন জানি তেমন আর কেউ জানে না। এই আক্রোশে সে নিজে রসাতলে ডুবতে পারে অন্যকেও টেনে নিয়ে যেতে পারে।

বাপী, মিষ্টিকে এভাবে সাবধান করার জন্য তুমি নিশ্চয় আমার মুণ্ডুপাত করছ। মানে মানে এখন সরে পড়ি।

তোমাদের হনিমুনের হনি অফুরন্ত হোক।—ঊর্মিলা।

বাপীর ঠোঁটে হাসি ঝুলছে। চিঠি পড়া শেষ করে মিষ্টি মুখ তুলল। স্বাভাবিক

জেরার সুরে জিগ্যেস করল, শেষের এই কথাগুলোর মানে কি?

—মানে, অত দূরে বসেও ওই মেয়ের আমাকে ডোবানোর মতলব।

—তোমার মিষ্টি ছাড়া হবার আক্রোশ ও যেমন জানে আর কেউ তেমন জানে না লিখেছে, আক্রোশে ওকেই রসাতলের দিকে টেনেছিলে নাকি?

—প্রায়।

মিষ্টির কৌতূহল বাড়লো।—শুনি না কি ব্যাপার?

বাপী বিপন্ন মুখ।—শুনতেই হবে?

মিষ্টি একটু হালকা খোঁচা দেবার লোভ ছাড়ল না।—তুমিই বলেছিলে আমাদের মধ্যে লুকোচুরির কিছু থাকতে পারে না। বলতে আপত্তি থাকলে বোলো না।

বাপী বড় নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা।—এরপর আর না বলে পারা যায় কি করে।.. তোমার বিয়ে হয়ে গেছে জেনে সমস্ত মেয়ে জাতটাকে ভস্ম করার মেজাজ নিয়ে বানারজুলি ফিরেছিলাম। সেই আক্রোশে উর্মিলার প্রেম-কাণ্ডে আগুন ধরিয়ে ওকেই প্রায় গিলে বসেছিলাম—

মিষ্টি হাসতে গিয়েও হোঁচট খেল।—তোমার গেলার নমুনা তো জানি, প্রায় বলতে কতটা?

—তা অনেকটা। ওর মা তখন ষোলো আনা আমার দিকে—আমাকে ঠেকায় কে?

মিষ্টি এবারে রুদ্ধশ্বাস।—তারপর?

—তারপর ওই মেয়ের চোখের জল আমার পিঠে চাবুক হয়ে নেমে এলো। পড়িমরি করে আবার কলকাতা ছুটে গিয়ে বিজয়কে শিলিগুড়ি ধরে নিয়ে এলাম। আর এখান থেকে মায়ের অজান্তে মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে ওদের বিয়ে দিলাম।

মিষ্টি চেয়ে আছে। তার কান-মন ভরে যাচ্ছে।

॥ কুড়ি ॥

চাকরির মোহ মিষ্টিরও আর নেই খুব। উপার্জনের সঙ্গে প্রয়োজনের কিছুমাত্র যোগ না থাকলে সেটা সখের চাকরি। তখন দশটা পাঁচটার কড়াকড়ি খুব সুখের মনে হয় না। মিষ্টি তবু তর্ক করতে ছাড়েনি। বলেছে, ঘরে বসে থেকে করব কি, খাবদাব ঘুমুবো আর মুটিয়ে যাব?

ওর মুটিয়ে যাবার নামে বাপীর কপট আতঙ্ক।—সর্বনাশ! সেটা বরদাস্ত হবে না। যা আছ তার থেকে এক চুল মোটা হতে দেখলে খাওয়া আর ঘুম আর্ধেক করে দেব আর হরদম ওঠ-বোস করাবো। এতদিনে আমার হাতের একটা পাকা আন্দাজ হয়ে গেছে —জোর রাতে আর ছুটির দিনের দুপুরে খুব কড়া করে মাপ নিয়ে ছাড়ব।

মিষ্টির অবাকই লাগে। এরকম বে-আবরু রসের কথা ওই মুখেই দিব্যি মানায়। হাসি চেপে বলেছে, তোমার অত কষ্ট করার দরকার কি, আমি চাকরিটা করে গেলেই তো হয়।

বাপী গম্ভীর। তা হয় না। অসিত চ্যাটার্জি আমার কান বিষিয়ে রেখেছে। ওখানে নাকি গণ্ডায় গণ্ডায় লোক তোমার রূপে গুণে মজে আছে। সব ছেড়েছুড়ে আমাকে তাহলে তোমার অফিস পাহারা দিতে হয়।

সন্তর্পণে একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছে মিষ্টি। দুজনের মধ্যে দুস্তর তফাৎ কত, অনুভব করা যায়। মুখের কথা ছেড়ে আগের লোকের চাউনিতে অবিশ্বাসের ছায়া দেখলেও বরদাস্ত করতে পারত না, ঝলসে উঠত। আর এই একজনের তাই নিয়ে সাদাসাপটা

ঠাট্টাও নির্ভেজাল রসের বস্তু হয়ে ওঠে।

মিষ্টির মা বাবা দাদারও এখন বাপীর সর্ব কথায় সায়। বিশেষ করে মায়ের। জামাই-গর্বে মহিলা ডগমগ। মেয়ের নিজের আলাদা নতুন গাড়ি হয়েছে, তার জন্য ড্রাইভার রাখা হয়েছে। সোনাদানার ছড়াছড়ি। ছেলের বউয়ের আর তাঁর নিজের গায়েও এক-গাদা নতুন গয়না উঠেছে। মেয়ে কোনো আপত্তিতে কান দেয়নি। মেয়ের একলার হাতখরচের জন্য এখানকার ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা পড়েছে তা-ও চোখ ঠিকরে পড়ার মতো। জীবন-ভোর বড় চাকরি করেও মেয়ের বাপ অত টাকা জমাতে পারেনি। জামাইয়ের পরামর্শ মতো সেই টাকা মনোরমা নন্দী আর মালবিকা নন্দীর নামে রাখা হয়েছে—ঠিকানাও সেই বাড়ির। বাপীর সঙ্গে এই টাকার কেউ কেউ কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাবে না। ইনকাম ট্যাক্স এড়ানোর এই ফন্দি মিষ্টির খুব পছন্দ নয়। কিন্তু দাদা এমন কি বাবাও বলে, বেশি টাকা যাদের, এভাবে কি কিছু টাকা সরিয়ে রাখতেই হয়।

মায়ের উদ্ভাসিত মুখ দেখে মিষ্টি তাকে আরো কিছু দেখানোর লোভ সামলাতে পারেনি। গাড়ি পাঠালেই মা চলে আসে। মেয়ের ঐশ্বর্যের আভাস পেলেও তার পরিমাণ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। মায়ের সঙ্গে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলার পর আনন্দে আত্ম-হারা মা-কে মিষ্টি নিজের এখানে নিয়ে এলো। খাওয়া দাওয়ার পর আরো কত সোনা আর মণিমুক্তো ঘরে পড়ে আছে মা-কে দেখালো। উত্তর বাংলার নানা ব্যাঙ্কে জমা টাকার পাশবইগুলো দেখেও মায়ের দম-বন্ধ হওয়ার দাখিল। মিষ্টি আনন্দ পেয়েছে বই কি। যে জামাইয়ের আজ এত গুণকীর্তন, এই মায়ের হাতে তার ছেলেবেলার হেনস্থা মেয়ে ভোলেনি। মানুষটার পিঠের ওই দাগগুলোর ওপর মিষ্টি যখন হাত বা ঠোঁট বুলিয়ে আদর করে, তখন সেই সব নির্যাতন অবজ্ঞা আর অবহেলা সব থেকে বেশি মনে পড়ে।

কিন্তু এত ঐশ্বর্য বলেই মিষ্টি নিজেও স্বস্তি বোধ করে না খুব। একটা উৎকণ্ঠা মনের তলায় থিতিয়েই আছে। ভুটান পাহাড়ের বাংলোয় নিজের চোখে কিছু দেখে এসেছে। কিছু বুঝেও এসেছে। তারপর ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে এই জমা টাকার স্তূপ দেখে কেবলই মনে হয়েছে এত বড় ব্যবসার তলায় তলায় কিছু বে-আইনী ব্যাপারের স্রোতও বইছে। বাপীর দিকে চেয়ে কোনরকম উদ্বেগের ছিটে-ফোঁটাও যে দেখে না—সেটা অবাক হবার মতো কিছু নয়। তার মতো বেপরোয়া দুঃসাহসী কজন হয়।

মুখে কিছু না বলে মিষ্টি দেখে যাচ্ছে। বুঝতে চেষ্টা করছে। নিজের চোখ আর বুদ্ধির ওপর আস্থা আছে। বাড়ির নিচের তলায় অফিস। বাপী কথামতো খাওয়া-দাওয়ার পর দু'তিন ঘণ্টার জন্য এসে বসে। জিত্ থাকলে তার কাছ থেকে কাজকর্ম বোঝা সহজ হয়। আর শুধু এই লোক থাকলে খানিক বাদে ফষ্টি-নষ্টি শুরু হয়ে যায়। এক-একদিন কাজের অছিলায় বাপী গম্ভীর মুখে জিত্কে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। মিষ্টি মনে মনে অপ্রস্তুত হয়। জিত্ চলে গেলে রাগ দেখায়।—তোমার যে যে দিনে বাইরে কাজ থাকবে সেই সব দিনে আমি এখানকার কাজ দেখতে বা বুঝতে নামব।

বাপীর ঠোঁটে জবাব মজুত।—আমার যা হবার হয়েছে, বউ ছেলে আছে, বেচারা জিতের মাথাটা আর খাবে কেন।

—জিত্ কি বোকা নাকি, তোমার চালাকি বুঝতে পারে না ভাবো?

—না পারার কি আছে। তোমাকে কি করে ঘরে এনেছি ও সেটা খুব ভালোই জানে।

তবু এই ক-মাসে মিষ্টি যতটুকু দেখেছে ব বুঝেছে, এখানকার ব্যবসায় বেআইনী কিছু আছে মনে হয়নি। বাপীর সঙ্গে উল্টোডাঙার বিশাল গোডাউনও দেখে এসেছে। সেখানে ভাসুর অর্থাৎ মণিদার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ভদ্রলোকের দুর্ভাগ্যের কথা মিষ্টির শোনা ছিল। মাসখানেক আগের ছুটিতে বাচ্চু এসেছিল। তখন শুনেছে। শোনার পর

ছেলেটার জন্য ভারী মায়া হয়েছিল। ওই ছেলেও খুব আর ছোটটি নেই এখন। সবই বোঝার কথা। যাই হোক, গোডাউন দেখেও সন্দিগ্ধ হবার মতো কিছু চোখে পড়েনি।

প্রথম ধাক্কা খেয়েছে মাস চার-পাঁচ বাদে বাপীর সঙ্গে টুরে এসে। পর পর দুবার মিষ্টি যেচে সঙ্গ নিয়েছে। তার স্পষ্ট কথা, খুব আনন্দ করে চাকরি ছাড়িয়েছ, এখন একলা বসে আমার দিন কাটে কি করে?

বাপী সানন্দে নিয়ে এসেছে। ভালো হোটেল যেখানে আছে সেখানে আর অসুবিধে কি। মিষ্টি সেই প্রথম টের পেয়েছে এ-সব দিকের ব্যবসার সবটাই সাদা রাস্তায় চলছে না। ফার্মের নামে অনেক টাকা চেকে আসতে দেখেছে। সেই সঙ্গে থোকে থোকে কাঁচা টাকাও। কাঁচা টাকার বেশির ভাগই ব্যাঙ্কে জমা পড়ছে না। যা-ও পড়ছে তা-ও ফার্মের নামে নয়, দুজনের নানা নামের অ্যাকাউণ্টে। ঘরের সিন্দুকে অত কাঁচা টাকার আমদানিও এই থেকেই বোঝা গেল। প্রথমবারের সন্দেহ দ্বিতীয়বারে সঙ্গে এসে আরো মাথায় গেঁথে গেল। এবারে মধ্যপ্রদেশের কয়েক জায়গায় টুরে আসা হয়েছিল। ফেরার সময় গা শিব-শির করার মতো সঙ্গে পাঁজা পাঁজা নোট।

এবারে ফিরে এসে মিষ্টি আর চুপ করে থাকতে পারল না। উদ্বেগ বুঝতে না দিয়ে ঘুরিয়ে প্রসঙ্গটা তুলল। জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের সেই ভুটান পাহাড়ের বাংলোর পিছনের অত জায়গায় সবটা জুড়ে শুধু নেশারই নানারকম গাছগাছড়ার চাষ হচ্ছে দেখেছিলাম, সব ওষুধে লাগে?

বাপী হেসে জবাব দিল, ওষুধে যতটা লাগে নেশায় তার থেকে বেশি লাগে।

—তোমার লাইসেন্স আছে?

—লাইসেন্স না থাকলে এত জায়গায় ব্যবসা চালাচ্ছি।

—না, মানে নেশার জন্য ও-সব বিক্রি করার লাইসেন্সও আছে?

বাপী হাসতে লাগল।—হঠাৎ তোমার মাথায় এসব চিন্তা কেন?

—বলোই না?

—আমি হোলসেলারদের দিয়ে খালাস। যা করার তারা করে। কোটার বাইরে তারা যা নেয় তার হিসেব মুখে মুখে—আমার রেকর্ড সাফ।

মিষ্টির পছন্দ হল না। বলল, কোটার বেশি জিনিস দেওয়াও তো অন্যায়, বিশেষ করে কেন বেশি নিচ্ছে তা যখন তুমি জানো।

এই গোছের ন্যায়-নীতির আলোচনা ভালো লাগার কথা নয়। কিন্তু বাপীর একটুও খারাপ লাগছে না। মিষ্টির ভেতরটা এখনো ছেলেবেলার মতোই পরিষ্কার। বলল, লোকে নেশা করবেই, তাই এ অন্যায় তুমি না করলে আর একজন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে করবে। হেসে খোঁচাও দিল, আর ন্যায়-অন্যায় যা-ই বলো সব করেছি তোমার জন্য—পিছনে টাকার জোর ছিল না বলে বানারজুলির বড়সাহেবের বাংলোয় ঢুকতে পর্যন্ত পেতাম না—লোকে নেশা আর কতটুকু করে, তোমার জন্য আমার টাকা রোজগারের নেশা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মিষ্টি মুখে আর কিছু বলল না, কিন্তু ভিতরে একটা দুশ্চিন্তা থিতিয়েই থাকল। বলতে ইচ্ছে করছিল, আমার জন্যেই যদি হয় তো এ নেশায় আর কাজ কি! আমার নাগাল তো পেয়েছ, এখন সাদা রাস্তায় চলো। বলতে পারল না। এত বছর ধরে এত জায়গায় যা ছড়িয়ে বসেছে, হুট করে তা গুটিয়ে ফেলতে বললে কান তো দেবেই না, উল্টে হেসে উড়িয়ে দেবে। বিরক্তও হতে পারে। এর পর বাপী টুরে বেরুলে ঘরে না ফেরা পর্যন্ত মিষ্টির একটা চাপা অস্বস্তির মধ্যে কাটে। এত কাঁচা টাকা নিয়ে অনায়াসে ঘোরাফেরা করে, মিষ্টির সে-জন্যেও দুশ্চিন্তা।

ইচ্ছে থাকলেও এখন আর সঙ্গে যাওয়া হয় না। নরেন্দ্রপুর থেকে বাচ্চুকে ছাড়িয়ে এনে আবার কলকাতার স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। মুখে না বললেও বাচ্চুর এখানে থাকার ইচ্ছেটা মিষ্টি টের পেত। কলকাতায় এলে কাকীমার কাছছাড়া হতে চায় না। এই থেকেই বুঝেছে। আর এই ছেলেটার ওপর তার কাকার স্নেহ মায়া মমতাও লক্ষ্য করেছে। এত বড় বাড়িতে মিষ্টিরও একা ভালো লাগে না। সে-ই তাগিদ দিয়ে বাচ্চুকে আনিয়েছে। ছেলেটার ওপর আগেই মায়া পড়েছিল। এখন আরো বেড়েছে।

সামনের বারে স্কুল ফাইন্যাল দেবে। কিন্তু মিষ্টি মাস্টার রাখতে দেয়নি। বাপীকে বলেছে, এটুকু দায়িত্ব তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।

বাপী আরো নিশ্চিন্ত।

সময় সময় তবু মিষ্টির কেমন নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিমনা দু চোখ নিজের দেহে ওঠা-নামা করে। যেমন ছিল তেমনি আছে। আগের মতই কাঁচা, তাজা। তবু খুশি হতে পারছে না তেমন। বছর ঘুরতে চলল, দেহের নিভৃতে কোনো সাড়া নেই, ঘোষণা নেই। সব থেকে বেশি কাম্য কি এখন, মুখ ফুটে বাপীকে বলতে না পারলেও নিজে জানে। কোল জোড়া হয়ে থাকার মতো কাউকে চাই। আগের জীবনে আর ছেলেপুলে না হওয়াটা ইচ্ছাকৃত ভাবত। একবারের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে সেই সম্ভাবনাও ভয়ের চোখে দেখত। সেই দোসরের ওপর ভরসা আদৌ ছিল না, তাই নিরাপদ বিধি-ব্যবস্থার দায় নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। কিন্তু এখন কি? এই এক বছর ধরে তো কোনো বাধারই বালাই নেই। ভাবতে গেলে নিজের মুখ লাল হয় মিষ্টির। দুবার স্রোতে ভেসে যাওয়ার এমন পরিপূর্ণ আনন্দ আগে জানা ছিল না। নিজের শরীর স্বাস্থ্য অত ভাল না হলে ধকল পোহানোও খুব সহজ হত না। এই ভোগ-বিস্মৃতির একটাই পরিণাম। কিন্তু এত দিনেও শরীরে তার কোনো লক্ষণ বা ইশারা নেই কেন?

মিষ্টির দুশ্চিন্তার ছায়াটা ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠেছে। সেই অভিজ্ঞ ডাক্তারের কথা মনে পড়েছে। বলেছিল, অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। তখনকার সেই ভাঙা স্বাস্থ্যই সব থেকে বড় ক্ষতি ধরে নিয়েছিল মিষ্টি। সেই ক্ষতি মানে কি তাহলে এই! এত পাওয়ার বিনিময়েও তার কিছু দেবার থাকবে না?

নিজের হেপাজতে গাড়ি, হাতে অঢেল টাকা, মিষ্টি দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে বসে থাকল না। মা কে শুধু বলল। তারপর সেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে মায়ের মারফৎ অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তার কাছে গেল। সঙ্গে কেবল মা। আর কেউ কিছু জানে না।

মা সব বলার পর কেসটা বড় ডাক্তারের কিছু কিছু মনে পড়েছে। 'দু' সপ্তাহে বার-কয়েক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সে মা কে জানিয়েছে, এত দিনেও হয়নি যখন, আর হবে বলে মনে হয় না। হবেই না এমন কথা ভদ্রলোক খুব জোর দিয়ে না বললেও মিষ্টি বা বোঝার বুঝে নিয়েছে। মা ডাক্তারের কথা মানতে রাজি নয়। কলকাতা শহরে বড় ডাক্তার ওই একজনই নয়। মায়ের তাগিদে সমস্ত কেস সহ আরো দুজন বিশেষজ্ঞকে দেখানো হয়েছে। তাদেরও উনিশ-বিশ একই কথা। তবে আশ্বাস দিল, বিজ্ঞান থেমে নেই, এ ধরনের কেস নিয়েও বিদেশে ঢালাও গবেষণা চলছে। কোনো আশা নেই, এ-কথা জোর দিয়ে বলা চলে না।

আগের জামাইয়ের ওপর জ্বলন্ত আক্রোশে মনোরমা নন্দী দুর্ভাবনার ব্যাপারটা ছেলেকে না বলে পারেনি। ছেলে আবার কথায় কথায় সেটা বাপীকেই বলে ফেলেছে। এই ভগ্নীপতি তার সব থেকে অন্তরঙ্গজন এখন। মা-কে নিজে তাগিদ দিয়ে দাদুর সাতাশি নম্বরের বাড়ি দীপেন নন্দীর একলার নামে লেখাপড়া করিয়েছে। শুধু তার জন্যেই ভগ্নীপতি ঘরে দামী বিলিতি বোতল মজুত রাখে। নিজে এরোপ্লেনের টিকিট

কেটে সপরিবারে তাকে বানারজুলিতে বেড়াতে পাঠিয়েছে—সেখানে নিজের বাংলোয় নি-খরচায় রাজার হালে রয়েছে। সেখানেও বেড়ানোর জন্য একটা গাড়ি চব্বিশ ঘণ্টা তাঃ দখলে। এমন দরাজ ভগ্নীপতির কাছে গোপন করার কি আছে। তার ওপর তরল পদার্থ পেটে পড়তে মনের খেদ আপনি প্রকাশ পেয়েছে।

বলেছে, বোনটার মন খুব খারাপ। তিন-তিনজন স্পেশালিস্ট দেখানো হয়েছে, তারা এই-এই বলছে—ওই অসিত রাসকেলটাকে হাতের নাগালে পেলে দীপুদা নিজেই তার মাথাটা ছাতু করে দেয়, ইত্যাদি।

বাপী আদৌ আকাশ থেকে পড়েনি। প্রথম বারের সেই অঘটনের পর দীপুদার মুখ থেকে বড় ডাক্তারের মন্তব্য শুনে বাপীর মনে এই সংশয় ছিল। মিষ্টিকে ঘরে আনার তিন মাসের মধ্যেও কোনো লক্ষণ না দেখে ছেলেপুলে যে আর হবে না, ধরেই নিয়েছে। কিন্তু সে-জন্য তার এতটুকু মাথাব্যথা নেই বা অসিত চ্যাটার্জীর মাথাও ছাতু করার ইচ্ছে নেই। সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে মিষ্টিকে চেয়েছিল। পেয়েছে। সেই অঘটন না ঘটলে বা তার পরেও একটা বা দুটো ছেলেপুলে থাকলে বাপীর চাওয়া আর পাওয়া দুই-ই বরবাদ হয়ে যেত।

বলে ফেলার পর দীপুদার অন্য সুর।—মা নিষেধ করেছিল, কিন্তু আমার মনে হয়েছে তোমার জেনে রাখাই ভালো। আমার মুখ থেকে শুনেছ মিষ্টিকে বোলো না যেন —দুদিন আগে হোক পরে হোক ও নিজে তো বলবেই তোমাকে।

বাপী বলেনি।

মিষ্টির থেকে থেকে বাপীর ওপরেই রাগ হয় এখন। এত বড় ব্যবসার কোনো কিছু চোখ এড়ায় না। বানারজুলি থেকে সময়ে আবু রব্বানীর চিঠি না এলে এখান থেকে টেলিগ্রাম যায়। সব কে-কেমন আছ জানাও। ঊর্মিলার চিঠি পেলে মিষ্টিকে তাগিদ দিয়ে জবাব লেখায়। জিতের আবার ছেলেপুলে হবে, তার বউ অ্যানিমিয়ায় ভুগছে। কিন্তু জিতের থেকেও চিন্তাভাবনা বেশি তার মালিকের। থোক থোক টাকা দিচ্ছে, খবর নিচ্ছে। বাচ্চুর দিকেও কড়া দৃষ্টি, তার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা। একমাত্র মিষ্টির সঙ্গেই যেন শুধু ভোগ-দখলের সম্পর্ক ষোল আনা ছেড়ে আঠের আনা।

খুব সুবিচার করছে না ঠাণ্ডা মাথায় মিষ্টি নিজেই বোঝে। এই সম্পর্কে ভোগ-দখলের থেকে সমর্পণ ঢের বেশি। আসলে রাগ হয় অন্য কারণে। নিজের দুশ্চিন্তা সম্পর্কে এই লোককে সেধে সজাগ করতেও সংকোচ। কিন্তু এত যার বুদ্ধি-বিবেচনা আর সবেতে এমন প্রখর দৃষ্টি, এতদিনে এ-ব্যাপারেও তো তার নিজে থেকেই সচেতন হওয়ার কথা। হলে মিষ্টির পক্ষেও সংকোচ ঝেড়ে সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়ানো সহজ হত। ও এখনো একেবারে হাল ছেড়ে বসে নেই! এরকম কেস নিয়ে বিদেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে শুনেছে। দরকার হলে তাদেরও বাইরে চলে যাওয়া তো জলভাত ব্যাপার। কিন্তু এ-ব্যাপারে ওই মানুষের এতটুকু হুঁশ নেই দেখেই মিষ্টির কখনো রাগ, কখনো অভিমান।

এই মানসিক অবস্থার মধ্যে হঠাৎ বড় রকমের ধাক্কা খেল একটা। দিন কয়েক আগে মিষ্টির কাছে ঊর্মিলার চিঠি এসেছে। তার শরীরটা খুব ভালো যাচ্ছে না লিখেছে। খুব অস্পষ্ট একটু ইঙ্গিতও আছে চিঠিতে যা পড়ে শুধু মেয়েরাই সন্দিগ্ধ হতে পারে। মিষ্টি সেটা ধরিয়ে দিতে খুশি মুখে বাপী পারলে তক্ষুনি তাকে পাল্টা চিঠি লিখতে বসিয়ে দেয়। তাগিদ সত্ত্বেও তিন দিনের মধ্যে লেখা হয়ে ওঠেনি। বিকেলে বাইরের ঘরে বসে বাচ্চু কাকুর কাছে তাদের স্কুলের খেলার গল্প ফেঁদে বসেছে। মিষ্টিও শুনছিল। আর এক-ফাঁকে উঠে গিয়ে চট করে চিঠিটা লিখে ফেলবে কিনা ভাবছিল। ওদিকে মনে পড়লেই বকুনি খেতে হবে।

কলিং বেল বেজে উঠল।

দরজা দুটো ভেজানো ছিল। বাপী সাড়া দিল, কাম ইন!

দরজা ঠেলে ঘরে পা ফেলল সন্তু চৌধুরী। পরনে দামী ট্রাউজারের ওপর সিল্কের শার্ট, কব্জিতে সোনার ব্যাণ্ডের ঘড়ি, দু-হাতের আঙুলে জেল্লা ঠিকরনো আংটি। লম্বা ফর্সা বলিষ্ঠ অপরিচিত মানুষকে খবর না দিয়ে সরাসরি দোতলায় উঠে আসতে দেখে মিষ্টি বাপীর দিকে তাকালো। প্রসন্ন মনে হল না তাকে।

সন্তু চৌধুরীর পিছনে আরো কেউ আছে কিনা বাপী ঝুঁকে দেখে নিল। তারপর নীরস স্বরে বলল, সন্তুদা যে...

ঘুরে বাচ্চুকে বলল, ভিতরে যা।

ছেলেটার দিকে চোখ পড়তেই মিষ্টি বুঝে নিল কে হতে পারে। বাচ্চু উঠে চলে গেল। কি করবে ভেবে না পেয়ে মিষ্টিও উঠে দাঁড়াল।

বাচ্চুকে এখানে দেখেই সন্তু চৌধুরীর ফর্সামুখ রাগে লাল। ওকে ভিতরে চলে যেতে বলা হল তাও কানে গেছে। সপ্রতিভ গাম্ভীর্যে এগিয়ে এলো। মিষ্টির মুখের ওপর। কপালে সিঁথিতে সিন্দুর আরো ঘরোয়া বেশবাস দেখে কে হতে পারে আঁচ করেছে। আর বাপীর মনে হল সেদিনের হা-ঘরে ছেলের এই বরাত দেখেও লোকটার বুক চড়চড় করছে। চোখ তুলে আলতো করে একবার তাকাতে মিষ্টি বুঝে নিল, ভব্যতার দায় কিছু নেই, সে-ও ভিতরে যেতে পারে।

ঘরের দিকে পা বাড়াতে পিছন থেকে বেশ অবাক সুরের প্রশ্ন কানে এলো, সঙ্গে সঙ্গে সরস জবাবও।

—তোমার মিসেস নাকি?

—একেবারে নির্ভেজাল।

মিষ্টি আড়ালে চলে গেল বটে, কিন্তু দূরে নয়। যে এলো তার থেকে ঘরের লোকের হাবভাব দেখে ওর বেশি দুশ্চিন্তা।

বাপী বলল, বোসো, হঠাৎ কি মনে করে?...

—হঠাৎ নয়, বিলেত থেকে ফিরে তোমার অনেক খোঁজ করেছিলাম। ফ্ল্যাট ছেড়ে বাড়ি করেছ কি করে জানব। ফোন গাইডেও তোমার নিজের নাম নেই। দিন কয়েক আগে খবরের কাগজে হঠাৎ হার্ব-ডিলার রাই অ্যাণ্ড তরফদারের বিজ্ঞাপনে টেলিফোন নম্বর দেখে তোমার বউদি অনেকটা আন্দাজেই ফোন করেছিল। তোমার অফিস থেকে খবর পেল তুমি এ-বাড়িরই দোতলায় থাকো।

খুব ঠাণ্ডা গলায় বাপী জিজ্ঞাসা করল, আমাকে এত খোঁজাখুঁজির কারণ কি?

চাপা ঝাঁঝে সন্তু চৌধুরী জবাব দিল, বাচ্চু তোমার ঘাড়ে পড়ে আছে সেই সন্দেহ আমাদের হয়েছিল। দু বছরের ওপর নিজের ছেলের একটা খবর পর্যন্ত না পেলে মায়ের মন কেমন হয় সেটা ওই রাসকেল বুঝতে না পারুক, তোমার বোঝার কথা।

...কার কথা বলছ, মণিদার?

সন্তু চৌধুরী জবাব দিল না। ঝাঁঝালো মুখ।

বাপী আরো শান্ত।—যা বললে, দ্বিতীয়বার উচ্চারণ কোরো না, ওই ভদ্রলোক আমার দাদা।

সন্তু চৌধুরীর ছোট চোখজোড়া খাপ্পা হয়ে উঠল।

একই সুরে বাপী আবার বলল, বাচ্চুকে কেউ আমার ঘাড়ে চাপায়নি, আমিই ওকে নিয়েছি।

রূঢ় স্বরে সন্তু চৌধুরী বলল, এখন আমরা যদি ওকে নিয়ে যেতে চাই?

—আমরা বলতে তুমি কে?

সন্তু চৌধুরী থমকালো একপ্রস্থ। মুখ আরো লাল।—ওর মা যদি নিতে চায়?

—ওর মা বলে কেউ আছে আমি ভাবি না। আর কিছু দিন গেলে বাচ্চুও ভাববে না।

দু চোখ ধক ধক করছে সন্তু চৌধুরীর। সেদিনের সেই করুণাপ্রার্থীর মত স্পর্ধা ভাবতে পারে না। চেঁচিয়ে উঠল, ধরাকে সরা দেখছ এখন তাহলে, মস্ত একজন হয়ে গেছ, কেমন? নিতে চাইলে তুমি ঠেকাতে পারবে?

—চেষ্টা করে দেখ। গলা চড়িও না, ছেলেটা শুনতে পাবে।

—চড়ালে তুমি কি করবে?

—গলাধাক্কা খাবে।

সন্তু চৌধুরী ছিটকে উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছাকাছি গিয়েও আবার ফিরল। দুচোখে গলগল করে তপ্ত বিষ ঝরছে।—অপমান মনে থাকবে, নিজের চরিত্র ভুলে এখন এতবড় সাধু হয়ে উঠেছ জানা ছিল না।

বাপী আস্তে আস্তে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মুখে একটি কথাও বলল না। আরো কিছু জানানোর জন্যে ধীরে সামনে এগলো।

মুহূর্তে বিপদ বুঝে সন্তু চৌধুরী এক ঝটকায় ঘর থেকে বেরিয়ে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

ওদিক থেকে মিষ্টি ছুটে এসে বাপীকে টেনে ফেরালো। দু কাঁধ ধরে জোর করে তাকে সোফায় বসিয়ে দিতে দিতে বলে উঠল, এ কি কাণ্ড—অ্যাঁ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি—বোসো বলছি। সত্যি তুমি ভদ্রলোককে মারতে যাচ্ছিলে?

—ও ভদ্রলোক নয়।

—খুব হয়েছে। ঠাণ্ডা হয়ে বোসো এখন।

—বাচ্চু কি করছে?

—ওর ঘরে কাঠ হয়ে বসে আছে।

বাপী বলল, ঠিক আছে, তুমি ওর কাছে যাও।

সোফায় হাত রেখে মিষ্টি দাঁড়িয়ে রইল একটু। পুরুষের এত সংযত অথচ এমন ভয়-ধরানো মূর্তি আর দেখেছে? এদিক-ওদিক দেখে নিল। তারপর চট করে দু-হাতে বাপীর মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়েই দ্রুত ভিতরে চলে গেল।

দুদিন বাদে বিকেলের দিকে মিষ্টি নিউ মার্কেট থেকে ফিরল। যখন বেরোয় বাপী বাড়ি ছিল না। মিষ্টি ফেরার আগে ফিরেছে। বাইরের ঘরে বসেছিল। বলাই তাকে বলেছে দিদিমণি গাড়ি নিয়ে মার্কেটে গেছে। কিন্তু ফিরল খালি হাতে বাপী খেয়াল করল না। ও কাছে আসতে খুশি মুখে বলল, জিতের এবারও ছেলেই হয়েছে—মেয়ের ইচ্ছে ছিল খুব।

কিছু না বলে মিষ্টি চুপচাপ ঘরে চলে যাচ্ছিল। বাপীর তখুনি আবার মনে পড়ল কি। ডাকল, শোনো! ঊর্মিলার চিঠির জবাব দেওয়া হয়েছিল তো?

মিষ্টি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। থমথমে মুখ। চোখে চোখ।—না।

—কেন? সঙ্গে সঙ্গে বিরক্ত।

—আমার সময় হয়নি, হবেও না। তুমি নিজে লেখো।

চলে গেল।

বাপী ভেবাচাকা খেয়ে গেল প্রথম। কি হতে পারে ভেবে নিল। ওর নিজের মনে চাপা দুঃখ থাকতেই পারে, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু তা বলে এমন থমথমে মুখ

দেখবে বা এমন কথা শুনবে ভাবা যায় না। বাপীর মনে মিষ্টির জায়গা ঈর্ষার অনেক ওপরে। অন্যের আনন্দে খুশি না হতে পারাটা ঈর্ষা ছাড়া আর কি? বাপীরও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আশা করল, একটু ঠাণ্ডা হবার পর নিজেই লজ্জা পাবে। ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যে উঠে সে-ও হাসিমুখেই ঘরে এলো।

মিষ্টি চুপচাপ খাটে বসে আছে। তেমনি থমথমে মুখ।

—কি ব্যাপার?

ভাবাবে মিষ্টি অপলক চেয়ে রইল।

বাপীর খটকা লাগল একটু। মনে হল, দু চোখে তার ভেতর দেখছে।

—এই মূর্তি কেন?

এবারে জবাব দিল। ফিরে জিজ্ঞাসা করল, বলব? তোমার আমার মধ্যে লুকোচুরির কিছু থাকতে পারে না. তবু বললে ঠাণ্ডা মাথায় বরদাস্ত করতে পারবে?

যে গোপনীয় ব্যাপারটা এত দিন ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল সেটাই কবুল করবে ধরে নিয়ে হাসি চেপে বাপীরও নিজের মুখখানা সীরিয়াস করে তোলার চেষ্টা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে বসার কুশনটা টেনে নিয়ে ওর দুই হাঁটুতে প্রায় হাঁটু ঠেকিয়ে মুখোমুখি বসল।—পারব। মিষ্টির সবই আমার কাছে মিষ্টি। বলে ফেলো।

উঠে সামনের দরজা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে মিষ্টি আবার জায়গায় ফিরে এলো।—তোমার গৌরী বউদির সেই ভদ্রলোক একটু আগে আমার ওপর দিয়ে তার সেদিনের অপমানের শোধ নিল। সেই মহিলাও পাশে ছিল।

বাপীর সত্তাসুদ্ধ আচমকা ঝাঁকুনি খেল একপ্রস্থ। তপ্ত রক্তকণার ছোটাছুটি। জায়গায় ফিরে স্থির হতে সময় লাগল।—কি অপমান করেছে?

মিষ্টির দু চোখ তার চোখে বিঁধে আছে।—মার্কেটে মুখোমুখি দেখা হয়ে যেতে খুব খুশিব বিনয়ে তোমার বউদির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। সম্মান দেখিয়ে আমার সঙ্গে আপনি আপনি করে কথা বলল। তুমি কত বড় একজন হয়েছ দুবার করে শোনালো। তারপর আমাকে কংগ্র্যাচুলেট করে বলল. এমন মস্ত মানুষের ঘরে আমাকে আশা করেনি. অন্য একজনকে দেখবে ভেবেছিল।

—কেন? বাপীর দুই চোয়াল শক্ত।

—গাড়িতে আর একজনের অবাঙালী সুন্দরী বউকে পাশে বসিয়ে তোমাকে আনন্দে হাওয়া খেয়ে বেড়াতে দেখেছে। শুধু সে নয়, তোমার বউদিও দেখেছে। গাড়িতে সেই মেয়েকে বসিয়ে রেখে তুমি নাকি নেমে এসে তাদের সঙ্গে কথাও বলেছ। তুমি তাদের বলেছ, নিজের বউ নয়. অন্যের বউ। তাই আমার বদলে তাকে এখানে দেখবে আশা করেছিল।

বাপীর তখুনি মনে পড়ল। অল্প অল্প মাথা নেড়ে বলল. একদিন দেখেছে—ঠিকই দেখেছে।—তাহলে একথা শুনেই তোমার সব বিশ্বাস ধ্বসে গেছে?

মিষ্টি চেয়ে আছে। নিরুত্তর।

—সেই আর একজনের সুন্দরী বউকে তুমিও দেখেছ। তার নাম ঊর্মিলা। গাড়িতে পাশে সে ছিল। সেই একই দিনের কথা—তোমার অফিস থেকে তাকে নিয়ে ফেরার পথে পার্ক স্ট্রীটের রাস্তায় তাদের সঙ্গে দেখা।

মিষ্টি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা সুরে বলল, সেদিনের কথা জানতাম না, তবে আমারও ঊর্মিলা বলেই মনে হয়েছিল।

—তাহলে? সে আর কি অপমান করেছে তোমাকে?

মিষ্টি চেয়ে রইল একটু।—শুনলে তোমার মাথা খুব ঠাণ্ডা থাকবে মনে হয় না।

—আমার মাথা সম্পর্কে তোমারও খুব ধারণা নেই। বলো।

—প্রথমবার কলকাতায় এসে তুমি কয়েকমাস বাচ্চুর বাবা-মায়ের আশ্রয়ে ছিলে নিজেই বলেছিলে। আজ শুনলাম বয়সে অত বড় বউদির দিকে তোমার চোখ গেছল বলেই সেখান থেকে তোমাকে তাড়ানো হয়েছিল। সত্যি কিনা তোমার বউদিকেই জিজ্ঞাসা করতে বলল। আমি জিজ্ঞেস করিনি। তোমার বউদি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল।

এ-ই শুনবে বাপী জানত। কুশন ঠেলে ঘরের মধ্যে একবার পায়চারি করে আবার মিষ্টির সামনে এসে দাঁড়াল।—আমার ভিতরের জানোয়ারকে তুমি ছেলেবেলায় দেখেছ। পরেও তার চোখ অনেকবার অনেক দিকে গেছে। কিন্তু বাপী তরফদার তোমাকে ছাড়া আর কাউকে চায়নি বলে চাবুক খেয়ে ওটাকে চোখ ফেরাতে হয়েছে। বাচ্চুর মা কোথায় কোন্ বাড়িতে থাকে জানে কিনা ওকে জিগ্যেস করে এসো!

আগের কথায় ধাক্কা খেয়েছিল। এবারে মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি প্রমাদ গুনল।—জেনে কি হবে, তুমি সেখানে যাবে?

—না গেলে সন্তু চৌধুরী যা বলেছে তার কতটা সত্যি তুমি জানবে কি করে?

উঠে দু-হাত ধরে মিষ্টি তাকে বিছানায় বসাতে চেষ্টা করল। আর কিচ্ছু জেনে কাজ নেই—অপমানে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছল।

তখনকার মতো বাপী ঠাণ্ডা হল বটে, কিন্তু তার পর থেকে সমস্তক্ষণ গুম হয়ে থাকল। সন্ধ্যা পর্যন্ত এ-ঘর ও-ঘর করল। মিষ্টিকে সামনে দেখলে দাঁড়াচ্ছে। দেখছে। আবার অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। একটু বাদে একটা বই খুলে বসল। কি বই মিষ্টি জানে। আরো দুই-একদিন এ-বইটার পাতা ওল্টাতে দেখা গেছে। নেপোলিয়ন হিল-এর থিংক অ্যাণ্ড্ গ্রো রিচ। রিচ অর্থাৎ বড়লোক হওয়ার রাস্তা দেখানো হয়েছে ভেবে কৌতূহল হয়ে মিষ্টিও বইটা উল্টেপাল্টে দেখেছিল। আগাগোড়া মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার দেখে পড়ার উৎসাহ হয়নি।

রাতে চুপচাপ।

মিষ্টির এতক্ষণের চাপা অস্বস্তি এবারে বুকে চেপে বসল।—যেমন মা-ই হোক, ছেলের জন্য কাতর হওয়া স্বাভাবিক। বাচ্চুর মা-ও অনেক কষ্টে ছেলের হদিস পেয়েছে। সেই সঙ্গে ওই ছেলের এখন একমাত্র আশ্রয় কে বা কারা তাও জেনেছে। তবু ছেলের মুখ চেয়েও মহিলা ওই লোকটার অমন কুৎসিত কথাগুলোর প্রতিবাদ করল না কেন? সত্যের ছিটেফোঁটাও না থাকলে ওভাবে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারল কি করে?

এর জবাব পরদিন পেল। স্কুল থেকে ফিরে জলখাবার খেয়ে বাচ্চু তার ঘরে গেছে, মিষ্টি ডাইনিং টেবিলে বসে। বাপী নিচের অফিস ঘরে। উঠে এলে একসঙ্গে চা খাবে।

সময় ধরেই উঠে এলো। একলা নয়, তার পিছনে আরো একজন।

—মিষ্টি, গৌরী বউদি, তোমার কাছে এসেছেন।

মিষ্টি নির্বাক কয়েক মুহূর্ত। সহজাত সৌজন্যে উঠে দাঁড়ানোর কথা। পারা গেল না। অস্ফুট স্বরে বলল, বসুন।

বসল। বেশ সহজ সুরে বলল, বেশি বসার সময় নেই ভাই। বাপীর দিকে ফিরল। চোখে একটু হাসির আভাস।—বউয়ের নাম মিষ্টি তুমি রেখেছ না ও-ই নাম?

বাপীও হাল্কা জবাব দিল, আমার কোনো কেরামতি নেই।

গৌরী বউদি মুখে আর নামের সঙ্গে চেহারার মিলের প্রশংসা করল না। তাড়ার মধ্যে কিছু দরকারী কাজ সেরে যাওয়ার মতো করে বলল, তোমার কাছেই একবার এলাম ভাই...

মহিলার রীতি জানা নেই মিষ্টির। গ্লানি বা পরিতাপ-কাতর মুখ দেখছে না।—

কাল যা শুনে এসেছি তা সত্যি নয় জানাতে? গলার স্বর সংযত হলেও সদয় নয় খুব।

গৌরী বউদি তক্ষুনি জবাব দিল, হ্যাঁ। সব মিথ্যে।

—কিন্তু কাল তো একটি কথাও বললেন না?

গৌরী বউদি চুপচাপ চেয়ে রইল একটু। জবাব দিল, কেন বললাম না, না বুঝে থাকলে বাপীকে জিগ্যেস কোরো।

প্রায় আধ মিনিট কারো মুখে আর কথা নেই। গৌরী বউদি চেয়ার ছেড়ে উঠল। বাপীকে বলল, তোমার বউভাগ্য ভালো, এর থেকে ঢের বেশি রাগ দেখব ভেবেছিলাম। চলি—

বাপী পলকে ভেবে নিল কি। গলা চড়িয়ে ডাকল, বাচ্চু—!

বাচ্চু এলো। তারপরেই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কে এসেছে জানত না।

গৌরী বউদি ওর আপাদমস্তক দেখে নিল একবার। সহজ সুরেই জিজ্ঞাসা করল, কি রে কেমন আছিস?

গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না ছেলেটার। সামান্য মাথা নাড়ল। ভালো আছে।

গৌরী বউদি চুপচাপ দেখল আর একটু। বলল, সব সময় কাকা কাকিমার কথা শুনে চলবি।...

দরজার দিকে পা বাড়ালো। বাপী এগিয়ে এলো।

নীচে গৌরী বউদির ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল। তাকে তুলে দিয়ে বাপী দু-মিনিটের মধ্যে ফিরে এলো। বাচ্চু ঘরে চলে গেছে। বলাই তক্ষুনি চায়ের পট আর পেয়ালা সাজানো ট্রে রেখে গেল।

বাপী চেয়ার টেনে মিষ্টির মুখোমুখি বসল। চা ঢেলে মিষ্টি একটা পেয়ালা তার দিকে এগিয়ে দিল।

বাপী বলল, গৌরী বউদিকে এক পেয়ালা চা খেয়ে যেতে বললে পারতে।

নিজের পেয়ালা মুখের দিকে তুলতে গিয়ে মিষ্টি থমকে তাকালো। চেয়েই রইল একটু। বলল, কি জানি, আমি জানতাম বাচ্চুকে তুমি ওই মায়ের ছায়াও মাড়াতে দিতে চাও না, তাছাড়া সেদিন আর একটা লোককে তুমি গলাধাক্কা দিতে গেছলে দেখে আজ আরো এই ভুলটা হয়ে গেল।

প্রচ্ছন্ন শ্লেষটুকু বাপী চুপচাপ হজম করে গেল। ভিতরে একটু অসহিষ্ণুতার তাপ ছড়িয়ে আছে। কেন, নিজেও জানে না। মনের অনুভূতিগুলো সব সময় যুক্তির পথে চলে না। তাই কেউ বুঝতেও পারে না। যেমন এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে সমস্ত অতীত মুছে দিয়ে এই গৌরী বউদিকে যদি মণিদার কাছে আর তাদের ছেলের কাছে ফিরিয়ে এনে দিতে পারত—দিত। তা হবার নয় বলেই ক্ষোভ হয়ত। কিন্তু মিষ্টি এই ক্ষোভের কি অর্থ খুঁজে পাবে?

একটু বাদে মিষ্টিই আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, অপবাদ দিয়ে তোমাকে তোমার দাদার বাড়ি থেকে তাড়ানোর কথাটাও মিথ্যে তাহলে?

পেয়ালা সামনে রেখে বাপী সোজা হয়ে বসল। সোজা তাকালো। দুজনের মধ্যে কোনো গোপনতা থাকবে না বলেছিল। এই গোপনতার সবটুকু ছিঁড়েখুঁড়ে দিলে কি হয় দেখার তাড়না। জবাব দিল, খুব সত্যি।

মিষ্টি থতমত খেল। অপবাদ সত্যি হলেও এই মুখ দেখবে ভাবেনি। আরো শোনার প্রতীক্ষায় চেয়ে রইল।

চোখে চোখ রেখে ঠাণ্ডা গলায় বাপী বলল, কাল আমার ভেতরের যে জানোয়ারটার কথা তোমাকে বলেছিলাম, কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও গৌরী বউদি সেটাকে ঠিক

দেখেছিল। দেখে প্রশ্রয় দিতে চেয়েছিল। তার আগে জানোয়ারের টুঁটি টিপে ধরে বাপী তরফদার ছিটকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল বলেই ও-বাড়িতে আর ঠাঁই হয়নি।

নিখাদ সত্যের আলোয় এসে দাঁড়ানোর ফল দেখল বাপী। মিষ্টির চোখে প্রথমে অবিশ্বাস, তারপর সমস্ত মুখ লাল। পাহাড়ের বাংলোয় রেশমার কথা শুনে বুক ভরে গেছল. আজকের অনুভূতিটা তার বিপরীত ধাক্কার মতো। চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে চুপচাপ উঠে চলে গেল।

কিন্তু বাপীর হাল্কা লাগছে। এই সত্যের স্বাদটুকু বিচিত্র লাগছে।

॥ একুশ ॥

এই সকালের একটা সামান্য ব্যাপার মনে পড়ল বাপীর। গাড়ি চালাচ্ছিল। তখন ঝমঝম বৃষ্টি। জোর বাতাস। সামনের কাঁচের ওধারে ওয়াইপারটা উঠছে নামছে। তা সত্ত্বেও কাচটা থেকে থেকে ঝাপসা ধূসর হয়ে যাচ্ছিল। ফলে সামনের সবও ঝাপসা। বাপী এক-একবার হাত দিয়ে হিমাভ কাঁচের খানিকটা ঘষে দিচ্ছিল। তক্ষুনি শুধু ওইটুকু জায়গায় ভিতর দিয়ে সামনের যা-কিছু সব তকতকে পারিষ্কার।

সেই গোছেরই কিছু হয়ে গেল। ভিতরের কোনো খুব আবছা আর্দ্র জায়গায় হঠাৎ ঘষা পড়েছে। তার ওধারে ঝকঝকে তকতকে কারো অস্তিত্বের ঝিলিক। দুচোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো ছটা তার। কয়েক পলকের জন্য বাপীর মনে হল শক্ত হাতে জীবনের সব ঝড়-জল-জঞ্জাল ঘষে-মুছে দিতে পারলে তবেই সেখানে পৌঁছনো সম্ভব।

মিষ্টি বেশ একটা ধাক্কা খেয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। এ-জন্যে বাপীর একটুকু উদ্বেগ নেই। মিষ্টির ঠাণ্ডা মাথায় প্রতিক্রিয়া অন্য রকম হবার কথা। তাকে রেশমার কথা বলা হয়েছে। ঊর্মিলার কথা বলা হয়েছে। গৌরী বউদির কথাও বলল। সব বলার পিছনেই গোপনতার সুড়ঙ্গ-পথ থেকে আলোয় আসার তাগিদ বাপীর। মিষ্টির সামনে কোনো মিথ্যের মুখোশ পরে থাকাটা যন্ত্রণার মতো।

ঠাণ্ডা মাথায় মিষ্টি সত্যি ভেবেছে। ভেবে হাল্কা হতে পেরেছে।...ওই লোকের প্রবৃত্তি ছকে বাঁধা হিসেবের শাসন জানে না, আবার নিজেই নিজেকে টেনে তোলে। এই জোর না থাকলে অমন বিচ্ছিরি সত্যি কথাও মুখের ওপর বলে দিত না। ও কিছু জানতেও পারত না।...আর সত্যি কথাই বা কতটা সত্যি? তার থেকে মনের তলায় জমা পরিতাপটুকুই হয়তো বেশি সত্যি। কারণ, এত দিনের মধ্যে মিষ্টি কি কোনো জানোয়ারের অস্তিত্ব টের পেয়েছে? পুরুষের দুরন্ত ভোগ হয়তো দেখেছে। ভেসে যাওয়া দেখেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়াও দেখেছে। অনুভব করেছে। জানোয়ার স্বার্থপর। একলা ভোগী। জানোয়ার তার দোসরের মন নিয়ে মাথা ঘামায় না।

মিষ্টির মেজাজ উল্টে এত ভালো হয়ে গেছে যে রাতের প্রগলভ শয্যায় এই ভাবনার আভাসটুকুই দিয়েই ফেলেছে। খুশিতে বুক বোঝাই বাপীর। কিন্তু আকাশ থেকে পড়া মুখ।—সে কি! আমার মধ্যে তুমি জানোয়ার দেখোনি?

মিষ্টি অনায়াসে মাথা নেড়েছে। দেখে নি।

—তোমার দশ বছর বয়সে বানারজুলির সেই জঙ্গলেও না? যার জন্য আজও আমার পিঠে এই দাগ।

তার পিঠের তলায় একটা হাত গুঁজে দিয়ে সেই দাগে আঙুল ঘষতে ঘষতে মিষ্টি জবাব দিয়েছে, জঙ্গলের জীব-জন্তুদের ভালবাসা-বাসি দেখে দেখে তখন তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছল।

কিন্তু দিনের আলোয় মিষ্টির কাছে আসার রীতি এখন একটু অন্যরকম। এই থেকে কি ধরনের দুশ্চিন্তা ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে বাপী আঁচ করতে পারে। সময় সময় কৌতুকও বোধ করে। দামাল ছেলের ঝড়ের মুখে বুক পেতে দেবার স্বভাব হলে তাকে আগলে রাখতেই হয়। বেপরোয়ার মতো জ্বলন্ত আগুনে হাত বাড়ানোর স্বভাব হলে সে-হাত টেনে ধরতেই হয়। মিষ্টির এখন এই গোছের দায়। নিজের সহজ অথচ অনমনীয় ব্যক্তিত্বের ওপর আস্থা খুব। সেটা বড় করে তুলে এমন দুরূহ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা।

হিসেবের বাইরে অজস্র টাকা আসাটা ও কখনো ঝড় ভাবে, কখনো জ্বলন্ত আগুন ভাবে।

পরের পাঁচ-ছ'মাসের মধ্যে বাপী কাজ উপলক্ষে আরো দু'বার বানারজুলি গেছে। সঙ্গে মিষ্টিও গেছে। আবু রব্বানীও বারকতক কলকাতায় এসেছে। মিষ্টির চোখ-কান খোলা। বুদ্ধিও রাখে। টের না পাবার কারণ নেই। আরো কিছু গোপন ব্যবসার খবর তার জানা হয়ে গেছে। বানারজুলিতে মদের কারবার আর কলকাতায় মদ চোরাই-চালানের খবর। আর কলকাতায়ও বনজ নেশার জিনিসের বাড়তি চালান আসছে এখন, তাও বুঝেছে। বুঝবে না কেন। গোপন টাকা আমদানির পরিমাণ তার কাছে তো আর গোপন নেই। ,আবু রব্বানীকে মিষ্টি জেরার মুখে ফেলেছিল। সে মাথা চুলকে পালিয়ে বেঁচেছে। দোস্ত্‌কেও সতর্ক করেছে।

সেবারে বানারজুলি থেকে ফিরেই মিষ্টির সাফ কথা!—এসব চলবে না।

বাপী অজ্ঞতার ভান করছে।—কি চলবে না?

—মদের চোরাই কারবার আর চোরাই-চালান। আর ওষুধের নামে নেশা যোগানো—

গুরুদায়িত্ব পালনের মুখখানা দেখে বাপীর মজা লাগছিল। মুখে নিরীহ বিস্ময়। —মদের কারবারে আমাকে পেলে কোথায়—ওসব তো আবু আর জিতের ব্যাপার।

—কার ব্যাপার আমি খুব ভালো করে জানি। বন্ধ করতে না পারো তোমার ক্যাপি-ট্যাল তুমি তুলে নাও।

--ও-বাব্বা! এও জেনে ফেলেছ?

আমি ঠাট্টা করছি না। আমার খুব খারাপ লাগছে। আর ওষুধের নামে সব জায়গায় যা চলছে তাও বন্ধ করতে হবে।

আরো একটু উসকে দেবার লোভে বাপী বলল, তুমি চাইলেও লোকে নেশা বন্ধ করবে না। আমি বন্ধ করলে তক্ষুনি আর কেউ এসে শুরু করবে।

—যে করে করবে, তুমি করবে না। তুমি নিজেই বলেছি , যা করেছ সব আমার জন্যে করেছ—আমি বলছি আর দরকার নেই।

বাপী হাসছে মিটিমিটি।—সেই কশাইয়ের গল্প শুনেছ—যে সকাল-বিকেল মাংস কাটত অথচ তার কাছেই যোগীরা যোগের পাঠ নিতে যেত?

—শুনেছি। মাংস কাটা কশাইয়ের কাজ ছিল। তাতে চুরি ছিল না। আমি চুরি চাই না। সাদা ব্যবসা করো।

ভিতরে ভিতরে বাপীর এই প্রথম নাড়াচাড়া পড়ল একপ্রস্থ। এতক্ষণের মজার বিপরীত টান ধরল চেয়ে রইল খানিক।—আমার মধ্যে তুমি তাহলে মস্ত একটা চোর দেখছ...চোর ভালো করার জন্য ক্ষেপে উঠেছ?

মিষ্টি থমকালো।—সোজা কথাকে অমন বেঁকিয়ে দেখো না।

—আমি সব সোজা দেখি। ডান হাতের বুড়ো আঙুল বার দুই নিজের বুকে ঠেকিয়ে বলল, ভেতরে দেখার চোখ থাকলে তুমি এখানে সব সোজা দেখতে. সব সাদা দেখতে।

ক্ষুব্ধস্বরে মিষ্টি জানান দিল, ওখানকার কথা বলছি না. আমি তোমার ব্যবসার কথা

বলছি!

ব্যবসাও আমিই! এবারে তুমি বলো, যে করেই হোক, আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার বদলে তোমাদের সাদা রাস্তার কোনো চালাঘরের বাপীকে দেখলে তোমার বাবা মা দাদা ফিরে চাইত, না তুমি আমাকে বুঝতে আসতে?

মিষ্টিও তেতে উঠছে।—তোমার ক্ষমতা কে অস্বীকার করছে, কিন্তু আর কেন?

—আর নয় কেন? কালো রাস্তায় যা এসে গেছে তাই ঢের ভাবছ? না থামলে সব খোয়াবার ভয়?

ব্যক্তিত্বের ঠোকাঠুকির ফলে এই লোককে একেবারে জল করে দেবার সুযোগ ফসকালো মিষ্টি। এ-কথার জবাবে তার অশান্তিটা সত্যিকারের কেন সেটা খোলাখুলি বলতে পারত। বলতে পারত, আমার সাদা কালো নিয়ে ভয় নয়, ঐশ্বর্য কমা-বাড়া নিয়েও ভয় নয়—আমার ভয় শুধু তোমার জন্য, তোমার কখন বিপদ হয় সেই জন্য। তুমি যদি বিপদ আপদ এত তুচ্ছ না করতে, তাহলে আমারও তোমাকে নিয়ে অত ভয় থাকত না।

কিন্তু তার বদলে অপমানে মুখ লাল হয়েছে।—তুমি তাহলে আমাকে এত ছোট এত নীচ ভাবো?

—আমি মোটেই তা ভাবি না। আমি শুধু বলতে চাই আমার সম্পর্কে তোমার ভাবনা বা ধারণায় কিছু ভুল হচ্ছে। আমি অসিত চ্যাটার্জি না, আমাকে তুমি তার মতো করে চালাতে চেষ্টা করলে আরো ভুল হবে, আরো অসুবিধে হবে।

বাপী ঘর ছেড়ে চলে এলো। একটা বই টেনে নিয়ে বসল। এখন বই বলতে নিজের নিভৃতে চোখ যায় এমন কিছু বই। এ-ধরনের বইয়ের প্রতি আকর্ষণ বেড়েই চলেছে কেন নিজেই জানে না। পড়তে পাঁচ মিনিটও ভালো লাগল না। ঘাড়ের পিছনটা ব্যথা-ব্যথা করছে, শক্ত লাগছে। মনে হয় বাষ্পের মতো কিছু জমাট বাঁধছে ওখানে। ইদানীং মাঝে মাঝে এ-রকম হচ্ছে। এই মুহূর্তে নিজের ওপরেই সব থেকে বেশি অসহিষ্ণু। মিষ্টিকে এমন সব কথা বলে এলো কেন? বিয়ের এই আড়াই বছর পরেও মিষ্টি তো তেমনি মিষ্টি। ও যা বলেছে বা ভেবেছে শতেকে একশ জনই তো তাই বলবে, তাই ভাববে। জঙ্গলের রাজ্যে নীতির হিসেব কম। এগারো বছর ধরে বাপী না হয় তাইতেই অভ্যস্ত হয়েছে। কিন্তু অন্য কেউ অভ্যস্ত না হলে তার এরকম আঁতে ঘা পড়ে কন? আরো খারাপ লাগছে, ধৈর্য খুইয়ে অসিত চ্যাটার্জিকে এর মধ্যে টেনে আনল বলে। জীবনের সব থেকে বড় যে ভুলটা মিষ্টি মেনেই নিয়েছে, ইতরের মতো সেখানেই ঘা বসিয়ে এলো। এক আগে নিজের মুখে যে সাদা মনের বড়াই করে এলো বাপী, সত্যি ওটা কতটুকু সাদা?

ছটফটানি বাড়তে থাকল। উঠে বাথরুমে গিয়ে ঘাড়ে মাথায় জল দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা পুরনো কথা মনে পড়ল। এয়ারপোর্টের চাকরির সময় মিষ্টি বারকয়েক করে ঘাড়ে মাথায় মুখে জল চাপড়াতো। প্রথম দিনে হোটেলে বসে ওমনি জল চাপড়ে এসে নিজেই বলেছিল কথাটা। কিন্তু এখন আর জল দেবার দরকার হয় না। তার মানে তখন অশান্তি ছিল, এখন নেই। কিন্তু বাপীর কি অশান্তি? এখন সেই জল ওর নিজের মাথায় চাপড়াতে হয় কেন?

চোখ মুখ মুছে আবার মিষ্টির কাছে এলো। মিষ্টি চুপচাপ বিছানায় বসে। বাপী সামনে এসে দাঁড়াল।

মিষ্টি চোখ তুলে তাকালো। জবাব দিল না।

মাথার পিছনটা বেজায় ভারি লাগছে। শক্ত ঘাড়টা বাপী বার দুই জোরে এ-কাঁধ থেকে ও-কাঁধ পর্যন্ত ফিরিয়ে সোজা করল।—আমার আজকাল কি একটা গণ্ডগোল

হচ্ছে, হঠাৎ-হঠাৎ রাগ হয়ে যায়, খানিক আগেও দেখেছ খুশি মনে ছিলাম...

মিষ্টি আলতো মন্তব্য করল, রাজা-বাদশারা শুনেছি ঢালা ফুর্তির সময়েও পান থেকে চুন খসলে হঠাৎ রেগে গিয়ে গর্দান নিয়ে ফেলত।

উপমাটা বেশ লাগল বাপীর! হেসে জবাব দিল, যা-ই বলো এখন আর রাগাতে পারবে না। রাজা-বাদশা ছেড়ে মাঝে মাঝে নিজেকে ভিখিরির মতো মনে হয়, আরো কত পাওয়ার ছিল—পাচ্ছি না। না, না, টাকা পয়সার কথা বলছি না, আমি কি রকম যেন থেমে যাচ্ছি।

কথাগুলো মিষ্টির দুর্বোধ্য লাগছে। বাপী বোঝাবে কি, যা বলল নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়।

আবার ঘাড় মাথা বার দুই সামনে পিছনে করল।

মিষ্টি চেয়েই ছিল। হঠাৎ কিছু ব্যতিক্রম চোখে পড়ল।—ওরকম করছ কেন?

—কি রকম যন্ত্রণা হচ্ছে...ঘাড়টাও সেই থেকে শক্ত হয়ে আছে। আজকাল মাঝে মাঝে এরকম হয়, তখন পাখার নিচে বসেও গরম লাগে। যাকগে, আমাকে তো চেনই, রাগ কোরো না।

মিষ্টি উঠে কাছে এসে দাঁড়াল।—চোখ অত লাল কেন?

বাপী আয়নার দিকে ফিরে টান করে নিজের দু'চোখ দেখে নিল। বলল, জলের ঝাপটা দিয়ে এলাম বলে বোধ হয়—

শুধু চোখ নয়, শ্যামবর্ণ মুখও কেমন লাগছে মনে হল মিষ্টির। হাত ধরে তাকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বলল, আমি একটুও রাগ করিনি, বোসো, আমি আসছি—

ঘর ছেড়ে চলে গেল। বাপীর এখন হালকা লাগছে একটু। গা ছেড়ে শুয়ে পড়ল। মিনিট চার-পাঁচের মধ্যে মিষ্টি ফিরল। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল, ফাঁক পেলে আজকাল তুমি ও-সব কি বই পড়ো বলো তো? আমি তো কিছু বুঝিই না—

বাপী হাসতে লাগল। জবাব দিল, বুঝতে চেষ্টা কোরো না, আমার মতো গোলক-ধাঁধার মধ্যে পড়ে যাবে। আমিও সব বুঝি না, অথচ নিজেকে যাচাই করার নেশায় পেয়ে বসে।

—কি যাচাই করার?

—নিজের ভিতরে কত সব অজানা অচেনা ভালো মন্দ হিংসে লোভ স্বার্থপরতার ব্যাপার নাকি আছে...যত বাজে ব্যাপার সব।

মিনিট পনেরোর মধ্যে জিত্ সোজা ভিতরে চলে এলো। সঙ্গে এক জন বয়স্ক ডাক্তার। জিতের হাতে তার মোটা ব্যাগ। বাপী অবাক। তক্ষুনি বুঝল, ফোনে জিত্‌কে মিষ্টি ডাক্তার নিয়ে আসতে হুকুম করেছে। ঘাড় মাথা ব্যথা আর চোখ লাল হবার কথাও নিশ্চয় বলেছে। কারণ কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করে ডাক্তার চোখের কোল টেনে ধরে দেখল, পালস্ দেখল। তারপর ব্যাগ খুলে ব্লাডপ্রেসার মাপার যন্ত্র বার করল।

দেখা হতে যন্ত্র গোটাতে গোটাতে ডাক্তার জানতে চাইল, বরাবরই তার হাই প্রেসার কিনা। বাপী জানালো প্রেসার এই প্রথম দেখা হচ্ছে।

মিষ্টি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, প্রেসার কত? রোগীর সামনে বলা ঠিক হবে না ভেবে ডাক্তার ইতস্তত করল একটু। মিষ্টির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, ওঁর বয়েস কত?

—বত্রিশ..—। মিষ্টিই জবাব দিল।

—তেত্রিশ। হালকা গলায় বাপী শুধরে দিল।—ছাব্বিশ সালের জানুয়ারিতে জন্ম, এটা আটান্নর আগস্ট।

আনুষঙ্গিক আরো কিছু পরীক্ষার পর ডাক্তার বাপীর পেশার খোঁজ নিয়ে উঠে দাঁড়াতে জিত্ তাকে বাইরের ঘরে এনে বসালো। মিষ্টিও এলো। ডাক্তারের কথা শুনে উতলা।

প্রেসার বেশ বেশি। ওপরেরটা একশ নব্বুই, নিচেরটা একশ। ব্যবসার টেনশনের দরুন এরকম হতে পারে। কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। আজকের মধ্যেই ই সি জি করানোর নির্দেশসহ ডাক্তার প্রেসক্রপশন আর ডায়েট চার্ট লিখে দিয়ে গেল। জিত্ তক্ষুনি ব্যবস্থা করতে ছুটল।

ঘরে ফিরেই মিষ্টি ফতোয়া দিল, এখন টানা রেস্ট, আর কোনো কথা নেই। ব্যবসার কাজকর্ম সব এখন বন্ধ—নো টেনশন।

বাপী হেসে জবাবে দিল, ব্যবসার আমি কি পরোয়া করি যে টেনশনের মধ্যে থাকব?

মিষ্টি চেয়ে রইল খানিক। পলকা ঠেসের সুরে মন্তব্য করল, ব্যবসা ছাড়াও সেই ছেলেবেলা থেকে এ পর্যন্ত তুমি টেনশনের মধ্যেই কাটিয়ে এসেছ।

বাপী হাসি মুখে সায় দিল, তা খানিকটা সত্যি বটে।

ই সি জি র রিপোর্ট মোটামুটি ভালো। কিন্তু মোটামুটি শুনে মিষ্টি একটুও খুশি নয়। হাই ব্লাডপ্রেসার থেকে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে বাপীর বাবার মারা যাবার ঘটনা অনেক আগেই শোনা ছিল। ফলে বেশ কিছুদিন মিষ্টির কড়া নজর আর কড়া শাসনের মধ্যে থাকতে হল বাপীকে।

ভালো লেগেছে। জীবনের আবার একটা নতুন স্বাদ পেয়েছে।

ঊর্মিলা মা হয়েছে। মেয়ের মা।

টেলিগ্রামে খবর এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টিও বিজয় মেহেরা আর ঊর্মিলার নামে গ্রিটিং টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছে। কিছুদিন আগে হলেও বাপী হাঁকডাক করে মিষ্টিকে খবরটা দিত। আর যদি বলত, চলো, এবারে আমরা গিয়ে ওদের একবার দেখে আসি—তাহলেও মিষ্টি অস্বাভাবিক কিছু ভাবত না। একবার ঘুরে যাবার জন্য ওরা কম ডাকাডাকি করছে না। কিন্তু বাপী কিছুই না বলে মিষ্টিকে ডেকে সুখবরের টেলি-গ্রামটা তার হাতে তুলে দিল।

বাপী ইজিচেয়ারে বসে তখন খবরের কাগজ পড়ছিল। হাতের কাছে সে-রকম পড়ার কিছু না থাকলে সকালের দু-তিনটে খবরের কাগজ নিয়ে দেড় দু'ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। রাজনীতি রাষ্ট্রনীতি বা হোমরাচোমরাদের নিয়ে কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। মানুষের খবর খুঁটিয়ে পড়ে। এমনি দুটো খবর মনে দাগ কেটে গেল। একটা বিদেশের ঘটনা। দুই শ্রমিক বন্ধু দশ আনা ছ'আনা ভাগে একখানা লটারির টিকিট কিনেছিল। সেই টিকিট প্রথম হয়েছে। আমাদের টাকার হিসেবে তিন লক্ষর ওপর প্রাপ্য তাদের। কিন্তু এক কপর্দকও ভোগে এলো না কারো। কারণ ছ'আনার গোঁ অর্ধেকের থেকে সে এক পয়সাও ছাড়বে না—টিকিটের গায়ে তো আর বখরার ভাগ লেখা নেই! ফলে ক্রোধে উন্মাদ দশআনার হাতে ছ'আনা খুন। দ্বিতীয় ঘটনা এই কলকাতার। এক মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিণী তার দুই মেয়ে আর ছোট্ট ছেলে সাজগোজ করে বাড়ির কর্তার সঙ্গে রাতের আনন্দ উৎসবের আমন্ত্রণে যোগ দেবার জন্য তৈরি। কর্তা গেল লণ্ড্রিতে তার ধোপ-দুরস্ত জামা-কাপড় আনতে। আর ফেরেনি। বাস চাপা পড়ে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই সব শেষ।

খবরের কাগজ কোলের ওপরে ফেলে ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে বাপী ভাবছিল, জীবনের তাহলে ব্যাপারখানা কি!

আধ ঘণ্টা বাদে মিষ্টি কাছে এসে বসল। বলল, একটা গ্রিটিং পাঠিয়ে দিয়ে এলাম।

মুখ না তুলে বাপী জবাব দিল, বেশ করেছ।

মিষ্টি চেয়ে রইল একটু। ব্লাডপ্রেসারের রকম-ফের হল কিনা বোঝার চেষ্টা। কিছুটা বুঝতে পারে। রক্তের চাপ সেই থেকে এখনো একটু বাড়তির দিকে, তবে স্থির, বেশি ওষুধ-টষুধ খাইয়ে ডাক্তার সেটা হুট করে টেনে নামাতে চায় না।

প্রেসার বেড়েছে মনে হল না। ফলে কৌতূহল বাড়লো। সাত মাস আগে ঊর্মিলার চিঠিতে শুধু সম্ভাবনার আভাস পেয়েই যে লোক খুশিতে আটখানা, তিন-চার দিনের মধ্যে সেই চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি বলে মিষ্টিকে বকুনি পর্যন্ত খেতে হয়েছে—আজ এমন সুখবরের পরে তার এই নির্লিপ্ত ভাব দেখে মিষ্টি প্রথমে অবাক, পরে সন্দিগ্ধ। তার কথা ভেবেই উচ্ছ্বাস চেপে আছে কিনা বোঝার চেষ্টা। তাও বোঝা গেল না।

—তোমার শরীর-টরীর খারাপ না তো?

বাপী সোজা হয়ে বসল।—না তো...কেন?

—এত বড় একটা খুশির খবর পেয়েও এমন চুপচাপ যে?

বাপী হাসল।—এত বড় মানে কত বড়?

—খুব বড় নয়?

—তা অবশ্য...। তবে বিয়ে-থা করে সংসারী হয়েছে যখন, ছেলেপুলে আসবে এ তো জানা কথাই।

নিজের অগোচরে মিষ্টির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। খানিক চুপ করে থেকে সংযত মোলায়েম সুরে জিগ্যেস করল, আমাদের কত দিন বিয়ে হয়েছে?

এবারে বাপী আত্মস্থ একটু। মনে মনে হিসেব করে জবাব দিল, দু' বছর আট মাস।..কেন?

—আমরা তাহলে এই জানা কথার বাইরে পড়ে আছি কেন?...ভেবেছ?

তার দিকে চেয়ে বাপী হাসছে অল্প অল্প।—ভেবে কি হবে। আমাদের ছেলেপুলে হবে না এ তো আমি তুমি ঘরে আসার অনেক আগেই একরকম জেনে বসে আছি।

অবিশ্বাস্য কাতর সুরে মিষ্টি বলে উঠল, তুমি জানতে?

বাপী সাদাসিধে ভাবেই মাথা নাড়ল।— তোমার প্রথমবারের গণ্ডগোলের ব্যাপারটা দীপুদার মুখে শুনেছিলাম...।

—কিন্তু একেবারে হবেই না দাদা তো জানত না!

—তোমার দাদা না জানলেও সব শুনে আমার তাই মনে হয়েছিল।

মিষ্টির ফর্সা মুখ তেতে উঠছে।—মনে হয়েছিল তাই তুমি নিশ্চিন্ত মনে বসে আছ? ভালো কাউকে দেখিয়ে চেষ্টাচরিত্র করার দরকার মনে করো নি?

হঠাৎ এরকম অভিযোগ কেন বাপী বুঝে উঠল না। বলল, চেষ্টা-চরিত্র যা করার তুমি নিজেই তো করেছ।..একজন ছেড়ে মায়ের সঙ্গে একে একে তিনজন এক্সপার্টের সঙ্গে কনসাল্ট করেছ—এরপর আমার আর কি করার থাকতে পারে?

—ও..' অস্ফুট স্বরে মিষ্টি বলল, তুমি এ-ও জেনে বসে আছ তাহলে। তোমার আর কি-ছু করার নেই? তুমি আমাকে বাইরে নিয়ে যেতে পারতে না—বাইরের এক্সপার্ট দেখাতে পারতে না?

বাপী এই প্রথম মিষ্টির দুঃখটা অনুভব করল। জবাব দিল, যেতে চাও চলো...কিন্তু আমার ধারণা এ-সব ব্যাপারে আমাদের স্পেশালিস্টরা একটুও পিছিয়ে নেই। মাঝখান থেকে আরো কষ্ট পাবে।

—তুমি ছেলে চাও না? তুমি কষ্ট পাচ্ছ না?

বাপী নির্দ্বিধায় মাথা নাড়ল।—আমি এ নিয়ে কিছু ভাবিই নি। আমি শুধু তোমাকে চেয়েছি—পেয়েছি। ব্যস।

—ব্যস নয়! মিষ্টির গলার স্বর কঠিন।—সব জেনে তুমি উদার হয়ে বসে আছ—চুপ করে থেকে তুমি আমাকে দয়া করছ।

বাপী অবাক। আহত।—তার মানে।

—তা না হলে ঊর্মিলার মেয়ে হয়েছে শুনে তুমি আনন্দে লাফালাফি করতে—আমার মুখ চেয়ে চুপ করে আছ।

বাপী বুঝল। হাসিই পেল এবারে। তরল সুরে বলল, কোনো এক্সপার্ট দিয়ে আগে তোমার মাথাটা দেখাব ভাবছি। পরেই গলার স্বর গভীর একটু, গম্ভীরও। বলল, আমি ঠিক আগের মতো কেন নেই জানি না.. ভেতরে কি হয় নিজেই বুঝি না তোমাকে বোঝাব কি করে। যা-ই হোক আমাকে অবিশ্বাস কোরো না, আমি শুধু তোমাকেই চেয়েছি, তার বেশি আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাই নি।

মিষ্টির লালচে মুখ। অপলক চেয়ে রইল। একটু বাদে উঠে গেল। এই লোককে অবিশ্বাস করে না। মিথ্যে যে বলে না, তার অনেক প্রমাণ পেয়েছে। তবু ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলতে পারলো না। যা বলল, সত্যি হলে তাকে শুধু ভোগী ছাড়া আর কি বলবে? মিষ্টি শুধু সেই ভোগের দোসর। ভোগের ভোজে কদর তার। মানুষটা আগের মতো নেই তা-ও ঠিক। নিজের ভিতরেই সময় সময় কোথায় তলিয়ে যায় মিষ্টি ঠাওর করে উঠতে পারে না। কিন্তু ভেসে ওঠে যখন, আকণ্ঠ তৃষ্ণা। তখন মিষ্টিকেই সব থেকে বেশি দরকার। মিষ্টি তখন খুব মিষ্টি। মিষ্টি কোনো দিন মা হবে না সেজন্যেও এই লোকের এতটুকু খেদ নেই। মিষ্টি কেবল তার ভোগের জগতের মিষ্টি।

ক্ষোভের মুখে খুব সুবিবেচনা করছে না মিষ্টি তা-ও বোঝে। মনের তলায় ক্ষীণ আশাটুকুও নির্মূল। পরিপূর্ণতার অভাব-বোধ যন্ত্রণার মতো। এ যন্ত্রণার ভাগীদার নেই। তাই ক্ষুব্ধ হয়। তাই এ-রকম ভাবে। নইলে, এই লোকের ভালবাসার গভীরতাও যে সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করতে হয় তাই বা অস্বীকার করে কি করে?

ঊর্মিলা,

টেলিগ্রামের পর মিষ্টি তোমার চিঠিও পেয়েছে। এতদিনে তুমিও মিষ্টির চিঠি পেয়ে থাকবে। তোমার মেয়ে হয়েছে শোনার পর আমার মনের কথা তোমাকে জানানো হয়নি। ছেলে শুনলে আমি নিশ্চয় এত খুশি হতাম না। কালে দিনে মেয়েটা যেন তোমার থেকে ঢের বেশি দুষ্টু হয়। আর, তুমি তোমার মা-কে যত জ্বালিয়েছ, ও যেন তার মা-কে তার থেকে অনেক বেশি জ্বালায়। আমি চোখ বুজে বলে দিতে পারি মেয়ে দেখতেও তোমার থেকে সুন্দর হবে।

আমার শরীরের কথা ভেবে অত ঘটা করে উতলা হয়ো না। আসলে মিষ্টি তার নিজের উদ্বেগ খানিকটা তোমার ওপর চাপিয়েছে। ওই প্রেসার-ট্রেসার হয়তো বরাবরই ছিল। আমার তেমন কিছুই অসুবিধে হচ্ছে না। আসল গণ্ডগোলটা অন্য দিকে, যা আমরাও জানা ছিল না। বাচ্চা বয়েস থেকে আমার কেবল খোঁজার ধাত, খোঁজার বরাত। যেমন ধরো সেই ছেলেবেলা থেকে মিষ্টিকে খুঁজেছি। ভিখিরির খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে তাকে পাওয়া যাবে না, বুঝে নিয়ে টাকা খুঁজেছি, ঐশ্বর্য খুঁজেছি। সে-দিকে এগোতে গেলে যা দরকার...অর্থাৎ তোমার মায়ের মনের ভাণ্ডারে ঢুকে পড়ার চাবিটি খুঁজেছি। তারপর একটু একটু করে সব পেয়েছি, মিষ্টির কাছেও পৌঁছে গেছি। কিন্তু

তারপর? এই তারপরের গোলকধাঁধার মধ্যে ঢুকে গেছি আমি। সেই ক্ষ্যাপার খোঁজার বাতিক যাবে কোথায়? কি খুঁজব? আরো টাকা আরো টাকা আরো টাকা? মিষ্টির মধ্যে আরো মিষ্টি আরো মিষ্টি আরো মিষ্টি? জীবন খোঁজার সেটাই শেষ কথা হলে ভেতরের ক্ষ্যাপা থামে না কেন? অত মাথা খোঁড়াখুঁড়ি কিসের?

যাক আর পাগলামি বাড়াব না। বিজয় তার কাজ নিয়ে সুখে থাকুক। তুমি তোমার মেয়ে নিয়ে সুখে থাকো। তোমাদের আমার এই খাপছাড়া রোগে পেয়ে বসলে মেয়েটার সর্বনাশ। তার থেকে চোখ-কান বুজে তোমরা আপাতত ওই মেয়ের দিকে মন দাও। —বাপী।

চিঠিটা সামনের টেবিলের ওপর। মিষ্টি স্থাণুর মতো বসে আছে।

দুপুরে রোজ দু'আড়াই ঘণ্টার জন্য নিজের অফিসে নেমে আসে। আজও তাই এসেছিল। বাপীর ব্লাডপ্রেসার চড়ে থাকার পর থেকে মিষ্টিরই এই ব্যবস্থা। বাপীর চেম্বারে বসে তার নির্দেশমতো কিছু কাজকর্ম সেরে রাখে। বাপী সকালের দিকে বসে। তেমন দরকার পড়লে বিকেলেও খানিকক্ষণের জন্য নামে।

প্যাডসুদ্ধু চিঠিটা ড্রয়ার ছিল। ড্রয়ারে খুলতেই মিষ্টির চোখে পড়েছে। নিজের হাতে চিঠি আর লেখেই না, চিঠির গোড়ায় ঊর্মিলার নাম দেখে কৌতূহল স্বাভাবিক। প্যাডটা টেনে নিয়ে পড়ল। শেষ হতে আবারও পড়ল।

মিষ্টির মনে হচ্ছিল, হঠাৎ সে বড় কিছু পুঁজি খুইয়ে বসেছে। সেই যন্ত্রণায় বুকের ভিতরটা টনটন করছে। এরই মধ্যে সে এত সুলভ হয়ে গেছে যে তার মধ্যে ওই লোকের আর খোঁজার কিছু নেই, আর পাওয়ার কিছু নেই। চোখ-কান বুজে বিজয় আর ঊর্মিলাকে তাদের মেয়ের দিকে মন দেবার উপদেশের ফাঁকে একটাই ইঙ্গিত স্পষ্ট মনে হল মিষ্টির। অর্থাৎ ওই লোকের এটুকুও অবলম্বন নেই।

প্যাড থেকে লেখা পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে পরিষ্কার করে দু'ভাজ করল। সেটা হাতে করে নিঃশব্দে দোতলায় উঠে এলো। পাশের চেয়ারে জিত্ বা ওদিকের হল-এর কেরানীবা কেউ টের পেল না।

ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে বাপী মোটা বই পড়ছিল একটা। মিষ্টি চুপচাপ সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটা এত তন্ময় যে দু'মিনিটের মধ্যেও টের পেল না।

—ওটা কি পড়ছ?

মুখের কাছ থেকে বইয়ের আড়াল সরল। বাপী দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালো। পৌনে চারটে। অর্থাৎ এরই মধ্যে উঠে আসবে ভাবে নি। বইটা ঘুরিয়ে মিষ্টির দিকে ধরল।

মিষ্টি জানে কি বই। শ্রীঅরবিন্দর লাইফ ডিভাইন। জিগ্যেস করল, ওতে কি আছে?

হেসে জবাব দিল, কে জানে, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না।

—তাহলে পড়ছ কেন?

রঙ্গ করে বাপী জবাব দিল, আমি পড়ছি না, আমাকে ঘাড় ধরে কেউ পড়াচ্ছে।

—আমিই বোধ হয়?

মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে এবারে খটকা লাগল বাপীর।...তার মানে?

—তার মানে তোমার টাকা আর টাকার মতো আমাকে নিয়েও তুমি তাহলে এখন খুব ক্লান্ত?

বাপী বিমূঢ় খানিক। মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ কি হল বোঝার চেষ্টা।

হাতের ভাঁজ করা চিঠিটা খুলে মিষ্টি সামনে ধরল।—এটা লিখে ডাকে না দিয়ে প্যাডেই রেখে দিয়েছিলে কেন—আমি পড়ব বলে?

এবারে বাপী হাসছে মিটিমিটি।—বাইরের টিকিট ছিল না বলে পাঠানো হয় নি।

কিন্তু ওটা পড়ে শেষে কি তুমি এই বুঝলে নাকি?

ঊর্মিলা কি বুঝবে?

বাপী থমকে চেয়ে রইল। তারপর হাত বাড়ালো—দাও ওটা।

মিষ্টি নড়ল না। চোখে চোখ।

—দেখছ কি? ছিঁড়ে ফেলব। ঊর্মিলারও যদি তোমার মতো বুদ্ধি-বিবেচনা হয় তাহলে মুস্কিলের কথাই!

মিষ্টি ভিতরে ভিতরে অবাক একটু। অপ্রস্তুত হওয়া দূরে থাক, এই উষ্ণ ঝাঁঝেও ভেজাল নেই। জিগ্যেস করল, তোমার বুদ্ধি-বিবেচনায় এই চিঠির কি অর্থ দাঁড়ায়?

বাপী আরো অসহিষ্ণু।—যা-ই দাঁড়াক, এতে তোমাকে ছোট করার বা খাটো করার কোনো ব্যাপার নেই। তোমার নাম থাকলেও আমার এই ভাবনার মধ্যে তোমার কোনো অস্তিত্ব নেই—বুঝলে?

মিষ্টির মুখ লাল।—নিজের দাম জেনে খুশি হলাম।

হাল ছেড়ে বাপী হাতের বইটা পাশের ছোট টেবিলে ফেলে দিল। তারপর ক্লান্ত গলায় বলল, মিষ্টি, অনেক লেখা-পড়া শিখেছ বলে বাতাস থেকে অশান্তি টেনে এনো না।

ইজিচেয়ারে আবার শরীর ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজল।

চিঠি হাতে নিয়ে মিষ্টি চলে গেল। একটা দুর্বোধ্য অস্বস্তি ওকেও ছেঁকে ধরেছে এখন।

মাসখানেক বাদে ঊর্মিলার জবাব এলো। মিষ্টিকে লিখেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার করে লিখেছে, প্রেসার ট্রেসার যা-ই থাক, সব থেকে আগে পত্রপাঠ বড় ডাক্তার ডেকে ফ্রেন্ডের মাথাখানা খুব ভাল করে দেখিয়ে নাও।

মিষ্টি চুপচাপ চিঠিটা বাপীর দিকে বাড়িয়ে দিল। পড়ে বাপী হাসতে লাগল। বলল, বাঁচা গেল, ঊর্মিলা তবু রোগ কিছুটা বুঝেছে।

॥ বাইশ ॥

'আগে বাঢ়্। মিল যায়গা!'

ভুটান জঙ্গলের উদোম ফকিরের গমগমে গলার স্বর আর কথাগুলো বাপীর প্রায়ই মনে পড়ে। সেদিনের মানসিকতায় শব্দ চারটে রোমাঞ্চকর কাণ্ড ঘটিয়েছিল। বুকের তলায় ঝংকার তুলেছিল। বিঘ্ন ঠেলে সামনে এগনোর সাদা মন্ত্র কেউ কানে জপে দিয়ে গেছল। কিন্তু এখন কি? জপের মতো কথাগুলো এখনো কানে বাজে কেন? স্নায়ুতে স্নায়ুতে সাড়া জাগে কেন?

বাপীর তন্ময় হতে সময় লাগে না। প্রকাণ্ড দেবদারু গাছের নিচে ভস্মমাখা সেই উলঙ্গ ফকির বসে। ওর দিকেই চেয়ে আছে। তার দু'চোখে হাসি ঠিকরোচ্ছে কি আলো, বাপী জানে না।

'আগে বাঢ়্। মিল যায়গা!'

ত্রিশূল হাতে উঠে দাঁড়াল। পলকে গভীর জঙ্গলে সেঁধিয়ে গেল।

কিন্তু কোথায় গেল? সামনে এগলো? কিছু পাওয়ার আশা না থাকলে ফকিরই বা এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? দুর্নিরীক্ষ মহাশূন্যে বসে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে এমন কোনো মহাশক্তিধরের কাছে পৌঁছনোর আশা? খুব ছেলেবেলায় বাপী ভাবত আকাশের ওপারে ঈশ্বরের রাজ্য। ও রকম কোনো অলৌকিক অস্তিত্বে বিশ্বাস

এখন নিজের কাছেই হাস্যকর।

'চলা পৃথ্বী—স্থিরভূমি'। দেড় হাজার বছর আগে ভারতীয় বিজ্ঞানী আর্যভট্টের ঘোষণা বাপী বইয়ে পড়েছে। সে বলে গেছে, সূর্য নয়, স্থিরভূমি এই পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে পাক খাচ্ছে। এই জ্ঞান কোনো ঈশ্বর মহাশূন্য থেকে তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল? গত দেড় বছর যাবৎ মানুষের তৈরি উপগ্রহ মহাকাশের রহস্যের আবরণ সরিয়ে চলেছে। স্পুৎনিক আর একসপ্লোরারের জয়-জয়কার। মানুষ খুব শিগগীরই ওই মহাকাশের গ্রহ-উপগ্রহ জয় করবে এমন বিশ্বাস বাপীরও আছে। কিন্তু সব-কিছুর আড়ালে বসে বিচ্ছিন্ন কোনো অলৌকিক পুরুষ এই শক্তির যোগানদারি করছে, বাপী ভাবে না।

অথচ শক্তিটুকু অস্বীকার করার উপায় নেই। একটা শক্তির উৎস কোথাও আছেই। সেটা কোথায়, কত বড় তার সম্পূর্ণ অস্তিত্বই বা কেমন? উলঙ্গ ফকির সম্পর্কেও বাপীর সেই গোছেরই বিস্ময়। হাড়গুঁড়নো রক্তজমানো সেই প্রচণ্ড শীতে লোকটার গায়ে একটা সুতো নেই। শীততাপের অমোঘ প্রাকৃতিক বিধান থেকে নিজেকে সে এমন অনায়াসে তফাতে সরিয়ে রাখতে পারে কোন শক্তির জোরে? লজ্জা-ভয়ই বা তার কাছে ঘেঁষে না কেন?

নিজের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে এক এক সময় দম বন্ধ হয়ে আসে বাপীর। ধড়ফড় করে ওঠে: নিজেকে টেনে তোলে। ভাবনা চিন্তা ঝেড়ে ফেলে বাস্তব ভূমির ওপর পা ফেলে চলতে চেষ্টা করে। কাজকর্মে মন দেয় কিন্তু সেই মন আর সেই উৎসাহে ভাটা পড়ছে তাও অনুভব করে।

তা হলেও ব্যবসা সেখানে দাঁড়িয়ে. টাকা আপনি আসছে। আসছেই। অনেকটা খেয়ালের বশেই বাপী, নিঃশব্দে মাঝে মাঝে এই বোঝা কিছু কিছু হালকা করে ফেলে। দেশের প্রায় সর্বত্র খরা বন্যা দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ বছর বছর পোকা-মাকড়ের মতো মরে যায়। তাছাড়া অন্ধ আতুর বা আর্তের সেবা প্রতিষ্ঠানই বা এ-দেশের মতো এত আর কোথায় আছে। গোটা দেশটাই যেন দাও-দাও রব তুলে হাত পেতে বসে আছে।

বাপীর নিঃশব্দে দিয়ে যাওয়ার অঙ্কটা ক্রমশ বড় হচ্ছে সেটা একমাত্র মিষ্টি লক্ষ্য করেছে। বাপী ওকেও বলে না। কিন্তু সমস্তই চেকবই পাশবই আর কাঁচা টাকা বোঝাই সিন্দুকের চাবি তার হেপাজতে। লক্ষ্য বা চোখ রাখলে তার না জানার কারণ নেই। এমন সংগোপন দানের বহর দেখেও মিষ্টি অস্বস্তি বোধ করে। ঐশ্বর্যের সবটা সাদা রাস্তায় আসছে না বলেই এভাবে বিবেক পরিষ্কার রাখার চেষ্টা কিনা বোঝে না।

ঠাট্টার সুরেই একদিন বলে ফেলল, দান করলেও লোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু প্রচার চায়—তুমি যেন খুব চুপি চুপি মস্ত মস্ত এক-একটা দানের পর্ব সেরে ফেলছ?

তার মুখের দিকে চেয়ে বাপী বেশ একটু কৌতুকের খোরাক পেল। ঠোঁটে হাসি। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা তুমি দক্ষিণেশ্বরে গেছ কখনো?

প্রশ্ন শুনে মিষ্টি অবাক।—মায়ের সঙ্গে দুই-একবার গেছি। কেন?

—আমি একবারও যাইনি। তোমার কথা শুনে সেখানকার জ্যান্ত ঠাকুরটির একটা কথা মনে পড়ল। বলেছিল, সেবা করতে পারিস, দান করার কে রে শালা তুই?

মিষ্টির ভালো লাগল। হেসে বলল, তুমি তাহলে সেবা করছ?

—আমি কিছুই করছি না। নিজেকে যাচাই করছি।

না বুঝে মিষ্টি চেয়ে রইল।

বাপী বলল, দিতে ইচ্ছে করে না। তখন আরো বেশি করে দিয়ে ফেলে দেখি কেমন

লাগে। মানে, দেখি কতটা টাকার গোলাম হয়ে বসে আছি। ছাড়তে না পারার গোলামি বরদাস্ত করতে না চাইলেও ওটা আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়।

মিষ্টির দ্ব-চোখ বড় বড়।—শেষে কি আমার ওপর দিয়েও এরকম এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট চলবে নাকি!

বাপী হাসছে।—ঘুরে ফিরে একই ব্যাপার কিন্তু।...সেই আঁকড়ে ধরে থাকার গোলামি।

মিষ্টি আর কিছু বলল না। এই জবাব আশাও করেনি, ভালও লাগেনি।

দিন গড়াতে গড়াতে উনষাট সালের আগস্ট পেরিয়ে সেপ্টেম্বরে পা ফেলল। মাসের প্রথম দিনে বাপীর জীবনের এই গতিও আচমকা বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়াল।

গত জুন মাস থেকে পশ্চিম বাংলার খাদ্য পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে উঠেছিল। চালের দর হু হু করে বাড়ছে। বাজারের চাল উধাও হয়ে যাচ্ছে। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে প্রতি দিন তিন-চার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ কলকাতায় আসছে খাবার খুঁজতে। মুখ্য-মন্ত্রী বিধান রায় খাদ্যনীতির ব্যর্থতার দায় খাদ্যমন্ত্রীর ওপর না চাপিয়ে নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি খারাপের দিকেই গড়াতে থাকল।

এই ব্যর্থতা সামনে রেখে প্রবল আক্রমণে নেমে গেছে বিরোধী দল। সরকারকে উল্টে দেবার হুমকি দিয়ে আসরে নেমেছে তারা। তাদের অসন্তোষ মুখ্যমন্ত্রীর ওপর যত না, তার থেকে ঢের বেশি খাদ্যমন্ত্রীর ওপর। পরের দ্ব-তিন মাসে চালের দর মণ পিছ্ব আরো পাঁচ টাকার ওপর বেড়ে গেছে। মূল্যবৃদ্ধি আর দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি কোমর বেঁধে গণ-আন্দোলনে নেমেছে। তারা চালের মজুতদারির বিরুদ্ধে যুঝবে, আইন অমান্য করবে, অবস্থান ধর্মঘট করবে, পিকেটিং করবে। অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠতে লাগল. কারণ খিদের জ্বালায় সাধারণ মানুষও ক্ষিপ্ত। জঠরে আগুন জ্বললে লোকে কান শুনতে ধান শোনে। রাজনীতি বুঝুক না বুঝুক, দুর্দিন ঘোচানোর যুদ্ধে তারাও ছুটে আসবে. হাত মেলাবে।

ধর-পাকড় শুরু হয়ে গেল। শাসনযন্ত্র গণবিক্ষোভের ষাট-পঁয়ষট্টি জন নেতাকে ছেঁকে তুলে আগে-ভাগে গ্রেপ্তার করল। কেউ কেউ আবার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে গা ঢাকা দিল। কিন্তু বিদ্রোহের আগুন তখন অনেক ছড়িয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রাণ নেবার হুমকি পর্যন্ত শোনা গেল। আগস্ট-এর শেষ দিনে গতকাল সেই রক্তাক্ত গণ-বিক্ষোভের প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। দুই তরফই প্রস্তুত ছিল। শহরের মানুষ গ্রামের মানুষ স্ত্রীলোক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সহ পঁচিশ হাজারের এক মিছিল ময়দানের সভার পর এগিয়ে এলো রাজভবনের দিকে।

পথ আগলে সশস্ত্র পুলিশও প্রস্তুত। রাত সাড়ে সাতটায় সেখানে পুলিশ আর জনতার খণ্ডযুদ্ধ। লাঠি-চার্জ টিয়ার গ্যাস। সেখান থেকে অশান্তির ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত শহরে। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড। স্টেট বাস আর দুধের বুথ পোড়ানোর হিড়িক পড়ে গেল।

এই দিনে গ্রেপ্তারের সংখ্যা তিনশ'র ওপর। আহতদের ভিড়ে হাসপাতাল বোঝাই।

বাইরে বাপী এই মানুষগুলোর থেকে অনেক দূরে অনেক বিচ্ছিন্ন। কিন্তু বিপুল ঐশ্বর্য সত্ত্বেও ভিতরের মনটা আজও এদেরই দিকে। ব্যক্তিবিশেষে বিধান রায় বাপীর চোখে শুধু পুরুষ নয়, পুরুষসিংহ। চিকিৎসায় ধন্বন্তরী নাম। শক্ত দুই হাতে এই বাংলার শিল্প বাণিজ্য শিক্ষা সংস্কৃতি পথ পরিবহন স্বাস্থ্য—সব কিছুর শ্রী ফেরানোর হাল ধরে বসে আছেন। বাপীর মানসিক বিরোধ তাঁর সঙ্গে নয়। স্বাধীনতার বারো বছরের মধ্যেও যে-শাসনযন্ত্র ক্ষুধার মুখে অন্ন যোগাতে পারল না, বিরোধ তার সঙ্গে। আন্দোলনও শেষ পর্যন্ত রাজনীতির খেলাই। অজ্ঞ ক্ষুধার্ত জনেরাই বেশির ভাগ এই

রাজনীতির প্রথম সারির বলি।

পরদিন অর্থাৎ আজ। পয়লা সেপ্টেম্বর। সকাল থেকে অশান্তির খবর কানে আসছে। আন্দোলনের অনেকখানি দখল চলে গেছে সমাজবিরোধীদের হাতে। বিকেলের মধ্যে পাঁচটা থানা আক্রমণ করে লুটপাট করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির এলাকায় তুমুল হামলা। বড় বড় রাস্তাগুলো ব্যারিকেড করে দেবার ফলে পুলিশ পেট্রল ব্যাহত। টিয়ার গ্যাস বা লাঠিচার্জে কুলোলো না আর। গুলি চলল। সরকারী হিসেবে পঁয়ষট্টি জন গুলিতে আহত আর চার জন নিহত। এ হিসেব কতটা সত্যি সকলেই জানে।

মিষ্টির বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন খবর পেয়েছিল। গতকাল বিকেলে দুজনে তাঁকে দেখতে যাবে ঠিক করেছিল। গণ্ডগোলের দরুন আর বাড়ি থেকে বেরোয় নি। আজও বিকেল পর্যন্ত বাড়ি বসে থেকে বাপীর একটুও ভালো লাগছিল না। গণ্ডগোল বেশি ঘোঁট পাকিয়েছে উত্তর কলকাতার দিকে। দক্ষিণ দিকের তেমন বড় কিছু ঘটনা বা দুর্ঘটনার খবর কানে আসেনি। বাপী মিষ্টিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবে। বা গণ্ডগোল দেখলে এগোবেই না।

চলেছে। বাপীর গাড়িও ইদানীং ড্রাইভার চালায়। নিজে ড্রাইভ করা ছেড়েছে। রাস্তায় ট্রাম বাস ট্যাক্সি এমন কি আর প্রাইভেট গাড়িও চোখে পড়ছে না। এলগিন রোডের কাছাকাছি আসতে বোঝা গেল ব্যাপার এদিকেও সুবিধের নয়। রাস্তা জুড়ে ভাঙা কাচ ডাবের খোলা ইঁট পাথর জুতো আর ভাঙা কাঠের তক্তার ছড়াছড়ি। ছোট বড় গলির মুখে এক-একটা জটলা। বন্দুক উঁচনো পুলিশের পেট্রল গাড়ি দেখলেই তারা ছুটছাট হাওয়া হয়ে যাচ্ছে।

পরিস্থিতি আর একটু ভালো করে বোঝার জন্যে বাপী গাড়িটা রাস্তার পাশে দাঁড় করাতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে পাঁচ-সাত জন মারমুখী ছেলে ছুটে এসে গাড়িটা ঘিরে ফেলল।—এই দিনে আপনারা গাড়ি চেপে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন?

কেন বেরিয়েছে বাপী তাদের বোঝাতে চেষ্টা করল, কিন্তু সেই ফাঁকে একজন পিছনের একটা টায়ারের ভাল্ব খুলে দিয়েছে। সশব্দে বাতাস বেরিয়ে টায়ারটা চুপসে গেল। এই দিনে বাইরে বেরুনোর কারণ শুনে হোক বা মিষ্টিকে দেখে হোক, তাদের মাতব্বর টায়ারটা যে ফাঁসিয়েছে তাকে ধমকে উঠল। তারপর বাপীকে বলল, বাড়তি টায়ার থাকে তো এক্ষুনি লাগিয়ে ফিরে যান—সামনে এগোতে পারবেন না—আরো বিপদে পড়বেন।

দূরে পুলিশের পেট্রল গাড়ি চোখে পড়া মাত্র দলটি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

মিষ্টিও গাড়ি থেকে নেমে এলো। পেট্রলগাড়িটা ঝড়ের বেগে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ড্রাইভার পিছনের ক্যারিয়ার থেকে সাজসরঞ্জাম বার করে স্টেপনি লাগানোর কাজে লেগে গেল। মিষ্টি আর বাপী নির্বাক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

—তুই আমার হাড়মাস সব খাক করে দিলি। তোকে আমি এবার থেকে ঘরে তালা দিয়ে আটকে রেখে দেব—তুই কত বড় হারামজাদা আমি এবার দেখে নেব!

তারস্বরের ক্ষিপ্ত কথাগুলো কানে আসতে বাপী ফিরে তাকালো। আর সেই মুহূর্তে মাথার ঠিক মধ্যিখানে কেউ বুঝি প্রচণ্ড মুগুরের ঘা বসিয়ে দিল একটা।

কথাগুলো কানে আসতে মিষ্টিও ফিরে তাকিয়েছিল।

...আধ হাত পাকা দাড়ি বোঝাই একটা লোক বছর এগারোর হাফপ্যান্ট হাফশার্ট পরা ঢ্যাঙা এক ছেলের হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে রাগে ফোঁস ফোঁস করে ওই কথা বলছে। লোকটার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে মেটে সিঁদুরের চওড়া তিলক।

মিষ্টিকে নয়, বাপীকে দেখেই লোকটা থমকে দাঁড়ালো একটু। আবার এগোতে গিয়েও পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকেই গেল বুঝি। দুই চোখ বিস্ফারিত। সামনে যাকে দেখছে, ঠিক দেখছে কিনা ভেবে পাচ্ছে না।

—বিপ্লববাবু আপনি! আপনি আমাদের সেই বিপ্লববাবু না?

বাপী নিস্পন্দ নির্বাক।

—আপনি আমাকে চিনতেও পারছেন না বিপ্লববাবু! আমি রতন। রতন বণিক! আমাকে...আমার বউ কমলাকে মনেও পড়ছে না আপনার?

মাথার মধ্যে ঝড়। যেভাবে হোক এই ঝড় না থামালে কোথায় ভেসে যাবে বাপী জানে না। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে টেনে তুলল। ওর শক্ত হাতে ধরা ছেলেটার দিকে না তাকাতে চেষ্টা করছে।

—চিনেছি। চিনে তোমার মতোই অবাক হয়ে গেছলাম।

রতন বণিক খুশিতে আটখানা।—আপনি না চিনে পারেন! এমন সুন্দর চেহারা হয়েছে এখন আপনার! এ আপনার গাড়ি? ইনি আপনার পরিবার? ছেলের হাত ছেড়ে দিয়ে বিগলিত মুখে মিষ্টির সামনে মাথা নোয়ালো।—পেন্নাম হই গো মাঠাক্কুন—এই বিপ্লববাবু আমাদের কতখানি ছিলেন আপনি জানেন না। উনি আমার বস্তির খুপরি ঘরে থাকতে আমি বলে দিয়েছিলাম, এই দিন থাকবে না—উনি রাজা হবেন! হ্যাঁ বিপ্লববাবু, আপনি কলকাতায়—আর আমি জানিও না!

মাথার ভিতরে যা হচ্ছে—হচ্ছে। পিঠেও চাবুক পড়ল একটা। মিষ্টি ভাবছে, একটু আগের বিভ্রাটের দরুণ মানুষটা এই লোকের আনন্দ বা কথায় তেমন সাড়া দিতে পারছে না।

রতন বণিক হঠাৎ ছেলেটার কাঁধ ধরে বাপীর দিকে ঠেলে দিল।—এই ছোঁড়া, পেন্নাম কর শিগগীর। কাকে দেখছিস জানিসও না। আজ ঘরে ফিরে তোর হাড় গুঁড়ো করে দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু তোর জন্যেই বিপ্লববাবুর সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে গেল-- তাই বেঁচে গেলি।

ছেলেটা দুজনকেই প্রণাম সেরে উঠতে রতনের একমুখ হাসি। আমার ছেলে বিপ্লব-বাবু, ওর নাম মদন। তখুনি আবার রাগের মুখ।—এত বড় পাজী ছেলে আর হয় না-বুঝলেন। খেয়েদেয়ে বেলা বারোটায় আমার চোখে ধুলো দিয়ে মারামারি গোলাগুলির মধ্যে বেরিয়েছে—আমি পাঁচ ঘণ্টা ধরে পাগলের মতো খুঁজতে খুঁজতে এইখানে এসে ওকে ধরেছি—এইটুকু বিচ্ছু আমাকে একেবারে শেষ করে ছাড়ল।

বাপীর চোখ দুটো এবারে কেউ যেন টেনে ছেলেটার মুখের ওপর বসিয়ে দিল।

দেখছে মিষ্টিও। গম্বা গড়ন। রোগা। কালোও নয় ফর্সাও নয়। বাপ যত দুষ্টু বলছে মুখ দেখলে ততো দুষ্টু মনে হয় না। চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায় দুষ্টুমিতে ছাওয়া। কিন্তু সব মিলিয়ে ছেলেটা দেখতে বেশ। এত বুড়োর এই ছেলে কেউ ভাববে না, নাতি-টাতি ভাববে।

সহজ ভাবেই মিষ্টি বলল, মায়ের কথা শোনে না বুঝি...

বলে অপ্রস্তুত। রতন বণিক ফোঁস করে বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা। বিড়বিড় করে বলল, মা তো নয়, শত্তুর।...ছেলে ছেলে করে পাগল হয়েছিল। আমি বলেছিলাম ছেলে হবে—হল। আর দুটো বছর না যেতে সেই ছেলে রেখে আমাকে একেবারে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল!

বাপী কাঠ। রতনের ছল-ছল দুচোখ তার মুখের ওপর।—আপনি তো এ খবরও জানেন না বিপ্লববাবু। এমন বউকে শত্তুর ছাড়া আর কি বলব? ভরা শীতেও দুবার করে চান করা চাই—কার নিষেধ কে শোনে। বুকে সর্দি বসিয়ে সাতদিনের জ্বরে সব শেষ। যাবার দিন সকালে আপনাকে মনে পড়েছিল...কিছু বলেও গেছল...

গাড়ি রেডি। বাপীর হঠাৎ ফেরার তাড়া। রতনকে বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দেখা করতে বলে মিষ্টিকে তাড়া দিয়ে গাড়িতে উঠল। রতনকে বলল, গণ্ডগোলের মধ্যে আর বাইরে

থেকো না—ঘরে চলে যাও।

বিকেলের আলো আর নেই-ই প্রায়। গাড়ির ভিতরটা আবছা। বাপী পিছনে মাথা রেখে নিশ্চল বসে আছে। দু চোখ বোজা।

মিষ্টির মনে পড়ছে কিছু। ফিরে তাকালো।—কলকাতায় সেই প্রথম দেখা হতে তুমি বলেছিলে, অফিসের চাকরি যাবার পর সেখানকার কোন্ পিওন আর তার বউ আদর করে তাদের বস্তিঘরে তোমাকে রেখেছিল...এ সেই পিওন নাকি?

জবাব না দিয়ে বাপী শুধু মাথা নাড়ল। সে-ই!

—ওদের কাছে কত দিন ছিলে?

—দু'মাস।

এবারে মিষ্টিও অবাক একটু।—সামান্য লোক হলেও তোমার জন্য এত করেছে, আর এত বছরের মধ্যে তুমি তাদের একটা খবরও নাওনি?

বাপী জবাব দিল না। মাথা পিছনে তেমনি ঠেস দেওয়া। দু'চোখ বোজা।

মিষ্টি এবারে ভালো করে লক্ষ্য করল। উতলা একটু।—শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

এবারেও বাপী সামান্য মাথা নাড়াল কি নাড়াল না।

মিষ্টি ভাবল ছেলেগুলো হঠাৎ ওভাবে হামলা করার দরুন স্নায়ুর ওপর দিয়ে ধকল গেছে। এর থেকে বেশি বিপত্তিও হতে পারত।

রাত্রি। দেড় হাত ফারাকে মিষ্টি ঘুমোচ্ছে। বাপী নিঃশব্দে উঠে বসল। শরীরের রোমে রোমে আগুনের কণা। নিঃশ্বাস নিতে ফেলতে লাগছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। বাপী জানে এই দুঃসহ যন্ত্রণার শেষ এই মুহূর্তে হয়ে যেতে পারে। যদি সে মিষ্টিকে ডেকে তুলতে পারে, তুলে যদি ওকে বলতে পারে, কথা ছিল তোমার আমার মধ্যে গোপন কিছু থাকবে না—তাই এবারে শেষ কিছু শোনো—শুনে আমাকে দেখো, চেনো।

বাপীর গলায় কুলুপ আঁটা। ডাকা যাবে না। বলা যাবে না। শরীর জ্বলছে। যন্ত্রণা বাড়ছে। শব্দ না করে খাট থেকে নামল। পা দুটো পাথরের মত ভারি। ঝিনঝিন করছে। অন্ধকার ঘর-সংলগ্ন বাথরুমে এলো। কানে মাথায় জলের ঝাপটা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কি-যে হতে লাগল বুঝছে না। পায়ের নিচে ভূমিকম্প। সব কিছু বিষম দুলছে, উল্টে যাচ্ছে। প্রাণপণে বেসিনটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল একটু। দেয়াল হাতড়ে ঘরে এলো। বিছানাটা কদ্দূর। বাপী কি আর নাগাল পাবে?

পেল। তারপর আর মনে নেই।

॥ তেইশ ॥

টানা দু মাস বাদে বাড়ির দোতলায় হাঁটা-চলার অনুমতি পেল বাপী। ডাক্তারের হুকুমে তার ওঠা বসা চলা ফেরা। তার নির্দেশ মিষ্টি একচুল এদিক ওদিক হতে দেবে না। সেই ভীষণ রাতটার কথা মনে নেই বাপীর। কারণ জ্ঞান ছিল না। পরদিন থেকে এই দু'মাস যাবৎ চিকিৎসার ঘটা দেখছে। দেড় মাস পর্যন্ত দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টার জন্য দুজন নার্স মোতায়েন ছিল। বাপীর বিরক্তি দেখে দুদিন আগে মিষ্টি রাতের নার্স ছেড়েছে। এখনো তিন দিন অন্তর ডাক্তার আসছে, প্রেসার মাপছে। সপ্তাহে একদিন করে বাড়িতে ই-সি-জি হচ্ছে। প্রেসার আরো ওপরের দিকে চড়ে থাকল বলে মিষ্টির দুশ্চিন্তা। ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছে, ওটাই মোটামুটি এখন স্বাভাবিক ধরে নিতে হবে। বেশি ওঠা-নামা করার থেকে এক জায়গায় বরং স্থির থাকা ভালো।

খবর পেয়ে বানারজুলি থেকে আবু রব্বানী ছুটে এসেছিল। একনাগাড়ে পনের দিন ছিল। তার পরেও আর একবার এসে ওকে দেখে গেছে। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঠাট্টাও

করেছে,. তোমার এমন পেল্লায় হার্ট কে অ্যাটাক করতে পারে আমি ভেবে পাই না বাপী-ভাই। যাকগে, এখন আর নো ওয়ার্ক, নো চিন্তা—আমি আছি, জিত্ আছে, তোমার কিছু ভাবনা নেই।

ব্যবসা বা কাজকর্ম নিয়ে বাপী আর একটুও মাথা ঘামাচ্ছে না। এদিকের একটা মস্ত শেকল যেন ঢিলেঢালা হয়ে খসে খসে যাচ্ছে। একটুও খারাপ লাগছে না। বরং হালকা লাগছে। কিন্তু অস্বস্তি অন্য কারণে। সে কি পালানোর পথ খুঁজছে? দু মাসে আগের সেই ঘুম আর যদি না-ই ভাঙত।—কি হত? বেঁচে যেত?

ভিতর থেকে সায় মেলে না। এমন মৃত্যুর কথা ভাবতেও যন্ত্রণা। জীবনের এক বিরাট মুক্তির স্বাদ কোথাও লেগে আছে। কিন্তু সেটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। চোরের মতো এই মৃত্যুর অন্ধকারে সেঁধিয়ে গেলে সেই মুক্তির নাগাল আর কোনদিন পাবে না।

রতন বণিক নিয়মিত আসে। বিপুলবাবুর শরীরের খবর নিয়ে যায়। গোড়ায় দেখা সাক্ষাৎ নিষেধ ছিল। এখন দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। দেখে। বিশেষ করে কপাল দেখে। ওর কপাল দেখার গল্প মিষ্টি এর মধ্যে বাপীর মুখে শুনেছে। তাই ও যখন কপাল দেখে মিষ্টি তখন ওর দিকে উদ্‌গ্রীব মুখে চেয়ে থাকে। রতন দোরগোড়ায় এলে দাঁড়ালে সহজ হবার চেষ্টায় বাপীকে সব থেকে বেশি যুঝতে হয়। এক এক সময় হেসে জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখছ?

রতন মাথা নেড়ে জবাব দেয়, ভালই।...ভাববেন না।

কিন্তু লোকটাকে বড় বিমর্ষ আর ক্লান্ত মনে হয় বাপীর। রতন বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। ছেলের চিন্তায় সর্বদা উতলা। বিপুলবাবুর এত অসুখ তাকে নিয়ে আসে কি করে! কিন্তু হাড়-পাজী ছেলে কোত্থেকে যে ওর ঘরে এলো ভগবান জানে'

বাপী পাশ থেকে আধ-পড়া বইটা তুলে নেয়। স্থির মনোযোগে পড়তে চেষ্টা করে কিন্তু ছাপা লাইনগুলো নড়াচড়া শুরু করে দেয়।

মিষ্টি এখন আবার দেড়'দুঘণ্টার জন্য নিচের অফিস ঘরে বসে কাজকর্ম দেখছে। বাপী সত্যি এখন ব্যবসা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না বলে দায়িত্ববোধ আরো বেশি। ব্যবসা-সংক্রান্ত সব পরামর্শ এখন জিতের সঙ্গে। বা চিঠিপত্রে আবু রব্বানীর সঙ্গে।

সেদিন নিচে নেমে দেখে, ছেলের হাত ধরে রতন বণিক আসছে। মিষ্টি বুঝল, ছেলেকে রেখে নিশ্চিন্তে বেশিক্ষণ বসতে পারে না বলে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। মিষ্টি আপিস ঘরে আসতে রতনও সঙ্গে এলো। ছেলেকে ভয় দেখানোর সুরে বলল, এই হল কর্তা-মা, ভয়ংকর রাগী কিন্তু। এখানে এই টুলে একেবারে চুপটি করে বসে থাকবি, নড়বি-চড়বি না। আমি বিপুলবাবুকে একটু দেখে আসি। ও এখানে বসে থাকলে কোন অসুবিধে হবে না তো মা-লক্ষ্মী?

মিষ্টি হাসিমুখে মাথা নাড়ল। অসুবিধে হবে না। ছেলেটা দুষ্টু খুব, সন্দেহ নেই। পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির রেখা। যা শুনল, অর্থাৎ কর্তা-মা সত্যিই ভয়ংকর রকমের রাগী কিনা বোঝার চেষ্টা। মিষ্টির বেশ লাগল ছেলেটাকে। এইটুকু ছেলের মা নেই। এ-ও মনে হল। বলল, বাইরে টুলে বসতে হবে না, আমার কাছে ঘরে বসে থাক। রতনকে বলল, ও একটুও দুষ্টুমি করবে না, তুমি ওপরে যাও।

এ-সময়ে এসেছে বলে মিষ্টি অখুশি নয়। একলা থাকলেই ওই লোক বইয়ের মধ্যে ডুবে যায়। কেউ কথাবার্তা কইতে বা গল্প করতে এলে সে সুযোগ হয় না। তাছাড়া রতন বণিককে যে খুব পছন্দ করে মিষ্টি এ-ও বুঝেছে।

খুশি মুখে রতন ওপরে উঠে এলো। একগাল হেসে বাপীর সামনে মেঝেতে বসে পড়ে বলল, দরাজ মন আর কাকে বলে। আমি ছেলেকে ভয় দেখালাম কর্তা-মা ভয়ংকর রাগী—চুপ করে বাইরের টুলে বসে থাক—আর উনি আদর করে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে

বসালেন—

রতন এলে বাপীর মানসিক প্রতিক্রিয়া একটু হয়ই। জিজ্ঞাসা করল কার কথা বলছ?

—আমাদের মা লক্ষ্মীর কথা বলছিলাম—আমি যা দেখার দেখে নিয়েছি, বড় মন, মায়ামমতা আছে।

বাপীর মাথায় একটা শব্দ ঘুরপাক খেতে লাগল।—তোমার ছেলে কি ওকে কর্তা মা বলে ডাকবে নাকি?

—উনি হলেন গিয়ে রাজরাণী, মেমসায়েব-টায়েব ভালো লাগে না। সচকিত একটু।—উনি রাগ করবেন না তো?

অগত্যা বাপী মাথা নাড়ল, রাগ করবে না। চুপচাপ রতনকে দেখল একটু। বছর তিপ্পান্ন বয়েস হবে এখন। কিন্তু লোকটা বুড়িয়েই গেছে।

কথায় কথায় রতন বণিকের চাপা অভিমানটুকু আগে প্রকাশ পেল।—ও জোর দিয়ে বলেছিল বিপুলবাবুর ভাগ্য একদিন না একদিন ফিরবেই—বিপুলবাবু নিজেও সেদিন সে-কথা বিশ্বাস করেননি। তা রতন যতটা ভাবতে পারে, ভাগ্য তার থেকে ঢের বেশিই ফিরেছে মনে হয়। তা না হলে এমন বাড়ি, এমন দুখানা ঝকঝকে গাড়ি হতে পারে না। ভাগ্যের জোরে রাজরাণীর মতো বউ পর্যন্ত ঘরে এসেছে।—কিন্তু এত বড় হয়ে বিপুলবাবু ওদের এ-ভাবে ভুলে যাবেন ভাবেনি। এতকাল ধরে বিপুলবাবু কলকাতায় আছেন, একটা খবর পেলে রতন ছুটে আসত—কি ঝড়-জলটা না গেছে ওর ওপর দিয়ে—এখনো যাচ্ছে। সবই তার অদৃষ্ট ছাড়া আর কি।

বাপী একটুও বিরূপ হল না। কোন ওজর দেখালো না। এ-রকম বলার অধিকার ওর আছে।

একটু চুপ করে থেকে খাটো গলায় জিজ্ঞাসা করল, যাবার দিন সকালে তোমার বউয়ের কি মনে পড়েছিল বলেছিলে সেই একদিন—কি বলে গেছল?

—আপনাকে মনে পড়েছিল। বলেছিল, যদি পারো তাঁর খোঁজ কোরো। তুমি যা বলেছিলে ততো বড়টি যদি উনি হয়ে থাকেন, আমার কথা বলে মদনের ভার তাঁর হাতে ছেড়ে দিও—উনি একভাবে না একভাবে ঠিক ওকে মানুষ করে দেবেন।

বাপী স্থাণুর মতো বসে রইল। অনেকক্ষণ বাদে জিজ্ঞাসা করল, তুমি সেই রুকলিনের চাকরি করছ এখনো?

বিষণ্ণ মুখে রতন মাথা নাড়ল। করছে না। পরে আস্তে আস্তে জানালো, বউ মারা যাবার পরেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। কিচ্ছু ভালো লাগত না, সর্বদা পাগল পাগল করত। তাছাড়া সে আপিসে গেলে ছেলে দেখে কে? সেই থেকে নিজের ভাগ্য পুড়িয়ে লোকের ভাগ্য দেখাই পেশা তার। ঘরে বসেই এ-কাজ করত। কিন্তু বস্তিঘরে কোন্ পদের খদ্দেরই বা আসবে। গোড়ায় গোড়ায় যা-ও চলত, এখন আর চলছেই না। ছেলেটা বিনে পয়সায় করপোরেশনের স্কুলে পড়ে—কিন্তু সেখানে পড়া যে কি হয় তাও ভালই জানে।

বাপী উঠে পায়চারি করল খানিক। রক্তশূন্য মুখ। শোবার ঘরে ঢুকে গেল। মিনিট পাঁচেক বাদে আবার ফিরে এলো। রতনের ছেঁড়া কোর্তার দু পকেটে দু তোড়া নোট গুঁজে দিল। বলল, দুই হাজার টাকা আছে, এখন এই দিয়ে চালাও। ছেলের ভার আমি নেব, কিন্তু এখনো মাসখানেক মাস-দেড়েক আমি বেরুতে পারব না—তাছাড়া ডিসেম্বর মাসটা না গেলে কোনো স্কুলে নতুন করে ভর্তি হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তোমার কাউকে কিছু বলার দরকার নেই, ব্যস্ত হবারও দরকার নেই—সময়মতো ব্যবস্থা যা করার আমিই করব—আমিই তোমাকে খবর দেব।

বলার পরেই ভিতরে বৃশ্চিক দাহ। যে গোপনতার পর্দা ছিঁড়েখুঁড়ে ভিতরের মানুষটা

বেরিয়ে আসতে চায়, তাকে আরো আড়ালে টেনে নিয়ে যাওয়া হল।

রতন বণিক হঠাৎ কেঁদে ফেলে বাপীর দু হাত ধরল।

হাত ছাড়িয়ে বাপী ভিতরে চলে গেল।

জানুয়ারির মাঝামাঝি, ব্যবস্থা যা করার নিঃশব্দেই করে ফেলল। বাপী অনেকটা নিশ্চিন্ত।

কিন্তু আরো পনেরটা দিন না যেতে এই ব্যবস্থা যে-ভাবে পণ্ড হয়ে গেল, বাপী নিজেই হতচকিত, বিমূঢ়।

মিষ্টি নিচের আপিস ঘরে ছিল। সাড়ে তিনটে না বাজতে উঠে এলো। বাপী খাটে শুয়ে বই পড়ছিল। বই সরাল। মিষ্টির অবাক মুখ।

—দিন পনের আগে তোমার সেই পিওন রতন বনিকের ছেলেকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে নরেন্দ্রপুরে ভর্তি করে দিয়ে এসেছিলে—আর তুমি গার্জেন হয়ে তাকে হস্টেলে রেখে এসেছিলে?

বই রেখে বাপী উঠে বসল। হিসেবের বাইরে কিছু একটা হয়েছে বুঝতে পারছে। হঠাৎ ঠাণ্ডা একটু। সংযতও।—হ্যাঁ। কেন?

—এই শরীর নিয়ে তুমি এত-সব করেছ, আমাকে বলোনি তো?

—আমার শরীর খুব ভাল আছে।...তোমাকে কে বলল?

—রতন নিজেই। ছেলে নিয়ে ওই হলঘরে বসে কান্নাকাটি করছে—দেখগে যাও।

—কান্নাকাটি করছে কেন?

জবাব দেবার আগে শরীরটা কতটা ভাল আছে মিষ্টি তাই দেখে নিল কিনা বোঝা গেল না। বলল, ছেলে কাউকে কিছু না বলে কাল সকালে হস্টেল ছেড়ে এত পথ হেঁটে ঘরে চলে এসেছে। পথ ভুল করার জন্য আসতেও অনেক সময় লেগেছে। রতন বিকেলের মধ্যেই নরেন্দ্রপুর ছুটে গেছল, কিন্তু সেখানকার মহারাজদের হাতে-পায়ে ধরেও ফল হয় নি—তাঁরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন এ-ছেলেকে আর রাখা সম্ভব নয়।

বাপী হতভম্ব। খাট থেকে নেমে এলো। হলঘরে এলো। পিছনে মিষ্টি। বিষণ্ণ পাংশু মুখে রতন মেঝেতে বসে আছে। একটু দূরে ছেলেটা ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে। বাপীকে দেখে রতন উঠে দাঁড়াল। সত্যি কাঁদছে। হাতজোড় করে বলল, আমাকে আপনি শুধু মাপ করে দিন বিপুলবাবু—খুব আক্কেল হয়েছে—গরিবের ছেলে মানুষ করার সাধ মিটেছে।

বাপী সোফায় বসল। থমথমে মুখ। কিন্তু তার পরেই কেন যেন অত রাগ আর থাকল না, ছেলেটার দিকে অপলক চেয়ে রইল খানিক। তারপর মিষ্টির দিকে তাকিয়ে সামনে হাত পাতল। বলল. ওর কান দুটো ছিঁড়ে এনে আমাকে দাও তো।

ছেলেটা ভয়ে ভয়ে দু পা সরে গেল। কান ছিঁড়তে যাকে বলা হল সে আসছে কিনা দেখে নিল। ঘাড় ফিরিয়ে খোলা দরজা দুটোর দিকেও তাকালো একবার। সত্যি কেউ কান ছিঁড়তে এলে পালাবার পথ আছে কিনা দেখে রাখল।

বাপীর হঠাৎ হাসিই পাচ্ছে কি রকম। কিন্তু গম্ভীর তেমনি। ছেলেটা ঘাবড়েছে, কিন্তু গোঁ-ধরা মুখ। একটা আঙুল তুলে মুখোমুখি সামনের সোফাটা দেখাল।—ওখানে বোস্।

ছেলেটা মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়েই রইল। রতন মারতে এগলো।—হারামজাদা, এর পরেও কথা কানে যাচ্ছে না তোর—তোকে আমি আস্ত রাখব!

—রতন!

ছেলের পিঠে নেমে আসার আগেই রতন বণিকের হাত থেমে গেল।

বাপী বলল, আমি যেখানে ভার নিয়েছি সেখানে তোমার শাসনের আর দরকার নেই!

ছেলের দিকে ফিরল।—আমি এক কথা দুবার বলি না মনে থাকে যেন। বোস্ ওখানে।

এঁকে-বেঁকে ছেলেটা সোফার সামনে গেল। বসল। কিন্তু বসার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কৌতুকের ব্যাপার ঘটল যেন। বসার জায়গা এমন হয় তার ধারণার বাইরে। নিজের অগোচরেই আধাআধি দাঁড়িয়ে আবার বসল। তারপরেই অপ্রস্তুত মুখে ভয়ে ভয়ে বাপীর দিকে তাকালো। নরম গদীর লোভে আবার ওঠা আর বসাটা ভাল কাজ হল না নিজেই বুঝছে।

মিষ্টি চেষ্টা করে হাসি চাপল। বাপী আড়চোখে একবার তাকে দেখে নিল। তেমনি গম্ভীর। রতনের দিকে ফিরে একটু গলা চড়িয়ে বলল, তুমি কিছু ভেবো না—এ-বয়সে ওর থেকে আমি ঢের বেশি বাঁদর ছিলাম, বিশ্বাস না হয় তোমার রাজরাণীকে জিগ্যেস কর। ওকে ঢিট করার ব্যবস্থা আমি করছি—ও আর কোথাও যাবে না, এখানে থাকবে।

মিষ্টি অবাক। রতন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। বিশ্বাস করবে·কি করবে না ভেবে পাচ্ছে না।

বাপীর দু চোখ রতনের মুখের ওপর।—তুমি চলে যাও এখন। আমার ওপর বিশ্বাস রেখে ছ'মাসের মধ্যে আর এ-মুখো হবে না। তারপর ইচ্ছে হয়, দেখে যেও—কিন্তু এখন শিগগীর না!

রতন বোকা আদৌ নয়। অকূলপাথার থেকে উঠে এলো। মিষ্টি কিছু বোঝার আগেই চট করে এগিয়ে এসে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে উঠল। তার পর খোলা দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে চলে গেল।

ছেলেটা তক্ষুনি উঠে দাঁড়িয়েছে। পিছনে ছোটার ইচ্ছে। তার আগেই ধমক খেয়ে পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেল।

—বোস্।

বসে পড়ল।

মিষ্টি আর চুপ করে থাকতে পারল না।—কি ব্যাপার?

—শুনলে তো। ঘাড় ফিরিয়ে হাঁক দিল, বাচ্চু!

ভিতরের ঘর থেকে বাচ্চু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। কলেজে পড়ছে। সুঠাম স্বাস্থ্য।

বাপী বলল, এখন থেকে এই ছেলেটা আমাদের এখানে থাকবে। ওর নাম মদন। কাল-পরশুর মধ্যে ভালো একটা স্কুলে ভর্তি করে দিবি। আর সব ব্যবস্থা আমি করছি। ওকে নিয়ে যা—

বাচ্চু অবাক একটু হল বটে, কিন্তু কিছুই জিগ্যেস করল না। এই কাকার বুকের খবর সে রাখে। এত শ্রদ্ধাও বোধ হয় দুনিয়ার আর কাউকে করে না। মদনের হাত ধরে ভিতরে চলে গেল।

চোখ মুখ ভালো করে লক্ষ্য করে মিষ্টি তেমন জেরা করতে ভরসা পেল না। তার অনুমান প্রেসার একটু-আধটু বেড়েছে। শুধু মন্তব্যের সুরে বলল, ব্যবস্থাটা আর একটু ভেবে-চিন্তে করলে হত না?

—কেন?

—পিওনের ছেলের সঙ্গে লেপটে থাকতে বাচ্চুর ভালো না-ও লাগতে পারে।

—লেপটে থাকতে হবে কেন? এ বাড়িতে ঘরের অভাব নাকি? আর ওই পিওন না থাকলে দুঃসময়ে তার কাকার অস্তিত্ব থাকত না এ কথাটা বাচ্চুকে জানিয়ে দিতেই বা তোমার অসুবিধে কি?

মিষ্টি চেয়ে রইল শুধু। এ-চাউনির অর্থ বাপীর কাছে দুর্বোধ্য নয় একটুও। যার জন্যে এত দরদ, দুঃসময়ে যারা এত করেছে—এতগুলো বছরের মধ্যে তাদের কথা একবারও মনেও পড়ে নি কেন? গাড়িতে পনের মিনিটের পথ...একটা খবর পর্যন্ত নেওয়া হয়

নি কেন?

বাপী সোজা হয়ে বসল একটু। এই নীরব প্রশ্নের জবাব দেবে? গোপনতার অন্ধকার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসার এমন সুযোগ আর পাবে? জবাব দেবে? দেবে দেবে দেবে?

কিন্তু অদৃশ্য কেউ গলা চেপে ধরেছে তার। দম বন্ধ হয়ে আসচে।

মিষ্টি তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এলো।—ঠিক আছে, যা করেছ বেশ করেছ, এখন ওঠো তো, মাথা ঠাণ্ডা করে চুপচাপ খানিক শুয়ে থাকো।

এক মাসের মধ্যে মদনের বাইরের ভোল বদলে গেল। কেউ দেখলে বুঝবে না ও এ বাড়ির ছেলে নয়। এমন চকচকে জামা প্যাণ্ট জুতো আগে চোখেও দেখে নি। তার আলাদা ঘর, আলাদা পড়ার ব্যবস্থা। দুবেলা দু'জন মাস্টারের কাছে পড়তে হয়। স্কুল-বাসে যায় আসে। এমন তোয়াজে থাকার ফলে এরই মধ্যে ছেলেটার কাঁচ মুখের শ্রী আরও ফিরে গেছে। মিষ্টিরও লাগে। কিন্তু পিওনের ছেলের জন্য যা করা হচ্ছে তা খুব স্বাভাবিক মনে হয় না তার। ঘরের লোক যা করছে ঝোঁকের বশে করছে ভাবে।

বাপীও ছেলেটাকে লক্ষ্য করে। নিজে কাছে আসে না। কাছে ডাকে না। কিন্তু কিছুই চোখ এড়ায় না। একটা দুরন্ত খাঁচায় এনে পোরা হয়েছে। ফাঁক পেলে ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারে। তক্ষুনি নিজের সেই দুরন্ত ছেলেবেলা চোখে ভাসে। একেবারে জাহান্নামেই যাবার কথা। যায় নি কারণ মাথার ওপর বাবা ছিল, আগলে রাখার মত পিসী ছিল, আর মিষ্টি নামে এক মেয়ের কাছে পৌঁছনোর একাগ্র লক্ষ্য ছিল। এই ছেলের কি আছে? কে আছে? ভেসে গেলে স্রোতের মতো ভেসে যাবে। ভাবতে গেলেও ভিতরটা ধড়ফড় করে ওঠে বাপীর।

দিন গড়ায়। মাস গড়ায়। একে একে দুটো বছরও গড়িয়ে গল। বাপীর বয়েস এখন সাঁইত্রিশ। কিন্তু মনে হয় এই দেহ-পিঞ্জরের অন্ধকারে সুড়ঙ্গ-গহ্বরে অনন্তকাল ধরে কেউ গুমরে মরছে, বেরিয়ে আসার জন্য মাথা খুঁড়ছে। যতদিন পর্যন্ত কিছু লক্ষ্য ছিল, খোঁজা ছিল, শুধু ততদিনই বাঁচার মত বেঁচেছিল। লক্ষ্যের শেষ, খোঁজার শেষ মানেই মৃত্যু। এই মৃত্যু জীবনের শেষ কথা হতে পারে না, এ-বিশ্বাস এখন বদ্ধমূল। কিন্তু সামনে কে এগোবে? কে খুঁজবে? যে এগোবে যে খুঁজবে সে তো এক মিথ্যেকে আশ্রয় করে গোপনতার অন্ধকার কবরের তলায় ঢুকে বসে আছে।

বাপী খুব আশা করেছিল, এখানে চোখের ওপর থেকে ছেলেটা মিষ্টির মন কাড়বে। মিষ্টির মন ওকে ঘিরে একটু একটু করে মায়ের মন হয়ে উঠবে। তখন বাপী এই গোপনতার কবর থেকে বেরিয়ে আসার কোন না কোন পথ একদিন পাবেই।

তা হল না। মিষ্টির কর্তব্যে ত্রুটি নেই। কিন্তু বাচ্চু যত কাছের, এই ছেলে তার ধারে-কাছেও না। দিন কয়েক আগে বলেছিল, স্কুল-কলেজের গরমের ছুটি চলেছে, বাচ্চু ক'দিনই দেখেছে দুপুরে রোদে মদন বয়সে বড় বাজে ছেলেদের সঙ্গে খেলা করছে নয়তো আড্ডা দিচ্ছে—ডাকলেও ওর কথা শোনে না তুমি ডেকে একটু ধমকে দিও তো।

শোনামাত্র বাপী তেতে উঠেছিল।—কেন, তুমি কিছু বলতে পারো না? তুমি ধমকে দিতে পারো না?

মিষ্টির সাফ জবাব, পরের ছেলেকে নিয়ে তুমি এত মাথা ঘামাচ্ছ—যা করার তুমিই করো।

বাপীর তক্ষুনি মনে হল, মিষ্টির চোখে এই পরের ছেলের সঙ্গে বাচ্চুর মতো পরের ছেলের অনেক তফাৎ। পিওনের বস্তিঘর থেকে এসেছে বলে শাসনের মর্যাদা দিতেও আপত্তি! সেদিনের মাত্রা-ছাড়া শাসনের মুখে মিষ্টিই আবার বাধা দিয়েছে। বেশি উত্তেজনার ফল জানে। মদনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাপীকে বলেছে, বেশি বাড়াবাড়ি

কোরো না। তুমি চাইলেই—

থেমে গেছে। সে চাইলেই বস্তিঘরের ছেলের স্বভাব এত সহজে বদলাবে না বলতে যাচ্ছিল বোধ হয়। তারপর দেড়-দু'মাসের মধ্যে বাপী তার মুখে এই ছেলের ভালো-মন্দ সম্পর্কে কোনো কথা শোনে নি।

...তারপর সমস্ত সত্তা দুমড়নো যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে বাপীর মুক্তির দিন। গোপনতার শেষ। বাষট্টি সালের জুলাইয়ের দু'তারিখ সেটা।

আগের দিনটা, অর্থাৎ পয়লা জুলাই, দেশের—বিশেষ করে এই বাংলার বিরাট শোকের দিন। ডাক্তার বিধান রায় নেই। বেলা বারোটার পাঁচ মিনিট আগে তাঁর জীবনদীপ নিভেছে। এই দিনে পৃথিবীতে এসেছিলেন। এই দিনেই চলে গেলেন। বাপীর ভিতরটা বিষাদে ছাওয়া। দোষ-গুণ নিয়ে মাটির এমন বিরাট পুরুষ আর কে থাকল?

পরদিন।...অর্থাৎ আজ সকাল। তাঁকে নিয়ে মহাযাত্রা শুরু হয়েছে। তাঁকে শেষ দেখা দেখতে কাতারে কাতারে মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। বাপীও ঘরে বসে থাকতে পারে নি। পায়ে হেঁটেই রাস্তার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। মহাযাত্রা এগিয়ে গেল। বাপী দেখছিল, দেশের মানুষ অকৃতজ্ঞ নয়। চোখের জলে তারা শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

বাপী ফিরে চলেছে। এ-ও মৃত্যু কি মুক্তি, ভাবছে। বাড়ির কাছাকাছি এসে হঠাৎ কিছু চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। রাস্তার ও-ধারে পানের দোকানের সামনে চোদ্দ থেকে সতের আঠের বছরের চার-পাঁচটা ছোকরা জটলা করছে আর সিগারেট টানছে। তাদের মধ্যে মদন! তার মুখেও সিগারেট।

বাপী নিঃশব্দে রাস্তা পেরুলো। ডানা ধরে হিঁচড়ে ওকে রাস্তার এ-পারে নিয়ে এলো। ছেলেটা যমের মুখে পড়েছে বুঝছে। বাড়ি। জামার মুঠো ধরেই বাপী তাকে দোতলায় বড় ঘরটায় এনে ফেলল। তারপর পায়ের থেকে জুতো খুলে এলোপাতাড়ি পিটতে লাগল।

ভিতর থেকে মিষ্টি ছুটে এলো। বাচ্চুও। কিন্তু বাপীর মাথায় খুন চেপেছে। গড়াগড়ি খাচ্ছে ছেলেটা কিন্তু মুখ দিয়ে শব্দ বার করছে না। ওকে একেবারে শেষ না করে বাপী থাকবেই না। মিষ্টি কয়েক পলক বিমূঢ়। সত্রাসে এগিয়ে এসে তাকে থামাতে চেষ্টা করল, দু'হাতে আগলে রাখতে চেষ্টা সরল। চেঁচিয়ে বলে উঠল, বাচ্চু, মদনকে তুলে নিয়ে শিগগীর ঘরে চলে যা!

বাচ্চু তাই করল। বাপী হাঁপাচ্ছে। চাউনিও অস্বাভাবিক।

হাত থেকে জুতোটা কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মিষ্টি আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে? ও কি করেছে?

জ্বলন্ত চোখে তার দিকে চেয়ে বাপী জবাব দিল, রাস্তায় ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে সিগারেট টানছিল...।

শোনামাত্র মিষ্টিও রেগে গেল কি রকম। বলে উঠল, ছোটলোকের ছেলে, বিড়ি সিগারেট খাবে বেশি কথা কি? তা বলে তুমি এত ক্ষেপে গিয়ে নিজের ক্ষতি করবে কেন?

—কি বললে? প্রাণপণ চেষ্টায় বাপী সংযত করতে চাইল নিজেকে। কিন্তু ভিতরে ভূমিকম্প হচ্ছে। গোপনতার কবরটা সবার জ'গ ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।—ও ছোট-লোকের ছেলে হলে সেই ছোটলোক আমি।...ও আমার ছেলে।...শুনতে পাচ্ছ? বুঝতে পারছ? সেই ছোটলোক আমি!

টলতে টলতে বাপী নিজের ঘরে চলে গেল।

মিষ্টি চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে। দু কানের পরদা ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু মগজে

কিছু ঢুকছে না। একটু বাদে পায়ে পায়ে সে-ও ঘরে এসে দাঁড়াল। বাপী খাটের রেলিং-এ ঠেস দিয়ে বসে আছে। উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি। এই মুখের দিকে চেয়ে অদ্ভুত আশংকায় মিষ্টির ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। নিজের আগোচরে দু'পা এগিয়ে এলো।

বাপীর ঘোরালো চাউনি।—কি শুনলে? কি বুঝলে?

মিষ্টি বিড়বিড় করে বলল, এসব কথা থাক এখন...।

—আর থাকবে না। অনেক থেকেছে। উঠে নিজেই দরজা দুটো ভেজিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল।—তোমাকে বলতে না পেরে প্রায় তিন বছর ধরে আমি মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করছি। অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি। তোমার আমার মধ্যে গোপনতা থাকবে না বড়াই করে বলে-ছিলাম—তার শাস্তি ভোগ করছি।...শোনো, আজ আবার বলছি, আমার যা-কিছু ভালো, যা-কিছু মন্দ—সব তোমার জন্যে—শুধু তোমার জন্যে।...লেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তুমি আমার সমস্ত স্বপ্ন চুরমার করে দিয়েছিলে মনে পড়ে? অসিত চ্যাটার্জী আর তার সঙ্গের জনাকতকের অপমানে আমার মাথা মুড়িয়ে দিয়েছিল, মনে পড়ে?

মিষ্টি বিমূঢ় মুখে চেয়ে আছে। নিজের অগোচরে মাথা নেড়েছে কিনা জানে না।

—সেই রাতে আমি পাগল হয়ে গেছলাম। সমস্ত মেয়ে জাতটাকে ভস্ম করে ফেলতে চেয়েছিলাম। সেই রাতে কমলা বণিক এসেছিল। আমি একটুও প্রস্তুত ছিলাম না। অন্ধ-কারের জানোয়ার শুধু তোমার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য মাথা খুঁড়ছিল। সেই অন্ধকারে তোমার বদলে কমলা এসেছিল। সে আমাকে চায়নি ছেলে চেয়েছে। রতন বণিক তার দিদিকে ছেলে দিতে পারে নি, তাকেও দিতে পারবে না বুঝেছিল। আরো দু' রাত আমিই শুধু নরকে ডুবেছিলাম, তারপর চাবুকে-চাবুকে নিজেই নিজেকে রক্তাক্ত করেছি—সজাগ করেছি। পালিয়ে গেছি। কিন্তু কমলাকে ঘৃণা করতে পারি নি। যাবার আগে ও বলেছিল, এরপর তুমি কেবল আমাকে ঘেন্নাই করবে জানি, কিন্তু আমি হয়তো তোমাকে পুজো করেই যাব, আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব যেন তোমাকে ভালো রাখে।

মিষ্টি চেয়ে আছে। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখের সামনে এবার তারও জগৎ ভাঙছে। গুঁড়িয়ে যাচ্ছে কানে যা শুনল তা তলিয়ে ভাবার ফুরসৎ পেল না। তার আগে ভিতরে এ কিসের ঢেউ? ঘৃণা? বিদ্বেষ? সব থেকে বেশি—অবিশ্বাস?

মিষ্টি একরকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাপী খাটে বসল। শুয়ে পড়ল। দু'চোখ আপনা থেকে বুজে এলো। চোখের সামনে অন্ধকারের সমুদ্র। অথচ আশ্চর্য! এই সমুদ্র সে অনায়াসে পার হয়ে যাচ্ছে। চারদিকে আলোর তট উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। সব অন্ধকারে খসে খসে দূরে সরে যাচ্ছে!

মিষ্টি বাচ্চুকে বলেছে ডাক্তার ডাকতে। ডাক্তার এসেছে। দেখে গেছে। আবার ই সি জি করা হয়েছে। তার ফল কি বাপী জানে না। কৌতূহলও নেই। ওরা কেন এত করছে ভেবে পায় না। এত ভালো কি বাপী জীবনে থেকেছে? সাতদিনের মধ্যে মিষ্টি একটা কথাও বলে নি। কিন্তু কাছে এসেছে। কর্তব্য করেছে। রাতের জন্য আবার নার্স এনেছে। বাপী না ঘুমনো পর্যন্ত নিজেও ঘরে থেকেছে। তারপর চলে গেছে। ও প্রচণ্ডভাবে নিজের সঙ্গে যুঝছে, বাপী বুঝতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য, তার জন্যও বাপীর ভিতরে এতটুকু উদ্বেগ নেই। আজ হোক বা দুদিন বাদে হোক, মিষ্টি ওকে বুঝবেই। না বুঝে পারে না। না বোঝা মানে সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা থাকা যায় না।

...সকাল থেকেই বাপীর চোখ-মুখের চেহারা সেদিন অন্যরকম। ভিতরে যেন এক অবাক-করা আনন্দের ফোয়ারার মুখ খুলে গেছে।...কিন্তু মিষ্টি জিত্‌ বাচ্চু তার মুখের দিকে চেয়ে কি বুঝছে? কি বুঝছে? বাপীর হাসি পেয়ে গেল। ওরা ঘাবড়াচ্ছে। আনন্দের ছিটেফোঁটাও টের পাচ্ছে না।

মিষ্টি সারাক্ষণ প্রায় কাছে কাছে আছে। দু-বার করে ডাক্তার এসে দেখে গেল। ডাক্তারের মতে প্রেসার বোধ হয় বেশি হাই। বাপীর হাসি পাচ্ছে। হাতের খোলা বইটা খোলা অবস্থাতেই উল্টে রেখে সকলের মুখগুলো দেখতে লাগল।

বিকেল। মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য মিষ্টি ঘর ছেড়ে গেছল। ফিরে এসে মিষ্টি দেখল বিছানা খালি। খোলা বইটা তেমনি উপুড় করা। ভাবল বাথরুমে গেছে। উঠে তাও যাবার কথা নয়:

মিষ্টি বইটা তুলে নিল। সকাল থেকে মোটা কালিতে লাল দাগ মারা একটা জায়গায় বহুবার করে পড়তে দেখেছে লোকটাকে। পড়েছে। তারপর চোখ বুজেছে। আর নিজের মনেই যেন হেসেছে। হাসিটা যে কি রকম অদ্ভুত লেগেছে মিষ্টির।

এখনো সেই লাল দাগ-মারা পাতা। মিষ্টি পড়ল। ছাপা অক্ষরে ছোট ছেলেদের উপকথার মতো গল্প একটু।

—'গরিব কাঠুরে জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেছল আর মনে মনে দুরবস্থার জন্য নিজেকে অভিসম্পাত করেছিল। সাধুর রূপ ধরে ভাগ্য এসে তার সামনে দাঁড়াল। বলল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল—পেয়ে যাবি। সাহস করে কাঠুরে সেদিন অনেক দূরে চলে গেল। তারপর অবাক কান্ড! সামনে মস্ত একটা চন্দনের পাহাড়। আনন্দে কাঠুরের পাগল হবার অবস্থা। তার দিন ফিরেছে। চন্দন কাঠে থলে বোঝাই করল। আর ভাবল, আস্তে আস্তে সমস্ত পাহাড়টাই তুলে নিয়ে যাবে'

কিছুদিন বাদেই কাঠুরের মনে হল, সাধু তো তাকে থামতে বলে নি—এগিয়ে যেতে বলেছিল। সামনে কি তাহলে আরো বেশি লোভের কিছু আছে নাকি? এগিয়ে চলল। এবারে টাকার পাহাড়! কাঠুরে আনন্দে দিশেহারা। দিন-কতক পাগলের মতো টাকা তোলার পর আবার সেই কথাই মনে হল। সাধু সামনে এগোতে বলেছিল। সামনে আরো কি? আবার চলল। এবারে সোনার পাহাড়। তারপর আবার সেই। আরো সামনে কি? হীরে মুক্তো মানিকের পাহাড়! ব্যস, চাওয়ার না পাওয়ার আর কি থাকতে পারে।

কিছুকাল মত্ত আনন্দে কাটানোর পর বিবেকের আবার সেই তাড়না। সাধু থামতে বলে নি। এগোতে বলেছিল। কিন্তু যা পাবার সব তো পেয়ে গেছে। আর কি পাবে? কোন দিকে এগোবে? বাইরে আর এগোবার কোনো দিক নেই নিজের ভিতরের দিকে চোখ গেল তার। কাঠুরে সেই পথ ধরে এগোতে লাগল। তারপর কি আশ্চর্য? সেখানে যে ঐশ্বর্য—তার আভাতেই যে দু'চোখ ঠিকরে যায়! এমন ঐশ্বর্য যে [illegible] চারিদিকে জ্যোতির সমুদ্র।

খোলা বইটা মিষ্টি তেমনি উল্টে রেখে দিল। একটু বাদেই খেয়াল হল, বাথরুমের এদিকে ছিটকিনি টানা। অর্থাৎ সেখানে কেউ নেই। ত্রস্তে উঠে দাঁড়াল। সব কটা ঘর খুঁজল নেই। নিচে নামতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ঘুরে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে ছাদের দিকে চলল। মাস কয়েকের মধ্যে নিচে নামতে দেখে নি। ছাদে বেড়াতে দেখেছে।

তাই। লম্বা ছাদের এ-মাথা ও মাথা করছে। নড়া-চড়া একেবারে বারণ!

বাপী দেখতেও পেল না। আর একবার ছাদের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় চলে গেল।

ফিরছে। মিষ্টি সামনে মুখোমুখি এগিয়ে গেল। বাপী থমকে দাঁড়াল। মুখে আলগা রক্ত জমাট বেঁধে আছে। চোখ অস্বাভাবিক চকচক করছে। অনেক দূরের কোথাও থেকে ফিরল যেন। ভালো করে দেখতে লাগল। খুব নরম গলায় বলল, মিষ্টি অবিশ্বাস কোরো না, অবিশ্বাস করে কষ্ট পেও না।

মিষ্টির বুকের তলায় মোচড় পড়ছে। একটা অজ্ঞাত ভয় তাকে ছেঁকে ধরেছে। এক হাতে বাপীর একটা হাত ধরল। অন্য হাতে শক্ত করে তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে বলল, ঠিক আছে, চলো—

মিষ্টির মনে হতে লাগল সিঁড়িগুলো বুঝি আর ফুরোবে না। একটু চেঁচিয়েই বলে উঠল, দেখে পা ফেলো—কাঁপছ কেন?

বাপী টেনে টেনে হেসে হেসে জবাব দিল, আনন্দে আনন্দে।

টের পেয়ে বাচ্চুও ছুটে এসেছে। ধরাধরি করে দুজনে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। মিষ্টির চোখের ইশারায় বাচ্চু ডাক্তারকে ফোন করতে ছুটল।

বাপী বেশ আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে শুলো। চোখ বুজল। ঠোঁটে হাসি।

কি একটা চমকের মধ্যে ঘোর কেটে গেল তার। মাঝে কতক্ষণ বা কটা দিন গেছে ঠাওর করতে পারছে না। ঘর ভরতি লোক। একটা অস্পষ্ট কোলাহলের মতো কানে আসছে। কি কাণ্ড, আবু রব্বানীর সঙ্গে এবারে দুলারিও এসেছে! কিন্তু এত আনন্দের মধ্যে ওদের চোখে জল কেন? ঘরের মধ্যে জিত্ মালহোত্রা...শ্বশুর শাশুড়ী দীপুদা...বাচ্চু—দরজার কাছে মদন...বিছানায় মিষ্টি। মিষ্টি চেঁচিয়ে বলছে কিছু। ও এত কাছে...কিন্তু কথাগুলো অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে মনে হচ্ছে কেন? মিষ্টি বলছে আমার সব ভুল ভেঙে গেছে, আমি আর কক্ষনো তোমাকে অবিশ্বাস করবো না, মদন আমার কাছেই থাকবে, আমাকে মা বলে ডাকবে—শুনছ?

...ভালো কথা তো! এত ভালো আর কি হতে পারে? কিন্তু মিষ্টি কাঁদছে কেন? কান্না বাপীর কোন দিন ভালো লাগে না।

...এ কি! এ যে আরো অবাক কাণ্ড! এত কাছের এই মানুষগুলো এতদিন ছিল কোথায়? তারা এত সুন্দরই বা হল কি করে?

—বাবা! আমার দিকে চেয়ে এভাবে দেখছ কি? আর আমার একটুও রাগ নেই তোমার ওপর!

—পিসী? কত দিন দেখো নি আমাকে আচ্ছা জব্দ! আর পালাবে?

—বাঃ! রেশমা! দুষ্টু মেয়ে...এমন করে? সাপের কামড়ের আর একটুও জ্বালা-যন্ত্রণা নেই তো?

—আর একজন...ঠিক এক রকমই আছে, এই মুখ বাপী কখনো ভুলতে পারে?... ঠোঁটের ফাঁকে চুল-চেরা হাসি, দাপটের চাউনি...কিন্তু মুখখানা গায়ত্রী রাইয়ের অত ফ্যাকাশে নয় আর, লালচে। গায়ত্রী মা, তোমার মেয়ে-জামাই খুব ভালো আছে, সুখে আছে—ফুটফুটে একটা নাতনি হয়েছে তোমার জানো তো?

—আমি খুব...খুব অন্যায় করেছি মাস্টারমশায়—কিন্তু আপনি তবু আমাকে বকছেন না কেন? অত হাসছেন কেন?

...সকলের সঙ্গে দেখা হল খুব ভালো হল। কিন্তু তার কি বসে থাকার জো আছে... খুঁজতে হবে না? সামনে এগোতে হবে না? পেতে হবে না? চন্দন কাঠের পাহাড়, টাকার পাহাড়, সোনার পাহাড়, হীরে-মণি-মুক্তার পাহাড়ের পর আর কি কোনো ঐশ্বর্য নেই নাকি? সেই সোনার হরিণ চাও তো ভিতরে খোঁজো। বাইরে কোথাও নেই। বাপী তার আভা দেখেছে, জ্যোতি দেখেছে। বাপী চেয়েছে অথচ পায় নি এমন কিছু আছে?

না, বাপী তরফদারের থামার সময় নেই।

—উপন্যাস সমাপ্ত—